# শরদিন্দু অম্‌নিবাস

# শরদিন্দু অম্‌নিবাস

প্র থ ম খ ণ্ড

ব্যো ম কে শ

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

প্রকাশক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা-৫৪

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫৯
মুদ্রণ সংখ্যা ৪১৫০০

## ব্যোমকেশ-উপন্যাস

সাধারণ গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ গল্প-উপন্যাসের জাতের তফাত আছে। ডিটেক্‌টিভ গল্প-উপন্যাসকে বলতে পারি একরকম শিকার-কাহিনী। অজানা কোন পশু মানুষের প্রাণহানি অথবা অন্যরকম ক্ষতি করেছে; খোঁজ করে, তাড়া করে, ফাঁদ পেতে, বেড়াজালে ঘিরে, কোণ-ঠেসা করে জব্দ অথবা হত্যা করা হল শিকারীর পেশা। আর, অজানা মানুষ জানা মানুষের প্রাণহানি অথবা অন্যরকম ক্ষতি করেছে; তার পরিচয় উদ্ধার করে, তাকে খুঁজে বার করে, তার অপরাধ প্রমাণযোগ্য করে তাকে বিচারালয়ে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো অথবা তাকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করানো হল ডিটেক্‌টিভের কাজ। আবার, শিকার-কাহিনীর সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর তফাতও আছে, সে তফাত গুরুতর। শিকার-কাহিনী পুরোপুরি শিকারীর ব্যাপার, তার এক তরফা কাহিনী। যে কাহিনীতে অন্বিষ্ট অপরাধী জন্তুর তরফ একেবারেই নেই। ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী এমন এক-তরফা নয়, তা দো-তরফা—যেন দাবাবোড়ে খেলা। ডিটেক্‌টিভ বুদ্ধি খেলাচ্ছে অপরাধীকে মাত করতে, অপরাধী বুদ্ধি খাটাচ্ছে ডিটেক্‌টিভের চাল এড়িয়ে চলতে। এই দৃষ্টিতে, ডিটেক্‌টিভ কাহিনীতে দেখতে পাই দুটি ভিন্নমুখী স্রোত। তার মধ্যে একটি হল ডিটেক্‌টিভের কর্ম ও চিন্তা, কেন্দ্রস্থানীয় ও ধীরতর; দ্বিতীয়টি হল অপরাধীর কর্ম ও চিন্তা, উৎকেন্দ্রিক ও বিচঞ্চল। ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর নায়ক বলতে গেলে একটি নয়, দুটি—অপরাধী এবং ডিটেক্‌টিভ। অপরাধী হল মূল কাহিনীর নায়ক, যে ঘটনাসূত্রের জট পাকিয়েছে। ডিটেক্‌টিভ নায়কের প্রতিপক্ষ নয়, নায়কের শত্রুও নয়, সে নায়কের অভিশাপ, তার কর্মফলের পেয়াদা, যে ঘটনাসূত্রের পাকানো জট খুলছে। অতএব বলা যায়, কাহিনীর পক্ষে ডিটেক্‌টিভ যেন বিধি, অধিনায়ক, যার মধ্যে রচয়িতাও খানিকটা আত্মগোপন করে থাকেন। ডিটেক্‌টিভ গল্পের পাত্রপাত্রীর একজন নয়, গোড়া থেকেই তিনি গল্পের আসরে পরিপূর্ণ স্বরূপে আসন গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁর স্বভাবের ও প্রকৃতির কোন আবর্তন-বিবর্তন বা রাখাঢাকা নেই কাহিনীসূত্রের বয়নে। তবে কোন লেখক যদি একই ডিটেক্‌টিভ নিয়ে কিছুকাল ধরে গল্প রচনা করতে থাকেন তবে কখনো কখনো তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে দিয়ে ডিটেক্‌টিভের জীবনসূত্রের কিছু কিছু টুকরা গাঁথা পড়ে যায়। এই ভগ্নাংশগুলি থেকে ধারাবাহিক জীবনীকাহিনী না পেলেও ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তি-পরিচয়, তার আচার-ব্যবহার ও গৃহজীবনের ইঙ্গিত ইত্যাদি যা পাওয়া যায় তাতে আমরা ডিটেক্‌টিভকে যেন আমাদের পরিচিত সাধারণ মানুষের মেলায় কখনো কখনো দেখতে পাই। তার ফলে মূল কাহিনীতে এমন একটু অতিরিক্ত ভালোলাগার সঞ্চার হয় যার নাম দিতে পারি পরিচয়-রস। তাতে পাঠকের আগ্রহ বাড়ে। ইংরেজী ডিটেক্‌টিভ সাহিত্যে এর উদাহরণ অপ্রচুর নয়। বিশেষ করে দুটি ডিটেক্‌টিভের নাম করা যায় যাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় কাহিনী-পরম্পরায় গাঁথা হয়ে পাঠকের চিত্তে বাস্তবতা পেয়েছে—শার্লক হোমস্‌ আর লর্ড পিটার উইম্‌সি। একদা অগণিত পাঠক-পাঠিকা শার্লক হোমস্‌ যে রক্তমাংসের মানুষ নয়, সার আর্থার কোনান্‌ ডয়েলের কল্পনা-সৃষ্ট, সেকথা মানতে চাইত না। এখনকার ভক্ত পাঠকেরা তা মানলেও হোমস্‌কে সত্যিকার মানুষ ভাবতে ভালোবাসেন। এ ভালোলাগার

ভালো পরিচয় তাঁর লণ্ডনের বাসা নিয়ে গবেষণা, তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা, তাঁর "জীবনীগ্রন্থ" রচনা। মানি এ সবই ছেলেখেলা, তবে বুড়ো মানুষের ছেলেখেলা—এ একরকম "পরীর দেশের বন্ধ দুয়ারে হানা" দেওয়া। এ ছেলেখেলা প্রবীণ সাহিত্য-চিন্তার চেয়ে কম সার্থক নয়।

বাংলায় প্রথম মৌলিক ডিটেক্‌টিভ গল্প কাহিনী ধারাবাহিকভাবে লিখেছিলেন পাঁচকড়ি দে। এঁর অধিকাংশ রচনাই উপন্যাস এবং সেগুলির কয়েকটি বেশ বৃহৎকায়। ডিটেক্‌টিভ গল্প ইনি দু'চারটির বেশি লেখেন নি। পাঁচকড়িবাবু প্রধানভাবে অনুকরণ করেছিলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক উইল্‌কি কলিন্‌সের রচনা এবং ফরাসী ডিটেক্‌টিভ-উপন্যাস লেখক এমিল গাবোরিয়োর ইংরেজি অনুবাদ। পরে কোনান্‌ ডয়েলের কাহিনী বার হলে তিনি ডয়েলের রচনা থেকেও মালমশলা কিছু কিছু নিয়েছিলেন। তবে পাঁচকড়িবাবু শার্লক্‌ হোম্‌সকে ছোঁন নি। এঁর ডিটেক্‌টিভেরা পুলিস কর্মচারী (কর্মনিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত) কেননা তখনো ডয়েলের হোম্‌সের মতো স্বাধীন-কারবারী ডিটেক্‌টিভের রেওয়াজ হয় নি। তবে, তিনি একটু অগ্রগামীর কাজ করেছিলেন কোন কোন বিষয়ে। তাঁর দুটি প্রধান ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তি-পরিচয় পুরোপুরি নেপথ্যে রাখেন নি, এমন কি তাঁদের দু'জনের মধ্যে একরকম পারিবারিক সম্বন্ধও স্থাপন করে দিয়েছিলেন। যাঁরা পাঁচকড়িবাবুর উপন্যাস ছেলেবেলায় আগ্রহ করে পড়েছেন তাঁদের হয়ত মনে পড়বে যে অরিন্দম বসু ছিলেন দেবেন্দ্রবিজয় মিত্রের দাদাশ্বশুর-স্থানীয়। নাত-জামাই দাদাশ্বশুরের অনুগত শিষ্য ছিল, দাদাশ্বশুর নাত-জামাইয়ের উন্নতিকামী ছিলেন। তার বেশি খবর কিছু নেই।

পাঁচকড়িবাবু আরও এক বিষয়ে অগ্রগামী ছিলেন। তিনি প্রবীণ ডিটেক্‌টিভকে নবীনের সমভূমিতে রাখেন নি, ঊর্ধ্বভূমিতে তুলেছেন। অরিন্দম যাকে বলে super-sleuth [১] তাইই। এই super sleuth আইডিয়াটি তখনো পাশ্চাত্য ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখকদের মাথায় ভালো করে আসেনি। কোনান্‌ ডয়েলের এসেছিল কিন্তু একটি ছাড়া তাঁর কোন গল্পে super-sleuth নেই। যে গল্পটিতে আছে সেখানেও তা ইঙ্গিতে প্রদর্শিত। ডয়েলের super-sleuth হল শার্লক হোম্‌সের দাদা মাইক্রফ্‌ট হোম্‌স, গবর্নমেন্ট আপিসের কেরানি। (গল্পটি যে পাঁচকড়িবাবুর পড়া ছিল, তার প্রমাণ আছে 'নীলবসনা সুন্দরী'তে। সেখানে অরিন্দম ঠিক হোম্‌সের দাদার মতোই গোয়েন্দাবাজি করেছিলেন)। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, super-sleuth কল্পনার বীজ আমাদের দেশে অনেক কালের। চোর ছাড়া কেউ চোর ধরতে পারে না,—এই ধারণার বশে আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকে ঘাগী চোরকে বশ করে পুলিসের কাজ করানো হত। তাই হাজার বছর আগেকার প্রবাদ ছড়ায় বলেছে, "জো সো চৌর সোউ দুষাধী" অর্থাৎ যে সে চোর, সেই শাস্তিদাতা। চুরি সেকালেও অপরাধ বলে গণ্য হত, এমন কি চুরির সাজায় প্রাণদণ্ড হত, তবুও লোকবিশ্বাসে চুরি বাহাদুরির কাজ বলে লোকে মনে মনে তারিফ করত (অন্তত গল্প-কথায়), এবং চৌর্যবৃত্তি দক্ষ শিল্পীর বিদ্যায় পরিণত হয়েছিল। "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে, যদি না পড়ে ধরা।" ছেলেভুলানো গল্পে যে "বড়" চোরের দেখা পাই তিনিই তখনকার দিনের বড় পুলিস এবং এখনকার দিনের শার্লক হোম্‌সের বড় ভাই মাইক্রফ্‌ট হোম্‌সের ভারতীয় পূর্বপুরুষ

---

১ অতিশায়ী ডিটেক্‌টিভ।

ছেলেভুলানো গল্পের চোর নায়ক super-criminal[২] এবং super-sleuth একাধারে। ঠিক এমনি ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন একজন ফরাসী ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখক মরিস ল ব্লাঁ। তাঁর গল্প-উপন্যাসের নায়ক আরস্যান্‌ লুপ্যাঁ যুগপৎ "চোর" এবং "দুষাধী"। ল ব্লাঁর কোন কোন কাহিনীতে লুপ্যাঁ হোম্‌সের প্রতিপক্ষও হয়েছে। আমাদের সাহিত্যে এমন চোর-পুলিস গল্পের সৃষ্টি হলে মন্দ হয় না। (শরদিন্দুবাবু কি বলেন?)

বাংলাভাষায় নবীন ধারায় ডিটেক্‌টিভ গল্প-কাহিনীর সৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় কোনান্‌ ডয়েলের অনুসরণে একটিমাত্র ডিটেক্‌টিভ ভূমিকার অবতারণা করেছেন তাঁর দীর্ঘদিনের গল্পমালার নায়করূপে[৩]। সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল 'সত্যান্বেষী' গল্পে। ব্যোমকেশ পুলিসের চাকরি করেন না, ডিটেক্‌টিভগিরি তাঁর জীবিকার্থে নয়, সখের, খেয়ালের। সত্য ও তথ্যের অনু-সন্ধানে তাঁর স্বভাবসংগত নিঃস্বার্থ জিজ্ঞাসাবৃত্তি ছিল (লর্ড পিটার উইম্‌সির মতো), তা-ই তাঁকে হোম্‌সের মতো দোঃসাধিক করেছিল। হোম্‌সের সংগে ব্যোমকেশের মিল—নামের মধ্যে অনুপ্রাসের ঝংকারটুকু কানে না তুললে—ওই পর্যন্তই। ব্যোমকেশ হোম্‌সের মতো উৎকেন্দ্রিক প্রকৃতির নয়, বিজ্ঞানদক্ষ নয়, গুণী বেহালাদার নয়, নেশাখোরও নয়, সে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকের বাঙালী যুবক,—শিক্ষিত, মেধাবী, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, সংযতবাক্‌, সহৃদয়। তার চারিত্র্যে মনস্বিতা ও গাম্ভীর্য ছাড়া এমন কিছু নেই যাতে তাকে সমান স্তরের সমান বয়সের বাঙালী ছেলের থেকে স্বতন্ত্র মনে করতে হয়। সুতরাং সখের ডিটেক্‌টিভ বাঙালী ছেলে রূপে ব্যোমকেশ বক্সী সম্পূর্ণ সুসংগত ও সার্থক সৃষ্টি। তাঁর চরিত্রের মতো নামটিও বেশ খাপ খেয়েছে। "ব্যোমকেশ" নামের ধ্বনিগুচ্ছে ধোঁয়া, বুঁদ হয়ে থাকা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক-অপ্রাসঙ্গিক শব্দের ইশারা আছে। হয়ত রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চভূত"-পঞ্চায়েতের প্রধানেরও চরিত্রাভাস আছে। ডয়েলের ডিটেক্‌টিভের নামের প্রতিধ্বনির কথা আগে বলেছি। ব্যোমকেশের পদবীও সমান সার্থক। ব্যোমকেশ পুলিসের মতো চাকরি করেন না, উকীলের মতো ফীও নেন না। তবে বক্‌শিশের—প্রশংসা, যশ, আত্মতৃপ্তি ইত্যাদি ফাঁকা দক্ষিণার—প্রত্যাশা অবশ্যই করেন। তাই ব্যোমকেশের পদবী স-বর্জিত বক্‌সী[৪]।

ডিটেক্‌টিভের সহচর—সহকারী নয়, সুহৃদ—ভূমিকার সৃষ্টি করেছিলেন কোনান্‌ ডয়েল। শার্লক হোম্‌সের বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসনও তাঁর সংগে ইংরেজী সাহিত্যে অমরতাপ্রাপ্ত। অজিত কিন্তু ওয়াটসনের বাংলা সংস্করণ নয়। হোম্‌স ও ওয়াটসনের মধ্যে বয়সের বেশ তফাত ছিল, মানসিক বৃত্তিতেও অসমতা ছিল। অজিত ব্যোমকেশের প্রায় সমান বয়সী এবং তাহাদের মনোবৃত্তি সমান ভূমির। অজিতকে সমসাময়িক ভদ্র বাঙালী যুবকের টাইপ বলা যায়। ব্যোমকেশ-অজিতের সহযোগিতায় শরদিন্দু-বাবুর গল্প-কাহিনী তর্‌তর্‌ করে বয়ে যায়। হোম্‌স ওয়াটসনের সহযোগিতা ওদের

---

২. অতিশায়ী অপরাধী।

৩. 'নায়ক' শব্দটির এক মানে ছিল মধ্যমণি।

৪. তুলনা করতে ইচ্ছা হয় রেক্‌স স্টাউটের দ্বিতীয় ডিটেক্‌টিভের পদবী (Fox)-এর সংগে।

মতো অত ঘনিষ্ঠ ছিল না। সেই জন্যেই হয়ত তাতে অন্য রসের আমদানি সহজ হয়েছে। পৌরাণিক উপমা টেনে এনে বলা যায় হোম্‌স আর ওয়াটসন যেন কৃষ্ণ আর উদ্ধব, ব্যোমকেশ আর অজিত যেন কৃষ্ণ আর সুবল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সখের ডিটেকটিভরূপে ব্যোমকেশের প্রথম প্রবেশ ছদ্মবেশে 'সত্যান্বেষী' গল্পে। কলকাতার চীনাবাজার (?) অঞ্চলে একদা মাসের পর মাস খুন হচ্ছিল, তাতে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, অন্যদিকে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এমন অবস্থায় একদিন ব্যোমকেশ পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই খুনের কিনারা করতে পারব।" পুলিস কমিশনারের অনুমতি নিয়ে ব্যোমকেশ সেই অঞ্চলে এক মেসে কিছুদিনের জন্যে ঠাঁই নিলেন। মেসের কর্তা ঠাঁই নাই বলাতে একজন মেসবাসী অনুকম্পা পরবশ হয়ে নিজের ঘরে স্থান দিয়েছিলেন। সে মেসবাসীর নাম অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সূত্রে রুম-মেট দু'জনের বন্ধুত্ব-সংযোগ এবং অভেদ্য বন্ধন। সে ১৩৩১ সালের কথা।

অজিতের মেসে ব্যোমকেশ এসেছিল ছদ্মনাম নিয়ে—অতুলচন্দ্র মিত্র। দেখে অজিত অনুমান করেছিল, "তাহার বয়স বোধকরি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে।"

অজিতের বয়সও তখন ওই রকম, হয়ত এক আধ বছর কম। সে "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির" হয়েছে। সংসারে বন্ধন নেই। বাপ ব্যাংকে টাকা রেখে গেছেন, তার সুদে স্বচ্ছন্দে একলা জীবন কাটানো যাবে। অজিত স্থির করেছে "কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত" করবে। তবে তখন পর্যন্ত সাহিত্যসাধনায় আদি-পর্বের উদ্যোগই চলছিল। অতঃপর ব্যোম-কেশের তাঁবে এসে সে বান্ধবের চরিত-কথার ব্যাসরূপে একেবারে সভাপর্বে অবতীর্ণ হল।

ব্যোমকেশ থাকত হ্যারিসন রোডের উপর—মনে হয় কলেজ স্ট্রীট ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের মাঝামাঝি কোন স্থানে, নম্বর বলা নেই—একটা বাড়ির তিন তলাটা ভাড়া নিয়ে। সবসুদ্ধ চার-পাঁচখানা ঘর। সংসারের দ্বিতীয় ব্যক্তি পরিচারক পুঁটিরাম। ব্যোমকেশের নির্বন্ধে অজিত এসে তৃতীয় ব্যক্তিরূপে অধিষ্ঠিত হল। পুঁটিরাম সময়মত চা করে দেয়। জলখাবার জোগায়। রান্নাবান্না করে। চৌকস কাজের লোক।

ব্যোমকেশের ফ্ল্যাটের দরজার পাশে পেতলের ফলকে লেখা ছিল দু'ছত্র-শ্রীব্যোমকেশ বক্সী/সত্যান্বেষী। সত্যান্বেষী মানে কি জিজ্ঞাসা করায় অজিতকে ব্যোমকেশ বলেছিল, "ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথা শুনতে ভাল নয়,[৫] গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাপ দিয়েছি সত্যান্বেষী।" আর একদিকেও খেতাপটা সার্থক হয়েছিল। ব্যোমকেশ পরে যে মেয়েটিকে বিয়ে করলে তার নাম সত্যবতী। ডরোথি সেয়ার্সের ডিটেক্‌টিভ লর্ড পিটার উইম্‌সির সঙ্গে হ্যারিয়েট ভেনের বিবাহ ঘটনার সূত্র অনেকটা যেন এমনিই। তবে সত্যবতী নিজে

---

৫ রবীন্দ্রনাথের 'ডিটেক্‌টিভ' গল্প পড়ার ফলে কি?

কোন হত্যাকাণ্ডের আসামী ছিল না, তা ছিল তার দাদা। হ্যারিয়েট ডেন নিজেই সন্দিগ্ধ আসামী ছিল।

ব্যোমকেশের ধরন-ধারণ সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের মতোই। তাঁর অসামান্যতার পরিচয় সহজে পাওয়া যেত না। "বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবত স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধি সংকোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও কিছুকাল ব্যোমকেশেরা হ্যারিসন রোডের বাসায় ছিল। তখন ব্যোমকেশের খোকা হয়েছে এবং ব্যোমকেশ রীতিমত সংসারী। কিন্তু আগেকার মতোই সে স্বকর্মনিরত ও নির্বিচল। অজিত ব্যোমকেশের কীর্তিগাথা পরের পর লিখে ও ছাপিয়ে চলেছে। তারা বইয়ের দোকান খুলেছে। তাতে অর্থাগম বেড়েছে। হ্যারিসন রোডের বাড়িতে আর চলছে না। ১৯৬৮ সালের দিকে "অজিত আর ব্যোমকেশ মিলে দক্ষিণ কলিকাতায় জমি কিনেছে, নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে; শীগ্‌গিরই তারা পুরনো বাসা ছেড়ে কেয়াতলায় চলে যাবে। অজিত একদিকে বইয়ের দোকান চালাচ্ছে অন্যদিকে বাড়ির তদারক করছে"। অজিতের এখন সময়ের টানাটানি যাচ্ছে, ধীরে সুস্থে ব্যোমকেশের কাহিনী লেখবার অবসর পাচ্ছে না। তার লেখার ভঙ্গিও ব্যোমকেশের আর পছন্দ হচ্ছে না; সেকেলে একঘেয়ে বলে মনে হচ্ছে। (সেজন্যে নিশ্চয়ই বইয়ের বিক্রী কমে নি।) হয়ত ব্যোমকেশের সাহিত্যিক হবার বাসনা জেগেছে। যাই হোক, ব্যোমকেশ এখন নিজেই নিজের কীর্তিগাথা লিপিবদ্ধ করবে বলে ঠিক করেছে। তাড়াতাড়ি লিখেও ফেলেছে একটা ('বেণীসংহার')। তবে পাঠকেরা অজিতের লেখনীর অনুপস্থিতি এখনো উপলব্ধি করে পারেনি। এই অবস্থা বর্তমানে চল্‌ছে। তবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে সত্যান্বেষীর দৃষ্টি বুঝি বা অতঃপর কলমের ডগাতেই মাছি হয়ে আটকে যায়। কল্পনাজাল কী সত্যান্বেষীকে সাহিত্যের রসে জারিয়ে দেবে? ব্যোমকেশ চরিত্রের ব্যাসরূপে অজিতের পুনরাবির্ভাবে আমরা পাঠকেরা খুশী হব। বোধকরি সত্যবতীও হবেন।

শরদিন্দুবাবুর ডিটেক্‌টিভ কাহিনীর আলোচনায় নেমে তাঁর ডিটেক্‌টিভ সম্বন্ধেই সাতকাহন করলুম। কেন যে তা, কৈফিয়ৎ অনেকে চাইতে পারেন বলে এখানে দিয়ে রাখি। ডিটেক্‌টিভ গল্পের প্রধান আকর্ষণ গল্পের কাহিনীতে—তার ঘটনার অভিনবত্বে, তার প্লটের প্যাঁচে, তার ভূমিকাগুলির স্বভাবসঙ্গতিতে, ঘটনা-পরম্পরার অনপেক্ষিততায় এবং সব মিলিয়ে অনন্যতায় অথচ সম্ভাব্যতায়। গৌণ আকর্ষণ থাকে ডিটেক্‌টিভের ব্যক্তিত্বে—তার আচরণে, বুদ্ধি প্রাখর্যে এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে। কোন এক লেখক যদি অনেক ডিটেক্‌টিভ কাহিনী লেখেন তবে তিনি সাধারণত ডিটেক্‌টিভ পাল্‌টান না। বড় জোর দু'জন (যেমন আগাথা ক্রিষ্টি) অথবা তিনজন (যেমন রেক্‌স্‌ স্টাউট)। (প্রত্যেক গল্পের জন্য আলাদা করে ডিটেক্‌টিভ সৃষ্টি বোধহয় চতুর্মুখেরও অসাধ্য।) সুতরাং পরপর গল্পে ডিটেক্‌টিভকে নিয়ে পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়তে থাকে এবং এমনও হয় যে প্লটের নিপুণতার চেয়ে ডিটেক্‌টিভের চারিত্র্য গল্প-কাহিনীকে বেশী স্বাদু করে। আমার মতো যাঁরা

ডিটেক্‌টিভ গল্পের মৌতাতী ভক্ত (fans) তাঁরা একথার মর্ম খুঝবেন! শার্লক হোম্‌স, ডাক্তার থর্নডাইক, ফাদার ব্রাউন, এর্ক্যুল পোয়ারো, মিস মার্‌পল, লর্ড পিটার উইম্‌সি, ইন্‌সপেক্‌টর ফ্রেঞ্চ, এলবার্ট ক্যাম্পিয়ন, এ্যাপ্‌লবি, নিরো উল্‌ফ. টিকাম্‌সে ফক্‌স, ডাক্তার গিডিয়ন ফেল, এলোরি কুইন, জজ ডী, ইন্‌সপেক্‌টর চাফিক্‌ ইত্যাদির মেলায় ব্যোমকেশ বক্সীর স্থান। সাহিত্য-লোকের ডিটেক্‌টিভদের মধ্যে এই বিষয়ে ব্যোমকেশের যোগ্যতা কিছু কম নয়। ব্যোমকেশের গল্পগুলির মধ্যে তাঁর নিজের প্রসঙ্গ যেমন ধারাপাতিত হয়ে উপস্থাপিত এমন কোন বিদেশী উদাহরণ মনে আসছে না।

গল্প-লেখক এবং ডিটেক্‌টিভ-কাহিনী লেখকরূপে শরদিন্দুবাবুর দক্ষতা প্রথম গল্পটিতেই প্রকটিত এবং সে দক্ষতা পরে একটুও খর্ব অথবা ম্লান হয়নি। একঘেয়েমি কাটিয়ে ডিটেক্‌টিভ গল্প লেখা বেশ দুরূহ ব্যাপার। এবং তার উপর আরও একটা কথা আছে। যাঁর প্রথম গল্প, কবিতা বা উপন্যাস উৎকৃষ্ট হয়েছে এমন অনেক বাঙালী লেখকের নাম করা যায়। কিন্তু প্রথমবার ভালো লেখার উচ্চমান পরবর্তী রচনা পরম্পরায় অব্যাহত রাখতে পেরেছেন এমন লেখকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম। শরদিন্দুবাবু সেই খুব কম লেখকদের একজন।

শরদিন্দুবাবুর গল্পের গুণ বহুগুণিত করেছে তাঁর ভাষা। কাহিনীকে ভাসিয়ে তাঁর ভাষা যেন তর্‌তর্‌ করে বয়ে গেছে সমাপ্তির সাগরসঙ্গমে। সে ভাষা সাধু না চলিত বলা মুস্কিল। বলতে পারি সাধু-চলিত কিংবা চলিত-সাধু। শরদিন্দুবাবুর স্টাইল তাঁর নিজেরই—স্বচ্ছ, পরিমিত, অনায়াসসুন্দর॥

**শ্রীসুকুমার সেন**

## সূচী

# সত্যান্বেষী

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ' একত্রিশ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম, কৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব। এই সময়টাতে বাঙালীর সন্তান অনেক ভাল স্বপ্ন দেখে,—যদিও সে-স্বপ্ন ভাঙিতেও বেশী বিলম্ব হয় না।

কিন্তু ও কথা যাক। ব্যোমকেশের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল এখন তাহাই বলি।

যাঁহারা কলিকাতা শহরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়তো জানেন না যে এই শহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্যক্‌চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়; কেবল দূরে দূরে দু'একটা পান বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্তির মত সঞ্চরণ করে এবং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে, সে-ও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই এবং মেসের দ্বিতলে একটি বেশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্তত একবার করিয়া পুলিস-রেড্ হইয়া থাকে, তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাজেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ীর বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ ছিল না; তাই ব্যক্তিগতভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপরতলায় সর্বসুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরীজীবী এবং বয়স্থ; শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইঁহারা অনেকদিন হইতে এই মেসে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লইয়া বাড়ী চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার

পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত—সেই সময় মেসের অধিবাসীদের কণ্ঠস্বর ও উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনীবাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন,—তাঁহার স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঘনশ্যামবাবু। ঘনশ্যামবাবু হারিয়া গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তারপর ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত; তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিরুদ্ঘাত শান্তিতে মেসের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল; আমিও আসিয়া নির্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নীচের তলার ঘরগুলি লইয়া বাড়ীওয়ালা নিজে থাকিতেন। ইনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—নাম অনুকূলবাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয় বিবাহ করেন নাই, কারণ, বাড়ীতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনি মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটীভাবে তিনি সমস্ত কাজ করিতেন যে, কোনও দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়ীভাড়া ও খোরাকি বাবদ পঁচিশ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়ীতে বড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করিত। আমিও অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিসে চলিয়া যাইত, বাসায় আমরা দুইজনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায় একসঙ্গেই হইত, তারপর দুপুরবেলাটাও গল্পে-গুজবে সংবাদপত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত, ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিও তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন,—"আর তো কোনও কাজ নেই, ঘরে বসে বসে কেবল বই পড়ি। আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আমি ডাক্তারবাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনীবাবু পান চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন; তারপর ঘনশ্যামবাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়া ঔষধ ডাক্তারবাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকী দুইজনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবুর কাছে তখনও দু'একজন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশমাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাগজে কিছু খবর আছে না কি?"

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় পুলিসের খানাতল্লাসী হয়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে তো নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হল?"

"কাছেই—ছত্রিশ নম্বরে। শেখ আবদুল গফুর বলে একটা লোকের বাড়ীতে।"

ডাক্তার বলিলেন,—"আরে, লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।—কি জন্যে খানাতল্লাসী হয়েছে, কিছু লিখেছে?"

"কোকেন। এই যে পড়ুন না!" বলিয়া আমি 'দৈনিক কালকেতু' তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তার চশমা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"গতকল্য—অঞ্চলে ছত্রিশ নং—স্ট্রীটে শেখ আবদুল গফুর নামক জনৈক চর্ম-ব্যবসায়ীর বাড়ীতে পুলিসের খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত -আছে, সেখান হইতে সর্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্তভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"কথাটা ঠিক। আমারও সন্দেহ হয় কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু'একবার তার ইশারা আমি পেয়েছি,—জানেন তো নানা রকম লোক ওষুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।—কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে তো আমার কোকেনখোর বলে মনে হয় না। বরং সে যে পাকা আফিংখোর একথা জোর করে বলতে পারি। সে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, অনুকূলবাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তার তো খুব সহজ কারণ রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ করে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্বদাই ভয়—পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি যদি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে জান, তাহলে আপনাকে বাঁচতে দেওয়া আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, তাহলে আমি তো জেলে যাবই, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেস্তে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি তা হতে দিতে পারি?" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম,—"আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি!"

"হ্যাঁ। ওদিকে আমার খুব ঝোঁক আছে!" বলিয়া আড়মোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি পায়ের জুতাজোড়াও কালির অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক হইতে অনুকূলবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শুনলুম এটা একটা মেস,—জায়গা খালি আছে কি?"

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূলবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না। মশায়ের কি করা হয়?"

লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"উপস্থিত চাকরীর জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয় আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগা শহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই—সব কানায় কানায় ভর্তি হয়ে আছে।"

সহানুভূতির স্বরে অনুকূলবাবু বলিলেন,—"সীজ্‌নের মাঝখানে মেসে-বাসায় জায়গা পাওয়া বড় মুস্কিল। মশায়ের নামটি কি?"

"অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্যন্ত চাকরীর সন্ধানে টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটী-বাটি বিক্রী করে যে-ক'টা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে

এল,—গুটি পঁচিশ-ত্রিশ বাকী আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন? তাই একটি ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশী দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এই ক'টা দিনের জন্যে দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু জায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।"

অনুকূলবাবু বলিলেন,—"বড় দুঃখিত হলাম অতুলবাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্তি।"

অতুল একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি ওড়িয়াদের আড্ডায় একটু জায়গা পাই।—আর তো কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয়তো টাকাগুলো চুরি করে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন?"

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম,—"আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আপত্তি? বলেন কি মশায়,—স্বর্গ হাতে পাব।" তাড়াতাড়ি ট্যাঁক হইতে কতকগুলো নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল,—"কত দিতে হবে? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভাল হত না? আমার কাছে আবার—"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম,—"থাক্, টাকা পরে দেবেন অখন—তাড়াতাড়ি কিছু নেই—" ডাক্তারবাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম,—"ইনি সংকটে পড়েছেন তাই আপাতত আমার ঘরেই থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্‌গদ স্বরে বলিল,—"আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি! কিন্তু বেশী দিন আমি কষ্ট দেব না—ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও জায়গা পেয়ে যাই, তাহলে সেখানেই উঠে যাব।" বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনার ঘরে? তা—বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি কি বলব? আপনার সুবিধাও হবে—ঘরভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"সে জন্যে নয়—উনি বিপদে পড়েছেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে তো বটেই।—তা আপনি আপনার জিনিসপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুলবাবু। এইখানেই আপাতত থাকুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিসপত্র সামান্যই—একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দারোয়ানের কাছে রেখে এসেছি—এখনই নিয়ে আসছি।"

আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ—স্নানাহার এখানেই করবেন।"

"তাহলে তো ভালই হয়।"—কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূলবাবু অন্যমনস্ক ভাবে কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ভাবছেন ডাক্তারবাবু?"

ডাক্তার চমক ভাঙিয়া বলিলেন,—"কিছু না। বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক্, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূলবাবুর কাছে একটা বাড়তি তক্তপোষ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরীর সন্ধানে

বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিসে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস-পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দু'জনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে নিত্য ওঠা-বসা; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বিশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তারপর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূলবাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম। রোগীর ভিড় কমিয়া গিয়াছিল; দু'একজন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূলবাবু আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। বিশেষ উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোকটাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ' টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন,—"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তাহলে ওর কোমরে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেতো না—আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল; কোকেন কিনতে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয়তো তাদের পুলিসের ভয় দেখায়, blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যস,—খতম্।"

অতুল বলিল,—"কে জানে মশায়, আমার তো ভারি ভয় করছে। আপনারা এ পাড়ায় আছেন কি করে? আমি যদি আগে জানতুম, তাহলে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"তাহলে ওড়িয়াদের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি তো দশ-বারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না বলে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয়নি।"

অতুল ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন—না?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনীবাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"কি হয়েছে অশ্বিনীবাবু? আপনি এ সময় নীচে যে?"

অশ্বিনীবাবু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"না, কিছু না—অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে—" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। প্রৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনীবাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম—তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনীবাবু পূর্বেই খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটা চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর কেবল একটা বালিশ ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না—তাই ভাবিলাম, সে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও তাগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয়তো অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে

লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইভাবে বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোন অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনীবাবুর ঘর; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই তো! এত রাত্রে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইল—হয়তো ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনীবাবু কথা কহিতেছেন।

একবার লোভ হইল, কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম,—হয়তো অশ্বিনীবাবু কোনও রোগের কথা বলিতেছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল,—"কি, অশ্বিনীবাবু ঘরে নেই?"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"না। তুমি জেগে ছিলে?"

"হ্যাঁ। অশ্বিনীবাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন।"

"তুমি জানলে কি করে?"

"কি করে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিশে কান রেখে মাটিতে শোও।"

"কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

"মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।"

কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তারপর পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূলবাবু বলিতেছেন,—"আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়। আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।"

উত্তরে অশ্বিনীবাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দু'জনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমিও ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম,—"ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো? অশ্বিনীবাবুর হয়েছে কি?"

অতুল হাই তুলিয়া বলিল,—"ভগবান জানেন। রাত হল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন?"

অতুল বলিল,—"সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্তায় চটকা ভেঙে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনীবাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়িতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনীবাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল,—"ওহে, ওঠ ওঠ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"অশ্বিনীবাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কি হয়েছে তাঁর?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস—" বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনীবাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূলবাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনীবাবু এত বেলা পর্যন্ত কখনও ঘুমান না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন?

অতুল অনুকূলবাবুর নিকটে গিয়া বলিল,—"দেখুন, দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার তো ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে! ভদ্রলোক হয়তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন? আর দেরী নয়, অতুলবাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের দরজা, তাহার উপর "ইয়েল্ লক্" লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই তিন জন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতী তালা ভাঙিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনীবাবু ঊর্ধ্বমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো ক্ষুর তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে।

নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তারপর অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বলভাবে অশ্বিনীবাবুর বীভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"কি ভয়ানক, শেষে অশ্বিনীবাবু আত্মহত্যা করলেন!"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তারপর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল,—"আত্মহত্যা নয়, ডাক্তারবাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিস ডাকতে চললুম—আপনারা কেউ কোনও জিনিস ছোঁবেন না।"

অনুকূলবাবু বলিলেন,—"বলেন কি, অতুলবাবু—খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল,—তা ছাড়া ওটা—" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন।

অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"তা হোক, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন—আমি এখনই পুলিস ডেকে আনছি।"—সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তারবাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হল!"

পুলিসের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজাহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু

প্রকাশ পাইল না যাহাতে অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনীবাবু অত্যন্ত নির্বিরোধ লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ী যাইতেন। দশ বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুদিন হইতে তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতেছিলেন; এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূলবাবুও এজাহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনী-বাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবান-বন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি:

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনীবাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ী বর্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, একশ' কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই করে থাকেন।

"অশ্বিনীবাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোন বদখেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই; মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করিনি। তিনি গত কয়েক মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোন লক্ষণ ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনীবাবু এসে বললেন,—'ডাক্তারবাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কি কথা?' তিনি এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললেন, —'এখন নয়, আর এক সময়।' বলেই তাড়াতাড়ি অফিস চলে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর আমি, অজিতবাবু আর অতুলবাবু আমার ঘরে বসে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিতবাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোন গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হল অশ্বিনীবাবুর?

"তারপর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মত চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। দরজা বন্ধ করে দিয়ে তিনি আবোল-তাবোল নানারকম বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাঁকে ঠান্ডা করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় বকেই চললেন। শেষে আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বললুম,—'আজ রাত্রে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,—তারপর আজ সকালে এই কান্ড! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।"

অনুকূলবাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা?"

অনুকূলবাবু বলিলেন,—"তা ছাড়া আর কি হতে পারে? তবে অতুলবাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়—অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয়তো বেশী জানেন,

অতএব তিনিই বলতে পারেন।”

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—“আপনিই না অতুলবাবু? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে?”

“আছে। নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাস দেখেছেন,—ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।”

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—“হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি?”

“না।”

“হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি?”

অতুল রাস্তার দিকের জানলাটা নির্দেশ করিয়া বলিল,—“ঐ জানলাটা হত্যার কারণ।”

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন,—“জানলা হত্যার কারণ? আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ঐ জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল?”

“না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।”

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—“আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।”

“স্মরণ আছে।”

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন,—“তবে কি অশ্বিনীবাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন?”

“না, হত্যাকারী অশ্বিনীবাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।”

“সে কি করে হতে পারে?”

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—“খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।”

অনুকূলবাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—“ঠিক তো! ঠিক তো! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকেনি। দেখছেন না দরজায় যে ইয়েল্ লক্ লাগানো।”

দারোগা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—“তাও তো বটে—”

অতুল বলিল,—“দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ভিতর থেকে ছাড়া খোলবার উপায় নেই।”

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—“সে ঠিক। কিন্তু একটা জায়গায় খট্‌কা লাগছে। অশ্বিনীবাবু যে রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলেন তার কি কোন প্রমাণ আছে?”

অতুল বলিল,—“না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণই আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।”

আমি বলিলাম,—“আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।”

দারোগা বলিলেন,—“তবে? অশ্বিনীবাবু রাত্রে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও তো সম্ভব বলে মনে হয় না।”

অতুল বলিল,—“না। কিন্তু আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনীবাবু গত কয়েক মাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।”

“রোগে ভুগছিলেন? ওঃ! ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন অতুলবাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।” দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন,—“আপনি দেখছি বেশ intelligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না! এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু এদিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তাহলে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁসিয়ার লোক, তাতে সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের

সন্দেহ হয়?" বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূলবাবু বলিলেন,—"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায়ই একটা-দুটো খুন হয়, এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সামনে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সুতোয় গাঁথা,—একটার কিনারা হলেই অন্যটার কিনারা হবে। অবশ্য যদি অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড বলে মেনে নেওয়া হয়।"

দারোগা বললেন,—"তা হতে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় বসে থাকলে বোধহয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।"

অতুল বলিল,—"দারোগাবাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তাহলে ঐ জানলাটার কথা ভাল করে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন,—"সব কথাই আমাদের ভাল করে ভেবে দেখতে হবে, অতুলবাবু। এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাস করতে চাই।"

তারপর উপরে নীচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে পারে। অশ্বিনীবাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু' একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরের শূন্য খাপটা বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য করিতেন এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনীবাবুর মৃতদেহ পূর্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয় সীলমোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনীবাবুর বাড়ীতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্রেরা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনীবাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীরভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কি? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দিন কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধগম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিহ্ন মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম,—"বাসার সকলেই তো মেস ছেড়ে চলে যাবার জোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূলবাবু বলিলেন,—"তাঁদের তো দোষ দেওয়া যায় না, অজিতবাবু! এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন!—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—একে খুন বলা যেতে পারে কি করে? আর যদি খুনই হয়, তাহলে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা তো খুন সম্ভব হতে পারে না। প্রথমতঃ, হত্যাকারী উপরে উঠল কি করে? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ তো আপনারা সকলে জানেন। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল,—কিন্তু সে অশ্বিনীবাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করলে কি করে? এ কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয়নি এ কথা নিশ্চিত। তা হলে বাকি থাকেন কারা?—যাঁরা মেসে থাকেন। এঁদের মধ্যে অশ্বিনীবাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি? সকলকেই আমরা বহুকাল থেকে জানি—কেউ এ কাজ করতে পারেন না। অবশ্য অতুলবাবু অল্পদিন হল এসেছেন—তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"অতুল—?"

ডাক্তারবাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—"অতুলবাবু লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

আমি বলিলাম,—"অতুল? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনীবাবুকে—"

ডাক্তার বলিলেন,—"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কাজ করতে পারেন না। তাহলে বাকি থাকে কি?—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও তো একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে—কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে।—এই সম্প্রদায়ের সর্দার কে তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ—মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন—"এখন মনে করুন, অশ্বিনীবাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দার হন?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—"সে কি? তাও কি কখনও সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন,—"অজিতবাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রে অশ্বিনীবাবু আমাকে যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয়—খুব সম্ভব তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বলতে পারে, হয়তো এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন!—ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না?"

এই অভিনব থিয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম,—"কি জানি ডাক্তারবাবু, আমি তো কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিসকে খুলে বলুন।"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"কাল তাই বলব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

দুই তিনটা দিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। মনের একান্ত অশান্তির উপর সি-আই-ডি বিভাগের বিবিধ কর্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পালাই পালাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পালাইতেও সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিস তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইশারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল—পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না তো?

সেদিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্-এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারিতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকার ছাপ মারা ছিল; ডাক্তারবাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকা কিম্বা জার্মানী হইতে ঔষধ আনাইয়া লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অর্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু, আপনি বিদেশ থেকে ওষুধ আনান কেন? দেশী ওষুধ কি ভাল হয় না?"

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল,—“এরিক্ এণ্ড হ্যাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরী করে?”

“হ্যাঁ।”

“আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে? আমার তো বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?”

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—“এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?”

অতুল বলিল,—“হয়তো রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কি না।”

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, —“খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে না কি?”

“আছে” বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম,—“হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোন কিনারা হয় নাই। পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগ এই হত্যা-রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।”

“ছাই হবে। ঐ আশা করা পর্যন্ত।” ডাক্তারবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“এ কি! দারোগাবাবু—”

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুইজন কনেস্টবল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব-পরিচিত দারোগা; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—“আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোন ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যাণ্ডকফ লাগাও।” একজন কনেস্টবল ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল,—“এ কি!”

দারোগা বলিলেন,—“এই দেখুন ওয়ারেণ্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হল। আপনারা দু'জনে একে অতুলচন্দ্র মিত্র বলে সনাক্ত করছেন?”

নিঃশব্দে অভিভূতের মত আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,—“শেষ পর্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়। —অজিত, কিছু ভেবো না—আমি নির্দোষ।”

একটা ঠিকা গাড়ী ইতিমধ্যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিস সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন,—“অতুলবাবুই তাহলে—! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।”

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে ক্ষোভে মর্মপীড়ায় আমি যেন দিগভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—“এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা—”

আমার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিসপত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া

পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভালবাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে,—সে নির্দোষ। তবে কি পুলিস ভুল করিল! আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে অশ্বিনীবাবু হত হন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝের বালিশের উপর কান পাতিয়া ডাক্তারের সহিত অশ্বিনীবাবুর কথাবার্তা শুনিতেছিল। কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তারপর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—একেবারে সকালে ঘুম ভাঙিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি—

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে, এ খুন—আত্মহত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসী পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিম্বা, এমনও তো হইতে পারে যে, নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এ কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিস ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপ নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বেলা তিনটা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকীলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত কিছুই জানা ছিল না, উকীলও কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকীল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি—সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ—অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দোষ, এ আন্দোলন মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে একজন জামীন পাওয়া গেল—তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম,—"উকীলের বাড়ী।"

অতুল সস্নেহে আমার একটা হাত চাপিয়া দিয়া বলিল,—"আমার জন্যে? তার আর দরকার নেই ভাই। আপাতত কিছু দিনের জন্যে ছাড়ান্ পাওয়া গেছে।"

দু'জনে ঘরের মধ্যে আসিলাম। অতুল ময়লা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"উঃ, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া নেই। তুমিও তো দেখছি নাওনি খাওনি! বেচারি! চল চল, মাথায় দু'ঘটী জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দেওয়া যাক। নাড়ী একেবারে চুঁইয়ে গেছে।"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম,—"অতুল,—তুমি—তুমি—"

"আমি কি? অশ্বিনীবাবুকে খুন করেছি কিনা?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল—"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধরেছে দেখছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তারবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল,—"অনুকূলবাবু, ঘষা দোয়ানীর মত আবার আমি ফিরে এলুম। ইংরাজীতে একটা কথা আছে না—bad penny, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম,—পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"অতুলবাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিস আপনাকে নির্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর—আপনার—; বুঝতেই তো পারছেন, পাঁচজনকে নিয়ে মেস। এমনিতেই সকলে পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই—কিন্তু—"

অতুল বলিল,—"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা তো যায় না, পুলিস হয়তো শেষে আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জে ফেলবে।—তা, আজই কি চলে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন,—"না, আজ রাতটা থাকুন; কিন্তু কাল সকালেই—"

অতুল বলিল,—"নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব,—শেষ পর্যন্ত ওড়িয়া হোটেল তো আছেই।" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসাভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,—"অতুলবাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি—কিন্তু উপায় কি বলুন? একে তো মেসের বদনাম হয়ে গেছে—তার উপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি,—সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম,—"তা—আপনার মেস, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম; ডাক্তার লজ্জিত বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি এমন সময় ঘনশ্যামবাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। সম্মুখে অতুলকে দেখিয়া তিনি যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন, পাংশুমুখে বলিলেন,—"অতুলবাবু আপনি—আপনি—?"

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমিই বটে ঘনশ্যামবাবু। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ঘনশ্যামবাবু বলিলেন,—"কিন্তু আপনাকে তো পুলিসে—" এই পর্যন্ত বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অতুলের চক্ষু কৌতুকে নাচিয়া উঠিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিস ছুঁলে বোধ হয় আটান্ন। ঘনশ্যামবাবু আমায় দেখে বিশেষ ভয় পেয়েছেন দেখছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল,—"ওহে দেখ তো, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখিলাম, বিলাতী তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"বিলিতি তালায় ঐ মুস্কিল; ভাল আছেন তো বেশ আছেন, খারাপ হলে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দেশী হুড়কো ভাল। যা হোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নের পূর্বে অতুল বলিল,—"অজিত, মাথা ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে—কি করি বল তো?"

আমি বলিলাম,—"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাওনা।"

অতুল বলিল,—"হোমিওপ্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে?—আচ্ছা চল, দেখা যাক্—হুমো পাখীর জোর।" .

আমি বলিলাম,—"চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল,—"আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে—কিছু ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডাক্তার খুশী হইয়া বলিলেন,—"বিলক্ষণ! পারি বৈ কি! পিত্তি পড়ে মাথা ধরেছে —বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারি হইতে নূতন ঔষধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া দিলেন—"খান, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।—অজিতবাবু,

আপনার চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না—উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে—না? শরীর ঢিস-ঢিস্ করছে? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন—শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।”

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল,—“ডাক্তারবাবু, ব্যোমকেশ বক্সী বলে কাউকে চেনেন?”

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,—“না। কে তিনি?”

অতুল বলিল,—“জানি না। আজ থানায় তাঁর নাম শুনলুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।”

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—“না, আমি তাঁকে চিনি না।”

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম,—“অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।”

“কি বল্‌ব?”

“তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না, সব কথা খুলে বলতে হবে।”

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—“আচ্ছা, বলছি। এস, আমার বিছানায় বস। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম।”

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমার পাশে বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতেই ছিল, ভাবিলাম, সেটা খাইয়া নিশ্চিন্তমনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল,—“এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর খেয়ো।”

সুইচ তুলিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া অতুল আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিযা অতুল বলিল,—“আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল সব খুলে বল্‌ব।” রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,— “এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।”

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়াছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। অতুল যে জিনিসটি দিয়াছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনিলাম না কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইশারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তারপর কখন দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না; সহসা অতুলের বিছানার উপর থপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডাণ্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আলোর সুইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ডাক্তার অনুকূলবাবু!

অতুল বলিল,—“বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তারবাবু, আপনার মত পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করলে!—ব্যাস্! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন। হ্যাঁ, নড়েছেন কি গুলি করেছি। অজিত, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দাও তো—বাইরেই পুলিস আছে।—

খবরদার—”

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সংগে সংগে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাহার চোয়ালে হাতুড়ির মত লাগিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটিতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল,—“বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি!”

“অপরাধ কি একটা, ডাক্তার, যে মুখে মুখে বলব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিস অফিসে তৈরী হয়েছে—ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাতত—”

চার পাঁচজন কনেস্টবল সংগে করিয়া দারোগা ও ইন্‌সপেক্টর প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল,—“আপাতত, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করবার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ করছি। ইন্‌সপেক্টরবাবু, ইনিই আসামী।’

ইন্‌সপেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—“এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে,—আমারও টাকার অভাব নেই।”

ব্যোমকেশ বলিল,—“তা তো নেই-ই। এত কোকেন বিক্রীর টাকা যাবে কোথায়!”

বিকৃত মুখে ডাক্তার বলিল,—“আমি কোকেন বিক্রী করি তার কোনও প্রমাণ আছে?”

“আছে বৈ কি ডাক্তার! তোমার সুগার-অফ-মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।”

জোঁকের মুখে নুন পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্তমধ্যে তেমনই কুঁকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল, এ যেন আমার সেই সাদাসিধা নির্বিরোধ অনুকূলবাবু নহে, একটা দুর্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এতদিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—“কি ওষুধ আমাদের দুজনকে দিয়েছিলে ঠিক করে বল দেখি ডাক্তার? মর্ফিয়ার গুঁড়ো—না? বল্‌বে না? বেশ, বোলো না,—কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।” একটা চুরুট ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল,—“দারোগাবাবু, এবার আমার এত্তালা লিখুন।”

ফার্স্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানাতল্লাস করিয়া দুটি বড় বড় বোতলে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“এখানে তো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়—সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।”

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীর তেতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী

সত্যান্বেষী

ব্যোমকেশ বলিল,—“স্বাগতম্! মহাশয় দীনের কুটীরে পদার্পণ করুন।”

জিজ্ঞাসা করিলাম,—“সত্যান্বেষীটা কি?”

“ওটা আমার পরিচয়। ডিটেক্‌টিভ কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও

খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি—সত্যান্বেষী। ঠিক হয়নি?"

সমস্ত তেতলাটা ব্যোমকেশের—গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একলাই থাক বুঝি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—"দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ?"

"প্রায় বছরখানেক,—মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্যে তোমাদের বাসায় স্থান পরিবর্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি স্টোভ্ জ্বালিয়া চা তৈয়ার করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আঃ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধরে ফেলেছিল।—দোষ অবশ্য আমারই!"

"কি রকম?"

"পুলিসের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা পড়ে গেলুম—বুঝতে পারছ না? ঐ জানলা দিয়েই অশ্বিনীবাবু—"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আচ্ছা, তাই বলছি। কতক তো কাল রাত্রেই শুনেছ—বাকিটা শোন। তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়ে চলেছিল, তা দেখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট, অন্য দিকে খবরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে দিয়ে আরও অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম—'আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্টিভ, আমার বিশ্বাস আমি এই সব খুনের কিনারা করতে পারব।' অনেক কথাবার্তার পর কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন; শর্ত হল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানবে না।

"তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জানত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই জায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশী ভালমানুষ বলে মনে হয়েছিল এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সেজে বসা যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয়নি।

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হল অশ্বিনীবাবু মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধহয়, সেদিন রাস্তার উপর একজন ভাটিয়ার লাস পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তার যখন শুনলে যে, তার ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্তের জন্য এমন একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তারপর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনীবাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে, অশ্বিনীবাবু আমাদের কথা শুনতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চলে গেলেন।

"অশ্বিনীবাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হল হয়তো তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কান পেতে যা শুনলুম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হল না। শুধু এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি ভয়ংকর একটা কিছু দেখেছেন। তারপর সে-রাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোনও কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকে রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারছ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জানতে দিত না যে, সে এই কাজের সর্দার! যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এইভাবে সে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবতঃ ডাক্তারের দালাল ছিল, হয়তো তারই মারফত বাজারে কোকেন সরবরাহ হত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হতেও পারে। সে-দিন রাত্রে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয়তো লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্ট করে—পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই—যেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছন পিছন গিয়ে তাকে শেষ করে দেয়।

"অশ্বিনীবাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্বুদ্ধিতার বশে সে-কথা ডাক্তারকেই বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয়তো তাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হল কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে বললুম যে, ঐ জানলাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, তখন সে বুঝলে, আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি। সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারে ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সাবধানে দিন কাটাতে লাগলুম।

"তারপর পুলিস এক মস্ত বোকামি করে বস্‌ল, আমাকে গ্রেপ্তার করলে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি আবার মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা;—কিন্তু সে ভাব গোপন করে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদারতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না।

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাসী করে কোকেন বার করে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে শুরু করলুম। দরজার তালায় পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ করে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল—আমরা রাত্রে দরজা বন্ধ করে শুতে পারব না।

"তারপর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দুজনকে দু' পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমুব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জানতে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি?"

আমি বলিলাম,—"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?"

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা তো তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হত না? এ বাসাটা নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—"না ভাই, প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক জায়গায় না থাকলে আর মন টিকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ-অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বল্‌ছ?"

"সত্যি বল্‌ছি।"

"তবে তুমি থাকো, আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।"

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল,—"সেই সঙ্গে আমার জিনিসগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

# পথের কাঁটা

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াশা-বর্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলার আলো ঝলমল করিতেছিল। বাড়ীর তেতলার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে শহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ী-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশেও এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াই পাখীগুলো অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অনেক ঊর্ধ্বে একঝাঁক পায়রা কলিকাতা শহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় ঊর্ধ্ব হইতে আরো ঊর্ধ্বে উঠিতেছে। বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুইজন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানালার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল,—"কিছুদিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ্য করেছ?"

আমি বললাম,—"না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল,—"বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ার কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়! ওসব পড়ে লাভ কি? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝকঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পর্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম—"ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রী হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিনে-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দী আঁটছে,—এইসব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু,—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটা কি শুনি?"

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—"পড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।"
পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিন লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

"পথের কাঁটা"

"যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেডল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্পপোস্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।"

দুই তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ল্যাম্পপোস্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে! এ বিজ্ঞাপনের মানে কি? আর পথের কাঁটাই বা কি বস্তু?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি। বিজ্ঞাপনটা তিন মাস ধরে ফি শুক্রবারে বার হচ্ছে, পুরনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই তো লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে? এর তো কোন মানেই হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপাতত কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।—লেখাটা পড়লে একটা জিনিস সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"কি?"

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা। প্রথমতঃ দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের অফিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়। সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তারপর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়,—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বলছেন,—'ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও তো অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো,—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।'—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর তুমি ঐ জিনিসটা চাও। তোমার কর্তব্য কি? নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর কি হল?"

"কি হল?"

"শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঐ জায়গায় কি রকম লোক-সমাগম হয় সেটা বোধ হয় তোমাকে বলে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটওয়ে লেডল্, ওদিকে নিউ মার্কেট, চারিদিকে গোটা পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস। তুমি ল্যাম্পপোস্ট ধরে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হল না,—কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হল না। তুমি বিরক্ত হয়ে চলে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো। তারপর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? চোরে-কামারে দেখা হল না অথচ সিঁধকাটি তৈরী হবার বন্দোবস্ত

হয়ে গেল। বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে তোমার লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"যদি তোমার যুক্তিধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তাহলে কি প্রমাণ হয়?"

"এই প্রমাণ হয় যে, 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হতে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল,—"আরে, অনুমানই তো আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence বলে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চলে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম না। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ ব্যোমকেশের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন কাজ। সুতরাং নীরব থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরো জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখী কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, ঐ পাখীটা কি চায় বলতে পার?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—"কি চায়? ওঃ, বোধহয় বাসা তৈরী করবার একটা জায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো? কোন সন্দেহ নেই?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—"কি করে বুঝলে? প্রমাণ কি?"

"প্রমাণ আর কি! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায়?"

দেখিলাম ব্যোমকেশের ন্যায়ের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি।

কহিলাম, "না,—তবে—"

"অনুমান। পথে এস! এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন?"

"দেয়ালা করিনি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, চড়াই পাখী সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে?"

"কেন নয়?"

"তুমি যদি কুটো মুখে করে একজনের জানলায় উঠে বসে থাক, তাহলে কি প্রমাণ হবে যে, তুমি বাসা বাঁধতে চাও?"

"না। তাহলে প্রমাণ হবে যে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কি?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল,—"চটাতে পারবে না। কিন্তু কথাটা তোমার মানতেই হবে,—প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।"

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম,—"কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব

উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সে তোমার মনের দুর্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মত লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল। কাল শনিবার, বিকেলে কোনো কাজও নেই। কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেবো।"

"কি ভাবে?"

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল, —"অপরিচিত ব্যক্তি—প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না—হাতে লাঠি আছে—কে ইনি? নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তেতলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বাহিরের দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল,—"ভেতরে আসুন— দরজা খোলা আছে।"

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সী স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রূপার মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবন্ধ কোট, পরিধানে কোঁচান থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তেতলার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল,—"অনুমান! অনুমান!"

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোকটি দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ডিটেক্‌টিভ ব্যোমকেশবাবু কার নাম?"

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, —"বসুন! আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেক্‌টিভ কথাটা আমি পছন্দ করি না; আমি একজন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড় বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্, তারপর আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে গ্রামোফোন-পিন রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা একেবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মত ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি জানলেন কি করে?"

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল—"অনুমান মাত্র। প্রথমতঃ আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়তঃ আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়তঃ আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা— আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং"—কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে, কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা শহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ট্রি' নাম দিয়া শহরের দেশী-বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকে মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের জল্পনা উত্তেজনায় একেবারে দাঁড়ছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্বে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই,—মাস দেড়েক পূর্বে সুকীয়া স্ট্রীট নিবাসী জয়হরি সান্ন্যাল নামক

জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাথে যাইবার জন্য তিনি যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কিসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে—আর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিস অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক্ হইতে বক্ষের চর্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃতব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কি না এবং যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ইহা সংঘটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না,—এই হত্যার উদ্দেশ্য কি এবং যে হত্যা করিয়াছে তাহার ইহাতে কি স্বার্থ! সরকারের পুলিস যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজীরা ফতোয়া দিলেন যে, ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভাল সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে শহরের সকল সংবাদপত্রে দেড়-ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল,—

আবার গ্রামোফোন পিন

**অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য**

**কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়**

"কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্বে জয়হরি সান্ন্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামোফোন পিন বাহির হয় এবং ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্ণে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়ীতে তুলিল, কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল-মধ্যেই পুলিস আসিয়া পড়িল। কৈলাসবাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ছিল, পুলিস তাঁহার

বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামোফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূরকর্মা নরঘাতক কলিকাতা শহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

"কৈলাসবাবু অতিশয় হৃদয়বান্ ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসবাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাসবাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

"পুলিস সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলিল। পুলিস সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়া দূরের কথা, গ্রামোফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্যন্ত দেখা গেল না।

পনের দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট রৈ-রৈ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা সম্বন্ধেও সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মত একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িংরুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটি অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা শহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কি করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাজে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিটেক্‌টিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুতঃ সে যে একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভাল রকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না জানি না; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুকু সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয় তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, একদিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিসের দ্বারা কিছু হবে না, তাদের কাছে আমি যাইনি, মশায়। দেখুন না, চোখের সামনে দিনে-দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি? আমিও তো প্রায় গিয়েছিলাম আর একটু হলেই।" তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—"আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন। এ ব্যাপারের কিনারা যদি কেউ করতে পারে তো সে পুলিস নয়। আমাকে গোড়া থেকে সমস্ত কথা খুলে বলুন, অ-দরকারী বলে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারী কিছু নেই।"

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার নাম শ্রীআশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি। আঠারো বছর বয়স থেকে সারা জীবন ব্যবসা উপলক্ষে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি—বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাইনি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেণ্ডি-গেণ্ডি আমি ভালবাসি না, তাই কোনওদিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয়নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয়নি—আসছে মাঘে একান্ন বছর পুরবে। প্রায় বছর দুই হল কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চলে যায়। বাড়ীভাড়াও দিতে হয় না, বাড়ীখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার শখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"অবশ্য পোষ্য কেউ আছে?"

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না। আত্মীয় বলতে বড় কেউ নেই, তাই ও হাঙ্গামা পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ী ঢুকতে দিই না।"

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করল, "ভাইপোটি কোথায় থাকেন?"

আশুবাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন,—"আপাতত শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামি করার জন্যে এবং পুলিসের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে দু'মাস জেল হয়েছে।"

"তার পর বলে যান।"

"বিনোদ ছোঁড়া,—আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক'দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গামা ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্ট করিনি; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুরী। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

"কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই, জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী ফিরে আসি। হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ী ফিরছি, আমহার্স্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ন'টা। রাস্তায় তখনও গাড়ী-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস করে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হতে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হল, আমার বুক-পকেটের ঘড়ির ওপর কে যেন

একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ি বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচখানা গুঁড়ো হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।"

আশুবাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ির বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন সেই ঘড়ি—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গান-মেটালের পকেট ঘড়ি বাহির করিল। ঘড়ির কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামোফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে পশ্চাদ্দিকে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়িটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃসংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবিলের উপর রাখিয়া আশুবাবুকে বলিল,—"তারপর?"

আশুবাবু বলিলেন,—"তারপর কি করে যে বাড়ী ফিরে এলাম সে আমিই জানি আর ভগবান জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারিনি। ভাগ্যে পকেটে ঘড়িটা ছিল, তাই তো প্রাণ বেঁচে গেল—নইলে আমিও তো এতক্ষণ হাসপাতালে মড়ার টেবিলে শুয়ে থাকতাম—" আশুবাবু শিহরিয়া উঠিলেন—"এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কি করে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়ীতে চড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয়নি—কি জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশুবাবুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল,—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন; আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর কোন ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তাহলে আপনাব প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।"

আশুবাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশবাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"এ তো খুব ভাল কথা। সবসুদ্ধ তাহলে তিন হাজার হল—গভর্নমেণ্টও দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগল ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?"

"কি রকম শব্দ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ।"

আশুবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—"না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কোন রকম শব্দ?"

"আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দই শুনেছিলাম। আর মনে হচ্ছে যেন—যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইক্লের ঘণ্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেননি?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন আরম্ভ করিল,—"আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেননি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস?"

একটু ইতস্তত করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"না।"

"উইল করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন?"

আশুবাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সংকোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন,—"আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ঐ প্রশ্নটি আমায় করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—প্রাইভেট—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল,—"আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিস—তিনি যে-ই হোন—আপনার উইলের কথা জানেন কি?"

"না। আমি আর আমার উকীল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আশুবাবু বলিলেন,—"হয়।"

"আপনার ভাইপো কতদিন হল জেলে গেছে?"

আশুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন,—"তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আজ তাহলে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঘড়িটা রেখে যান; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশুবাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে তো কোন ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারতপক্ষে বাড়ী থেকে বেরুবেন না।"

আশুবাবু পাণ্ডুর মুখে বলিলেন,—"বাড়ীতে আমি একলা থাকি,—যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না, বাড়ীতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।"

আশুবাবু জিজ্ঞাস করিলেন,—"বাড়ী থেকে একেবারে বেরুতে পাব না?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার, রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

আশুবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"তুমি ভাবছ, আমি আশুবাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন এবং বাড়ীতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি করে?"

চকিত হইয়া বলিলাম,—"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ-- সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কি হতে পারে, ভেবে দেখেছ?"

"না। কি কারণ?"

"এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথম, রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম,—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এমন কি অস্ত্র হতে পারে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম,—"আচ্ছা, এমন কোন বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরী করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোঁড়া যায়?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু' একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিম্বা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন? সে তো নির্জন স্থানই খুঁজবে। বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুঁড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে। কথায় বলে—শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কিসে?'

আমি বলিলাম,—"মনে কর, যদি এয়ার-গান হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল,—"এয়ার-গান ঘাড়ে করে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।—না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কি করে?"

আমি বলিলাম,—"তুমিই তো এখনি বলছিলে,—শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল,—"ঠিক তো—ঠিক তো—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি হল?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল,—"কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সূতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

"কি রকম?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল,—"প্রথমতঃ দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশুবাবু—যিনি ঘড়ির কল্যাণে বেঁচে গেছেন—তিনিও প্রৌঢ়। তারপর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান লোক ছিলেন,—হতে পারে কেউ বেশী ধনী কেউ কম ধনী, কিন্তু গরীব কেউ নয়। তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং শেষ কথা—এইটেই সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য—তাঁরা সবাই অপুত্রক—"

আমি বলিলাম,—"তুমি তাহলে অনুমান কর যে—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান এখনও আমি কিছুই করিনি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরিজীতে যাকে বলে premise."

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এই ক'টি premise থেকে অপরাধীদের ধরা—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একেবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজওয়ালারা 'মার্ডারস্ গ্যাং' বলে যতই চীৎকার করুক, গ্যাংএর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান। এক কথায়, পরব্রহ্মের মত ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—"এ কথা তুমি কি করে বলতে পারো? কোন প্রমাণ আছে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্যবেধ করবার শক্তি পাঁচ জন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে,—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয়নি। আশুবাবুর কথাই ধর, ঘাড়টি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি? এমন টিপ কি পাঁচ জনের হয়? এ যেন চক্রাছিদ্রপথে মৎস্য-চক্ষু বিদ্ধ করার মত,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে তো? ভেবে দেখ, সে কাজ একা অর্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বৈ দু'জনের ছিল না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল—সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুতঃ এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরী, ল্যাবরেটরী, মিউজিয়ম ও গ্রীনরুম। আশুবাবুর ঘাড়টা তুলিয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাতত স্নানের বেলা হয়ে গেছে।"

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কি কাজে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবিলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ঐ কার্যটা একত্র না করিলে মনঃপূত হইত না।

একটা চুরুট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল; বলিল, —"আশুবাবু লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয়?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম,—"কেন বল দেখি? আমার তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়—নিরীহ ভালমানুষ গোছের—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আর নৈতিক চরিত্র?"

আমি বলিলাম,—"মাতাল ভাইপোর উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র তো ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্ক লোক। বিয়ে করেননি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা করে থাকেন তো অন্য কথা; কিন্তু এখন আর ওঁর সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল,—"বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশুবাবু নিত্য গানবাজনা করে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ী। স্ত্রীলোকের বাড়ী বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, কারণ, বাড়ীর ভাড়া আশুবাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দু'টি প্রাণীর বৈঠককে কোন মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে! বুড়োর প্রাণে তো রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তের বছর ধরে আশুবাবু এই নাগরিকাটির ভরণ-পোষণ করে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠার অভাব নেই, আশুবাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীত-পিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই; দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম,—"তাই না কি? সঙ্গীত-পিপাসু সেজে ঢোকবার মতলব করেছিলে বুঝি? নাগরিকাটির দর্শন পেলে? কি রকম দেখতে শুনতে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"একবার চকিতের ন্যায় দেখা পেয়েছিলুম। কিন্তু রূপবর্ণনা করে তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়, অপূর্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড় জোর উনিশ কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না করে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ আশুবাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা। তা ছাড়া, আশুবাবুর উইলের ওয়ারিস সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল—"

"ইনিই তাহলে আশুবাবুর উত্তরাধিকারিণী?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে আর একটি ভদ্রলোকের দেখা পেলুম; ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চলে গেলেন। কিন্তু ও কথা যাক্। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশুবাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোমকেশও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনি ভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঘড়িটা থেকে কিছু পেলে?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"ঘড়ি থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক—গ্রামোফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন, দুই—তার ওজন দু' রতি, তিন—আশুবাবুর ঘড়িটা একেবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম,—"তার মানে দরকারী তথ্য কিছুই পাওনি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল,—"তা বলতে পারি না। প্রথমতঃ বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোঁড়বার সময় হত্যাকারী আর হত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশী হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হাল্‌কা জিনিস যে, সাত আট গজের বেশী দূর থেকে ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হতে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কি রকম অভ্রান্ত, তা তো দেখেছ। প্রত্যেকবার তীর একেবারে মর্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম,—"সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয়তো দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয়তো নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না, কি করে সে এমন ভাবে আত্মগোপন করলে?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম,—"আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায়—যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়। তারপর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারু সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যদি হত, তাহলে ফুটপাথের ওপরেই তো কাজ সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন কোনও যন্ত্র আমার জানা নেই—যা নিঃশব্দে ছোঁড়া যায় অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলি একটা মানুষের শরীর ফুটো করে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; শেষে বলিল,—"বুঝতে পারছি, এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব পর্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মত ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া

আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় গিছলে?"

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল,—"উকীলের বাড়ী।" তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্ণের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিল; একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটের সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল,—"ওহে, কাল কি ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে? 'পথের কাঁটা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার সময় যে উপস্থিত।"

সত্যই 'পথের কাঁটা'র কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এস এস, তোমার একটু সাজসজ্জা করে দিই। এমনি গেলে তো চলবে না।"

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,—"চলবে না কেন?"

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স হইতে ক্রেপ, কাঁচি, স্পিরিট-গাম ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুশ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গাম লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—"অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কি না, তাই একটু সতর্কতা।"

মিনিট পনের পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি,—কি সর্বনাশ! এ তো অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ছুঁচোলা গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিন্‌কালেও ছিল না। বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম,—"এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে? যদি পুলিসে ধরে?"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল,—"মা ভৈঃ! পুলিসের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর,—অজিতবাবু কোথায় থাকেন?"

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম,—"না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।"

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল,—"কি করতে হবে, তোমার তো জানাই আছে,—শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এসো, পেছু নিতে পারে।"

"সে সম্ভাবনাও আছে না কি?"

"অসম্ভব নয়। আমি বাড়ীতেই রইলুম, যত শীগ্‌গির পার, ফিরে এসো।"

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু সাহসও হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পান খাইতাম, খোট্টা পানওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পান চাহিলাম। লোকটা নির্বিকার-চিত্তে পান দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভাল করিয়া দৃক্‌পাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এস্‌প্ল্যানেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মত নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুইএর গুঁতা নির্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সংএর মত ল্যাম্পপোস্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় অন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জেণ্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্নভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয়তো আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে,

কেন দাঁড়াইয়া আছ? কি করি, ফুটপাথের ধারেই হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানলায় নানাবিধ বিলাতী পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে করে ক্ষতি নাই, গাঁটকাটা ভাবিয়া হাতে হাতকড়া না পরায়!

ঘড়িতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোস্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দু'টা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই। নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা স-মৎসর আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে হইবে। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এস্‌প্ল্যানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পেঁৗছিলাম।

"ছবি লিবেন, বাবু!"

কানের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গি-পরা নীচ শ্রেণীর একজন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ছবির ব্যবসা কলিকাতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি লোকটা নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গি-পরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক্ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট্ট হাসির শব্দে চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, একজন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙলায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন,—"চিঠি তো পেয়ে গেছ দেখছি, এবার বাড়ী যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে বৌবাজারের মোড় পর্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে করে হাওড়ার মোড় পর্যন্ত, তারপর ট্যাক্সিতে করে বাড়ী যাবে।"

সার্কুলার রোডের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত শহর মাড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম-কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগার টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম,—"সাহেব কখন এলে?"

ব্যোমকেশ ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া বলিল,—"মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম, "আমার পেছু নিয়েছিলে কেন?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"যে কারণে নিয়েছিলুম, তা সফল হল না, এক মিনিট দেরী হয়ে গেল।—তুমি যখন ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করছিলুম। 'পথের কাঁটা'র ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ করে থাকবে, বিশেষতঃ তুমি যে-রকম ছটফট করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চলে যাবার পর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরী হয়েছিল—তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পেঁৗছলুম, তখন তুমি খাম হাতে করে ইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ।—কি করে খাম পেলে?"

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলে? কিছু মনে আছে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সেটা আসল নয়—নকল। তোমার গোঁফ-দাড়ির মত। যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়িগোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ্ত উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"চিঠিতে কি দেখলে? কিছু পেয়েছ না কি?"

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—"শুধু একটি কথা অজিত, একটি ছোট্ট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক্ থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পন্টুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কি করে জোড়া লাগল? চিঠিতে কি আছে?"

"তুমিই পড়ে দেখ।" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর-গগ্‌ল দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময় আপনি সংবাদ পাইবেন।

"পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমাণ্টিক—তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বৃত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল দেখি! আমি তো এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপন করবার চেষ্টার মধ্যে হয়তো কোন বদ মতলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর তো আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ! অতবড় জিনিসটা দেখতে পেলে না?" ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল,—"আশুবাবু। এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই—" বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পুরিল।

আশুবাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামা-কাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে চোখের কোলে কালি, যেন অকস্মাৎ কোনও মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া একেবারে ভাঙিয়া

পড়িয়াছেন। কাল সদ্য মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মাণ দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি ব্যোমকেশবাবু। আমার উকীল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল,—"সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সংগে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধহয় খবর পেয়েছেন।"

আশুবাবু হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি সব জানেন?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল,—"সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককেও দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সংগে ঐ স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল—আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরী করবার পরই বিলাস উকীল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধ হয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তারপর ক্রমে—যা হয়ে থাকে। ওরা এত দিন সুযোগ অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশুবাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হল,—অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই —এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশুবাবু শংকাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তার মানে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দু'জনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল; তবে নিজের হাতে নয়। এই কলকাতা শহরেই একজন লোক আছে—যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি—অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচ জন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশুবাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্মন্তুদ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি. কাউকে দোষ দেবার নেই!—আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিষ্কলংক জীবন যাপন করেছিলাম. তারপর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। একদিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিন অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে একদিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হল না, কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ী ভাড়া করে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তের বছর তাকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে তো আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে—কোনও দিন সন্দেহ হয়নি। বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হতে পারে না!—যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয়তো পরজন্মে কাজে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা—তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না। আর সে জেনেও কোন লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশুবাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয়তো নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন। মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্মল থাকতে পেরেছেন এইটেই আপনার সব চেয়ে বড় প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হতে পারত না।"

আশুবাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে

অনেক ছোট, কিন্তু আপনার কাছে আমি যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ংকর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্ধেক বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে। আর বেশী কি বল্‌ব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।”

আশুবাবু বিদায় লইবার পর তাহার অদ্ভুত ট্র্যাজেডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—“আশুবাবুকে খুন করবার চেষ্টার পেছনে যে বিলাস উকীল আর ঐ স্ত্রীলোকটা আছে, এ কথা তুমি কবে জান্‌লে?”

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল,—“কাল বিকেলে।”

“তবে পালাবার আগে তাদের ধরলে না কেন?”

“ধরলে কোন লাভ হত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হত না।”

“কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামোফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।”

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—“তা যদি সম্ভব হত, তাহলে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।”

“তুমি তাদের তাড়িয়েছ?”

“হ্যাঁ। আশুবাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকীলের বাড়ী গিয়ে ইশারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা সরে না পড়েন তো হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকীল বুদ্ধিমান লোক, সন্ধ্যার গাড়ীতেই বামাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।”

“কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হল?”

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—“লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকীল শুধু-হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নন, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তাঁর কাছে ছিল, সমস্তই সংগে নিয়েছিলেন এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্ধমানের পুলিস তাঁকে হাজতে পুরেছে—আগে থাকতেই তারা খবর জানত কি না! যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু'বচ্ছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসীই তার উচিত শাস্তি, তবু তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু'বচ্ছরই বা মন্দ কি?”

পরদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল,—“কে? ভেতরে আসুন।”

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়িগোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়শ ত্রিশের মধ্যেই—চেহারা দেখিলে মনে হয়, একজন অ্যাথ্‌লেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল,—“কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম। আমার নাম প্রফুল্ল রায়—আমি একজন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট।” বলিয়া অনাহূতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল,—“আমাদের জীবনবীমা করবার মত পয়সা নেই।”

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক একজন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ, দাঁতগুলো পানের রসে রক্তাক্ত হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হয়।

প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—“আমি বীমা কোম্পানীর লোক বটে, কিন্তু ঠিক বীমার কাজে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে

আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই।—আপনারই নাম তো ব্যোমকেশবাবু?—বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—"

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল,—"পরামর্শ নিতে হলে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—"আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়, তবু—" বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া সুরে বলিল,—"উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"বেশ তো, বেশ তো। উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কিসের? আপনার নামটি—? মাফ করবেন অজিতবাবু, আপনি যে ব্যোমকেশবাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারিনি। আপনি ভাগ্যবান্ লোক মশায়, সর্বদা এত বড় একজন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম বিচিত্র crime- এর মর্মোদ্ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্তও বোধ হয় dull নয়! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বীমার কাজ ছেড়ে আপনার মত জীবন যাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল,—"এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ করে বলেন,—তাহলে সব দিক্ দিয়েই সুবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"এই যে বলি।—আমি বীমা কোম্পানীর এজেন্ট, তা তো আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি কাজ করি। কোম্পানীর হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কাজ আমি করেছি, তাই কোম্পানী খুশী হয়ে আমাকে কলকাতা অফিসের চার্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস দুই বেশ কাজ চালিয়েছিলাম মশাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বীমা কোম্পানীর একটা লোক আমার পেছনে লাগল। চুনোপুঁটির কারবার আমি করি না, দু' চার হাজারের কাজ আমার অধীনস্থ এজেন্টরাই করে, কিন্তু বড় বড় খদ্দেরের বেলা আমি নিজে কাজ করি। এই লোকটা আমার বড় বড় খদ্দের—ভাল ভাল লাইফ—ভাঙাতে আরম্ভ করলে। আমি যেখানে যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়—কোম্পানীর নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড় বড় লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এইভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানী থেকে তাগাদা আসতে লাগল, কিন্তু কি করব, কেমন করে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মামলা-মোকদ্দমা করাও সহজ নয়—তাতে কোম্পানীর ক্ষতি হয়। অথচ ছিনে জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাসখানেক কেটে গেল, লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মনিব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দু'টি চিরকুট বাহির করিয়া, ছোট টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল,—"দিন বারো চোদ্দ আগে এই বিজ্ঞাপনটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধহয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয়। কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হলে কি হয়, মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল! পথের কাঁটা আর কাকে বলে? ভাবলাম, দেখি তো আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না! মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না।"

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল, "পড়লেন তো? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি তো নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবার—কদমতলায় কেষ্ট ঠাকুরের মত ল্যাম্পপোস্ট ধরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধরে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও কেউ নেই। ডিস্‌গাস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি!"

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল,—"এই দেখুন সে চিঠি।"

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ঠিক আমার পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্তে আগামী সোমবার ১১ই মার্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল,—"একে তো পকেটে চিঠি এল কি করে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি পড়ে অজানা আতঙ্কে ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিস্ট্রি ভালবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিস্ট্রি। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখিনি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন তো?"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—"উনি কি মনে করেন সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন! আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"সেই কথাই তো জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভাল নয়। এ রকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি? আমি নিজে গত দশ বারো দিন ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারিনি; অথচ যেতে হলে মাঝে আর একটি দিন বাকী। তাই কি করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"দেখুন, আজ আমি আপনাকে কোনও পরামর্শ দিতে পারলুম না। আপনি এই কাগজ দু'খানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা করে আমি আপনাকে যথাকর্তব্য বলে দেব।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"কিন্তু কাল সকালে তো আমি আসতে পারব না, আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রে সুবিধে হবে না কি? মনে করুন, আটটা কি ন'টার সময় যদি আসি?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাক্‌ব —আমাকেও এক জায়গায় যেতে হবে—" বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।"

"বেশ, তাই আসব—" পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দুটা পান মুখে পুরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"পান খান কি? খান না!—আমরা এক একটা বদ অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারি না; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পানের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা—আজ উঠি তাহলে, নমস্কার।"

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্যন্ত গিয়া রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,— "পুলিসে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয়? আমার তো মনে হয়, পুলিস যদি তদন্ত করে লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে।"

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা খাপ্পা হইয়া বলিল,—"পুলিসের সাহায্য যদি নিতে চান, তাহলে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্যন্ত পুলিসের সঙ্গে

কাজ করিনি, করবও না।—এই নিয়ে যান আপনার টাকা।” বলিয়া টেবিলের উপর নোটখানা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।”

“না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তাহলে—” বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিল, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সেভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্ন-কণ্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ পাশের ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু' একটা ইংরাজী শব্দ কানে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তারপর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কাকে ফোন করলে?”

সে-কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“কাল এস্‌প্ল্যানেড থেকে ফেরবার সময় একজন তোমার পেছু নিয়েছিল জানো?”

আমি চকিত হইয়া বলিলাম,—“না! নিয়েছিল না কি?”

ব্যোমকেশ বলিল,—“নিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কি অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।” বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এতবড় দুঃসাহসিকতা কি আছে, তা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরূহ হেঁয়ালির মত হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—“প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু ভেবে দেখিনি।”

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল; ঘড়িতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—“উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল,—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।”

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—“সে আবার কি?”

ব্যোমকেশ বলিল,—“বাঃ, 'পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?”

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—“মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।”

“আমি তো যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।”

“কিন্তু না গেলেই কি নয়? 'পথের কাঁটা'র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তাহলে যে ঢের কাজ হত।'

“হয়তো হত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন তো আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার মত কিছু খবর তো চাই।”

“কিন্তু দুজনে গেলে তো হবে না। চিঠিতে যে মাত্র একজনকে যেতে বলেছে।”

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজাল প্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবার-সোল জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যস্—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোষাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবিলের উপর দু'টি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল,—"সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম,—"এ সব কি হচ্ছে?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েস্টকোটের ভিতরে পুরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপে বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে কয়েকটা জিনিস পকেটে পুরিতে পুরিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"চিঠি নিয়েছ? কি সর্বনাশ, নাও নাও, শীগ্‌গির একখানা সাদা খামের মধ্যে পুরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দেশমত হু হু করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধতাকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়িতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী।

কি করিতে হইবে, গাড়ীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আমি আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী। রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রাসাদ থাকিলে আলো প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্ধেক তেজ গ্রাস করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেস-

কোর্সের সাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্য ঘড়িগুলোও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝংকৃত হইয়া উঠিল।"

ঘড়ির শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। চমকিয়া পকেট হইতে খামখানা বাহির করিয়া হাতে লইলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পেঁছিতে তখনও প্রায় অর্ধেক পথ বাকী আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোকবিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কানের কাছে শব্দ হইল,—"আসছে—তৈরী থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিটখানেকের মধ্যে দেখা গেল, পিচঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খামসমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের মধ্যে আসিল; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুটপরিহিত আরোহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগ্‌লের ভিতর দিয়া আমাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে সাইক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া সাইক্লের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, সংগে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তারপর নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটি হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে পড়িয়া আছে।

আমি পেঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার করে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটা শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"ব্যস্, হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়! আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগ্‌ল খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল,—"ব্যোমকেশ-বাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, এর পকেটগুলো ভাল করে দেখে নাও তো অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে কি না।"

এক পকেট হইতে অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পান

রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"ব্যোমকেশ-বাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। কারণ, আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আপনি করেননি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই, এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাজে লাগাবার ফুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিস হুইস্‌ল বাহির করিয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিল, তারপর আমাকে বলিল,—"অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘণ্টিতে হাত দিও না, বড় ভয়ানক জিনিস!"

প্রফুল্ল রায় হাসিল,—"সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাই তো আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন, নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি বলে আমার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিস্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ করে আজ সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোশটাই দেখেছিলাম!—যাক, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন।" প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—"তাও তো বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পানের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"একটা পান পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পান খাওয়াবার রীতি নেই সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টা পান তাহার মুখে পুরিয়া দিলাম। পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল,—"ধন্যবাদ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিসের আগমনশব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। দূরে মোটর-বাইকের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শুনা গেল। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পুলিস তো এসে পড়ল। আমাকে তাহলে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"ছাড়ব কি রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল,—"পুলিসে দেবেনই?"

"দেব বৈকি!"

"ব্যোমকেশবাবু, বুদ্ধিমান লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারবেন না—" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর-বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, একজন ইউনিফর্ম-পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল,—"What's up? Dead?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল,—"এ যে খোদ কর্তা দেখছি! টু লেট্‌ সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশবাবু, পানটা খেলে ভাল করতেন, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনার মত লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে এক লরি পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার কাছ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে।"

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়া সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল।

ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা সরকারী খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘণ্টির মাথাটা খুলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র যে তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্যন্ত কারুর মাথায় আসেনি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি এই স্প্রিংএর! কি ভয়ংকর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলি বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু' কাজ একসঙ্গে হয়, ঘণ্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘণ্টির শব্দে স্প্রিংএর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে—সেদিন কথা হয়েছিল—শব্দে শব্দ ঢাকে গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কত বড় বুদ্ধিমান, সেইদিন তার ইংগিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কি করে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রথমটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু ক্রমশঃ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ও দুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলছে? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে তো সে তা দূর করে দেবে—অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে। পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও, এটা যে তার অনাহারী পরহিতৈষা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তারপর এ দিকে দেখ, যাঁরা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন। আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইংগিত করতে চাই না, কারণ যে-কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা বলে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না করে থাকা যায় না যে, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশুবাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বোঝা যায় না কি?

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন বাইরে পৃথক হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙা পাথরবাটির দুটো অংশ যেমন সহজে জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য। এদিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ওদিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

আমি বলিলাম,—"হয়তো পড়ে, কিন্তু আমার পড়েনি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এ সব তো খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশুবাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—লোকটা কে? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে, তারাও জানতে পারেনি, লোকটা কে এবং কি করে সে খুন করে। আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান বর্ম। আমি তাকে কস্মিনকালেও ধরতে পারতুম কিনা জানি না, যদি না সে আমার মন বোঝবার জন্যে সেদিন নিজে এসে হাজির হত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যেদিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোস্ট ধরে দাঁড়িয়েছিলে, সেদিন তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তারপর অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করলে। তুমি যখন এই বাড়ীতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে, তুমি আমারই দূত। আশুবাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জানত, কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে, আমি অনেক

কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হলে কি করত বলা যায় না—হয়তো এ কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস—সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটা সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানতে এল। এতে তার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রফুল্ল রায়ই যে পথের কাঁটা এবং গ্রামোফোন-পিন, তা জানা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না।—শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।"

"কি ভুল?"

"সেদিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারেনি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।"

"তুমি জানতে! তবে আসবামাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?"

"কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হত না। সে যে খুনী আসামী, তার প্রমাণ কিছু ছিল কি? তাকে ধরার একমাত্র উপায় ছিল—যাকে বলে in the act, রক্তাক্ত হস্তে! আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দুজনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?

"যা হোক, প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে, আমি অনেক কথাই জানি—শুধু বুঝতে পারলে না যে তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ করে গেল,—যেন রাত্রে রেসকোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিস সঙ্গে নিয়ে যাই! তাই সে পুলিসের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিসের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় খুশী হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল; আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

"বেচারা ঐ একটা ভুল করে সব মাটি করে ফেললে। শেষকালে তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয়নি, এ কথা সেদিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তোমার মনে আছে, প্রথম যেদিন আশুবাবু আসেন, সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘণ্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করিনি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না। তারপর 'পথের কাঁটা'র চিঠি যখন পড়লুম এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কি জানো—বাইসিক্ল!

"বাইসিক্লের কথা কেন যে তখন পর্যন্ত মাথায় ঢোকেনি, এটাই আশ্চর্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হতে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নেই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে সরে যাবার জন্যে ঘণ্টি দিয়েই পাশ কাটিয়ে চলে গেল। তুমিও মাটিতে পড়ে পটলোৎপাটন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কারণ, সে দু'হাতে হ্যান্ডেল ধরে আছে—অস্ত্র ছুঁড়বে কি করে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

"একবার পুলিস ভারী বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফেন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লালবাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিস সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ করে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায় তখন মনে মনে খুব হেসেছিল

নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্‌এর মাথা খুলে দেখবার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসেনি।" বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেল্‌টি নিরীক্ষণ করিতে লাগল।

টেবিলের উপর হইতে সরকারী লম্বা খামখানা হাওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"পুলিস কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিস এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন; তারপর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; যদিও এতে তাঁর খুশী হওয়াই উচিত ছিল—কারণ, গভর্নমেণ্টের অনেক খরচ এবং মেহনত বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিস সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাস কেউ সনাক্ত করতে পারেনি, জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর লোকরা লাস দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদের প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম উপলক্ষে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠির উপসংহারে পুলিস সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন—এই ঘণ্টিটি ফেরৎ দিতে হবে। এটা না কি এখন গভর্নমেণ্টের সম্পত্তি।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"ওটার ওপর তোমার ভারী মায়া পড়ে গেছে—না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?"

ব্যোমকেশও হাসিয়া ফেলিল,—"সত্যি, দু'হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘণ্টিটা বক্‌শিশ করেন, আমি মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কি?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখানা। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ' টাকারও বেশী।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘণ্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে একটা প্রশ্ন করিলাম,—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে?"

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনীর মত ফাঁসি যেত তাহলে ভাল হত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনি ভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিস্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কোথা দিয়া যে কোথায় গিয়া পেঁছিতে পারে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজিস্ট্রি চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙীন কাগজের টুকরা বাহির করিল, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রীআশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক।

# সীমন্ত-হীরা

কিছুদিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোনও কাজকর্ম ছিল না।

এদেশের লোকের কেমন বদ্‌ অভ্যাস, ছোটখাটো চুরি-চামারি হইলে বেবাক হজম করিয়া যায়, পুলিসে পর্যন্ত খবর দেয় না। হয়তো তাহারা ভাবে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। নেহাৎ যখন গুরুতর কিছু ঘটিয়া যায় তখন সংবাদটা পুলিস পর্যন্ত পৌঁছায় বটে কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বেসরকারী গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবার মত উদ্যোগ বা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। কিছু দিন হা-হুতাশ ও পুলিসকে গালিগালাজ করিয়া অবশেষে তাহারা ক্ষান্ত হয়।

খুন জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিস তাহাকে হাজৎ-জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকী সময়টুকু নিজের লাইব্রেরী ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে, গল্প লিখিয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মত এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একেবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সেদিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম,—"কি হে, বাংলাদেশের চোর-ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"না। তার প্রমাণ তো খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা তো পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসছে কৈ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার তখনি আসে, তাকে জোর করে ধরে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। ধৈর্যং রহু। আসল কথা আমাদের দেশে প্রতিভাবান বদমায়েস—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে, কি করব; দোষ আমার নয়, দোষ তোমাদের দীনাহীনা পিঁচুটি নয়না বঙ্গভাষার—প্রতিভাবান বদমায়েস খুব অল্পই আছে। পুলিস কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ—তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই। জানো তো যে পুকুরে দু'চারটে বড় বড় রুই কাৎলা আছে সেই পুকুরে ছিপ ফেলেই শিকারীর আনন্দ।"

আমি বলিলাম,—"তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁষটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিৎ যদি কেউ এখানে থাকতেন, তিনি নির্ভয়ে বলে দিতেন যে তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তাহলে মনস্তত্ত্ববিৎ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কথনো নাম শোনেনি—এই হচ্ছে আজকাল-কার নূতন বিধি। তোমরা আধুনিক গল্প-লেখকের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছ।"

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম,—"ভাই, আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, প্রতিদানের আশা না করে শুধু আনন্দ যোগাই, তবু কি তোমাদের মন ওঠে না? এর বেশী যদি চাও তাহলে নগদ কিছু ছাড়তে হবে।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাক-পিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখ দীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্লু-ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন দিয়া আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্য-মুখে আমার হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তরবঙ্গের বনিয়াদী জমিদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমিদারী স্টেটের নাম। জমিদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারী ইংরাজীতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই,—

প্রিয় মহাশয়,

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথখরচের জন্য ১০০৲ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেনে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে স্টেশনে গাড়ী উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"তাই তো হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরী কার্যটি কি—চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার তো ও সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমিদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতীটি পাশের জমিদার চুরি করে নিয়ে গেছে; তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলেছে। ভেতরে নিশ্চয় কোনো বড় রকম গোলমাল আছে।"

"ঐটে তোমাদের ভুল; বড় লোক রুগী হলে মনে কর ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুস্কুড়ি হলে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার-বৈদ্যের কথা মনেই পড়ে না।"

"যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে না কি?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—"হাতে যখন কোনো কাজ নেই, তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা তো হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনো যাওনি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম,—"আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"দোষ কি? একজনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুশীই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা তো একটা কর্তব্যবিশেষ।

শাস্ত্রে লিখেছে—সর্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।”

কোন শাস্ত্রে এমন জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ আছে যদিও স্মরণ করিতে পারিলাম না, তবু সহজেই রাজী হইয়া গেলাম।

সেইদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেন্ড ক্লাশ কামরায় আমরা তিনজন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মশাইদের কন্দুর যাওয়া হচ্ছে?”

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“মশাইয়ের কন্দুর যাওয়া হবে?”

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, —“আমি—এই পরের স্টেশনেই নামব।”

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বলিল,—“আমরাও তার পরের স্টেশনে নেমে যাব।”

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ী থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন স্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরার জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখাচোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—“ওহে—”

ব্যোমকেশ বলিল,—“জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়ীতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালই!”

তারপর প্রায় প্রতি স্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পেঁৗছিলাম। স্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামী মোটর লইয়া জমিদারের একজন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে বসিলাম। অতঃপর নির্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্মচারীটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু' একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন,—“আমি কিছুই জানি না, মশাই! শুধু আপনাদের স্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যাচ্ছি।”

আমরা মুখ তাকাতাকি করিলাম, আর কোনো কথা হইল না। পরে জমিদারভবনে পেঁৗছিয়া দেখিলাম,—সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারৎ—তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির উপর বাগান, হট হাউস্, পুষ্করিণী, টেনিস্ কোর্ট, কাছারি বাড়ী, অতিথিশালা, পোস্ট-অফিস আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ীর সম্মুখে থামিতেই জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সেক্রেটারী বলিলেন,—“আপনারা মুখ-হাত ধুয়ে জলযোগ করে নিন। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।”

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন,—“কুমার বাহাদুরে লাইব্রেরী ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে—আমার সঙ্গে আসুন।”

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এমনি একটা ভাব

লইয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মত সাধারণ পাঞ্জাবী পরা একটি সহাস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা —ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন,— "আপনিই ব্যোমকেশবাবু? আসুন।"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল,—"ইনি আমার বন্ধু সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওঁকে সহজে কাছ-ছাড়া করিনে।"

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন,—"আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিতবাবু এসেছেন, আমি ভারি খুশী হয়েছি। কারণ, প্রধানতঃ ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমিদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। লাইব্রেরী ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম, দেয়াল-সংলগ্ন আলমারিগুলি দেশী বিলাতী নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবিলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরী ঘরটি যে কেবল-মাত্র জমিদার-গৃহের শোভাবর্ধনের জন্য নহে, রীতিমত ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।" সেক্রেটারীকে হুকুম দিলেন, "তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ্য রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

সেক্রেটারী সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ করে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্যাদা জড়ানো রয়েছে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো দরকার আছে মনে করিনে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনো বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম,—"গল্পচ্ছলেও কি কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না?"

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলবে না।"

হয়তো একটা ভাল গল্পের মশলা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনো কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন,—"আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরত আছে, সে সম্বন্ধে বোধহয় আপনি কিছু জানেন না—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন,—"আপনি জানেন? তাহলে এ কথাও জানেন বোধহয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয়নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন,—"সে সুযোগ আর কখনো হবে কি না জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল—"চুরি গেছে!"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন,—"হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা শুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমিদার বংশ অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। বারো ভূঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশা'দের আমলে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ এই জমিদারী অর্জন করেন। সাদা কথায় তিনি একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ করে পরে বাদশা'র কাছ থেকে সনন্দ আদায় করেন। সে বাদশাহী সনন্দ এখনো আমাদের কাছে বর্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের 'রাজা' উপাধি ছিল।

"ঐ 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের আদি পূর্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চলে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনো অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন,—"জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়,—এই হচ্ছে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠেরা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু'বছর আগে আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারী পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ান্‌স্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমিদারী থেকে পেয়ে থাকেন।

"এ তো গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন-প্রদর্শনীতে আমার হীরা এক্‌জিবিট্ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে করে সেই হীরা নিয়ে কলকাতা গেলাম; কলকাতায় পেঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা করে দেবার পর তবে নিশ্চিত হলাম। আপনারা জানেন, প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরত প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীরা চুরি যাবার কোনো ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাসকেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

"সাত দিন ধরে এক্‌জিবিশন চলল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শ টাকা দামের মেকি পেস্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিম্বা পুলিসকে খবর দেননি কেন?"

কুমার বলিলেন,—"খবর দিয়ে কোনও লাভ হত না, কারণ কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম।"

"ওঃ"—ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"তারপর বলে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন,—"এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ীর লোককে পর্যন্ত এ কথা জানাতে পারিনি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়।

"কথাটা আরও খোলসা করে বলা দরকার। পূর্বে বলেছি, আমার এক কাকা আছেন।

তিনি কলকাতায় থাকেন, স্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন,—তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মত আশ্চর্য মানুষ খুব কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয় মনীষী বলে পরিচিত হতে পারতেন। যেমন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস্ সম্বন্ধে কি একটা তথ্য আবিষ্কার করে ইংরাজ গভর্নমেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন—তার ফলে 'স্যর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবত আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্তি এক্‌জিবিট্ করে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের উপর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না।" বলিয়া কুমার বাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরাটার দাম কত হবে?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই করে দেখিনি। গৃহদেবতার মতই সে হীরাটা অমূল্য ছিল।

"সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেননি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন,—'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই জোড়হাত করে কাকাকে বললাম,—'কাকা, আপনার আর যা-ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।'—কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয়নি।

"তবে পত্র ব্যবহার হয়েছে। যেদিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু পড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।"

চাবি দিয়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙলা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,—

কল্যাণীয় খোকা,

দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাওনি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে বলে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্বাদ নিও।

ইতি<br>
তোমার কাকা<br>
শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরৎ দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হীরের বাক্স বার করে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের একজন ভাল জহুরী, দেখেই বললেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মত গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন,—"জহুরী ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দু'শ টাকার বেশী এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল,—"তাহলে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহর দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন,—"হাঁ। কেমন করে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই। যেমন করে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত-হীরা' আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্যে ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি শর্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশী হবেন?"

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"কবে নাগাদ? তবে কি,—তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন বলে মনে হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিল. বলিল.—"এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক. আজ শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রে দুইজনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"প্ল্যান অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না। আগে বাড়ীটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হীরেটা কি বাড়ীতেই আছে মনে হয়?"

"নিশ্চয়। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপো'র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার. কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—"

"তোমার বিশ্বাস—?"

"যাক্‌, সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই ঠিক করে বলা যায় না।"

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ?"

"কোন্‌ কাজের?"

"যে উপায় অবলম্বন করে তুমি হীরেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখেছি। ডাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য।"

"তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন তো সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুর বেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"কাজ কত দূর হল?"

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল,—"বিশেষ সুবিধা হল না। বুড়ো একটি হর্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালী চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারী বেরালের মত। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারী খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি।"

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ে চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাত মিথ্যে নয়,—খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়ীটা নানারকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়; কর্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমতঃ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢোকাই মুস্কিল,—ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বসে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচিল ডিঙিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই,—আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচোলো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুশী করে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ীর সদর-দরজায় নেপালী ভৃত্য উজ্‌রে সিং থাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছেন, ভালরকম কৈফিয়ৎ যদি না দিতে পার, বাড়ীতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকিদার তো আছেই, তার উপর চারটে বিলিতী ম্যাস্টিফ্‌ কুকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্যোদ্ধার করবে, সে পথও বন্ধ।"

"তবে উপায়?"

"উপায় হয়েছে। বুড়োর একজন সেক্রেটারী চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ' টাকা মাইনে—বাড়ীতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্‌গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত করে দিয়ে এসেছি,—কাল ইণ্টারভিউ দিতে যেতে হবে।"

"দুটো দরখাস্ত কেন?"

"একটা তোমার, একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।"

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা আটটার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণের ভবনে সেক্রেটারী পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। শহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ী; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মত আরও কয়েকজন চাকরী অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ীর কর্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদারদিগকে ডাকিতেছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয়তো আমাদের ডাক পড়িবার পূর্বেই অন্য কেহ বাহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ পর্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নূতন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্তা আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি? এতক্ষণ তো একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরান-পরিহিত বিশালকায় স্যর

দিগিন্দ্র বসিয়া আছেন। বুলডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মত মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চক্‌চকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ বাহু দুটা বনমানুষের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে আঙুলগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলার' মত সরু ও সুদৃশ্য,—একেবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দু'টা ক্ষুদ্র এবং সর্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভাল ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইল। তারপর সেই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুলডগ হাসিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল,—"উজির, দরজা বন্ধ করে দাও।"

নেপালী ভৃত্য উজির সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবিলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"কার নাম নিখিলেশ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে আমার।"

কর্তা কহিলেন,—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দু'জনে সল্লা করে দরখাস্ত করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন,—"বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত পড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক, তুমি এম. এস্-সি পাশ করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন য়ুনিভার্সিটি থেকে?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি থেকে।"

"হুঁ। টেবিলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন,—"কোন সালে পাশ করেছ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়!

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল,—"আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক, একটা ফাঁড়া তো কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের উপর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃথা তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্তা কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"অজিতবাবু!"

"আজ্ঞে।"

বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল

বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে, তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় হায়, মুহূর্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম!

কর্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,—"লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।"

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কর্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশবাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করিনি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।" ব্যোমকেশের মুণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন,—"খুলির মধ্যে অন্তত পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন্-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কন্‌ভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে।......হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গ-মুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা, কূটবুদ্ধি, একগুঁয়ে। Intuition খুব বেশী; reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনো mature করেনি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শব ব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা বলিলেন,—"আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশী। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশী।

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে বলে মনে হয়?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্বিকার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কর্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা, কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল,—"সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"বটে বটে! তোমার সাহস তো কম নয় দেখছি! কিন্তু কি করে কাজ হাসিল করবে শুনি? এখনই তো তোমাদের ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেব। তারপর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরাটা বাড়িতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহর পানে চাহিয়া কর্তা বলিলেন,—"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্তার কপালের শিরাগুলো ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে অন্ধ জিঘাংসা জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। হাতের

কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলে ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্তা কহিলেন,—"দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি—না? তোমার মত ডিটেক্‌টিভ দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাংলাদেশের বার্তিল'? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বচ্ছর সময় দিলাম, বার কর খুঁজে। And be damned!"

কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন,—"উজ্‌রে সিং!"

উজ্‌রে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্তা আমাদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন,— "এই বাবু দু'টিকে চিনে রাখো। আমি বাড়িতে থাকি বা না থাকি এ'রা এ বাড়িতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে? যাও।"

উজ্‌রে সিং তাহার নির্বিকার নেপালী মুখ ও তীর্যক্ চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মত হাস্য করিলেন, বলিলেন,— "খুঁজি-খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশ চন্দ্র?"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে মরে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না; বুঝলে? দিগিন রায় যে-জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে জিনিস খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম নয়। —ভাল কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামী জিনিস আছে, কিন্তু তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার স্টুডিওতে চললাম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না।—আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান করে দিই,—আমার বাড়িময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাস্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে, হীরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তাহলে সেই দণ্ডেই কান ধরে বার করে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাসে গোছের একটু হাসিয়া বলিল,—"চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মত লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম,—"ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটি হল।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয়নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের স্টেশনে নেমে যাবেন বলে পাশের গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয়নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল,—"বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্বলতাটুকু ছিল বলেই রক্ষে, নইলে হয়তো হাল ছেড়ে দিতে হত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম,—"কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধরে বার করে দিত তাহলে কি হত বলা যায় না। যা হোক, বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন্ দুর্বলতার সন্ধান পেলে শুনি! আমি তো বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ,—লোহার মত শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। যার যত বেশী বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছ। একটু পরিষ্কার করে বল।"

"বুড়োর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছি। বাড়িতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন তো আট আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু হীরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়িতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবৎ গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ঐ বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রি পুরে দেবে। যা হয় কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তা কি হয়, তোমাকেও চাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল কি ভাল?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কেহ বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী স্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ির মধ্যে সুপারির মত একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোনকালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমতঃ, মূল্যবান জিনিস-পত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারি কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত—সে-জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এড্‌গার অ্যালেন্ পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস শুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারি খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িখানা চিত্র ও মূর্তির একটা কলা-ভবন (gallery) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্তি প্ল্যাস্টার-কাস্ট্ সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। সর্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর স্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জন হইল,—"এস।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবিল চলিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কি হে

ব্যোমকেশবাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মত হবে দেখছি, শেষ পর্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"বেশ বেশ। এই নাও চাবি। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম; কিন্তু এই প্ল্যাটার-কাস্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমার সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজ্‌রে সিং—"

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা আপনি কি করছেন?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"আমার তৈরী নটরাজ-মূর্তির নাম শুনেছ তো? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরী করছি। আর একটা আমার টেবিলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—কি বল?"

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবিলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্মিত বিখ্যাত মূর্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"ঐ মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে এক্‌জিবিট করিয়েছিলেন!"

স্যর দিগিন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন,—"হ্যাঁ। আসল মূর্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল; তাই, ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।"

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার খুঁজো।" ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরৎ দিল; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—"ওহে অজিত-বাবু, তুমি তো গল্প-টল্প লিখে থাকো; সুতরাং একজন বড় দরের আর্টিস্ট! বল দেখি এ পুতুলটি কেমন?"—বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল,—"চমৎকার! এর তুলনা নেই।"

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটাও কি আপনি নিজে মোল্‌ড করেছেন?"

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে?"

ব্যোমকেশ মূর্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—"এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয়?"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"না। কেন বল দেখি? পাওয়া গেলে কিনতে না কি?"

"বোধ হয় কিনতুম। আপনিই এই রকম প্ল্যাস্টার-কাস্ট তৈরী করিয়ে বাজারে বিক্রী করেন না কেন? আমার বিশ্বাস, এতে পয়সা আছে।"

"পয়সার যদি কখনও অভাব হয় তখন দেখা যাবে। আপাতত জিনিসটাকে বাজারে বিক্রী করে খেলো করতে চাই না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,—"এখন তাহলে উঠি। আবার ও বেলা আসব।" বলিয়া মূর্তিটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি তো আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটা ভেঙেছিলে!" তারপর বাঘের মত ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিলেন,—"তোমাদের একবার সাবধান করে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্তি যদি ভেঙেছ, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বার করে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—"এইসব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক্, ও বেলা তাহলে আবার আসছ? বেশ কথা, উদ্যোগিনাং পুরুষসিংহ—; এবার বাড়ির কোন্ দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত করে রাখতে পারি।"

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"চল, এতক্ষণে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।"

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতী বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাস্টার-কাস্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্য করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ি পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হে, প্ল্যাস্টার-কাস্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তুমি তো জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্বলতা।"

"তা তো জানি। কিন্তু কি দেখলে?"

"দেখলুম প্ল্যাস্টার-কাস্টিং খুব সহজ, যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মত ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার করে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা-কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরী করা।"

"এই! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?"

"দুর্ভাবনা নেই। ছাঁচে প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোনও শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তাহলে সেটা মূর্তির মধ্যে রয়ে যাবে।"

"অর্থাৎ?"

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়িখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একেবারে বেহায়া,—সে অম্লানবদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ বুধবার। এখনও দু'দিন সময় আছে।"

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবিলের

উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কত দিন হল তৈরী করেছেন?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্যার দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?"

"না—অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার।" বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, "একজন তক্‌মা-পরা চাপরাসী দিয়ে গেছে!"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেন্সিল দিয়া লেখা,—"এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্র্যান্ড হোটেলে আছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুশী হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল,—"এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলায়, তা হলেই সব মাটি। আবার নূতন করে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে একভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশাপাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে আমি, ব্যোমকেশ ও স্যার দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যার দিগিন্দ্র মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের শব্দে বোধহয় বুঝিতে পারিল আমি জাগিয়াছি, বলিল,—"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেটা বসবার ঘরে টেবিলের উপর কোনোখানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাত্রি ক'টা?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আড়াইটে। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম,—"তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবিলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয়,—দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে তো টেবিলের উপরই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবিলের উপর? হাতীর দাঁতের দোয়াতদান, টাইমপিস ঘড়ি, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে

তারপর আবার দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের ফলে সে মনে মনে কোনও একটা সংকল্প করিয়াছে।

স্যার দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন, —"এই যে মাণিক-জোড়, এস, এস। আজ যে ভারী সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি! দুশ্চিন্তায়

রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি?”

ব্যোমকেশ টেবিল হইতে নটরাজের মূর্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—“এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারিনি।”

পূর্ণ এক মিনিটকাল দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—“ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয়নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।”

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—“কেমন? হল তো? কিন্তু মূর্তিটা দামী জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।”

মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“ধন্যবাদ।” বলিয়া মূর্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পুরিল।

তারপর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল,—“নাঃ, ঠকে গেলুম।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি ব্যাপার বল তো? আমি তো তোমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারলুম না।”

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“নানা কারণে আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হীরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার জায়গা আর হতে পারে কি? হীরেটা চোখের সামনে টেবিলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্ল্যাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে হীরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হীরেটার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেটা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হীরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক করে বেরিয়েছিলুম যে পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ করে পুতুলটা আমায় দান করে দিলে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল।—এখন আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।”

আমি বলিলাম,—“কিন্তু সময়ও তো আর নেই। মাঝে মাত্র একদিন।”

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল,—“মাত্র একদিন। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা হল না। এদিকে কুমার বাহাদুর এসে হানা দিয়ে বসে আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক দিয়েই হাস্যাস্পদ করে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!” মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রের বাড়িতে গেলাম। শুনিলাম কর্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নূতন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজীরে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজীরে সিং বরান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজীরে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দু'জনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু হল না। উজরে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া—আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল,—"কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,—"আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হল না। কুমার সাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবিলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ মূর্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল,—"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি—" তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ-মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হল?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"দেখ দেখ—নেই! মনে আছে, আজ সকালে পেন্সিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম? সে অক্ষরটা নেই!"

দেখিলাম সত্যিই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে? পেন্সিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও তো পারে!

ব্যোমকেশ বলিল,—"বুঝতে পারছ না? বুঝতে পারছ না?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে।—পুঁটিরাম!"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তারপর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"তুমি শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে,—হীরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই টেবিলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন। আপনার স্পেশাল ট্রেন যেন ঠিক থাকে। পাবামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে থাকা বোধহয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু করে কাজ নেই—স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আমি করে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না;—না আপনার সেক্রেটারীকেও নয়—আচ্ছা, নমস্কার।"

তারপর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রে ব্যোমকেশ কখন ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্তিটা যথাস্থানে নাই। সেদিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলিল,—"আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন, "তোমাদের

দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আসনি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।”

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল,—“আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে গ্র্যান্ড হোটেলে এসে আছেন,—তাঁকে কাল একরকম জানিয়েই দিয়েছি যে তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।”

স্যর দিগিন্দ্র কিছুক্ষণ কুঞ্চিত-চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন; ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুলডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন—“তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশী হলাম। খোকাকে বোলো বৃথা চেষ্টা করে যেন সময় নষ্ট না করে।”

“আচ্ছা, বলব।”—টেবিলের উপর আর একটি নটরাজ-মূর্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“এই যে আর একটা তৈরী করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন করে রেখেছি; শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক।—কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙে যায়,—আর একটা পাব কি?”

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন,—“বেশ, যদি ভেঙে যায়, আর একটা পাবে। আমার বাড়িতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এটাও কম লাভ নয়।”

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল,—“আজ্ঞে হ্যাঁ। এত দিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে—ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভাল লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?”—স্যর দিগিন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনি ভাবে তাহার একটা হাত টেবিলের উপর হইতে নটরাজ-মূর্তিটি তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ-মূর্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন—“হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা,” তখন কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কসরৎ হয়তো আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল,—“এখন তাহলে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়,—মনে রাখবেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চললুম তবে,—নমস্কার!”

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ির বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল,—“গ্র্যান্ড হোটেল।”

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—“ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড?”

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—“এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য। আমি যে অনুমান

করেছিলুম হীরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্তি তৈরী করে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল করে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট 'ব' অক্ষরটি লেখা না থাকত, তাহলে আমি জানতেও পারতুম না!" বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল যখন এই 'ব' অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই খুড়োর টেবিল থেকে নটরাজটি উল্টে দেখলুম,—আমার সেই 'ব' মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস্! তারপর হাত-সাফাই তো দেখতেই পেলে।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি ঠিক জানো, হীরেটা ওর মধ্যেই আছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোন সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু যদি না থাকে?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—"তাহলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য বলে কোনও জিনিস নেই; শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যান্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—"কি? কি হল, ব্যোমকেশবাবু?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ-মূর্তিটি টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এটা তো দেখছি কাকার নটরাজ, কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—"

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে—?"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে তো? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কি বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, পরীক্ষা করে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন আপনার সীমন্ত-হীরা।"—ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল, তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাস্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। —ব্যোমকেশবাবু, আপনাকে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না, আপাতত যত শীঘ্র পারেন বেরিয়ে পড়ুন। খুড়ো মশাই যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তাহলে আবার হীরা হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমার বাহাদুরকে স্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর-করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন দিয়া আঁটা। চেক-এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিতবাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক!] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি
প্রতিভামুগ্ধ
শ্রীত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ রায়

ব্যোমকেশকে এক রকম জোর করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির করিয়াছিলাম।

গত একমাস ধরিয়া সে একটা জটিল জালিয়াতির তদন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিল; একগাদা দলিল পত্র লইয়া রাতদিন তাহার ভিতর হইতে অপরাধীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং রহস্য যতই ঘনীভূত হইতেছিল ততই তাহার কথাবার্তা কমিয়া আসিতেছিল। লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া নিরন্তর এই শুষ্ক কাগজপত্রগুলো ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করিলে সে বলিত,—"নাঃ, বেশ তো আছি—"

সেদিন বৈকালে বলিলাম,—"আর তোমার কথা শোনা হবে না, চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দিনের মধ্যে অন্তত দু'ঘণ্টাও তো বিশ্রাম দরকার।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু নয়—চল লেকের দিকে। দু'ঘণ্টায় তোমার জালিয়াৎ পালিয়ে যাবে না।"

"চল—" কাগজপত্র সরাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার মনটা সেই অজ্ঞাত জালিয়াতের পিছু ছাড়ে নাই বুঝিতে কষ্ট হইল না।

লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একজন বহু পুরাতন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই; আই.এ ক্লাশে দু'জনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম,—"আরে! মোহন যে! তুমি কোত্থেকে?"

সে আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিল,— "অজিত! তাই তো হে! কদ্দিন পরে দেখা! তারপর খবর কি?"

কিছুক্ষণ পরস্পরের পিঠ চাপড়া-চাপড়ির পর ব্যোমকেশের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম। মোহন বলিল,—"আপনিই? বড় খুশি হলুম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত বটে, আপনার কীর্তি-প্রচারক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আমাদের বাল্যবন্ধু অজিত; কিন্তু বিশ্বাস হত না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি আজকাল কি করছ?"

মোহন বলিল,—"কলকাতাতেই প্র্যাক্‌টিস করছি।"

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে নানা কথায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে, মোহন দু' একবার কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া আবার থামিয়া গেল। ব্যোমকেশও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই এক সময় অল্প হাসিয়া বলিল,—"কি বলবেন বলুন না।"

মোহন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে সে নিয়ে আপনাকে বিব্রত করা অন্যায়। অথচ—"

আমি বলিলাম,—"তা হোক, বল। আর কিছু না হোক, ব্যোমকেশকে কিছুক্ষণের জন্য জালিয়তের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া তো হবে।"

"জালিয়াৎ?"

আমি বুঝাইয়া দিলাম। তখন মোহন বলিল,—"ও! কিন্তু আমার কথা শুনে হয়তো ব্যোমকেশবাবু হাসবেন—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"হাসির কথা হলে নিশ্চয় হাসব, কিন্তু আপনার ভাব দেখে তা মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্ছে একটা কোনও সমস্যা কিছুদিন থেকে আপনাকে ভাবিত করে রেখেছে,—আপনি তারই উত্তর খুঁজছেন।"

মোহন সাগ্রহে কহিল,—"আপনি ঠিক ধরেছেন। জিনিসটা হয়তো খুবই সহজ—কিন্তু

আমার পক্ষে এটা একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নেহাত বোকা নই--সাধারণ সহজ-বুদ্ধি আছে বলেই মনে করি; অথচ একজন রোগে পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত লোক আমাকে প্রত্যহ এমনভাবে ঠকাচ্ছে যে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন; শুধু আমাকে নয়, তার সমস্ত পরিবারের তীক্ষ্ণ সতর্কতা সে প্রতি মুহূর্তে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।"

কথা কহিতে কহিতে আমরা একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মোহন বলিল,—"যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি—শুনুন। কোনো এক বড় মানুষের বাড়িতে আমি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা বনেদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেটে বাস; অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আছে—তা থেকে মাসিক হাজার পনের টাকা আয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা কি রকম বুঝতেই পারছেন।

"এই বাড়ির যিনি কর্তা তাঁর নাম নন্দদুলালবাবু। ইনিই বলতে গেলে এ বাড়িতে আমার একমাত্র রুগী। বয়স কালে ইনি এত বেশী বদ-খেয়ালী করেছিলেন যে পঞ্চাশ বছর বয়স হতে না হতেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাতে পঙ্গু, আরো কত রকম ব্যাধি যে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। তাছাড়া পক্ষাঘাতের লক্ষণও ক্রমে দেখা দিচ্ছে। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একটা কথা আছে,—মানুষের মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, মানুষ যে বেঁচে থাকে এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। আমার এই রুগীটিকে দেখলে সেই কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে।

"এই নন্দলালবাবুর চরিত্র আপনাকে কি করে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। কটুভাষী সন্দিগ্ধ, কুটিল, হিংসাপরায়ণ—এক কথায় এমন ইতর নীচ স্বভাব আমি আর কখনো দেখিনি। বাড়িতে স্ত্রী পুত্র পরিবার সব আছে কিন্তু কারুর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তাঁর ইচ্ছা যৌবনে যে উচ্ছৃঙ্খলতা করে বেড়িয়েছেন এখনো তাই করে বেড়ান। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছেন, শরীরে সে সামর্থ্য নেই। এই জন্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ওপর দারুণ রাগ আর ঈর্ষা,—যেন তাঁর এই অবস্থার জন্যে তারাই দায়ী। সর্বদা ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে কাকে জব্দ করবেন।

"শরীরের শক্তি নেই, বুকের গোলমালও আছে,—তাই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেন না, নিজের ঘরে বসে বসে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর কদর্য গালাগাল বর্ষণ করছেন, আর দিস্তে দিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। তাঁর এক খেয়াল যে তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক; তাই কখনো লাল কালিতে কখনো কালো কালিতে এন্তার লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকদের ওপর ভয়ংকর রাগ, তাঁর বিশ্বাস সম্পাদকেরা কেবল শত্রুতা করেই তাঁর লেখা ছাপে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি লেখেন?"

"গল্প। কিম্বা আত্ম-চরিতও হতে পারে। একবার মাত্র সে-লেখার ওপর আমি চোখ বুলিয়েছিলুম, তারপর আর সেদিকে তাকাতে পারিনি। সে-লেখা পড়বার পর গঙ্গাস্নান করলেও মন পবিত্র হয় না। আজকালকার যাঁরা তরুণ লেখক, সে-গল্প পড়লে তাঁদেরও বোধ করি দাঁত কপাটি লেগে যাবে।"

ব্যোমকেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"চরিত্রটি যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটি কি?"

মোহন আমাদের দু'জনকে দুটি সিগারেট দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া বলিল,—"আপনারা ভাবছেন এমন গুণবান লোকের আর কোনো গুণ থাকা সম্ভব নয়—কেমন? কিন্তু তা নয়। এঁর আর একটি মস্ত গুণ আছে, এই শরীরের ওপর ইনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।"

সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল,—"ব্যোমকেশবাবু, আপনি তো এই কাজের কাজী, সমাজের নিকৃষ্ট লোক নিয়েই আপনাকে কারবার করতে হয়, মদ গাঁজা চণ্ডু কোকেন ইত্যাদি অনেক রকম নেশাই মানুষকে করতে দেখে থাকবেন;—কিন্তু মাকড়সার রস খেয়ে কাউকে নেশা করতে দেখেছেন কি?"

আমি আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলাম,—"মাকড়সার রস! সে আবার কি?"

মোহন বলিল,—"এক জাতীয় মাকড়সা আছে, যার শরীর থেকে এই বীভৎস বিষাক্ত রস পিষে বার করে নেওয়া হয়—"

ব্যোমকেশ কতকটা আত্মগত ভাবে বলিল,—"Tarantula dance! স্পেনে আগে ছিল,—এই মাকড়সার কামড় খেয়ে লোকে হরদম নাচত! দারুণ বিষ! বইয়ে পড়েছি বটে কিন্তু এদেশে কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি।"

মোহন বলিল,—"ঠিক বলেছেন—ট্যারাণ্টুলা; সাউথ আমেরিকার স্প্যানিশ সংকর জাতির মধ্যে এই নেশার খুব বেশী চলন আছে। এই ট্যারাণ্টুলার রস একটা তীব্র বিষ, কিন্তু খুব কম মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করে। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবের দোষে স্নায়বিক উত্তেজনা না হলে যারা থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই মাকড়সার রস কি রকম লোভনীয় বস্তু। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে এর ফল সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায়। অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডল ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ে এবং তারপরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য।

"আমাদের নন্দদুলালবাবু বোধহয় যৌবনকালে এই চমৎকার নেশাটি ধরেছিলেন; তারপর শরীর যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়ল তখনো নেশা ছাড়তে পারলেন না। আমি যখন গৃহ-চিকিৎসক হয়ে ওঁদের বাড়িতে ঢুকলুম তখনো উনি প্রকাশ্যে ঐ নেশা চালাচ্ছেন, সে আজ বছরখানেকের কথা। আমি প্রথমেই ওটা বন্ধ করে দিলুম,—বললুম, যদি বাঁচতে চান তাহলে ওটা ছাড়তে হবে।

"এই নিয়ে খুব খানিকটা ধস্তাধস্তি হল, তিনিও খাবেনই আমিও খেতে দেব না। শেষে আমি বললুম,—"আপনার বাড়িতে ও জিনিস ঢুকতে দেব না, দেখি আপনি কি করে খান।" তিনিও কুটিল হেসে বললেন,—"তাই নাকি? আচ্ছা, আমিও খাব, দেখি তুমি কি করে আটকাও।" যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।

"পরিবারের আর সকলে আমার পক্ষে ছিলেন, সুতরাং সহজেই বাড়ির চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী ছেলেরা পালা করে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলেন, যাতে কোনোক্রমে সে-বিষ তাঁর কাছে পৌঁছতে না পারে। তিনি নিজে একরকম চলৎশক্তিহীন, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যে সে-জিনিস সংগ্রহ করবেন সে ক্ষমতা নেই। আমি এইভাবে তাঁকে আগলাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলুম।

"কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাড়িসুদ্ধ লোকের নজর এড়িয়ে তিনি নেশা করতে লাগলেন; কোথা থেকে সে জিনিস আমদানি করেছেন কেউ ধরতে পারল না।

"প্রথমটা আমার সন্দেহ হল, হয়তো বাড়ির কেউ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। তাই একদিন আমি নিজে সমস্ত দিন পাহারায় রইলুম। কিন্তু আশ্চর্য মশায়, আমার চোখের সামনে তিন তিনবার সেই বিষ খেলেন। তাঁর নাড়ী দেখে বুঝলুম—অথচ কখন খেলেন ধরতে পারলুম না।

"তারপর তাঁর ঘর আঁতিপাঁতি করেছি, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু তবু তাঁর মৌতাত বন্ধ করতে পারিনি। এখনো সমভাবে সেই ব্যাপার চলছে।

"এখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকটা ঐ মাকড়সার রস পায় কোথা থেকে এবং পেলেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে খায় কি করে!"

মোহন চুপ করিল। ব্যোমকেশ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, মোহন শেষ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"অজিত, বাড়ি চল। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এসেছে, যদি তা ঠিক হয় তাহলে—"

বুঝিলাম সেই পুরানো জ্বালিয়াৎ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোহন এতক্ষণ

যে বকিয়া গেল তাহার শেষের দিকের কথাগুলো হয়তো তাহার কানেও যায় নাই। আমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলাম,—"মোহনের গল্পটা বোধহয় তুমি ভাল করে শোনোনি—"

"বিলক্ষণ! শুনেছি বৈকি। সমস্যাটা খুবই মজার—কৌতূহলও হচ্ছে—কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? আমি একটা বিশেষ শক্ত কাজে—"

মোহন মনে মনে বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"তবে কাজ নেই—থাক। আপনাকে এইসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে অনুরোধ করা অবশ্য অনুচিত; কিন্তু—কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হলে হয়তো লোকটার প্রাণ বাঁচাতে পারা যেত। একটা লোক—যতবড় পাপিষ্ঠই হোক—বিন্দু বিন্দু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে চোখের সামনে দেখছি অথচ নিবারণ করতে পারছি না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?"

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"আমি করব না বলিনি তো। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হলে ঘণ্টা দু'য়েক ভাবতে হবে; আর, একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়—কিন্তু আজ বোধহয় তা পেরে উঠব না। নন্দদুলালবাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই মরতে দেওয়া যেতে পারে না। সে আমি দেবোও না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এখনি আমার বাসায় ফিরতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জালিয়ৎ লোকটাকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু একবার কাগজগুলো ভাল করে দেখা দরকার।—সুতরাং আজকের রাতটা নন্দদুলাল-বাবু নিশ্চিন্ত মনে বিষ পান করে নিন—কাল থেকে আমি তাঁকে জব্দ করে দেব।"

মোহন হাসিয়া বলিল,—"বেশ, কালই হবে। কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন—আমি 'কার' পাঠিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, তাতে আপনার উৎকণ্ঠাও অনেকটা লাঘব হবে। অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখেশুনে আসুক; তারপর ওর মুখে সব কথা শুনে আজ রাত্রেই কিম্বা কাল সকালে আমি আপনার ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশের বদলে আমি যাইব, ইহাতে মোহনের মুখে যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা কাহারো চক্ষু এড়াইবার নয়। ব্যোমকেশ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"আপনার বাল্যবন্ধু বলেই বোধহয় অজিতের ওপর আপনার তেমন—ইয়ে—নেই। কিন্তু হতাশ হবেন না, সৎসঙ্গে পড়ে ওর বুদ্ধি এখন এমনি ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে তার দু' একটা দৃষ্টান্ত শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।—হয়তো ও নিজেই আপনার এই ব্যাপারের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেবে, আমাকে দরকারও হবে না।"

এতবড় সুপারিশেও মোহন বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না। রুই কাৎলা ধরিবার আশায় ছিপ ফেলিয়া যাহারা সন্ধ্যাকালে পুঁটিমাছ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তাহাদের মত মুখভাব করিয়া সে বলিল,—"অজিতই চলুক তাহলে। কিন্তু ও যদি না পারে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে! তখন তো আমি আছিই।" ব্যোমকেশ আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল,—"সব জিনিস ভাল করে লক্ষ্য কোরো, আর চিঠিপত্র কি আসে খোঁজ নিও।"—এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্মোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।

মনে মনে এইরূপ সংকল্প আঁটিয়া মোহনের সহিত লেক হইতে বাহির হইলাম। বাস আরোহণে যখন নির্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে

—রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতেছে। মোহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সার্কুলার রোড হইতে একটা গলি ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটা লোহার রেলিংযুক্ত বড় বাড়ি দেখাইয়া মোহন বলিল,—"এই বাড়ি।"

দেখিলাম সেকেলে ধরনের পুরাতন বাড়ি, সম্মুখে লোহার ফটকে টুল পাতিয়া দারোয়ান বসিয়া আছে। মোহনকে দেখিয়া সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"বাবুজি, আপকো ভিতর যানা—"

মোহন হাসিয়া বলিল,—"ভয় নেই দারোয়ান, উনি আমার বন্ধু।"

"বহুত খুব"—দারোয়ান সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা বাড়ির সম্মুখস্থ অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম।

অঙ্গন পার হইয়া বারান্দায় উঠিতেই ভিতর হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল, বলিল,—"কে, ডাক্তারবাবু? আসুন।" আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি—?"

মোহন তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি বলিল, যুবকও উত্তর দিল, "বেশ তো, বেশ তো, উনি আসুন না—"

মোহন তখন পরিচয় করাইয়া দিল—গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র, নাম অরুণ। তাহার অনুবর্তী হইয়া আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। দুইটা ঘর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে একটা কলহ-তীক্ষ্ণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—"কে? কে তুমি? এখন আমায় বিরক্ত করো না, আমি লিখছি।"

অরুণ বলিল,—"বাবা, ডাক্তারবাবু এসেছেন। অভয়, দোর খোল।" একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের যুবক—বোধহয় গৃহস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র—দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

অরুণ চুপিচুপি অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—"খেয়েছেন?"

অভয় ম্লানভাবে ঘাড় নাড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল, ঘরের মধ্যস্থলে খাটের উপর বিছানা পাতা রহিয়াছে এবং সেই বিছানায় বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া, ডান হাতে উত্থিত কলম ধরিয়া, অতি শীর্ণকায় নন্দদুলালবাবু ক্রুদ্ধ কষায়িত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মাথার উপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, আর একটা টেবিল-ল্যাম্প খাটের ধারে উঁচু টিপাইয়ের উপর রাখা ছিল; তাই লোকটির সমস্ত অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচেই কিন্তু মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া একটা শ্রীহীন পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাড় চওড়া, ধারালো মুখে মাংসের লেশমাত্র নাই, হনুর অস্থি দু'টা যেন চর্ম ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে—পাৎলা দ্বিধা-ভগ্ন নাকটা মুখের উপর গৃধ্রের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দু'টা কোনো অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আবার যে তাহারা মৎস্যচক্ষুর মত ভাবলেশহীন হইয়া পড়িবে তাহার আভাসও সে-চক্ষে লুক্কায়িত আছে। নিম্নের ঠোঁট শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সব মিলিয়া মুখের উপর একটা কদাকার ক্ষুধিত, অসন্তোষ যেন রেখায় রেখায় চিহ্নিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ এই প্রেতাকৃতি লোকটির দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতটা থাকিয়া থাকিয়া অকারণে আনর্তিত হইয়া উঠিতেছে, যেন সেটা স্বাধীন-ভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যাঙের দেহ তড়িৎ সংস্পর্শে চমকাইয়া উঠিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই স্নায়ু-নৃত্য কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

নন্দদুলালবাবুও বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, সেই ভাঙা অথচ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার! এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ এখানে? কি চায় লোকটা? যেতে বল—যেতে বল—"

মোহন চোখের একটা ইশারা করিয়া আমাকে জানাইল যে আমি যেন গৃহস্বামীর এরূপ সম্ভাষণে কিছু মনে না করি; তারপর শয্যার উপর হইতে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলা সরাইয়া শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া রোগীর নাড়ী হাতে লইয়া স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। নন্দদুলালবাবু মুখে একটা বিকৃত হাস্য লইয়া একবার আমার পানে একবার ডাক্তারের পানে তাকাইতে লাগিলেন। বাঁ হাতটা তেমনি নৃত্য করিতে লাগিল।

শেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া মোহন বলিল,—"আবার খেয়েছেন?"

"বেশ করেছি খেয়েছি—কার বাবার কি?"

মোহন অধর দংশন করিল, তারপর বলিল,—"এতে নিজেরই কেবল ক্ষতি করছেন, আর কারু নয়। কিন্তু সে তো আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতাই নেই। ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছেন।"

নন্দদুলালবাবু মুখের একটা পৈশাচিক বিকৃতি করিয়া বলিলেন,—"তাই নাকি এয়ার? মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছি? কিন্তু তোমার ঘটে তো অনেক বুদ্ধি আছে? তবে ধরতে পারছ না কেন? বলি, চারদিকে তো সেপাই বসিয়ে দিয়েছ,—কই, ধরতে পারলে না?" বলিয়া হি হি করিয়া এক অশ্রাব্য হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোহন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারি। যা করছিলেন করুন।"

নন্দদুলালবাবু পূর্ববৎ হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"দুয়ো ডাক্তার, দুয়ো। আমায় ধরতে পারলে না, ধিনতা ধিনা পাকা নোনা—" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

নিজের পুত্রদের সম্মুখে এই কদর্য অসভ্যতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; মোহনেরও বোধ করি ধৈর্যের বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে আমাকে বলিল,—"নাও অজিত, কি দেখবে দেখেশুনে নাও—আর পারা যায় না।"

হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্ফালন থামাইয়া নন্দদুলালবাবু দুই সর্প-চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া কটুকণ্ঠে কহিলেন,—"কে হে তুমি—আমার বাড়িতে কোন্ মতলবে ঢুকেছ?" আমি কোন জবাব দিলাম না, তখন—"চালাকি করবার আর জায়গা পাওনি? ওসব ফন্দি ফিকির এখানে চলবে না যাদু,—বুঝেছ? এইবেলা চটপট সরে পড়, নইলে পুলিস ডাকব। যত সব নচ্ছার ছিঁচকে চোরের দল।" বলিয়া মোহনকেও নিজের দৃষ্টির মধ্যে সাপটাইয়া লইলেন। সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে আনিয়াছে ঠিক না বুঝিলেও আমার উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

অরুণ লজ্জিতভাবে আমার কানে কানে বলিল,—"ওঁর কথায় কান দেবেন না। ওটা খেলে ওঁর আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না।"

মনে মনে ভাবিলাম, কি ভয়ংকর এই বিষ যাহা মানুষের সমস্ত গোপন দুষ্প্রবৃত্তিকে এমন উগ্র প্রকট করিয়া তোলে! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইহা খায় তাহার নৈতিক অধোগতির মাত্রাই বা কে নিরূপণ করিবে?

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল সব দিক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে, তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরের চতুর্দিক ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরটা বেশী বড়, আসবাবপত্রও অধিক নাই,—একটা খাট, গোটা দুই তিন চেয়ার, একটা আলমারি ও একটা তেপায়া টেবিল। এই টেবিলের উপর ল্যাম্পটা রাখা আছে এবং তাহারি পাশে কয়েক দিস্তা অলিখিত কাগজ ও অন্যান্য লেখার সরঞ্জাম রহিয়াছে। লিখিত কাগজপত্রগুলা অবিন্যস্ত ভাবে চারিদিকে ছড়ানো। আমি এক তা কাগজ তুলিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই শিহরিয়া রাখিয়া দিলাম;—মোহন যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। এ লেখা পড়িলে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল জোলারও বোধ করি গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। শুধু তাই নয়, লেখার বিশেষ রসালো স্থলগুলিতে লাল কালির দাগ দিয়া লেখক মহাশয় সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, এতখানি নোংরা জঘন্য মনের পরিচয় আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

নন্দদুলালবাবুর দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তিনি আবার লেখায় মন দিয়াছেন। পার্কারের কলম দ্রুতবেগে কাগজের উপর সঞ্চরণ করিয়া চলিয়াছে, পাশের টেবিলে দোয়াতদানিতে আর একটা মেটে লাল রঙের পার্কারের ফাউণ্টেন পেন রাখা আছে, লেখা শেষ হইলেই বোধ করি দাগ দেওয়া আরম্ভ হইবে।

হইলও তাই। পাতাটা শেষ হইতেই নন্দদুলালবাবু কালো কলম রাখিয়া লাল কলমটা তুলিয়া লইলেন। আঁচড় কাটিয়া দেখিলেন, কালি ফুরাইয়া গিয়াছে—তখন টেবিলের উপর হইতে লাল কালির চ্যাপ্টা শিশি লইয়া তাহাতে কালি ভরিলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে নিজের লেখার মণিমুক্তাগুলি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের অন্যান্য জিনিস দেখিতে লাগিলাম। আলমারিটাতে কিছু ছিল না, শুধু কতকগুলো অর্ধেক ঔষধের শিশি পড়িয়াছিল। মোহন বলিল, সেগুলো তাহারই প্রদত্ত ঔষধ। ঘরে দু'টি জানালা, দু'টি দরজা। একটি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, অন্যটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ওদিকে স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। সে ঘরটাও দেখিলাম; বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটা কাচা কাপড় তোয়ালে তেল সাবান মাজন ইত্যাদি রহিয়াছে।

জানালা দু'টা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বাহিরের সহিত উহাদের কোনো যোগ নাই, তাছাড়া অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে।

ব্যোমকেশ থাকিলে কি ভাবে অনুসন্ধান করিত তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। দেয়ালে টোকা মারিয়া দেখিব কি না ভাবিতেছি—হয়তো কোথাও গুপ্ত দরজা আছে—এমন সময় চোখে পড়িল দেয়ালে একটা তাকের উপর একটি চাঁদির আতরদানি রহিয়াছে। সাগ্রহে সেটাকে পরীক্ষা করিলাম; তাহার মধ্যে খানিকটা তুলা ও খোপে খোপে আতর রহিয়াছে। চুপি চুপি অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উনি আতর মাখেন নাকি?"

সে অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কি জানি। বোধহয় না; মাখলে গন্ধ পাওয়া যেত।"

"এটা কতদিন এঘরে আছে?"

"তা বরাবরই আছে। বাবাই ওটা আনিয়ে ঘরে রেখেছিলেন।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লেখা বন্ধ করিয়া নন্দদুলালবাবু এই দিকেই তাকাইয়া আছেন। মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল; খানিকটা তুলা আতরে ভিজাইয়া পকেটে পুরিয়া লইলাম।

তারপর ঘরের চারিদিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নন্দদুলালবাবুর দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিল; দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই শ্লেষপূর্ণ কদর্য হাসিটা লাগিয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া আমরা বারান্দায় বসিলাম। আমি বলিলাম,—"এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কোনো কথা গোপন না করে উত্তর দেবেন।"

অরুণ বলিল,—"বেশ, জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম,—"আপনারা ওঁকে সর্বদা নজরবন্দীতে রেখেছেন? কে কে পাহারা দেয়?"

"আমি, অভয় আর মা পালা করে ওঁর কাছে থাকি। চাকর-বাকর বা অন্য কাউকে কাছে যেতে দিই না।"

"ওঁকে কখনও ও জিনিস খেতে দেখেছেন?"

"না—মুখে দিতে দেখিনি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।"

"জিনিসটার চেহারা কি রকম কেউ দেখেছেন?"

"যখন প্রকাশ্যে খেতেন তখন দেখেছিলুম—জলের মতন জিনিস, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে থাকত; তাই কয়েক ফোঁটা সরবৎ কিম্বা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন।"

"সে রকম শিশি ঘরে কোথাও নেই—ঠিক জানেন?"

"ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।"

"তাহলে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসে। কে আনে?"

অরুণ মাথা নাড়িল,—"জানি না।"

"আপনারা তিনজন ছাড়া আর কেউ ও ঘরে ঢোকে না? ভাল করে ভেবে দেখুন।"

"না—কেউ না। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া।"

আমার জেরা ফুরাইয়া গেল—আর কি জিজ্ঞাসা করিব? গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমকেশের উপদেশ স্মরণ হইল; পুনশ্চ আরম্ভ করিলাম,—"ওঁর কাছে কোনো চিঠিপত্র আসে?"

"না।"

"কোনো পার্সেল কি অন্য রকম কিছু?"

এইবার অরুণ বলিল,—"হ্যাঁ—হপ্তায় একখানা করে রেজিস্ট্রি চিঠি আসে।"

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম,—"কোত্থেকে আসে? কে পাঠায়?"

লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া অরুণ আস্তে আস্তে বলিল,—"কলকাতা থেকেই আসে—রেবেকা লাইট নামে একজন স্ত্রীলোক পাঠায়।"

আমি বলিলাম—"হুঁ—বুঝেছি। চিঠিতে কি থাকে আপনারা দেখেছেন কি?"

"দেখেছি।" বলিয়া অরুণ মোহনের পানে তাকাইল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি থাকে?"

"সাদা কাগজ।"

"সাদা কাগজ?"

"হ্যাঁ—খালি কতকগুলো সাদা কাগজ খামের মধ্যে পোরা থাকে—আর কিছু না।"

আমি হতবুদ্ধির মত প্রতিধ্বনি করিলাম,—"আর কিছু না?"

"না।"

কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম; শেষে বলিলাম,—"ঠিক জানেন খামের ভিতর আর কিছু থাকে না!"

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল,—"ঠিক জানি। বাবা নিজে পিওনের সামনে রসিদ দস্তখত করে চিঠি নেন বটে কিন্তু আগে আমিই চিঠি খুলি। তাতে সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

"প্রত্যেক বার আপনিই চিঠি খোলেন? কোথায় খোলেন?"

"বাবার ঘরে। সেইখানেই পিওন চিঠি নিয়ে যায় কিনা।"

"কিন্তু এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! সাদা কাগজ রেজিস্ট্রি করে পাঠাবার মানে কি?"

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল,—"জানি না।"

আরো কিছুক্ষণ বোকার মত বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রেজিস্ট্রি চিঠির কথা শুনিয়া মনে আশা হইয়াছিল যে ফন্দিটা বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু না, ওদিকের দরজায় একেবারে তালা লাগানো। বুঝিলাম, আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপার সামান্য ঠেকিলেও, আমার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। 'তুলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।' ঐ বিষজর্জরিতদেহ অকালপঙ্গু বুড়া লম্পটকে আঁটিয়া ওঠা আমার কর্ম নয়,—এখানে ব্যোমকেশের সেই শাণিত ঝক্‌ঝকে মস্তিষ্কটি দরকার।

মলিন মুখে, ব্যোমকেশকে সকল কথা জানাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, একটা কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নন্দদুলালবাবু কাউকে চিঠিপত্র লেখেন?"

অরুণ বলিল,—"না, তবে মাসে মাসে মনিঅর্ডার করে টাকা পাঠান।"

"কাকে পাঠান?"

লজ্জাম্লান মুখে অরুণ বলিল,—"ঐ ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে।"

মোহন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল,—"ঐ স্ত্রীলোকটা আগে নন্দদুলালবাবুর—"

"বুঝেছি। কত টাকা পাঠান?"

"এক শ টাকা। কিন্তু কেন পাঠান তা বলতে পারি না।"

মনে মনে ভাবিলাম—পেন্‌সন। কিন্তু মুখে সে-কথা না বলিয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। মোহন রহিয়া গেল।

বাসায় পোঁছিতে রাত্রি আটটা বাজিল।

ব্যোমকেশ লাইব্রেরী ঘরে ছিল, দ্বারে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলিয়া বলিল,—"কি খবর? সমস্যা-ভঞ্জন হল?"

"না"—আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্বে ব্যোমকেশ একটা মোটা লেন্স লইয়া একখণ্ড কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল, এখন আবার যন্ত্রটা তুলিয়া লইল। তারপর আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—"ব্যাপার কি? এত সৌখীন হয়ে উঠলে কবে থেকে? আতর মেখেছ যে?"

"মাখিনি। নিয়ে এসেছি।" তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম, সেও বোধ হইল মন দিয়া শুনিল। উপসংহারে আমি বলিলাম—"আমার দ্বারা তো হল না ভাই—এখন দেখ, তুমি যদি কিছু পার। তবে আমার মনে হয়, এই আতরটা অ্যানালাইজ্ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে—"

"কি পাওয়া যাবে—মাকড়সার রস?" ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে তুলাটা লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল,—"আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি আতর।" তুলাটা হাতের চামড়ার উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল,—"হ্যাঁ—কি বলছিলে? কি পাওয়া যেতে পারে?"

আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম,—"হয়তো নন্দদুলালবাবু আতর মাখবার ছল করে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল,—"এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে? নন্দদুলালবাবু যে আতর মাখেন তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ?"

"তা পাইনি বটে—কিন্তু—"

"না হে না, ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর। কি করে জিনিসটা ঘরের মধ্যে আসে, কি করে নন্দদুলালবাবু সকলের চোখের সামনে সেটা মুখে দেন—এইসব কথা ভেবে দেখ। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয় কেন? ভেবে দেখেছ?"

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম,—"অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হল না।"

"আরো ভাবো—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?—গভীর ভাবে ভাবো, একাগ্র চিত্তে ভাবো, নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো—" বলিয়া সে আবার লেন্সটা তুলিয়া লইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর তুমি?"

"আমিও ভাবছি। কিন্তু একাগ্রচিত্তে ভাবা বোধহয় হয়ে উঠবে না। আমার জালিয়াৎ—" বলিয়া সে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে আরাম কেদারাটায় লম্বা হইয়া শুইয়া আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম। সত্যই তো, কি এমন কঠিন কাজ যে আমি পারিব না। নিশ্চয় পারিব। ,

প্রথমত, রেজিস্ট্রি করিয়া সাদা কাগজ আসিবার সার্থকতা কি? অদৃশ্য কালি দিয়া তাহাতে কিছু লেখা থাকে? যদি তাই থাকে, তাহাতে নন্দদুলালবাবুর কি সুবিধা হয়? জিনিসটা তো তাঁহার কাছে পোঁছিতে পারে না!

আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া যাক, জিনিসটা কোনোক্রমে বাহির হইতে ঘরের ভিতরে আসিয়া পোঁছিল, কিন্তু সেটা নন্দদুলালবাবু রাখেন কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিও লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নয়। অষ্টপ্রহর সতর্ক চক্ষু তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার উপর প্রত্যহ খানাতল্লাসী চলিতেছে। তবে?

ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, পাঁচটা চুরুট পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া

গেল,—কিন্তু একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইলাম না। নিরাশ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি এমন সময় একটা অপূর্ব আইডিয়া মাথায় ধরিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া আরাম কেদারায় উঠিয়া বসিলাম।

এও কি সম্ভব! কিম্বা—সম্ভব নয়ই বা কেন? শুনিতে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিলেও—এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? ব্যোমকেশ বলিয়াছে, কোনো বিষয়ের যুক্তিসম্মত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও ইহাই তো এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ব্যোমকেশকে বলিব মনে করিয়া উঠিয়া যাইতেছি, ব্যোমকেশ নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিল; আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি? ভেবে বার করলে না কি?"

"বোধহয় করেছি।"

"বেশ বেশ। কি বার করলে শুনি?"

বলিতে গিয়া একটু বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তবু জোর করিয়া সংকোচ সরাইয়া বলিলাম,—"দেখ, নন্দদুলালবাবুর ঘরের দেওয়ালে কতকগুলো মাকড়সা দেখেছি, এখন মনে পড়ল। আমার বিশ্বাস তিনি সেইগুলোকে—"

"ধরে ধরে খান!"—ব্যোমকেশ হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, "অজিত, তুমি একেবারে একটি—জিনিয়াস! তোমার জোড়া নেই। দেয়ালের মাকড়সা ধরে ধরে খেলে নেশা হবে না ভাই, গা-ময় গরলের ঘা ফুটে বেরুবে। বুঝলে?"

আমি উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম,—"বেশ, তবে তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল। অলসভাবে একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—"সাদা কাগজ ডাকে কেন আসে বুঝতে পেরেছ?"

"না।"

"ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে কেন টাকা পাঠানো হয় বুঝেছ?"

"না।"

"নন্দদুলালবাবু দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন কেন তাও বুঝতে পারনি?"

"না। তুমি বুঝেছ?"

"বোধহয় বুঝেছি," ব্যোমকেশ চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়া নিমীলিত নেত্রে কহিল,—"কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে না-জানা পর্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।"

"কি বিষয়ে?"

ব্যোমকেশ মুদিতচক্ষে বলিল,—"আগে জানা দরকার নন্দদুলালবাবুর জিভ কোন্ রঙের।"

মনে হইল ব্যোমকেশ আমাকে পরিহাস করিতেছে, রুষ্ট মুখে বলিলাম,—"ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?"

"ঠাট্টা!" ব্যোমকেশ চোখ খুলিয়া আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল,—"রাগ করলে? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। নন্দদুলালবাবুর জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তাঁর জিভের রঙ লাল হয় তাহলে বুঝব আমার অনুমান ঠিক, আর যদি না হয়—। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি?"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম,—"না, জিভ লক্ষ্য করবার কথা আমার মনে হয়নি।"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল,—"অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যা হোক, এক কাজ কর, ফোন করে নন্দদুলালবাবুর ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।"

"রসিকতা করছি মনে করবে না তো?"

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া কাব্যের ভাষায় বলিল,—"ভয় নাই তোর ভয় নাই ওরে ভয় নাই—কিছু নাই তোর ভাবনা—"

পাশের ঘরে গিয়া নম্বর খুঁজিয়া ফোন করিলাম। মোহন তখনো সেখানে ছিল, সে-ই উত্তর দিল,—"ও কথাটা দরকারি বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি। নন্দদুলালবাবুর জিভের

রঙও টকটকে লাল। একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়, কারণ তিনি বেশী পান খান না।—কেন বল দেখি?"

ব্যোমকেশকে ডাকিলাম, ব্যোমকেশ আসিয়া বলিল,—"লাল তো? তবে আর কি—হয়ে গেছে।—দেখি।" আমার হাত হইতে ফোন লইয়া বলিল,—"ডাক্তারবাবু? ভালই হল। আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, অজিতই ভেবে বার করেছে—আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। আমার জালিয়াৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম তাই—হ্যাঁ, জালিয়াৎকে ধরেছি।......বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল নন্দদুলালবাবুর ঘর থেকে লাল কালির দোয়াত আর লাল রঙের ফাউণ্টেন পেনটা সরিয়ে দেবেন।......হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন। কাল একবার আসবেন তখন সব কথা বলব...আচ্ছা, নমস্কার। অজিতকে আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। বলেছিলুম কিনা—যে ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষণ ধারালো হয়ে উঠেছে?" হাসিতে হাসিতে ব্যোমকেশ ফোন রাখিয়া দিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিত মুখে বলিলাম,—"কতক-কতক যেন বুঝতে পারছি; কিন্তু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বল। কেমন করে বুঝলে?"

ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"খাবার সময় হল, এখনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। আচ্ছা, চটপট বলে নিচ্ছি শোনো।—প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হবে জিনিসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কি করে। তার নিজের হাত পা নেই, সুতরাং কেউ তাকে নিশ্চয়ই নিয়ে আসে। কে সে? ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়,—ডাক্তার, দুই ছেলে, স্ত্রী এবং আর একজন। প্রথম চারজন বিষ খাওয়াবে না এটা নিশ্চিত, অতএব এ পঞ্চম ব্যক্তির কাজ।"

"পঞ্চম ব্যক্তি কে?"

"পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে—পিওন। সে হপ্তায় একবার সই করাবার জন্যে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং তার মারফতেই জিনিসটা ঘরে প্রবেশ করে।"

"কিন্তু খামের মধ্যে তো সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

"ঐখানেই ফাঁকি। সবাই মনে করে খামের মধ্যে জিনিসটা আছে, তাই পিওনকে কেউ লক্ষ্য করে না। লোকটা হুঁসিয়ার, সে অনায়াসে লাল কালির দোয়াত বদলে দিয়ে চলে যায়। রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ক্রমে পিওনকে নন্দদুলালবাবুর ঘরে ঢোকবার অবকাশ দেওয়া।"

"তারপর?"

"তুমি আর একটা ভুল করেছিলে; ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয়—পেনসন স্বরূপ নয়, ও প্রথা কোথাও প্রচলিত নেই—টাকা ওষুধের দাম, ওই মাগিই পিওনের হাতে ওষুধ সরবরাহ করে।

"তাহলে দেখ ওষুধ নন্দদুলালবাবুর হাতের কাছে এসে পোঁছল, কেউ জানতে পারলে না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঘরে লোক থাকে, তিনি খাবেন কি করে? নন্দদুলালবাবু গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্বদাই হাতের কাছে লেখার সরঞ্জাম রয়েছে, তাই উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই—খাটের ওপর বসেই সে কার্য সম্পন্ন করা যায়। তিনি কালো কলম দিয়ে গল্প লিখছেন, লাল কলম দিয়ে তাতে দাগ দিচ্ছেন এবং একটু ফাঁক পেলেই কলমের নিবটি চুষে নিচ্ছেন। কালি ফুরিয়ে গেলে আবার ফাউণ্টেন পেন ভরে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এখন বুঝতে পারছ?"

"কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কি করে? কালোও তো হতে পারত?"

"হায় হায় এটা বুঝলে না! কালো কালি যে বেশী খরচ হয়। নন্দদুলালবাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশী খরচ হতে দিতে পারেন? তাই লাল কালির ব্যবস্থা।"

"বুঝেছি।—এত সহজ—"

"সহজ তো বটেই। কিন্তু যে-লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ বলেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।"

"তুমি ধরলে কি করে?"

"খুব সহজে। এই ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হয়,—এক, রেজিস্ট্রি করে সাদা কাগজ আসা; দুই, নন্দদুলালবাবুর গল্প লেখা। এই দুটোর সত্যিকার কারণ খুঁজতে গিয়েই আসল কথাটি বেরিয়ে পড়ল।"

পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, আমরা দু'জনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনি? ও—ডাক্তারবাবু, কি খবর?.........নন্দদুলালবাবু চেঁচামেচি করছেন?.........হাত পা ছুঁড়ছেন? তা হোক, তা হোক, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।......অ্যাঁ! কি বললেন? অজিতকে গালাগাল দিচ্ছেন? শকার বকার তুলে?......ভারি অন্যায়। ভারি অন্যায় কিন্তু—যখন তাঁর মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন আর উপায় কি?.........অজিত অবশ্য ওসব গ্রাহ্য করে না; অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তা সে জানে। মধু ও হুল—কমলে কণ্টক ......এই জগতের নিয়ম......আচ্ছা নমস্কার।"

# অর্থমনর্থম্

স্নানাহারের জন্য উঠি-উঠি করিতেছিলাম, বেলা সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল—এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল।

শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, 'হ্যালো, কে আপনি? বিধুবাবু? ও...নমস্কার! নমস্কার! কি খবর? অ্যাঁ। বলেন কি?...আমায় যেতে হবে? তা বেশ...কত নম্বর?...ও আচ্ছা...আধঘণ্টার মধ্যেই গিয়ে পৌঁছুব...'

পাঞ্জাবির বোতাম লাগাইতে লাগাইতে ব্যোমকেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল, 'চল হে, একটু ঘুরে আসা যাক। একটা খুন হয়ে গেছে, বিধুবাবু স্মরণ করেছেন।'

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোন্ বিধুবাবু? ডেপুটি কমিশনার?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—তিনিই। আমার ওপর এত দয়া কেন হল, বুঝতে পারছি না। নিজের ইচ্ছেয় যে ডাকেননি, তা তাঁর কথার ভাবেই বেশ বোঝা গেল। বোধহয় ওপর থেকে হুড়ো এসেছে।'

পুলিসের ডেপুটি কমিশনার বিধুবাবুর সঙ্গে কাজের সূত্রে আমাদের আলাপ হইয়াছিল। তিনি বেশ মুরুব্বীগোছের লোক ছিলেন, দেখা হইলেই গাম্ভারিভাবে ব্যোমকেশকে অনেক সদুপদেশ দিতেন; ব্যোমকেশ যে বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় তাঁহার অপেক্ষা সর্বাংশে ছোট, এই কথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানাভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ব্যোমকেশ অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহার লেকচার শুনিত ও মনে মনে হাসিত। বিধুবাবু নিজের গুণ গরিমার বর্ণনা করিতে করিতে অনেক সময় পুলিসের অনেক গূঢ় খবর প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন। তাই, পুলিস-সংক্রান্ত কোনও খবর প্রয়োজন হইলেই ব্যোমকেশ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া একদফা লেকচার শুনিয়া আসিত।

যৌবনকালে বোধ করি বিধুবাবু একেবারে নির্বোধ ছিলেন না; বিশেষতঃ এই বয়স পর্যন্ত তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য ও কর্মোৎসাহ ছিল। কিন্তু পুলিস-আইনের কলে পড়িয়া তাঁহার বুদ্ধিটা যন্ত্রবৎ হইয়া পড়িয়াছিল। সহকর্মীরা আড়ালে তাঁহাকে 'বুদ্ধুবাবু' বলিয়া ডাকিত।

যা হোক, তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করিয়া লইয়া আমরা দু'জনে বাহির হইলাম। বাসে যথাস্থানে পৌঁছিতে মিনিট কুড়ি সময় লাগিল। স্থানটা শহরের উত্তরাংশে, ভদ্র বাঙালী পল্লীর কেন্দ্রস্থল। নম্বর খুঁজিতে খুঁজিতে চোখে পড়িল, একটি বাড়ির দরজায় দুইজন লালপাগড়ী দাঁড়াইয়া সতর্কভাবে গোঁফে চাড়া দিতেছে; বুঝিলাম, এই বাড়িটাই ঘটনাস্থল।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া কনেস্টবলদ্বয় পথ ছাড়িয়া দিল; আমরা প্রবেশ করিলাম। বাহির হইতে দেখিলে দোতলা বাড়িটা ছোট বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভিতরে বেশ সুপ্রসর, অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি বলিয়া মনে হয়। বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখের খোলা দালানে বড় বড় টবে বাহারে তালগাছ সাজানো রহিয়াছে চোখে পড়িল। একটা প্রকাণ্ড কাচের পাত্রে লাল মাছ খেলা করিতেছে। দালানের তিন ধারে বারান্দাযুক্ত কয়েকটি ঘর। প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে দালানের অপর প্রান্তে উপরে উঠিবার দু'মুখো সিঁড়ি।

ডানধারের একটা ঘরে অনেক লোক গিস্‌গিস্ করিতেছে দেখিয়া আমরা সেই দিকেই গেলাম। দেখিলাম, ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের সম্মুখে স্থূলকায় পক্বগুম্ফ বিধুবাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছেন; বাড়ির চাকরের এজেহার হইয়া গিয়াছে—বামুনের এজেহার হইতেছে। লোকটা কাঁদো-কাঁদো মুখে জোড়-হস্তে দাঁড়াইয়া বিধুবাবুর কড়া কড়া প্রশ্নের

জবাব দিতেছে ও ধমক খাইয়া চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতেছে। কয়েকজন নিম্নতন পুলিস-কর্মচারী চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমাদের দেখিয়া বিধুবাবুর মুখ আরও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন, বসুন। বিশেষ কিছু নয়—একটা খুন হয়েছে, সামান্য ব্যাপার। কে আসামী, তাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। ওয়ারেণ্টও ইস্যু করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু কর্তার হুকুম হল আপনাকে ডাকতে—তাই—' বিধুবাবু সজোরে একটা গলাঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম—আপনিও দেখুন, যদিও দেখবার কিছুই নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি স্বয়ং যে কাজে রয়েছেন, তাতে আমার থাকা-না-থাকা সমান। যা হোক, কমিশনার সাহেব যখন হুকুম দিয়েছেন, তখন আপনার সহকারী হিসাবে আমি না হয় থাকব। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো? কে খুন হয়েছে?'

কৈতববাদের অপার মহিমা; দেবতা একটু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন, 'এ বাড়ির কর্তা করালীবাবু গতরাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় খুন হয়েছেন। মৃত্যুর ধরনটা একটু নূতন গোছের, তাই সাহেব একেবারে ঘাব্‌ড়ে গেছেন। কিন্তু আসলে ব্যাপার খুব সহজ—করালীবাবুর এক ভাগ্নে—মতিলাল, সে-ই এ কাজ করেছে; আর করেই ফেরার হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল, 'গোড়া থেকেই সমস্ত কথা না বললে আমার মত লোকের বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। দয়া করে একটু খোলসাভাবে বলবেন কি?'

বিধুবাবুর মুখের মেঘ সম্পূর্ণ কাটিয়া গেল, তিনি একটু গ্রাম্ভারি হাস্য করিয়া বলিলেন, 'একটু বসুন। এই লোকটার এজেহার শেষ করে নিই, তারপর সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলব।'

পাচক ব্রাহ্মণটা তখনও দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল, বিধুবাবু তাহাকে প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিলেন, 'সাবধান হয়ে বুঝে-সমঝে কথা বলবে। মিথ্যে কথা একটি বলেছ কি সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতকড়া—বুঝলে?'

বামুনঠাকুর শীর্ণকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে।'

বিধুবাবু তখন অসমাপ্ত জেরা আরম্ভ করিলেন, 'কাল রাত্রে তুমি মতিলালবাবুকে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে, ঘড়ি তো দেখিনি—বোধহয়, একটা দুটো হবে।'

'ঠিক করে বল, একটা না দুটো?'

'আজ্ঞে, বারোটা একটা হবে।'

বিধুবাবু হুমকি দিয়া উঠিলেন, 'আবার পাঁচরকম কথা! ঠিক বল, বারোটা, না একটা, না দুটো?'

পাচক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, বারোটা।'

দারোগা ক্ষিপ্রহস্তে জবানবন্দী লিখিয়া লইতে লাগিল।

'তিনি চোরের মত পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—তিনি প্রায় রোজ রাত্তিরেই বাড়ি থাকেন না।'

'আবার বাজে কথা! যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও। মতিলালবাবুকে তুমি উপর থেকে নেমে আসতে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে না হুজুর। তিনি যখন সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান, তখন দেখেছিলুম।'

'ওপর থেকে নামতে দেখনি! তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে আমি—আজ্ঞে আমি—'

'সত্যি কথা বল, তুমি তখন কোথায় ছিলে?'

পাচক ভয়-কম্পিত স্বরে জড়াইয়া জড়াইয়া বলিল, 'আজ্ঞে ধর্মাবতার, আমার দেশের লোকেরা এ বাড়ির সামনে মেছ্ করে থাকে—তাই রাতের কাজকর্ম শেষ হলে তাদের আড্ডায় গিয়ে একটু বসি।'

'ওঃ—তুমি তখন আড্ডায় বসে গাঁজায় দম দিচ্ছিলে!'

'আজ্ঞে—'

'সদর দরজা তাহলে খোলা ছিল?'

ভয়ে পাচকটা শুকাইয়া গিয়াছিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

বিধুবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তাহলে রাত্রে বাড়িতে কারা আসা-যাওয়া করেছিল, তুমি আড্ডায় বসে বসে দেখেছিলে?'

'আজ্ঞে, আর কেউ বাড়ি থেকে বেরোননি।'

'হুঁ। তুমি কখন বাড়ি ফিরলে?'

'আজ্ঞে, মতিবাবু চলে যাবার আধঘণ্টা পরেই আমি বাড়িতে এসে দরজা বন্ধ করে দিলুম। সুকুমারবাবু তার আগেই ফিরে এসেছিলেন।'

'অ্যাঁ! সুকুমারবাবু আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছিলেন?'

'তা জানি না, হুজুর।'

'তিনি কখন ফিরেছিলেন?'

'মতিবাবু বেরিয়ে যাবার কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে।'

বিধুবাবুর ভ্রূকুটি গভীরতর হইল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'তুমি এখন যেতে পার। দরকার হলে আবার তোমার এজেহার হবে।'

পাচকঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পলায়ন করিল। বিধুবাবু তখন ঘর হইতে অন্য পুলিস-কর্মচারীদের সরিয়া যাইতে বলিলেন। ঘরে কেবল আমি আর ব্যোমকেশ রহিলাম।

বিধুবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখলেন তো, একজনকে জেরা করেই সব কথা বেরিয়ে পড়ল। ভাল জেরা করতে জানলে—যা হোক, আপনাকে গোড়া থেকে না বোঝালে আপনি বুঝতে পারবেন না। বাড়ির সকলের জবানবন্দী নিয়ে যেসব কথা জানা গেছে, তাই মোটামুটি আপনাকে বলছি—মন দিয়ে শুনুন।'

ব্যোমকেশ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে শুনিতে লাগিল। বিধুবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'এই বাড়ির যিনি কর্তা ছিলেন, তাঁর নাম করালীবাবু। তিনি বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ছিলেন। বেশ অবস্থাপন্ন লোক, কলকাতায় চার-পাঁচখানা বাড়ি আছে, তা ছাড়া ব্যাঙ্কেও দু'তিন লাখ টাকা জমা আছে।

'স্ত্রী-পুত্র না থাকলেও তাঁর পুষ্যির অভাব নেই। তিনটি ভাগ্নে—মতিলাল, মাখনলাল আর ফণিভূষণ, এবং শ্যালীর দুটি ছেলে-মেয়ে—সবসুদ্ধ এই পাঁচটি লোককে করালীবাবু প্রতিপালন করতেন। তারা সবাই এই বাড়িতেই থাকে। তাদের তিন কুলে আর কেউ নেই।

'যতদূর জানা যায়, করালীবাবু ভয়ঙ্কর ক্ষ্যাপাটে মেজাজের লোক ছিলেন। বাতব্যাধিতে পঙ্গু ছিলেন, বয়সও ষাট-বাষট্টি হয়েছিল—তাই নিজের ঘর থেকে বড় একটা বেরুতেন না। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ লোকে তাঁকে বাঘের মতন ভয় করত। তাঁর এক অদ্ভুত পাগলামি ছিল—তিনি কেবলই নিজের উইল তৈরী করতেন। তাঁর তিনখানা উইল দেরাজ থেকে বেরিয়েছে। প্রথমটায় তিনি মাখনকে ওয়ারিস করে যান, দ্বিতীয়টার ওয়ারিস মতিলাল, এবং সবশেষটায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দিয়ে গেছেন। শেষ উইলটা তৈরী হয়েছে —পরশু। সুকুমারই এখন তাঁর ওয়ারিস।

'করালীবাবুর থেকে থেকে' উইল বদলাবার কারণ ছিল এই যে, যখন যার ওপর তিনি চটতেন, তখনই তাকে উইল থেকে খারিজ করে দিতেন।

'এই উইলের ব্যাপার নিয়ে কাল দুপুরবেলা মতিলালের সঙ্গে করালীবাবুর খুব একচোট ঝগড়া হয়ে যায়। মতিলালের শরীরে অনেক দোষ আছে—সে তাঁকে 'ঘাটের মড়া' 'বাহাত্তুরে বুড়ো' ইত্যাদি গালাগাল দিয়ে চলে আসে।

'তারপর রাত্রি প্রায় বারোটার সময় মতিলাল চুপিচুপি বাড়ি থেকে পালায়—বামুন এবং চাকর দু'জনেই তাকে পালাতে দেখেছে। আজ সকালবেলা দেখা গেল, করালীবাবু তাঁর বিছানায় মরে পড়ে আছেন।

'কি করে মৃত্যু হল, প্রথমটা কেউ বুঝতে পারেনি। আমি এসে বার করলুম—তাঁর ঘাড়ে, ঠিক মেডালা আর ফার্স্ট ভার্টিব্রা'র মাঝখানে একটা ছুঁচ আমূল ফুটিয়ে দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

বিধুবাবু চুপ করিলে ব্যোমকেশ মুখ তুলিল, বলিল, 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! মেডালা আর ফার্স্ট সার্ভিক্ল ভার্টিব্রা'র সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে খুন করেছে, এ যে একেবারে Bride of Lammermoor!' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, 'মতিলালের নামে ওয়ারেণ্ট বার করে দিয়েছেন? লোকটা কাজকর্ম কিছু করে কি না, খবর পাওয়া গেছে কি?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'কিছু না—কিছু না! থার্ড ক্লাস অবধি বিদ্যে, ঘোর বয়াটে। মামার অন্ন মারত, আর বেলেল্লাগিরি করে বেড়াত।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আর মাখনলাল?'

'তিনিও প্রায় দাদার মত, তবে অতটা নয়। কোকেন, গাঁজা-টাজা খায় বটে, কিন্তু দাদার মত এখনও নাম-কাটা সেপাই হয়ে ওঠেনি।'

'আর ফণিভূষণ?'

'তিনি আবার খোঁড়া। কথায় বলে—কানা-খোঁড়া এক গুণ বাড়া, কিন্তু এ ছোঁড়া বোধহয় অতটা খারাপ নয়। তার কারণ, খোঁড়া বলে বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না। তিন ভাইয়ের মধ্যে এই ফণিভূষণই একটু মানুষের মত বোধ হল।'

'আর সুকুমার?'

'সুকুমার বেশ ভাল ছেলে; মেডিক্যাল কলেজের ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ে। তার বোন সত্যবতীও কলেজে পড়ে। এরা দুই ভাই-বোনে বুড়োর যা কিছু সেবা-শুশ্রূষা করত।

'এরা সকলেই বোধ হয় অবিবাহিত?'

'হাঁ—মেয়েটিও।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'এবার চলুন, বাড়িটা একবার ঘুরে দেখা যাক। মৃতদেহ বোধহয় এখনও স্থানান্তরিত হয়নি।'

'না।' একটু অপ্রসন্নভাবেই বিধুবাবু উঠিয়া অগ্রবর্তী হইয়া চলিলেন, আমরা তাঁহার অনুসরণ করিলাম। উপরে উঠিবার সিঁড়ি বারান্দার দুই দিক হইতে উঠিয়া মাঝে চওড়া হইয়া দ্বিতলে পেঁাছিয়াছে। সিঁড়ির নীচে একটি ঘরের দরজা দেখা গেল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ও ঘরটি কার?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'ওটা মতিলালের ঘর। বিশেষ কারণবশতঃ তিনি নীচে শোয়াই পছন্দ করতেন। কর্তা অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক ছিলেন, রাত্রি ন'টার পর কারুর বাইরে থাকবার হুকুম ছিল না। এর ঠিক ওপরের ঘরেই কর্তা শুতেন।'

'ও—আর এ ঘরটি?' বলিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির পাশে কোণের ঘরটি নির্দেশ করিল।

'ওটায় মাখনলাল থাকে।'

'এরা সবাই যে-যার ঘরেই আছেন বোধহয়? অবশ্য মতিলাল ছাড়া?'

'নিশ্চয়। আমি কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছি, আমার বিনা অনুমতিতে কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়। দোরের কাছে কনেস্টবল মোতায়েন আছে।'

ব্যোমকেশ অস্ফুট স্বরে প্রশংসা ও অনুমোদনসূচক কি একটা বলিল, শুনা গেল না। দোতলায় উঠিয়া সম্মুখেই একটা বন্ধ দরজা দেখাইয়া বিধুবাবু বলিলেন, 'এই ঘরে করালীবাবু শুতেন।'

দরজার সম্মুখে গিয়া হঠাৎ ব্যোমকেশ নতজানু হইয়া ঝুঁকিয়া বলিল, 'এটা কিসের দাগ?'

বিধুবাবুও ঝুঁকিয়া একবার দেখিলেন, তারপর সোজা হইয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন,

'ও চায়ের দাগ। প্রত্যহ সকালে ঐ মেয়েটি—সত্যবতী—চা তৈরী করে এনে করালীবাবুকে ডাকত—আজ সকালে সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, তিনি মরে পড়ে আছেন। সেই সময় বোধহয় পেয়ালা থেকে চা চল্‌কে পড়েছিল।'

'ও—তিনিই বুঝি সর্বপ্রথম করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতে পারেন?'

'হ্যাঁ।'

দ্বারে চাবি লাগানো ছিল, বিধুবাবু তালা খুলিয়া দিলে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি মাঝারি আয়তনের, আসবাবপত্র বেশী নাই, কিন্তু যে কয়টি আছে, সেগুলি পরিপাটীভাবে সাজানো। মেঝেয় মুজাপুরী কার্পেট পাতা; ঘরের মাঝখানে কাজকরা টেবিল-ক্লথে ঢাকা ছোট টিপাই; এক কোণে একটি আলনা—তাহাতে কোঁচানো থান ও জামা গোছানো রহিয়াছে, জুতাগুলি নীচে বার্ণিশ করা অবস্থায় সারি সারি রাখা আছে। ঘরের বাঁ দিকের কোণে একখানি খাট—খাটের উপর চাদর-ঢাকা একটা বস্তু রহিয়াছে, দেখিলে মনে হয়, যেন কেহ পাশ ফিরিয়া চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। খাটের পাশে একটি টেবিল, তাহার উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ও মেজার গ্লাস সারি দিয়া সাজানো রহিয়াছে। কাচের গেলাস ঢাকা একটি কুঁজা খাটের শিয়রে মেঝের উপর রাখা আছে। মোটের উপর ঘরটি দেখিলে গৃহকর্তা যে কিরূপ গোছালো লোক ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়, এবং বিছানায় শয়ান ঐ চাদর-ঢাকা লোকটি যে গত রাত্রিতে এই ঘরেই খুন হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

টিপাইয়ের উপর এক পেয়ালা অনাস্বাদিত চা তখনও রাখা ছিল, ব্যোমকেশ প্রথমে সেই পেয়ালাটাই অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিল। শেষে মৃদুস্বরে কতকটা নিজমনেই বলিল, 'পেয়ালার অর্ধেক চা চল্‌কে পিরিচে পড়েছে, পেয়ালাটা অর্ধেক খালি, পিরিচটা ভরা—কেন?'

বিধুবাবু অধীরভাবে মুখের একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, 'সে কথা তো আগেই বলেছি, মেয়েটি—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনেছি। কিন্তু কেন?'

বিধুবাবু এই অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলেন না, বিরক্তমুখে জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইল। চায়ের উপর একটা শ্বেতাভ ছালি পড়িয়াছিল, চামচ দিয়া চা নাড়িয়া সে আস্তে আস্তে একটু চা মুখে দিল। তারপর পেয়ালাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ মুছিয়া খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বিছানার দিকে চাহিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃতদেহ নাড়াচাড়া হয়নি? ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে?'

বিধুবাবু জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কেবল চাদরটা মাথা পর্যন্ত ঢাকা দেওয়া হয়েছে, আর ছুঁচটা বার করে নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে চাদরটি তুলিয়া লইল। শুষ্ক শীর্ণ লোকটি, যেন দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতেছে। মাথার চুল সব পাকিয়া যায় নাই, কপালের চামড়া কুঁচকাইয়া কয়েকটা গভীর রেখা পড়িয়াছে। মুখে মৃত্যু-যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন নাই।

ব্যোমকেশ লাস না সরাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিল। ঘাড়ের চুল সরাইয়া দেখিল, নাকের কাছে ঝুঁকিয়া অনেকক্ষণ কি নিরীক্ষণ করিল। তারপর বিধুবাবুকে ডাকিয়া বলিল, 'আপনি নিশ্চয় খুব ভাল করেই লাস পরীক্ষা করেছেন, তবু দুটো বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঘাড়ে তিনবার ছুঁচ ফোটানোর দাগ আছে।'

বিধুবাবু পূর্বে তাহা লক্ষ্য করেন নাই, এখন তাহা দেখিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ— কিন্তু ও বিশেষ কিছু নয়। মেডালা আর মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থলটা খুঁজে পায়নি, তাই কয়েকবার ছুঁচ ফুটিয়েছে। দ্বিতীয় বিষয়টি কি?'

'নাকটা দেখেছেন?'

'নাক?'

'হ্যাঁ—নাক।'

বিধুবাবু নাক দেখিলেন। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম, নাসারন্ধ্রের চারিদিকে কয়েকটা ছোট ছোট কালো দাগ রহিয়াছে, শীতের সময় গায়ের চামড়া ফাটিয়া যেরূপ দাগ হয়, সেইরূপ।

বিধুবাবু বলিলেন, 'বোধহয় সর্দি হয়েছিল। ঘন ঘন নাক মুছলে ওরকম দাগ হয়। এ থেকে আপনি কি অনুমান করলেন?' বিধুবাবুর স্বর বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ।

'কিছু না—কিছু না। চলুন, এবার পাশের ঘরটা দেখা যাক। ওটা বোধহয় করালীবাবুর বসবার ঘর ছিল।'

পাশের ঘরে টেবিল, চেয়ার, টাইপ রাইটার, বইয়ের আলমারি ইত্যাদি ছিল—এই ঘরেই করালীবাবু অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। বিধুবাবু টেবিলের দেরাজ নির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'এই দেরাজে তাঁর উইলগুলো পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ এই ঘরটাও ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। দেরাজে অন্য কোনও কাগজপত্র ছিল না। ঘরের অপর দিকে ছোট একটি গোসলখানা—ব্যোমকেশ সেটাতে একবার উঁকি মারিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, 'এখানে আর কিছু দেখবার নেই। এবার চলুন সুকুমারবাবুর ঘরে—তিনি মৃতের উত্তরাধিকারী না? ভাল কথা, ছুঁচটা একবার দেখি।'

বিধুবাবু পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশ তাহার ভিতর হইতে একটি ছুঁচ বাহির করিয়া দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিল। সাধারণ ছুঁচ অপেক্ষা আকারে একটু বড় ও মোটা—অনেকটা কাঁথা-সেলাইয়ের ছুঁচের মত; তাহার প্রান্ত হইতে একটু সুতো ঝুলিতেছে।

ব্যোমকেশ বিস্ফারিত-নয়নে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চাপা-স্বরে কহিল, 'আশ্চর্য! ভারি আশ্চর্য!'

'কি?'

'সুতো। দেখছেন না, ছুঁচে সুতো পরানো রয়েছে—কালো রেশমের সুতো!'

'তা তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ছুঁচ সুতো পরানো থাকাতে আশ্চর্যটা কি?'

ব্যোমকেশ একবার বিধুবাবুর মুখের দিকে তাকাইল, তারপর যেন একটু লজ্জিত-ভাবে বলিল, 'তাও তো বটে, আশ্চর্য হবার কি আছে। ছুঁচে সুতো পরানো তো হয়েই থাকে, সেই জন্যেই তো ছুঁচের সৃষ্টি!' ছুঁচ খামে রাখিয়া বিধুবাবুকে ফেরত দিল, বলিল, 'চলুন, এবার সুকুমারবাবুকে দেখা যাক।'

বারান্দার বাঁ দিকের মোড় ঘুরিয়া কোণের ঘরটা সুকুমারবাবুর। দ্বার ভেজানো ছিল, বিধুবাবু নিঃসংশয়ে দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সুকুমার টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, আমরা ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের এক ধারে খাট, অপর ধারে টেবিল, চেয়ার ও বইয়ের আলমারি। কয়েকটা তোরঙ্গ দেয়ালের এক ধারে উপরি উপরি করিয়া রাখা আছে।

সুকুমারের বয়স বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশ হইবে; চেহারাও বেশ ভাল, ব্যায়ামপুষ্ট বলিষ্ঠগোছের দেহ। কিন্তু বাড়িতে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার ফলে মুখ শুকাইয়া, চোখ বসিয়া গিয়া চেহারা অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহার চোখে একটা ভয়ের ছায়া পড়িল।

বিধুবাবু বলিলেন, 'সুকুমারবাবু, ইনি—ব্যোমকেশ বক্সী—আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান।'

সুকুমার গলা সাফ করিয়া বলিল, 'বসুন।'

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিল। একখানা বই টেবিলের উপর রাখা ছিল, তুলিয়া লইয়া দেখিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'আপনি কাল রাত বারোটার সময় কোথা থেকে ফিরেছিলেন সুকুমারবাবু?'

সুকুমার চমকিয়া উঠিল, তারপর অস্ফুট স্বরে বলিল, 'সিনেমায় গিয়েছিলুম।'

ব্যোমকেশ মুখ না তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোন্ সিনেমায়?'

'চিত্রা।'

বিধুবাবু একটু ধমকের সুরে বলিলেন, 'এ আমাকে আগে বলা উচিত ছিল। বলেননি কেন?'

সুকুমার আমতা-আমতা করিয়া বলিল, 'দরকারী কথা বলে মনে হয়নি, তাই বলিনি—'

বিধুবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, 'দরকারী কি অদরকারী, সে বিচার আমরা করব। আপনি যে চিত্রায় গিয়েছিলেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?'

সুকুমার কিছুক্ষণ নতমুখে চিন্তা করিল, তারপর আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট হইতে একখণ্ড রঙীন কাগজ আনিয়া দেখাইল। কাগজখানা সিনেমা টিকিটের অর্ধাংশ, বিধুবাবু সেটা ভাল করিয়া দেখিয়া নোটবুকের মধ্যে রাখিলেন।

ব্যোমকেশ বইয়ের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিল, 'সন্ধ্যের 'শো'তে না গিয়ে সাড়ে ন'টার 'শো'তে গিয়েছিলেন—এর কোনও কারণ ছিল কি?'

সুকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, সে অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'না, কারণ এমন কিছু—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী রাত্রি পর্যন্ত বাইরে থাকা করালীবাবু পছন্দ করেন না, এ কথা নিশ্চয় আপনার জানা ছিল?'

সুকুমার উত্তর দিতে পারিল না, পাংশমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার মুখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালী-বাবুর সঙ্গে আপনার শেষ দেখা কখন হয়েছিল?'

একটা ঢোঁক গিলিয়া সুকুমার কহিল, 'সন্ধ্যে পাঁচটার সময়।'

'আপনি তাঁর ঘরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

সুকুমার জোর করিয়া নিজের কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'মেসোমশাইকে উইল সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়েছিলুম। তিনি মতিদাদাকে বঞ্চিত করে আমার নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করেছিলেন; এই নিয়ে মতিদা'র সঙ্গে দুপুরবেলা তাঁর বচসা হয়। আমি মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলুম যে, আমি একা তাঁর সম্পত্তি চাই না, তিনি যেন তাঁর সম্পত্তি সবাইকে সমান ভাগ করে দেন।'

'তারপর?'

'আমার কথা শুনে তিনি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন।'

'আপনিও বোধ হয় বেরিয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ। সেখান থেকে আমি ফণীর ঘরে গিয়ে বসলুম। ফণীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে রাত হয়ে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাবলুম, বায়স্কোপ দেখে আসি; ফণীও যেতে বললে। তাই রাত্রে চুপি চুপি গিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, মেসোমশাই জানতে পারবেন না।'

সুকুমারের কৈফিয়ৎ শুনিয়া বিধুবাবু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা গেল। ব্যোমকেশের মুখ কিন্তু নির্বিকার হইয়া রহিল। বিধুবাবু বেশ একটু কঠিন স্বরে বলিলেন, 'আপনার মনের কথা কি বলুন তো ব্যোমকেশবাবু? আপনি কি সুকুমারবাবুকে খুনী বলে সন্দেহ করেন?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'না না, সে কি কথা—চলুন, এবার এ'র ভগিনীর ঘরটা—'

বিধুবাবু অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলিলেন, 'চলুন। কিন্তু অযথা একটি মেয়েকে উত্ত্যক্ত করবার কোনো দরকার ছিল না, সে কিছু জানে না। তাকে যা জিজ্ঞাসা করবার আমি জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি।'

ব্যোমকেশ কুণ্ঠিতভাবে বলিল, 'সে তো নিশ্চয়। তবু একবার—'

বারান্দা যেখানে মোড় ফিরিয়াছে, সেই কোণের উপর মেয়েটির ঘর; বিধুবাবু গিয়া দরজায় টোকা মারিলেন। আধ মিনিট পরে একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে দরজা খুলিয়া আমাদের দেখিয়া কবাটের পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। আমরা সঙ্কুচিত-পদে ঘরে প্রবেশ করিলাম। সুকুমারও আমাদের পিছনে পিছনে আসিয়াছিল, সে গিয়া ক্লান্তভাবে বিছানায় বসিয়া পড়িল।

ঘরে ঢুকিবার সময় মেয়েটিকে একবার দেখিয়া লইয়াছিলাম। তাহার গায়ের রঙ ময়লা, লম্বা রোগা গোছের চেহারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দু'টি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখও ঈষৎ ফুলিয়াছে; সুতরাং সে সুশ্রী কি কুশ্রী, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মাথার চুল রুক্ষ। এই শোকে অবসন্ন মেয়েটিকে জেরা করার নিষ্ঠুরতার জন্য মনে মনে ব্যোমকেশের উপর রাগ হইতেছিল, কিন্তু তাহার কুণ্ঠার আড়ালে যে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পিত উদ্দেশ্য রহিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ মেয়েটিকে একটি নমস্কার করিয়া বিনীতভাবে বলিল, 'আপনাকে একটু কষ্ট দেব, কিছু মনে করবেন না। এ রকম একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা যখন বাড়িতে হয়ে যায়, তখন বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত পুলিসের ছোটখাটো উৎপাতও সহ্য করতে হয়—'

বিধুবাবু ফোঁস করিয়া উঠিলেন, 'পুলিসের নামে বদনাম দেবেন না, আপনি পুলিস নন।'

ব্যোমকেশ সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া বলিল, 'বেশী নয়, দু' একটা সাধারণ প্রশ্ন আপনাকে করব। বসুন।' বলিয়া ঘরের একটিমাত্র চেয়ার নির্দেশ করিল।

মেয়েটি বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার ব্যোমকেশের দিকে তাকাইল। তারপর চাপা ভাঙা গলায় বলিল, 'আপনি কি জানতে চান, বলুন। আমি দাঁড়িয়েই জবাব দিচ্ছি।'

'বসবেন না? আচ্ছা, আমিই তাহলে বসি।' চেয়ারে বসিয়া ব্যোমকেশ একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। এ ঘরটিও সুকুমারের ঘরের মত অত্যন্ত সাদাসিধা—আসবাবের বাহুল্য নাই। খাট, টেবিল, চেয়ার, বইয়ের আলমারি; বাড়্তির মধ্যে একটা দেরাজযুক্ত ড্রেসিং টেবিল।

কড়িকাঠের দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই রোজ সকালে চা নিয়ে করালীবাবুকে ডাকতেন?'

মেয়েটি নীরবে ঘাড় নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ তাহলে চা দিতে গিয়েই আপনি প্রথম জানতে পারলেন যে, তিনি মারা গেছেন?'

মেয়েটি আবার ঘাড় নাড়িল।

'তার আগে আপনি কিছু জানতেন না?'

বিধুবাবু গলার মধ্যে গজ্‌গজ্ করিয়া বলিলেন, 'বাজে প্রশ্ন, বাজে প্রশ্ন। একেবারে foolish!'

ব্যোমকেশ যেন শুনিতে পায় নাই, এমনি ভাবে বলিল, 'রাত্রিতে করালীবাবুর দরজা খোলা থাকত?'

'হ্যাঁ। এ বাড়ির কারুর দরজা বন্ধ করে শোবার হুকুম ছিল না। মেসোমশাই নিজেও রাত্রিতে দরজা খুলে শুতেন।'

'বটে! তাহলে—'

বিধুবাবু আর যেন সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ঢের হয়েছে, এবার উঠুন। যত সব বাজে প্রশ্ন করে বেচারীকে বিরক্ত করবার দরকার নেই। আপনি ক্রস্

একজামিন করতে জানেন না—'

এতক্ষণে ব্যোমকেশের বিনীতভাবের মুখোশ খসিয়া পড়িল। খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত সে বিধুবাবুর দিকে ফিরিয়া তীব্র অথচ অনুচ্চ কণ্ঠে কহিল, 'যদি বার বার বিরক্ত করেন, তাহলে আমি কমিশনার সাহেবকে জানাতে বাধ্য হব যে, আপনি আমার অনুসন্ধানে বাধা দিচ্ছেন। আপনি জানেন, এ ধরনের কেস সাধারণ পুলিসের এলাকায় পড়ে না—এটা সি আই ডি'র কেস?'

গালে চড় খাইলেও বোধ করি বিধুবাবু এত স্তম্ভিত হইতেন না। তিনি আরক্ত-চক্ষুতে কটমট করিয়া কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর একটা অর্ধোচ্চারিত কথা গিলিয়া ফেলিয়া গটগট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ মেয়েটির দিকে ফিরিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনি করালীবাবুর মৃত্যুর কথা জানতেন না? ভেবে দেখুন।'

'ভেবে দেখেছি, জানতুম না।' মেয়েটির গলার আওয়াজে একটু জিদের আভাস পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, 'যাক। এখন আর একটা কথা বলুন তো, করালীবাবু চায়ে ক' চামচ চিনি খেতেন?'

মেয়েটি এবার অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, শেষে বলিল, 'চিনি? মেসোমশাই চায়ে চিনি একটু বেশী খেতেন, তিন-চার চামচ দিতে হত—'

বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন হইল, 'তবে আজ তাঁর চায়ে আপনি চিনি দেননি কেন?'

মেয়েটির মুখ একেবারে ছাইয়ের মত হইয়া গেল, ত্রাস-বিস্ফারিত নয়নে সে একবার চারিদিকে চাহিল। তারপর অধর দংশন করিয়া অতিকষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল, 'বোধহয় মনে ছিল না, কাল থেকে আমার শরীরটা ভাল নেই—'

'কাল কলেজে গিয়েছিলেন?'

অস্পষ্ট অথচ বিদ্রোহপূর্ণ উত্তর হইল, 'হ্যাঁ।'

অলসভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সব কথা খুলে বললে আমাদের অনেক সুবিধা হয়, আপনাদেরও হয়তো সুবিধা হতে পারে।'

মেয়েটি ঠোঁট টিপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ আবার বলিল, 'সব কথা বলবেন কি?'

মেয়েটি আস্তে আস্তে কাটিয়া কাটিয়া বলিল, 'আমি আর কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিল। এতক্ষণ সে টেবিলের উপর রক্ষিত একটা সেলায়ের বাক্সের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছিল, এবার টেবিলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল। বাক্সটা নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এটা আপনার বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

বাক্সটা ব্যোমকেশ খুলিল। বাক্সর মধ্যে একটা অসমাপ্ত টেবিল-ক্লথ ও নানা রঙের রেশমী সুতা তাল পাকানো ছিল। সুতার তালটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ নিজমনেই বলিতে লাগিল, 'লাল, বেগুনী, নীল, কালো—হুঁ—কালো—' সুতা রাখিয়া দিয়া বাক্সর মধ্যে কি খুঁজিল, পাট-করা টেবিল-ক্লথটা খুলিয়া দেখিল; তারপর মেয়েটির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'ছুঁচ কই?'

মেয়েটি একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিল, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—'ছুঁচ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—ছুঁচ। ছুঁচ দিয়েই সেলাই করেন নিশ্চয়। সে ছুঁচ কোথায়?'

মেয়েটি কি বলিতে গেল, কিন্তু কিছু বলিতে পারিল না; হঠাৎ ফিরিয়া 'দাদা' বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সুকুমার যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানে তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাপা কান্নার আবেগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

সুকুমার বিহ্বলের মত তাহার মুখটা তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, 'সত্য—সত্য—?'

সত্যবতী মুখ তুলিল না, কাঁদিতেই লাগিল। ব্যোমকেশ তাহাদের নিকটে গিয়া খুব নরম সুরে বলিল, 'ভাল করলেন না, আমাকে বললে পারতেন। আমি পুলিস নই—শুনেছেন তো। বললে হয়তো আপনাদের সুবিধা হত—চল অজিত।'

ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ সন্তর্পণে দ্বার ভেজাইয়া দিল; কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, 'এবার?—হ্যাঁ—ফণীবাবু। চল, বোধহয় ওদিকের ঘরটা তাঁর।'

করালীবাবুর ঘর পার হইয়া বারান্দার অপর প্রান্তের মোড় ঘুরিয়া পাশেই একটা দরজা পড়ে, ব্যোমকেশ তাহাতে টোকা মারিল।

একটি একুশ-বাইশ বছর বয়সের ছোকরা দরজা খুলিয়া দিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনিই ফণীবাবু?'

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ—আসুন।'

ফণীর চেহারা দেখিয়াই মনে হয়, তাহার শরীরে কোথাও একটা অসংগতি আছে; কিন্তু সহসা ধরা যায় না। তাহার দেহ বেশ পুষ্ট, কিন্তু মুখখানা হাড় বাহির করা; বহুদিনের নিরুদ্ধ বেদনা যেন অল্পবয়সেই তাহার মুখখানাকে রেখা-চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। আমরা ঘরে প্রবেশ করিতেই সে আগে আগে গিয়া একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' তখন তাহার হাঁটার ভংগী দেখিয়া বুঝিলাম, শারীরিক অসংগতিটা কোন্‌খানে। তাহার বাঁ পা'টা অস্বাভাবিক সরু—চলিত কথায় যাহাকে 'ছিনে-পড়া' বলে, তাই। ফলে, হাঁটিবার সময় সে বেশ একটু খোঁড়াইয়া চলে।

আমি বিছানার এক পাশে বসিলাম, ফণী আমার পাশে বসিল। ব্যোমকেশ প্রথমটা যেন কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, শেষে একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, 'এই ব্যাপারে পুলিস আপনার দাদা মতিলালবাবুকে সন্দেহ করে, আপনি জানেন বোধ হয়?'

ফণী বলিল, 'জানি; কিন্তু আমিও জোর করে বলতে পারি যে, দাদা নির্দোষ। দাদা ভয়ানক রাগী আর ঝগড়াটে—কিন্তু সে মামাকে খুন করবে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষয় থেকে বঞ্চিত হবার রাগে তিনি এ কাজ করতে পারেন না কি?'

ফণী বলিল, 'সে অজুহাত শুধু দাদার নয়, আমাদের তিন ভায়েরই আছে। তবে শুধু দাদাকেই সন্দেহ করবেন কেন?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'আপনি যা জানেন, সব কথাই বোধহয় পুলিসকে বলেছেন, তবু দু' একটা কথা জানতে চাই—'

ফণী একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'আপনি কি পুলিসের লোক নন? আমি ভেবেছিলুম, আপনারা সি আই ডি—'

ব্যোমকেশ সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, আমি একজন সামান্য সত্যান্বেষী মাত্র—'

বিস্ফারিত চক্ষে ফণী বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনি সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'এখন বলুন তো, করালীবাবুর সংগে বাড়ির আর সকলের সম্বন্ধটা কি রকম ছিল? অর্থাৎ তিনি কাকে বেশী ভালবাসতেন, কাকে অপছন্দ করতেন—এই সব।'

ফণী কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া রহিল, তারপর একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'দেখুন, আমি খোঁড়া মানুষ—ভগবান আমাকে মেরেছেন—তাই আমি ছেলেবেলা থেকে কারুর সংগে ভাল করে মিশতে পারি না। এই ঘর আর এই বইগুলো আমার জীবনের সংগী (বিছানার পাশে একটা বইয়ের শেল্‌ফ দেখাইল)—মামা যে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কাকে বেশী ভালবাসতেন, তা নির্ভুলভাবে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি বড় তিরিক্ষি মেজাজের লোক ছিলেন, তাঁর মনের ভাব মুখের কথায় প্রকাশ পেত

না। তবে আঁচে-আন্দাজে যতদূর বোঝা যায়, সত্যবতীকেই মনে মনে ভালবাসতেন।'

'আর আপনাকে?'

'আমাকে—আমি খোঁড়া অকর্মণ্য বলে হয়তো ভেতরে ভেতরে একটু দয়া করতেন—কিন্তু তার বেশী কিছু—। আমি মৃতের অমর্যাদা করছি না, বিশেষতঃ তিনি আমাদের অন্নদাতা, তিনি না আশ্রয় দিলে আমি না খেতে পেয়ে মরে যেতুম, কিন্তু মামার শরীরে প্রকৃত ভালবাসা বোধহয় ছিল না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি সুকুমারবাবুকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, জানেন বোধহয়?'

ফণী একটু হাসিল—'শুনেছি। সুকুমারদা সব দিক থেকেই যোগ্য লোক, কিন্তু ও-থেকে মামার মনের ভাব কিছু বোঝা যায় না। তিনি আশ্চর্য খেয়ালী লোক ছিলেন; যখনই কারুর ওপর রাগ হত, তখনই টপাটপ টাইপ করে উইল বদলে ফেলতেন। বোধহয়, এ বাড়িতে এমন কেউ নেই—যার নামে একবার মামা উইল তৈরী না করেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শেষ উইল যখন সুকুমারবাবুর নামে, তখন তিনিই সম্পত্তি পাবেন।'

ফণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আইনে কি তাই বলে? আমি ঠিক জানি না।'

'আইনে তাই বলে।' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ অবস্থায় আপনি কি করবেন, কিছু ঠিক করেছেন কি?'

ফণী চুলের মধ্যে একবার আঙুল চালাইয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া বলিল, 'কি করব, কোথায় যাব, কিছুই জানি না। লেখাপড়া শিখিনি, উপার্জন করবার যোগ্যতা নেই। সুকুমারদা যদি আশ্রয় দেয়, তবে তার আশ্রয়েই থাকব—না হয়, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।' তাহার চোখের কোলে জল আসিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে বলিল, 'সুকুমারবাবু কাল রাত্রি বারোটার সময় বাড়ি ফিরেছেন।'

ফণী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল—'রাত্রি বারোটার সময়! ওঃ—হ্যাঁ, তিনি বায়স্কোপে গিয়েছিলেন!'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'করালীবাবুকে ক'টার সময় খুন করা হয়েছে, আপনি আন্দাজ করতে পারেন? কোনও রকম শব্দ-টব্দ শুনেছিলেন কি?'

'কিছু না। হয়তো শেষ রাত্রে—'

'উঁহু—তিনি রাত্রি বারোটায় খুন হয়েছেন।' ব্যোমকেশ উঠিয়া পড়িল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'উঃ, আড়াইটে বেজে গিয়েছে—আর না, চল হে অজিত। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে—আপনাদেরও তো এখনও খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি—নমস্কার।'

এমন সময় নীচে একটা গণ্ডগোল শোনা গেল; পরক্ষণেই আমাদের ঘরের দরজা সজোরে ঠেলিয়া একজন লোক উত্তেজিতভাবে বলিতে বলিতে ঢুকিল, 'ফণী, দাদাকে অ্যারেস্ট করে এনেছে—' আমাদের দেখিয়াই সে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মাখনবাবু?'

মাখন ভয়ে কুঁচকাইয়া গিয়া 'আমি—আমি কিছু জানি না।' বলিয়া সবেগে ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

নীচে নামিয়া গিয়া দেখিলাম, বসিবার ঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড। বিধুবাবু ঘরে নাই, থানার ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। একটা পাগলের মত চেহারার হাতকড়া-পড়া লোককে দু'জন কনস্টেবল ধরিয়া আছে আর সে হাউমাউ করিয়া বলিতেছে, 'মামা খুন হয়েছেন? দোহাই মশাই, আমি কিছু জানি না—যে দিব্যি গালতে বলেন গালছি—আমি মাতাল দাঁতাল লোক—ডালিমের বাড়িতে রাত কাটিয়েছি—ডালিম সাক্ষী আছে—'

ইন্‌স্পেক্টরবাবুটি সত্য সত্যই কাজের লোক, এতক্ষণ নিস্পৃহভাবে বসিয়াছিলেন,

আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, ইনিই মতিলাল—বিধুবাবুর আসামী। যদি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোথায় একে গ্রেপ্তার করা হল?'

যে সাব-ইন্‌স্পেক্টরটি গ্রেপ্তার করিয়াছিল, সে বলিল, 'হাড়কাটা গলির এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে—'

মতিলাল আবার বলিতে আরম্ভ করিল, 'ডালিমের বাড়িতে ঘুমুচ্ছিলুম—কোন্ শালা মিছে কথা বলে—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিল, 'আপনি তো ভোর না হতেই বাড়ি ফিরে আসেন, আজ ফেরেননি কেন?'

পাগলের মত আরক্ত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া মতিলাল বলিল, 'কেন? কেন? আমি—আমি মদ খেয়েছিলুম—দু'বোতল হুইস্কি টেনেছিলুম—ঘুম ভাঙেনি—'

ব্যোমকেশ ইন্‌স্পেক্টরবাবুর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল, তিনি বলিলেন, 'নিয়ে যাও—হাজতে রাখো—'

মতিলাল চীৎকার করিতে করিতে স্থানান্তরিত হইলে, ব্যোমকেশ বলি, 'বিধুবাবু কোথায়?'

'তিনি মিনিট পনের হল বাড়ি গেছেন—আবার চারটের সময় আসবেন।'

'আচ্ছা, তাহলে আমরাও উঠি, কাল সকালে আবার আসব। ভাল কথা, বাড়ির ঘরগুলো সব খানাতল্লাস হয়েছে?'

'করালীবাবুর আর মতিলালের ঘর খানাতল্লাস হয়েছে, অন্য ঘরগুলো খানাতল্লাস করা বিধুবাবু দরকার মনে করেননি।'

'মতিলালের ঘর থেকে কিছু পাওয়া গেছে?'

'কিছু না।'

'উইলগুলো দেখা হল না, সেগুলো বোধহয় বিধুবাবু সীল করে রেখে গেছেন। থাক, কাল দেখলেই হবে। আচ্ছা, চললুম। ইতিমধ্যে যদি নূতন কিছু জানতে পারেন, খবর দেবেন।'

বাসায় ফিরিলাম। রাত্রে করালীবাবুর বাড়ির একটা নক্সা তৈয়ার করিয়া ব্যোমকেশ আমাকে দেখাইল, বলিল, 'করালীবাবুর ঘরের নীচে মতিলালের ঘর; মাখনের ঘর তার পাশে। ফণীর ঘরের নীচে বৈঠকখানাঘর অর্থাৎ যেখানে পুলিস আড্ডা গেড়েছে। সত্যবতীর ঘরের নীচে রান্নাঘর, আর সুকুমারের ঘরের নীচের ঘরে চাকর বামুন শোয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ প্ল্যান্ কি হবে?'

'কিছু না।' বলিয়া ব্যোমকেশ নক্সাটা মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে লাগিল। আমি বলিলাম, 'তোমার কি রকম মনে হচ্ছে? মতিলাল বোধহয় খুন করেনি—না?'

'না--সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।'

'তবে কে?'

'সেইটে বলাই শক্ত, মতিলালকে বাদ দিলে চারজন বাকী থেকে যায়—ফণী, মাখন সুকুমার আর সত্যবতী। এদের মধ্যে যে কেউ খুন করতে পারে। সকলের স্বার্থ প্রায় সমান

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'সত্যবতীও?'

'নয় কেন?'

'কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে—'

'মেয়েমানুষ যাকে ভালবাসে, তার জন্যে করতে পারে না, এমন কাজ নেই।'

'কিন্তু তার স্বার্থ কি? করালীবাবুর শেষ উইলে তার ভাই-ই তো সব পেয়েছে।'

'বুঝলে না? যে লোক ঘণ্টায় ঘণ্টায় মত বদলায়, তাকে খুন করলে আর তার মত বদলাবার অবকাশ থাকে না।'

স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। এদিক হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। বলিলাম, 'তবে কি

তোমার মনে হয়—সত্যবতীই—?'

'আমি তা বলিনি। সুকুমার হতে পারে, সম্পূর্ণ বাইরের লোকও হতে পারে। কিন্তু সত্যবতী মেয়েটি সাধারণ মেয়ে নয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। গত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এত প্রকার খাপছাড়া ও পরস্পর-বিরোধী মালমশলা আমাদের হস্তগত হইয়াছিল যে, তাহার ভিতর হইতে সুসংলগ্ন একটা কিছু বাছিয়া বাহির করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ব্যাপারটা এতই জটিল যে, ভাবিতে গেলে আরও জট পাকাইয়া যায়।

শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মৃতদেহ দেখে তুমি কি বুঝলে?'

'এই বুঝলাম যে, হত্যা করবার আগে হত্যাকারী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করেছিল।'

'কি করে বুঝলে?'

'তাঁর ঘাড়ে হত্যাকারী তিনবার ছুঁচ ফুটিয়েছিল। ক্লোরোফর্ম না করলে তিনি জেগে উঠতেন। তাঁর নাকে ছোট ছোট দাগ দেখেছিলে মনে আছে? সেগুলো ক্লোরোফর্মের চিহ্ন'।

'তিনবার ছুঁচ ফোটাবার মানে?'

'মানে, প্রথম দু'বার মর্মস্থানটা খুঁজে পায়নি। কিন্তু সেটা তেমন জরুরী কথা নয়; জরুরী কথা হচ্ছে এই যে, ছুঁচটা বিঁধিয়ে রেখে গেল কেন? কাজ হয়ে গেলে বার করে নিয়ে চলে গেলেই তো আর কোনও প্রমাণ থাকত না।'

'হয়তো তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আর একটা কথা—রাত বারোটার সময় খুন হয়েছে, তুমি বুঝলে কি করে?'

'ওটা আমার অনুমান। কিন্তু সত্যবতী যদি কখনও সত্যি কথা বলে, দেখবে, আমার অনুমানটা ঠিক। ডাক্তারের রিপোর্ট থেকেও জানা যাবে।'

কিছুক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সুকুমারের টেবিলের ওপর একখানা বই রাখা ছিল—গ্রে'র অ্যানাটমি। সারা বইয়ের মধ্যে কেবল একটা পাতায় কয়েক লাইন লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া ছিল।'

'সে কয় লাইনের অর্থ?'

'অর্থ—মেডালা এবং প্রথম কশেরুর সন্ধিস্থলে যদি ছুঁচ বিঁধিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।'

আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'বল কি! তাহলে?'

'কিন্তু আশ্চর্য! লাল পেন্সিলটা সুকুমারের টেবিলে দেখলুম না।' বলিয়া হঠাৎ উঠিয়া গভীর চিন্তাক্রান্তমুখে ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল। আমার মনের মধ্যে অনেক-গুলা প্রশ্ন গজগজ করিতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিতে ভরসা হইল না। জানিতাম, এই সময় প্রশ্ন করিলেই সে খেঁকী হইয়া উঠে।

রাত্রে শয়ন করিয়া সে একটা প্রশ্ন করিল, 'তুমি তো একজন সাহিত্যিক, বল দেখি thimble-এর বাঙ্লা কি?'

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, 'Thimble? যা আঙুলে পরে দর্জিরা সেলাই করে?'

'হ্যাঁ।'

আমি ভাবিতে ভাবিতে বলিলাম, 'অঙ্গুলিত্রাণ হতে পারে—কিম্বা—সূচীবর্ম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওসব চালাকি চলবে না, খাঁটি বাঙলা প্রতিশব্দ বল।'

স্বীকার করিতে হইল, বাঙলা প্রতিশব্দ নাই, অন্তত আমার জানা নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি জানো?'

'উঁহু। জানলে আর জিজ্ঞাসা করব কেন?'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। আমিও বাঙলা ভাষার অশেষ দৈন্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি, ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছে। একটু রাগ হইল; কিন্তু বুঝিলাম, আমাকে না লইয়া যাওয়ার কোনও মতলব আছে—হয়তো আমি গেলে অসুবিধা হইত।

যখন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা; জামা খুলিয়া পাখাটা চালাইয়া দিয়া সিগারেট ধরাইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল?'

সে একপেট ধোঁয়া টানিয়া আস্তে আস্তে ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, 'উইলগুলো দেখা গেল। উইলের সাক্ষী বাড়ির বামুন আর চাকর—তাদের টিপ্‌সই রয়েছে।'

'আর?'

'বাড়ির অন্য ঘরগুলো ভাল করে খানাতল্লাস করতে বললুম। কিন্তু বিধুবাবু গোঁ ধরেছেন, আমি যা বলব, তার উল্টো কার্জটি করবেন। শেষ পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে এলুম, যদি খানাতল্লাস না করেন, কমিশনার সাহেবকে নালিশ করব।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! তিনি এখনও মতিলালকে কামড়ে পড়ে আছেন।' কিয়ৎকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মেয়েটা ভয়ানক শক্ত, এমন মুখ টিপে রইল, কিছুতেই মুখ খুললে না! অথচ এ রহস্যের চাবিকাঠি তার কাছে। যা হোক, দেখা যাক, বিধুবাবু যদি শেষ পর্যন্ত খানাতল্লাস করা মনস্থ করেন হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'কি পাওয়া যাবে, প্রত্যাশা কর?'

'কে বলতে পারে? সামান্য জিনিস, হয়তো একটা ডাক্তারি দোকানের ক্যাশমেমো কিম্বা একটা পেন্সিল কিম্বা—কিন্তু বৃথা গবেষণা করে লাভ নেই। চল, নাইবার বেলা হল।'

দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া শুইয়া কাটাইয়া দিল; মনে হইল, সে যেন কিছুর প্রতীক্ষা করিতেছে। তিনটা বাজিতেই পুঁটিরাম চা দিয়া গেল, নিঃশব্দে পান করিয়া ব্যোমকেশ পূর্ববৎ পড়িয়া রহিল।

সাড়ে চারটা বাজিবার পর পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। ব্যোমকেশ দ্রুত উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিল, 'কে আপনি?...ও ইন্‌স্পেক্টরবাবু, কি খবর?...সুকুমারবাবুর ঘর সার্চ হয়েছে! বেশ বেশ, বিধুবাবু তাহলে শেষ পর্যন্ত...তাঁর ঘরে কি পাওয়া গেল? ...অ্যাঁ, সুকুমারবাবুকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে! তারপর—কিছু পাওয়া গেল? ক্লোরোফর্মের শিশি...আলমারিতে বইয়ের পেছনে ছিল...আর? উইল! আর একখানা টাইপ-করা উইল? বলেন কি? কোন্ তারিখের?...যে রাত্রে করালীবাবু মারা যান, সেইদিন তৈরী—হুঁ। কোথায় ছিল? বাক্সের তলায়! এ উইলে ওয়ারিস কে?...ফণীবাবু!

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, পর্যায়ক্রমে এবার তাঁরই পালা ছিল বটে।...সুকুমারবাবুর বোনকে কি গ্রেপ্তার করা হয়েছে?...না...ও—বুঝেছি...ঘরে আর কিছু পাওয়া যায়নি? এই ধরুন —একটা লাল পেন্সিল? পাননি? আশ্চর্য! সেলাইয়ের কোনও উপকরণ পাননি? তাই তো! বিধুবাবু আছেন?...মতিলালকে খালাস করতে গেছেন...তবু ভাল, বিধুবাবুর সুমতি হয়েছে। সুকুমারবাবুর ঘর ছাড়া আর কোন্ কোন্ ঘর সার্চ হয়েছে? আর হয়নি! কি বললেন, বিধুবাবু দরকার মনে করেননি! বিধুবাবু তো কিছুই দরকার মনে করেন না। আমার আজ যাবার দরকার আছে কি? নূতন উইলখানা দেখতুম . ও—নিয়ে গেছেন...আচ্ছা —কাল সকালেই হবে। লাল পেন্সিল আর ঐ সেলাইয়ের উপকরণটা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে—ততক্ষণ—কি বলছেন? সুকুমারের বিরুদ্ধে overwhelming প্রমাণ পাওয়া গেছে? তা বলতে পারেন—কিন্তু ডাক্তারের রিপোর্ট পাওয়া গেছে? মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে কি লিখেছেন? আহারের তিন ঘণ্টা পরে...তার মানে আন্দাজ রাত বারোটা...আচ্ছা, কাল সকালে নিশ্চয় যাব।'

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল। তাহার চিন্তা-কুণ্ঠিত ভ্রূ ও মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সুকুমারই তাহলে? তুমি তো তাকে গোড়া থেকেই সন্দেহ করেছিলে—না?'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এ ব্যাপারের যত কিছু প্রমাণ, সবই সুকুমারের দিকে নির্দেশ করছে। দেখ, করালীবাবুর মৃত্যুর ধরনটা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এ ডাক্তারের কাজ। যারা ডাক্তারি কিছু জানে না, তারা ওভাবে খুন করতে পারে না। যে ছুঁচটা ব্যবহার করা হয়েছে, তাও তার বোনের সেলায়ের বাক্স থেকে চুরি করা, এমন কি, সুতোটা পর্যন্ত এক। সুকুমার বারোটার সময় বাড়ি ফিরল— ঠিক সেই সময় করালীবাবুও মারা গেলেন। সুকুমারের ঘর সার্চ করে বেরিয়েছে ক্লোরোফর্মের শিশি, আর একটা টাইপ-করা উইল—করালীবাবুর শেষ উইল, যাতে তিনি সুকুমারকে বঞ্চিত করে ফণীকে সর্বস্ব দিয়ে গেছেন। সুকুমার নিজের মুখেই স্বীকার করেছে যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা করালীবাবুর সঙ্গে তার ঝগড়া হয়েছিল—সুতরাং তিনি যে আবার উইল বদলাবেন, তা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। খুন করবার মোটিভ্ পর্যন্ত পরিষ্কার পাওয়া যাচ্ছে।'

'তাহলে সুকুমারই যে আসামী, তাতে আর সন্দেহ নেই?'

'সন্দেহের অবকাশ কোথায়?' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, সুকুমারকে দেখে তোমার কি রকম মনে হল? খুব নির্বোধ বলে মনে হল কি?'

আমি বলিলাম, 'না। বরঞ্চ বেশ বুদ্ধি আছে বলেই মনে হল।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইখানেই ধোঁকা লাগছে। বুদ্ধিমান বোকার মত কাজ করে কেন?'

বলিয়াই ব্যোমকেশ সচকিতভাবে সোজা হইয়া বসিল। দ্বারের কাছে অস্পষ্ট পদধ্বনি আমিও শুনিতে পাইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'কে? ভিতরে আসুন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর আস্তে আস্তে দ্বার খুলিয়া গেল। তখন ঘোর বিস্ময়ে দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে—সত্যবতী!

সত্যবতী ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিল; কিছুকাল শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে বাঁচান।'

অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু তড়াক করিয়া সত্যবতীর সম্মুখে দাঁড়াইল। সত্যবতীর মাথাটা বোধহয় ঘুরিয়া গিয়াছিল, সে অন্ধভাবে একটা হাত বাড়াইয়া দিতেই ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া তাহাকে একখানা চেয়ারে আনিয়া বসাইয়া দিল। আমাকে ইঙ্গিত করিতেই পাখাটা চালাইয়া দিলাম।

প্রথম মিনিট দুই-তিন সত্যবতী চোখে আঁচল দিয়া খুব খানিকটা কাঁদিল, আমরা নির্বাক লজ্জিত মুখে অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া রহিলাম। আমাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনেও এমন ব্যাপার পূর্বে কখনও ঘটে নাই।

সত্যবতীকে পূর্বে আমি একবারই দেখিয়াছিলাম; সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়ে হইতে সে যে আকারে-প্রকারে একটুও পৃথক, তাহা মনে হয় নাই। সুতরাং ঘোর বিপদের সময় সমস্ত শঙ্কাসঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া সে যে আমাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারে, ইহা যেমন অচিন্তনীয়, তেমনই বিস্ময়কর। বিপদ উপস্থিত হইলে অধিকাংশ বাঙালীর মেয়েই জড়বস্তু হইয়া পড়ে। তাই এই কৃশাঙ্গী কালো মেয়েটি আমার চক্ষে যেন সহসা একটা অপূর্ব অসামান্যতা লইয়া দেখা দিল। তাহার পায়ের মলিন জরির নাগরা হইতে রুক্ষ অযত্নসম্বৃত চুল পর্যন্ত যেন অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতায় ভরপুর হইয়া উঠিল।

ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া সে যখন মুখ তুলিয়া আবার বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আমার দাদাকে আপনি বাঁচান,' তখন দেখিলাম, সে প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার গলার স্বর তখনও কাঁপিতেছে।

ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'আপনার দাদা অ্যারেস্ট হয়েছেন, আমি শুনেছি— কিন্তু—'

সত্যবতী ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিল, 'দাদা নির্দোষ, তিনি কিছু জানেন না—বিনা অপরাধে তাঁকে—' বলিতে বলিতে আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্যোমকেশ ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়াছে বুঝিলাম, কিন্তু সে শান্তভাবেই বলিল, 'কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে—'

সত্যবতী বলিল, 'সে সব মিথ্যে প্রমাণ। দাদা কখনও টাকার লোভে কাউকে খুন করতে পারেন না। আপনি জানেন না—তাঁর মতন লোক; ব্যোমকেশবাবু, আমরা মেসোমশায়ের টাকা চাই না, আপনি শুধু দাদাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন, আমরা আপনার পায়ে কেনা হয়ে থাকব।' তাহার দুই চোখ দিয়া ধারার মত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু সে আর তাহা মুছিবার চেষ্টা করিল না—বোধ করি, জানিতেই পারিল না।

ব্যোমকেশ এবার যখন কথা কহিল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অশ্রুতপূর্ব গাঢ়তা লক্ষ্য করিলাম, সে বলিল, 'আপনার দাদা যদি সত্যই নির্দোষ হন, আমি প্রাণপণে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করব—কিন্তু—'

'দাদা নির্দোষ, আপনি বিশ্বাস করছেন না? আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না—একটা মাছিকে মারাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়—' বলিতে বলিতে সে হঠাৎ নতজানু হইয়া ব্যোমকেশের পায়ের উপর হাত রাখিল।

'ও কি করছেন? উঠে বসুন—উঠে বসুন।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পা সরাইয়া লইল।

'আপনি আগে বলুন, দাদাকে ছেড়ে দেবেন?'

ব্যোমকেশ দুই হাত ধরিয়া সত্যবতীকে জোর করিয়া তুলিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল, তারপর তাহার সম্মুখে বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, 'আপনি ভুল করছেন—সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার মালিক আমি নই—পুলিস। তবে আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু চেষ্টা করতে হলে সব কথা আমার জানা দরকার। বুঝছেন না, আমার কাছ থেকে যতক্ষণ আপনি কথা গোপন করবেন, ততক্ষণ কোন সাহায্যই আমি করতে পারব না।'

চক্ষু নত করিয়া সত্যবতী বলিল, 'আমি তো কোনও কথা গোপন করিনি।'

'করেছেন। আপনি সেই রাত্রেই করালীবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে বলেননি।'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে সত্যবতী ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইল, তারপর বুকে মুখ গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলিল, 'এখন সব কথা বলবেন কি?'

কাতর চোখ দুটি তুলিয়া সত্যবতী বলিল, 'কিন্তু সে কথা আমি কি করে বলব? তাতে যে দাদার ওপরেই সব দোষ গিয়ে পড়বে।'

অনুনয়ের কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, আপনার দাদা যদি নির্দোষ হন, তাহলে সত্যি কথা বললে তাঁর কোনও অনিষ্ট হবে না, আপনি নির্ভয়ে সমস্ত খুলে বলুন, কোনো কথা গোপন করবেন না।'

সত্যবতী অনেকক্ষণ মুখ নীচু করিয়া ভাবিল, শেষে ভগ্ন স্বরে বলিল, 'আচ্ছা, বলছি। আমার যে আর উপায় নেই—' উদ্গত অশ্রু আঁচল দিয়া মুছিয়া নিজেকে ঈষৎ শান্ত করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'সেদিন সন্ধ্যেবেলা মেসোমশায়ের সঙ্গে দাদার একটু বচসা হয়েছিল। মেসোমশাই দাদাকে সব সম্পত্তি উইল করে দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে মতিদা'র সঙ্গে দুপুরবেলা তুমুল ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল। কলেজ থেকে ফিরে তাই শুনে দাদা মেসোমশাইকে বলতে গিয়েছিলেন যে, তিনি সব সম্পত্তি চান না, সম্পত্তি যেন সকলকে সমান ভাগ করে দেওয়া হয়। মেসোমশাই কোনও রকম তর্ক সইতে পারতেন না, তিনি রেগে উঠে বললেন, 'আমার কথার ওপর কথা! বেরোও এখান থেকে—তোমাকে এক পয়সা দেব না।'

'মেসোমশাই যে এ কথায় রাগ করবেন, তা দাদা বুঝতে পারেননি; তিনি সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফণীদা'র ঘরে গিয়ে বসলেন। ফণীদা খোঁড়া মানুষ, বাইরে বেরুতে পারেন না—তাই দাদা রোজ সন্ধ্যেবেলা তাঁর কাছে বসে খানিকক্ষণ গল্প করতেন। ফণীদা'কে

আপনারা বোধহয় দেখেছেন? তিনি ইস্কুল-কলেজে পড়েননি বটে, কিন্তু বেশ ভাল লেখাপড়া জানেন। তাঁর আলমারির বই দেখেই বুঝতে পারবেন—কত রকম বিষয়ে তাঁর দখল আছে। অনেক সময় আমি তাঁর কাছে পড়া বলে নিয়েছি।

'মেসোমশায়ের সঙ্গে বচসা হওয়াতে দাদার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তিনি রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমাকে বললেন, 'সত্য, আমি বায়স্কোপ দেখতে যাচ্ছি, সাড়ে এগারটার সময় ফিরব—সদর দরজা খুলে রাখিস।' এই বলে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি চুপি চুপি বেরিয়ে গেলেন।

'আমাদের বামনঠাকুর রাত্রির খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর বাইরে গিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিজের দেশের লোকের আড্ডায় গল্পগুজব করে, আমি জানতুম—তাই দাদাকে দোর খুলে দেবার জন্য আমি আর জেগে রইলুম না। রাত্রি দশটার পর হাঁড়ি-হেঁসেল উঠে গেলে আমিও গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। মনে হল, যেন দাদার ঘরে একটা শব্দ শুনতে পেলুম। মেঝের ওপর একটা ভারী জিনিস—টেবিল কি বাক্স সরালে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ। ভাবলুম দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এলেন।

'আবার ঘুমবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু কি জানি কেন ঘুম এল না—চোখ চেয়েই শুয়ে রইলুম। দাদার ঘর থেকে আর কোনও সাড়া পেলুম না; মনে করলাম তিনি শুয়ে পড়েছেন।

'এইভাবে মিনিট পনের কেটে যাবার পর—বারান্দায় একটা খুব মৃদু শব্দ শুনতে পেলুম, যেন কে পা টিপে টিপে যাচ্ছে। ভারী আশ্চর্য মনে হল; দাদা তো অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন, তবে কে বারান্দা দিয়ে যাচ্ছে? আমি আস্তে আস্তে উঠলুম; দরজা একটু ফাঁক করে দেখলুম—দাদা নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। চাঁদের আলো বারান্দায় পড়েছিল, দাদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কথা; আপনার দাদার পায়ে জুতো ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর হাতে কিছু ছিল?'

'না।'

'কিছু না? একটা কাগজ কিম্বা শিশি?'

'কিছু না।'

'তখন ক'টা বেজেছিল; দেখেছিলেন কি?'

সত্যবতী বলিল, 'দেখার দরকার হয়নি, তখন শহরের সব ঘড়িতেই বারোটা বাজ্‌ছিল।'

ব্যোমকেশের দৃষ্টি চাপা উত্তেজনায় প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল, 'তারপর বলে যান।'

সত্যবতী বলিতে লাগিল, 'প্রথমটা আমি কিছু বুঝতে পারলুম না। দাদা পনের মিনিট আগে ফিরে এসেছেন—তাঁর ঘরে আওয়াজ শুনে জানতে পেরেছি—তবে আবার তিনি কোথায় গিয়েছিলেন? হঠাৎ মনে হল হয়তো মেসোমশায়ের শরীর খারাপ হয়েছে, তাঁর ঘরেই গিয়েছিলেন। মেসোমশাই কখনও কখনও রাত্রিবেলা বাতের বেদনায় কষ্ট পেতেন—ঘুম হত না। তখন তাঁকে ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়াতে হত। আমি চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে মেসোমশায়ের ঘরের দিকে গেলুম।

'তাঁর ঘরের দোর রাত্রে বরাবরই খোলা থাকে—আমি ঘরে ঢুকলুম। ঘর অন্ধকার—কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেও কি রকম একটা গন্ধ নাকে এল। গন্ধটা যে ঠিক কি রকম তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না—তীব্র গন্ধ নয়, অথচ—'

'মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ?'

'হ্যাঁ—ঠিক বলেছেন, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।'

'হুঁ—ক্লোরোফর্ম। তারপর!'

'দোরের পাশেই সুইচ্। আলো জেবলে দেখলুম, মেসোমশাই খাটে শুয়ে আছেন—ঠিক যেন ঘুমচ্ছেন। তাঁর শোবার ভঙ্গী দেখে একবারও মনে হয় না যে তিনি—; কিন্তু তবু কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করতে লাগল। সেই গন্ধটা যেন একটা ভিজে ন্যাক্ড়ার মতন আমার নিশ্বাস বন্ধ করবার উপক্রম করলে।

'কিছুক্ষণ আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, ওটা ওষুধের গন্ধ, মেসোমশাই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

'পা কাঁপছিল, তবু সন্তর্পণে তাঁর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঝুঁকে দেখলুম—তাঁর নিশ্বাস পড়ছে না। তখন আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে, তা আমি বোঝাতে পারব না—মনে হচ্ছে এইবার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। বোধহয়, মাথাটা ঘুরেও উঠেছিল; নিজেকে সামলাবার জন্যে আমি মেসোমশায়ের বালিশের ওপর হাত রাখলুম। হাতটা ঠিক তাঁর ঘাড়ের পাশেই পড়েছিল—একটা কাঁটার মত কি জিনিস হাতে ফুটল। দেখলুম, একটা ছুঁচ তাঁর ঘাড়ে আমূল বেঁধানো—ছুঁচে তখনও সুতো পরানো রয়েছে।

'আমি আর সেখানে থাকতে পারলুম না। কিন্তু কি করে যে আলো নিবিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম, তাও জানি না। যখন ভাল করে চেতনা ফিরে এল, তখন নিজের বিছানায় বসে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছি আর কাঁদছি।

'তারপর তো সবই আপনি জানেন। দাদাকে আমি সন্দেহ করিনি, আমি জানি, দাদা এ কাজ করতে পারেন না, তবু একথা যে কাউকে বলা চলবে না, তাও বুঝতে দেরী হল না। পরদিন সকালবেলা কোনোরকমে চা তৈরী করে নিয়ে মেসোমশায়ের ঘরে গেলুম—'

সত্যবতীর স্বর ক্ষীণ হইয়া মিলাইয়া গেল। তাহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা, চোখের আতঙ্কিত দৃষ্টি হইতে বুঝিতে পারিলাম, কি অসীম সংশয় ও যন্ত্রণার ভিতর দিয়া সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিটা তাহার কাটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছে। সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আপনার মত অসাধারণ মেয়ে আমি দেখিনি। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করে মূর্চ্ছা—হিস্টিরিয়ার ঠেলায় বাড়ি মাথায় করত—আপনি—'

সত্যবতী ভাঙ্গা গলায় বলিল, 'শুধু দাদার জন্যে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আপনি এখন তবে বাড়ি ফিরে যান। কাল সকালে আমি আপনাদের ওখানে যাব।'

সত্যবতীও উঠিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কিত কণ্ঠে বলিল, 'কিন্তু আপনি তো কিছু বললেন না?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'বলবার কিছু নেই। আপনাকে আশা দিয়ে শেষে যদি কিছু না করতে পারি? এর মধ্যে বিধুবাবু নামক একটি আস্ত—ইয়ে আছেন কিনা, তাই একটু ভয়। যা হোক, এইটুকু বলতে পারি যে, আপনি যে সব কথা বললেন, তা যদি প্রথমেই বলতেন, তাহলে হয়তো কোনও গোলমাল হত না।'

অশ্রুপূর্ণ চোখে সত্যবতী বলিল, 'আমি যা বললুম তাতে দাদার কোনও অনিষ্ট হবে না? সত্যি বলছেন? ব্যোমকেশবাবু, আমার আর কেউ নেই—' তাহার স্বর কান্নায় বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি গিয়া সদর দরজাটা খুলিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, 'আপনি আর দেরী করবেন না—রাত হয়ে গেছে। আমাদের এটা ব্যাচেলর এস্টাব্লিশমেণ্ট—বুঝলেন না—'

সত্যবতী একটু ব্যস্তভাবে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সে চৌকাঠ পার হইয়াছে, এমন সময় ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিল শুনিতে পাইলাম না। সত্যবতী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষণকালের জন্য তাহার কৃতজ্ঞতা-নিষিক্ত মিনতিপূর্ণ চোখ দুটি আমি দেখিতে পাইলাম—তারপর সে নিঃশব্দে ছোট্ট একটি নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

দরজা ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া বসিল, ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সাতটা

বেজে গেছে।' তারপর মনে মনে কি হিসাব করিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বলিল, 'এখনও ঢের সময় আছে।'

আমি সাগ্রহে তাহাকে চাপিয়া ধরিলাম, 'ব্যোমকেশ, কি বুঝলে? আমি তো এমন কিছু—কিন্তু তোমার ভাব দেখে বোধ হল, যেন তুমি ভেতরের কথা বুঝতে পেরেছ।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'এখনও সব বুঝিনি।'

আমি বলিলাম, 'যাই বল, সুকুমারের বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরুতর হোক, আমার তো দৃঢ় বিশ্বাস সে খুন করেনি।'

ব্যোমকেশ হাসিল—'তবে কে করেছে?'

'তা জানি না—কিন্তু সুকুমার নয়।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না, সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিল। বুঝিলাম, এখন কিছু বলিবে না। আমিও বসিয়া এই ব্যাপারের অদ্ভুত জটিলতার কথা ভাবিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ পরে ব্যোমকেশ একটা প্রশ্ন করিল, 'সত্যবতীকে সুন্দরী বলা বোধ হয় চলে না—না?'

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'কেন বল দেখি?'

'না, অমনি জিজ্ঞাসা করছি। সাধারণে বোধহয় কালোই বলবে।'

বর্তমান সমস্যার সঙ্গে সত্যবতীর চেহারার কি সম্বন্ধ আছে, বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের মন কোন্ দুর্গম পথে চলিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। আমি বিবেচনা করিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, লোকে তাকে কালোই বলবে, কিন্তু কুৎসিত বোধহয় বলতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—'কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।'—কেমন?—ভাল কথা, অজিত, তোমার বয়স কত হল বল দেখি?'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'আমার বয়স—'

'হ্যাঁ—কত বছর ক'মাস ক'দিন, ঠিক হিসেব করে বল।'

কে জানে—হয়তো আমার বয়সের হিসাবের মধ্যেই করালীবাবুর মৃত্যু-রহস্যটা চাপা পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশের অসাধ্য কার্য নাই; আমি মনে মনে গণনা করিয়া বলিলাম, 'আমার বয়স হল ঊনত্রিশ বছর পাঁচ মাস এগারো দিন।—কেন?'

ব্যোমকেশ একটা ভারী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক, তুমি আমার চেয়ে তিন মাসের বড়। বাঁচা গেল। কথাটা কিন্তু মনে রেখো।'

'মানে?'

'মানে কিছুই নেই। কিন্তু ও কথা থাক। এই ব্যাপার নিয়ে ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে উঠেছে। চল, আজ নাইট-শো'তে বায়স্কোপ দেখে আসি।'

ব্যোমকেশ কখনও বায়স্কোপে যায় না, বায়স্কোপ থিয়েটার সে ভালই বাসে না। তাই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বলিলাম, 'তোমার আজ হল কি বল দেখি? একেবারে খেপচুরিয়াস্ মেরে গেলে না কি?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অসম্ভব নয়। আমি লগনচাঁদা ছেলে—ভট্টাচার্যিমশাই কুষ্ঠী তৈরার করেই বলেছিলেন, এ ছেলে ঘোর উন্মাদ হবে। কিন্তু আর দেরী নয়। চল, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। 'চিত্রা'য় ক'দিন থেকে একটা খুব ভাল ফিল্ম দেখাচ্ছে।'

আহারাদি করিয়া বায়স্কোপে উপস্থিত হইলাম। রাত্রি সাড়ে নয়টায় চিত্র-প্রদর্শন আরম্ভ হইল। ছবিটা কিছু দীর্ঘ—শেষ হইতে প্রায় পৌনে বারোটা বাজিল।

অনেক দূর যাইতে হইবে—বাসও দু'একখানা ছিল; আমি একটাতে উঠিবার উপক্রম করিয়াছি, ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, হেঁটেই চল না খানিকদূর।' বলিয়া হনহন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ছাড়িয়া সে যখন পাশের একটা সরু রাস্তা ধরিল, তখন বুঝিলাম

সে করালীবাবুর বাড়ির দিকে চলিয়াছে। এত রাত্রে সেখানে কি প্রয়োজন, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল না। যাহা হউক, বিনা আপত্তিতে তাহার সঙ্গে চলিলাম।

স্বাভাবিক অপেক্ষা কিছু বেশী দ্রুতপদেই আমরা চলিতেছিলাম, তবু করালীবাবুর বাড়ি পেঁছিতে অনেকটা সময় লাগিল। করালীবাবুর দরজার পাশেই একটা গ্যাস-পোস্ট ছিল, তাহার নীচে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ হাতের আস্তিন সরাইয়া ঘড়ি দেখিল। কিন্তু ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন ছিল না, ঠিক এই সময় অনেকগুলো ঘড়ি চারিদিক হইতে মধ্যরাত্রি ঘোষণা করিয়া দিল।

ব্যোমকেশ উৎফুল্লভাবে আমার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, 'হয়েছে। চল, এবার একটা ট্যাক্সি ধরা যাক।'

পরদিন বেলা সাড়ে আটটার সময় আমরা করালীবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। কয়েকজন পুলিস-কর্মচারী ও বিধুবাবু হাজির ছিলেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া বিধুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'ব্যোমকেশ-বাবু, আপনি শুনেছেন বোধহয় যে, সুকুমারকে অ্যারেস্ট করেছি। সে-ই আসল আসামী, তা আমি গোড়া থেকেই বুঝেছিলুম—আমি শুধু তাকে ল্যাজে খেলাচ্ছিলুম।'

'বলেন কি?' ব্যোমকেশ মহা বিস্ময়ের ভান করিয়া এমন ভাবে বিধুবাবুর পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, যেন খেলাইবার যন্ত্রটা সত্য সত্যই সেখানে বিদ্যমান আছে। ইন্‌স্পেক্টর সাব-ইন্‌স্পেক্টর হাসি চাপিবার চেষ্টায় উৎকট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বিধুবাবু একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন, 'আপনি আজ কি মনে করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। শুনলুম, আর একটা নূতন উইল বেরিয়েছে—তাই সেটা দেখতে এলুম।'

উইল ব্যোমকেশকে দেখাইবেন কি না, তাহা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিধুবাবু অনিচ্ছা-ভরে ফাইল হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'দেখবেন, ছিঁড়ে ফেলবেন না যেন। এই উইলটাই হচ্ছে সুকুমারের বিরুদ্ধে সেরা প্রমাণ। করালীবাবুকে খুন করবার পর এটা সুকুমার চুরি করে নিজের ঘরে এনে লুকিয়ে রেখেছিল—কোথায় রেখেছিল জানেন? তার ঘরে যে তিনটে ট্রাঙ্ক উপরো-উপরি করে রাখা আছে, তারই নীচের ট্রাঙ্কটার তলায়।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, সবই যে মিলে যাচ্ছে দেখছি! কিন্তু একটা কথা বলুন তো, সুকুমার উইলখানা ছিঁড়ে ফেললে না কেন?'

বিধুবাবু নাকের মধ্যে একপ্রকার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'হুঃ, সে বুদ্ধি থাকলে তো। ভেবেছিল, আমরা তার ঘর সার্চই করব না।'

'সুকুমার কিছু বললে?'

'কি আর বলবে! সবাই যা বলে থাকে, যেন ভারি আশ্চর্য হয়ে গেছে, এমনি ভাব দেখিয়ে বললে, 'আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ উইলখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া, সমুচিত শ্রদ্ধার সহিত তাহার ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। আমিও গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, সাদা এক-তা ফুলস্ক্যাপ্ কাগজের উপর ছাপার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে—

'অদ্য ইংরাজী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে, আমি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে এই উইল করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও নগদ টাকা আমার কনিষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীমান ফণীভূষণ পাইবে। পূর্বে যে সকল উইল করিয়াছিলাম, তাহা অত্র দ্বারা নাকচ করা হইল। স্বাক্ষর—শ্রীকরালীচরণ বসু।'

উইল পড়িয়া ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিল, দেখিলাম, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া

উঠিয়াছে। সে বলিল, 'বিধুবাবু, এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! উইল যে—' বলিয়া কাগজখানা বিধুবাবুর সম্মুখে পাতিয়া ধরিল।

বিধুবাবু বিস্মিতভাবে সেটা আগাগোড়া পড়িয়া বলিলেন, 'কি হয়েছে? আমি তো কিছু—'

'দেখছেন না?' বলিয়া স্বাক্ষরের নীচেটা আঙুল দিয়া দেখাইল।

তখন বিধুবাবু চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া বলিলেন, 'ওঃ, সাক্ষী—'

'চুপ!' ব্যোমকেশ ঠোঁটে আঙুল দিয়া ঘরের ভেজানো দরজার দিকে তাকাইল। কিছুক্ষণ উৎকর্ণভাবে শুনিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া হঠাৎ কবাট খুলিয়া ফেলিল।

মাখনলাল দরজায় কান পাতিয়া শুনিতেছিল, সবেগে পলাইবার চেষ্টা করিল। ব্যোমকেশ তাহাকে কামিজের গলা ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল; জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া বলিল, 'ইন্স্পেক্টরবাবু, একে ধরে রাখুন—ছাড়বেন না। আর, কথা কইতে দেবেন না।'

মাখন ভয়ে আধমরা হইয়া গিয়াছিল, বলিল, 'আমি—'

'চুপ! বিধুবাবু, একটা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে আনিয়ে নিন। আসামীর নাম দেবার দরকার নেই—নামটা পরে ভর্তি করে নিলেই হবে।' বিধুবাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া খাটো গলায় বলিল, 'ততক্ষণ এই লোকটাকে ল্যাজে খেলান—আমরা আসছি।'

বিধুবাবু বুদ্ধিভ্রষ্টের মত বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে কিছুই—'

'পরে হবে। ইতিমধ্যে আপনি ওয়ারেণ্টখানা আনিয়ে রাখুন। এস অজিত।'

দ্রুতপদে ব্যোমকেশ উপরে উঠিয়া গিয়া ফণীর কবাটে টোকা মারিল। ফণী আসিয়া দরজা খুলিয়া সম্মুখে ব্যোমকেশকে দেখিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশের ব্যস্তসমস্ত ভাব আর ছিল না, সে সহাস্য-মুখে বলিল, 'আপনি শুনে সুখী হবেন, করালীবাবুর প্রকৃত হত্যাকারী কে—তা আমরা জানতে পেরেছি।'

ফণী একটু মলিন হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা গ্রেপ্তার হয়েছেন জানি। কিন্তু এখনও যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস না হবারই তো কথা। তাঁর ঘর থেকে আর একটা উইল বেরিয়েছে।—সে উইলের ওয়ারিস আপনি।'

ফণী বলিল, 'তাও শুনেছি। কথাটা শুনে অবধি আমার মনটা যেন তেতো হয়ে গেছে। তুচ্ছ টাকার জন্যে মামার অপঘাতে প্রাণ গেল।' একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'অর্থমনর্থম্! তিনি আমায় সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, এতেও আমি খুশী হতে পারছি না ব্যোমকেশবাবু। নাই দিতেন টাকা—তবু তো তিনি বেঁচে থাকতেন।'

ব্যোমকেশ বইয়ের শেল্ফটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বইগুলা দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক-ভাবে বলিল, 'তা তো বটেই। পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ—শঙ্করাচার্য তো আর মিথ্যে বলেননি! এটা কি বই? ফিজিওলজি! সুকুমারবাবুর বই দেখছি।' বইখানা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ নামপত্রটা দেখিল।

ফণী একটু হাসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ—সুকুমারদা মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর ডাক্তারি বই পড়তে দিতেন। কি আশ্চর্য দেখুন। এ বাড়িতে আমি সুকুমারদাকেই সব চেয়ে আপনার লোক মনে করতুম—এমন কি, দাদাদের চেয়েও—অথচ তিনিই—'

ব্যোমকেশ আরও কতকগুলি বই খুলিয়া দেখিয়া বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি তো দেখছি একজন পাকা গ্রন্থকীট! সব বই দাগ দিয়ে পড়েছেন।'

ফণী বলিল, 'হ্যাঁ। পড়া ছাড়া আর তো কোনও অ্যামুজমেণ্ট নেই—সঙ্গীও নেই। এক সুকুমারদা রোজ সন্ধ্যাবেলা খানিকক্ষণ আমার কাছে এসে বসতেন। আচ্ছা, ব্যোমকেশ-বাবু, সত্যিই কি সুকুমারদা এ কাজ করেছেন? কোনও সন্দেহ নেই?'

ব্যোমকেশ চেয়ারে আসিয়া বসিল, বলিল, 'অপরাধীর বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাতে সন্দেহের বিশেষ স্থান নেই। বসুন—আপনাকে সব কথা বলছি।'

ফণী বিছানায় উপবেশন করিল, আমি তাহার পাশে বসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'দেখুন, হত্যা দু'রকম হয়—এক, রাগের মাথায় হত্যা, যাকে crime of passion বলে; আর এক, সঙ্কল্প করে হত্যা। রাগের মাথায় যে-লোক খুন করে, তাকে ধরা কঠিন নয়—অধিকাংশ সময় সে নিজেই ধরা দেয়। কিন্তু যে লোক ভেবে-চিন্তে নিজেকে যথাসম্ভব সন্দেহমুক্ত করে খুন করে, তাকে ধরাই কঠিন হয়ে পড়ে। তখন কে আসামী, তার নাম আমরা জানতে পারি না, পাঁচজন লোকের ওপর সন্দেহ হয়। এ রকম ক্ষেত্রে আমরা কোন্ পথে চলব? তখন আমাদের একমাত্র পথ হচ্ছে—হত্যার প্রণালী থেকে হত্যাকারীর প্রকৃতি বোঝবার চেষ্টা করা।

'বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি—হত্যাকারী লোকটা একাধারে বোকা এবং চতুর। সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত খুন করেছে অথচ নির্বোধের মত খুনের যা-কিছু প্রমাণ নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে। বলুন দেখি, সত্যবতীর ছুঁচ দিয়ে খুন করবার কি দরকার ছিল? বাজারে কি ছুঁচ পাওয়া যায় না? আর উইলখানা যত্ন করে লুকিয়ে রাখবার কোনও আবশ্যকতা ছিল কি? ছিঁড়ে ফেললেই তো সব ন্যাটা চুকে যেত। এ থেকে কি মনে হয়?'

ফণী হাতের উপর চিবুক রাখিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে ব্যক্তি স্বভাবতই নির্বোধ, সে বুদ্ধিমানের মত কাজ করবে—এ সম্ভব নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, সে বোকামির ভান করতে পারে। সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আসামী যেই হোক সে বুদ্ধিমান।

'কিন্তু বুদ্ধিমান লোকও ভুল করে, বোকা সাজবার চেষ্টাও সব সময় সফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও আসামী কয়েকটা ছোট ছোট ভুল করেছিল বলে আমি তাকে ধরতে পেরেছি।'

ফণী মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি ভুল সে করেছিল?'

'বলছি।' ব্যোমকেশ পকেট হাঁটকাইয়া একটা সাদা কাগজ বাহির করিল—'কিন্তু তার আগে এ বাড়ির একটা নক্সা তৈরী করে দেখাতে চাই। একটা পেন্সিল আছে কি? যে কোনও পেন্সিল হলেই চলবে।'

ফণীর বিছানায় বালিশের পাশে একটা বই রাখা ছিল, তাহার ভিতর হইতে সে একটা লাল পেন্সিল বাহির করিয়া দিল।

পেন্সিলটা লইয়া ব্যোমকেশ ভাল করিয়া দেখিল, তারপর মৃদু হাস্যে সেটা পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'থাক, প্ল্যান্ আঁকবার দরকার নেই—মুখেই বলছি। অপরাধী প্রধানতঃ তিনটি ভুল করেছিল। প্রথমে—সে গ্রে'র অ্যানাটমির এক জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছিল; দ্বিতীয়—সে বাক্স টানবার সময় একটু শব্দ করে ফেলেছিল; আর তৃতীয়—সে আইন ভাল জানত না।'

ফণীর মুখ হইতে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা একেবারে মড়ার মত হইয়া গিয়াছিল, সে অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 'আইন জানত না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আর সেই জন্যেই তার অতবড় অপরাধটা ব্যর্থ হয়ে গেল।'

শুষ্ক অধর লেহন করিয়া ফণী বলিল, 'আপনি কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'সুকুমারবাবুর ঘর থেকে যে উইলটা বেরিয়েছে—উইল হিসেবে সেটা মূল্যহীন। তাতে সাক্ষীর দস্তখত নেই।'

মনে হইল, ফণী এবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইবে। অনেকক্ষণ কেহ কোনও কথা বলিল না; দৃষ্টিহীন শুষ্ক চক্ষু মেলিয়া ফণী মাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর দুই হাতে মাথার চুল মুঠি করিয়া ধরিয়া অর্ধব্যক্ত স্বরে বলিল, 'সব বৃথা—সব মিছে—; ব্যোমকেশবাবু, আমাকে একটু সময় দিন, আমি বড় অসুস্থ বোধ করছি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় নাড়িল, 'আধ ঘণ্টা সময় আপনাকে দিলুম—তৈরী হয়ে নিন।' দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'থিম্বলটা অবশ্য ফেলে দিয়েছেন; সেটা সুকুমারের ঘরে রেখে আসেননি কেন বোঝা যাচ্ছে না। তাড়াতাড়িতে আঙুল থেকে খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন—না? তাই হবে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম কার হাত দিয়ে আনালেন? মাখন?'

ফণী বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'আধ ঘণ্টা পরে আসবেন—'

দ্বার ভেজাইয়া দিয়া আমরা নীচে নামিয়া আসিয়া বসিলাম। মাখন তখনও ইন্স্পেক্টর ও সাব্-ইনস্পেক্টরের মধ্যবর্তী হইয়া দারুভূত জগন্নাথের মত বসিয়াছিল, ব্যোমকেশ ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, 'তুমি কবে ফণীকে ক্লোরোফর্ম এনে দিয়েছ?'

মাখন চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি কিছু জানি না—'

'সত্যি কথা বল, নইলে ওয়ারেণ্টে তোমার নামই লেখা হবে।'

মাখন কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'দোহাই আপনাদের, আমি এ সবের মধ্যে নেই। ফণী বলেছিল রাত্রে তার ঘুম হয় না, একফোঁটা করে ক্লোরোফর্ম খেলে ঘুম হবে—তাই—'

'বুঝেছি। একে এবার ছেড়ে দিতে পারেন, বিধুবাবু।'

মুক্তি পাইয়া মাখন একেবারে বাড়ি ছাড়িয়া দৌড় মারিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওয়ারেণ্ট এসেছে?'

বিধুবাবু বলিলেন, 'না, এই এল বলে। কিন্তু কার জন্য ওয়ারেণ্ট?'

'করালীবাবুকে যে খুন করেছে, তার জন্য।'

বিধুবাবু অতিশয় অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, এটা পরিহাসের সময় নয়। কমিশনার সাহেব আপনাকে একটু স্নেহ করেন বলে আপনি আমার ওপর হুকুম চালাচ্ছেন, তাও আমি সহ্য করছি। কিন্তু তামাশা সহ্য করব না।'

'তামাশা নয়—এ একেবারে নিরেট সত্যি কথা। শুনুন তবে—' বলিয়া ব্যোমকেশ সংক্ষেপে সমস্ত কথা বিধুবাবুকে বলিল। বিধুবাবু কিছুক্ষণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া রহিলেন, তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তাই যদি হয়, তবে তাকে একলা ফেলে এলেন কি বলে? যদি পালায়?'

'পালাবে না; সে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে। আর সেইটেই আমাদের একমাত্র ভরসা; কারণ, তার অপরাধ আদালতে প্রমাণ করা বিশেষ কঠিন হবে। জুরীদের আপনি জানেন তো—তারা 'নট্ গিল্টি' বলেই আছে।'

'তা তো জানি—কিন্তু—' বিধুবাবু আবার বসিয়া পড়িলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে আমরা ফণীর ঘরে গেলাম। বিধুবাবু সর্বপ্রথম দরজা খুলিয়া গট্‌গট্ করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ফণী বিছানায় শুইয়া আছে, বিছানার পাশে তাহার ডান হাতটা ঝুলিতেছে; আর ঠিক তাহার নীচে মেঝের উপর পুরু হইয়া রক্ত জমিয়াছে। কব্জির কাটা ধমনী হইতে তখনও ফোঁটা ফোঁটা গাঢ় রক্ত ঝরিয়া পড়িতেছে।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এতটা আমি প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু এ ছাড়া তার উপায়ই বা ছিল কি?'

ফণীর বুকের উপর একখানা চিঠি রাখা ছিল; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ পাঠ করিল। চিঠিতে এই কয়টি কথা লেখা—

ব্যোমকেশবাবু,

চলিলাম। আমি খোঁড়া অকর্মণ্য, এখানে আমার অন্ন জুটিবে না—দেখি ওখানে জোটে কি না।

আমি জানি, মোকদ্দমা করিয়া আপনারা আমার ফাঁসী দিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার বাঁচিয়া কোনও লাভ নাই; যখন টাকাই পাইলাম না, তখন কিসের সুখে বাঁচিব?

মামাকে খুন করিয়াছি সেজন্য আমার ক্ষোভ নাই; তিনি আমাকে ভালবাসিতেন না,

খোঁড়া বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তবে সুকুমারদার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। কিন্তু তিনি ছাড়া দোষ চাপাইবার লোক আর কেহ ছিল না।

তা ছাড়া, তিনি ফাঁসী গেলে আর একটা সুবিধা হইত। কিন্তু যে কথা নিজের বিকলাঙ্গতার লজ্জায় জীবনে কাহাকেও বলিতে পারি নাই আজ আর তাহা প্রকাশ করিব না।

ক্লোরোফর্ম কোথা হইতে পাইয়াছি তাহা বলিব না; যে আনিয়া দিয়াছিল সে আমার অভিসন্ধি জানিত না। তবে পরে হয়তো সন্দেহ করিয়াছিল।

আপনি আশ্চর্য লোক, থিম্বলের কথাটাও ভুলেন নাই। সেটা সত্যই আঙুল হইতে খুলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম; ঘরে ফিরিয়া আসিয়া চোখে পড়িল। সেটা এই ঘরেই আছে —খুঁজিয়া লইবেন। সেদিন রাত্রিতে সত্যবতীর ঘর হইতে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করিয়াছিলাম—সে তখন রান্নাঘরে ছিল।

আপনি ছাড়া আমাকে বোধহয় আর কেহ ধরিতে পারিত না কিন্তু তবু আপনাকে বিদ্বেষ করিতে পারিতেছি না। বিদায়। ইতি—

বহুদূরের যাত্রী
ফণিভূষণ কর

চিঠিখানি বিধুবাবুর হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন সুকুমারবাবুকে ছেড়ে দেবার বোধহয় আর কোনও বাধা নেই। তাঁর ভগিনীকেও জানানো দরকার। তিনি বোধহয় নিজের ঘরেই আছেন।—চল অজিত।'

সপ্তাহখানেক পরে আমরা দুইজনে আমাদের বসিবার ঘরে অধিষ্ঠিত ছিলাম। বৈকালবেলা নীরবে চা-পান চলিতেছিল।

গত কয়দিন অপরাহ্ণে ব্যোমকেশ নিয়মিত বাহিরে যাইতেছিল। কোথায় যায়, আমাকে বলে নাই, আমিও জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার কাছে মাঝে মাঝে এমন দু'একটা গোপনীয় কেস আসিত যাহার কথা আমার কাছেও প্রকাশ করিবার তাহার অধিকার ছিল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজও বেরুবে না কি?'

ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ।'

একটু সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, 'নূতন কেস হাতে এসেছে, না?'

'কেস? হ্যাঁ—কিন্তু কেসটা বড় গোপনীয়।'

আমি আর ও বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিলাম না, বলিলাম, 'সুকুমারের ব্যাপার সব চুকে গেছে?'

'হ্যাঁ—প্রোবেটের দরখাস্ত করেছে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, ঠিক কিভাবে ফণী খুন করলে, আমাকে বুঝিয়ে বল তো; এখনও ভাল করে জট ছাড়াতে পারছি না।'

চায়ের শূন্য পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা শোন, পর পর ঘটনাগুলো যেমন ঘটেছিল, বলে যাচ্ছি—

'সেদিন দুপুরবেলা করালীবাবুর সঙ্গে মতিলালের ঝগড়া হল। সন্ধ্যেবেলা সুকুমার এসে তাই শুনে করালীবাবুকে বোঝাতে গেল। সেখান থেকে গালাগালি খেয়ে বেরিয়ে ফণীর ঘরে প্রায় সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত কাটালে; তারপর খেয়েদেয়ে বায়স্কোপ দেখতে গেল। এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই!'

'না।'

'রাত্রি আটটা থেকে নয়টার মধ্যে—অর্থাৎ সত্যবতী যে সময় রান্নাঘরে ছিল, সেই সময় ফণী তার ঘর থেকে থিম্বল আর ছুঁচ চুরি করলে। সে বুঝতে পেরেছিল, করালী-

বাবু আবার উইল বদলাবেন এবং এবার সে সম্পত্তি পাবে। সে ঠিক করলে, বুড়োকে আর মত বদলাবার ফুরসৎ দেবে না। বুড়োকে ফণী বিষচক্ষে দেখত; বিকলাঙ্গ লোকের একটা অদ্ভুত মানসিক দুর্বলতা প্রায়ই দেখা যায়—তারা নিজেদের দৈহিক বিকৃতি সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সইতে পারে না। ফণী বোধহয় অনেকদিন থেকেই করালীবাবুকে খুন করবার মতলব আঁটছিল।

'বামুনঠাকুরের এজেহার থেকে জানা যায়, রাত্রি আন্দাজ সাড়ে এগারোটার সময় মতিলাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। গাঁজাখোরদের সময়ের ধারণা থাকে না, তাই বামুন-ঠাকুর একটু সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিল। আমি হিসাব করে দেখেছি, মতিলাল বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ঠিক এগারোটা বেজে পঁচিশ মিনিটে। তার ও-দোষ বরাবরই ছিল—রাত্রে বাড়ি থাকত না।

'সে বেরিয়ে যাবার পর ফণীও নিজের ঘর থেকে বেরুল। মতিলালের ঘর করালী-বাবুর শোবার ঘরের ঠিক নীচেই, পাছে পায়ের শব্দ হয়, তাই ফণী এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ঘুমন্ত করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করতে মিনিট পাঁচেক সময় লাগল; তারপর সে তাঁর ঘাড়ে অপটু হস্তে ছুঁচ ফোটালে। তিনবার ফোটাবার পর তবে ছুঁচ যথাস্থানে পেঁছল। সুকুমারের মতন ডাক্তারি ছাত্র যদি এ কাজ করত, তাহলে তিনবার ফোটাবার দরকার হত না।

'করালীবাবুকে শেষ করে ফণী পাশের ঘরের দেরাজ থেকে তাঁর শেষ উইল বার করলে—দেখলে, উইল তার নামেই বটে।

'এখানে একটু সন্দেহের অবকাশ আছে। এমনও হতে পারে যে, ফণী করালীবাবুকে ক্লোরোফর্ম করে পাশের ঘরে গিয়ে উইলটা পড়লে; যখন দেখলে উইল তারই নামে, তখন ফিরে এসে করালীবাবুকে খুন করলে। সে যাই হোক, এই ব্যাপারে তার দশ-বারো মিনিট সময় লাগল।

'এখন কথা হচ্ছে, উইলখানা নিয়ে সে কি করবে? যথাস্থানে রেখে দিলেও পারত, কিন্তু তাতে সুকুমারকে ভাল করে ফাঁসানো যায় না। অথচ নিজেকে বাঁচাতে হলে একজনকে ফাঁসানো চাই-ই।

'উইল আর ক্লোরোফর্মের শিশি সে সুকুমারের ঘরে লুকিয়ে রেখে এল। জানত, এত বড় কাণ্ডের পর সব ঘর খানাতল্লাস হবেই—তখন উইলও বেরুবে। এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—সুকুমারের ফাঁসি হবে আর সে সম্পত্তি পাবে।

'উইলটা ট্রাঙ্কের তলায় রাখতে গিয়ে একটু শব্দ হয়েছিল—সেই শব্দে সত্যবতীর ঘুম ভেঙে যায়। তখন রাত্রি পৌনে বারোটা। সে ভাবলে, তার দাদা বায়স্কোপ দেখে ফিরে এল। কিন্তু বাস্তবিক সুকুমার তখন ফিরতে পারে না; সে ফিরেছে—যখন ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে—

'আর কিছু বোঝাবার দরকার আছে কি?'

'উইলে সাক্ষীর দস্তখত না থাকার কারণ কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'আমার মনে হয়, খাওয়া-দাওয়ার পর করালীবাবু উইলটা লিখেছিলেন, তাই আর রাত্রে কিছু করেননি। সম্ভবতঃ তাঁর ইচ্ছে ছিল, পরদিন সকালে চাকর-বামুনকে দিয়ে সহি দস্তখত করিয়ে নেবেন।'

নীরবে ধূমপান করিয়া কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, তারপর জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর সঙ্গে তারপর আর দেখা হয়েছিল? সে কি বললে? খুব ধন্যবাদ দিলে তো?'

বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না। শুধু গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম করলে।'

'চমৎকার মেয়ে কিন্তু—না?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, তর্জনী তুলিয়া বলিল, 'তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, সে কথাটা মনে আছে তো?'

'হ্যাঁ—কেন?'

উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ পাশের ঘরে প্রবেশ করিল। মিনিট পাঁচেক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা করিয়া বাহির হইয়া আসিল। আমি বলিলাম, 'তোমার গোপনীয় মক্কেল তো ভারী শৌখিন লোক দেখছি, সিল্কের পাঞ্জাবি পরা ডিটেক্‌টিভ না হলে মন ওঠে না।'

এসেন্স-মাখানো রুমালে মুখ মুছিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। সত্য অন্বেষণ তো আর চাট্টিখানি কথা নয়, অনেক তোড়জোড় দরকার।'

আমি বলিলাম, 'সত্য অন্বেষণ তো অনেকদিন থেকেই করছ, কই, এত সাজ-সজ্জা তো কখনো দেখিনি।'

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'সত্য অন্বেষণ আমি অল্পদিন থেকেই আরম্ভ করেছি।'

'তার মানে?'

'তার মানে অতি গভীর। চললুম।' মুচকি হাসিয়া ব্যোমকেশ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

'সত্য—ওঃ।' আমি লাফাইয়া গিয়া তাহার কাঁধ চাপিয়া ধরিলাম,—'সত্যবতী! এ ক'দিন ধরে ঐ মহা সত্যটি অন্বেষণ করা হচ্ছে বুঝি? অ্যাঁ—ব্যোমকেশ! শেষে তোমার এই দশা! কবি তাহলে ঠিক বলেছেন—প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খবরদার! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, অর্থাৎ সম্পর্কে তার ভাশুর। ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলবে না। এবার থেকে আমিও তোমায় দাদা বলে ডাকব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমাকে এত ভয় কেন?'

সে বলিল, 'লেখক জাতটাকেই আমি ঘোর সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখি।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, 'বেশ, দাদাই হলুম তাহলে।' ব্যোমকেশের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলাম, 'যাও ভাই, চারটে বাজে, এবার জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়। আশীর্বাদ করি, সত্যের প্রতি যেন তোমার অবিচলিত ভক্তি থাকে।'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গেল।

# চোরাবালি

কুমার ত্রিদিবের বারম্বার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ আর উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একদিন পৌষের শীত-সুতীক্ষ্ণ প্রভাতে ব্যোমকেশ ও আমি তাঁহার জমিদারীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল দিন সাত-আট সেখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাইয়া, ফাঁকা জায়গার বিশুদ্ধ হাওয়ায় শরীর চাঙ্গা করিয়া লইয়া আবার কলিকাতায় ফিরিব।

আদর যত্নের অবধি ছিল না। প্রথম দিনটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় অপর্যাপ্ত আহার করিয়া ও কুমার ত্রিদিবের সঙ্গে গল্প করিয়াই কাটিয়া গেল। গল্পের মধ্যে অবশ্য খুড়া মহাশয় স্যর দিগিন্দ্রই বেশী স্থান জুড়িয়া রহিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর শয়নঘরের দরজা পর্যন্ত আমাদের পেঁছাইয়া দিয়া কুমার ত্রিদিব বলিলেন, কাল ভোরেই শিকারে বেরুনো যাবে। সব বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

ব্যোমকেশ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিল, 'এদিকে শিকার পাওয়া যায় নাকি?'

ত্রিদিব বলিলেন, 'যায়। তবে বাঘ-টাঘ নয়। আমার জমিদারীর সীমানায় একটা বড় জঙ্গল আছে, তাতে হরিণ, শুয়োর, খরগোশ পাওয়া যায়; ময়ূর, বনমুরগীও আছে। জঙ্গলটা চোরাবালির জমিদার হিমাংশু রায়ের সম্পত্তি। হিমাংশু আমার বন্ধু; আজ সকালে আমি তাকে চিঠি লিখে শিকার করবার অনুমতি আনিয়ে নিয়েছি। কোনো আপত্তি নেই তো?'

আমরা দু'জনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলাম, 'আপত্তি!'

ব্যোমকেশ যোগ করিয়া দিল, 'তবে বাঘ নেই এই যা দুঃখের কথা।'

ত্রিদিব বলিলেন, 'একেবারে যে নেই তা বলতে পারব না; প্রতি বছরই এই সময় দু'একটা বাঘ ছটকে এসে পড়ে—তবে বাঘের ভরসা করবেন না। আর বাঘ এলেও হিমাংশু আমাদের মারতে দেবে না, নিজেই ব্যাগ করবে।' কুমার হাসিতে লাগিলেন—'জমিদারী দেখবার ফুরসৎ পায় না, তার এমনি শিকারের নেশা। দিন রাত হয় বন্দুকের ঘরে, নয় তো জঙ্গলে। যাকে বলে শিকার-পাগল। টিপও অসাধারণ—মাটিতে দাঁড়িয়ে বাঘ মারে।'

ব্যোমকেশ কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বললেন জমিদারীর—চোরাবালি? অদ্ভুত নাম তো।'

'হ্যাঁ, শুনেছি ওখানে নাকি কোথায় খানিকটা চোরাবালি আছে, কিন্তু কোথায় আছে, কেউ জানে না। সেই থেকে চোরাবালি নামের উৎপত্তি।' হাতের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'আর দেরী নয়, শুয়ে পড়ুন। নইলে সকালে উঠতে কষ্ট হবে।' বলিয়া একটা হাই তুলিয়া প্রস্থান করিলেন।

একই ঘরে পাশাপাশি খাটে আমাদের শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। শরীর বেশ একটি আরামদায়ক ক্লান্তিতে ভরিয়া উঠিতেছিল; সানন্দে বিছানায় লেপের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

ঘুমাইয়া পড়িতেও বেশী দেরী হইল না। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—চোরাবালিতে ডুবিয়া যাইতেছি; ব্যোমকেশ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। ক্রমে ক্রমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়া গেল; যতই বাহির হইবার জন্য হাঁকপাক করিতেছি ততই নিম্নাভিমুখে নামিয়া যাইতেছি। শেষে নাক পর্যন্ত বালিতে তলাইয়া গেল। নিমেষের জন্য ভয়াবহ মৃত্যু-যন্ত্রণার স্বাদ পাইলাম। তারপর ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দেখিলাম, লেপটা কখন অসাবধানে নাকের উপর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে বিছানায় বসিয়া রহিলাম, তারপর ঠাণ্ডা হইয়া আবার শয়ন করিলাম। চিন্তার সংসর্গ ঘুমের মধ্যেও কিরূপ বিচিত্রভাবে সঞ্চারিত হয় তাহা দেখিয়া হাসি পাইল।

ভোর হইতে না হইতে শিকারে বাহির হইবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। কোনোমতে হাফ্-প্যাণ্ট ও গরম হোস্ চড়াইয়া লইয়া, কেক সহযোগে ফুটন্ত চা গলাধঃকরণ করিয়া

মোটরে চড়িলাম। মোটরে তিনটা শট-গান্, অজস্র কার্তুজ ও এক বেতের বাক্স-ভরা আহার্য দ্রব্য আগে হইতেই রাখা হইয়াছিল। কুমার ত্রিদিব ও আমরা দুইজন পিছনের সীটে ঠাসাঠাসি হইয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কুয়াশায় ঢাকা অস্পষ্ট শীতল উষালোকের ভিতর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

কুমার ওভারকোটের কলারের ভিতর হইতে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'সূর্যোদয়ের আগে না পেঁছুলে ময়ূর বনমোরগ পাওয়া শক্ত হবে। এই সময় তারা গাছের ডগায় বসে থাকে—চমৎকার টার্গেট।'

ক্রমে দিনের আলো ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। পথের দু'ধারে সমতল ধানের ক্ষেত; কোথাও পাকা ধান শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও সোনালী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দূরে আকাশের পটমূলে পুরু কালির দাগের মত বনানী দেখা গেল; আমাদের রাস্তা তাহার একটা কোণ স্পর্শ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কুমার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন যে ঐ বনেই শিকার করিতে চলিয়াছি।

মিনিট কুড়ি পরে আমাদের মোটর জঙ্গলের কিনারায় আসিয়া থামিল। আমরা পকেটে কার্তুজ ভরিয়া লইয়া বন্দুক ঘাড়ে মহা উৎসাহে বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। কুমার ত্রিদিব একদিকে গেলেন। আমি আর ব্যোমকেশ একসঙ্গে আর একদিকে চলিলাম। বন্দুক চালনায় আমার এই প্রথম হাতে খড়ি, তাই একলা যাইতে সাহস হইল না। ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে স্থির হইল যে বেলা ন'টার সময় বনের পূর্ব সীমান্তে ফাঁকা জায়গায় তিনজনে আবার পুনর্মিলিত হইব। সেইখানেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা থাকিবে।

প্রকান্ড বনের মধ্যে বড় বড় গাছ—শাল, মহুয়া, সেগুন, শিমুল, দেওদার—মাথার উপর যেন চাঁদোয়া টানিয়া দিয়াছে; তাহার মধ্যে অজস্র শিকার। নীচে হরিণ, খরগোশ—উপরে হরিয়াল, বনমোরগ, ময়ূর। প্রথম বন্দুক ধরিবার উত্তেজনাপূর্ণ আনন্দ—আওয়াজ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষচূড়া হইতে মৃত পাখীর পতন-শব্দ, ছর্‌রার আঘাতে উড্ডীয়মান কুক্কুটের আকাশে ডিগ্‌বাজী খাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্তি—একটা এপিক লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছে। কালিদাস সত্যই লিখিয়াছেন, বিধ্যন্তি লক্ষ্যে চলে—সঞ্চরমান লক্ষ্যকে বিদ্ধ করা—এরূপ বিনোদ আর কোথায়? কিন্তু যাক্—পাখী শিকারের বহুল বর্ণনা করিয়া প্রবীণ বাঘ-শিকারীদের কাছে আর হাস্যাস্পদ হইব না।

আমাদের থলি ক্রমে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। বেলাও অলক্ষিতে বাড়িয়া চলিয়াছিল। আমি একবার এক কার্তুজে—দশ নম্বর—সাতটা হরিয়াল মারিয়া আত্মশ্লাঘার সপ্তমস্বর্গে চড়িয়া গিয়াছিলাম—দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল আমার মত অব্যর্থ সন্ধান সেকালে অর্জুনেরও ছিল না। ব্যোমকেশ দুইবার মাত্র বন্দুক চালাইয়া—একবার একটা খরগোশ ও দ্বিতীয়বার একটা ময়ূর মারিয়াই—থামিয়া গিয়াছিল। তাহার চক্ষু বৃহত্তর শিকারের অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছিল। বনে হরিণ আছে; তা ছাড়া, বাঘ না হোক, ভাল্লুকের আশা সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই যদিও মহুয়া গাছে তখনও ফল পাকে নাই তবু তাহার ভাল্লুক-লুব্ধ মন সেই দিকেই সতর্ক হইয়া ছিল।

কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, জঙ্গলের বাতাসের গুণে পেটের মধ্যে অগ্নিদেব ততই প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা তখন জঙ্গলের পূর্বসীমা লক্ষ্য করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুমার ত্রিদিবের বন্দুকের আওয়াজ দূর হইতে বরাবরই শুনিতে পাইতে-ছিলাম, এখন দেখিলাম তিনিও পূর্বদিকে মোড় লইয়াছেন।

বনভূমির ঘন সন্নিবিষ্ট গাছ ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে আমরা রৌদ্রোজ্জ্বল খোলা জায়গায় নীল আকাশের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখেই বালুকার একটা বিস্তীর্ণ বলয়—প্রায় সিকি মাইল চওড়া; দৈর্ঘ্যে কতখানি তাহা আন্দাজ করা গেল না—বনের কোল ঘেঁষিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে। বালুর উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া চক্ চক্ করিতেছে; শীতের প্রভাতে দেখিতে খুব চমৎকার লাগিল।

এই বালু-বলয় জঙ্গলকে পূর্বদিকে আর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কোনো সুদূর

অতীতে হয়তো ইহা একটি স্রোতস্বিনী ছিল, তারপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে—হয়তো ভূমিকম্পে—খাত উঁচু হইয়া জল শুকাইয়া গিয়া শুষ্ক বালুপ্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

আমরা বালুর কিনারায় বসিয়া সিগারেট ধরাইলাম।

অল্পকাল পরেই কুমার ত্রিদিব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'দিব্যি ক্ষিদে পেয়েছে—না? ঐ যে দুর্যোধন পৌঁছে গেছে—চলুন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কুমার ত্রিদিবের উড়িয়া বাবুর্চি মোটর হইতে বাস্কেট নামাইয়া ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছিল। অনতিদূরে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপর সাদা তোয়ালে বিছাইয়া খাদ্যদ্রব্য সাজাইয়া রাখিতে ছিল। তাহাকে দেখিয়া কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মত আমরা সেই দিকে ধাবিত হইলাম।

আহার করিতে করিতে, কে কি পাইয়াছে তাহার হিসাব হইল। দেখা গেল, আমার এক কার্তুজে সাতটা হরিয়াল সত্ত্বেও, কুমার বাহাদুরই জিতিয়া আছেন।

আকণ্ঠ আহার ও অনুপান হিসাবে থার্মোফ্লাস্ক্ হইতে গরম চা নিঃশেষ করিয়া আবার সিগারেট ধরানো গেল। কুমার ত্রিদিব গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিলেন, সিগারেটে সুদীর্ঘ টান দিয়া অর্ধনিমীলিত চক্ষে কহিলেন, 'এই যে বালুবন্ধ দেখছেন এ থেকেই জমিদারীর নাম হয়েছে চোরাবালি। এদিকটা সব হিমাংশুর।' বলিয়া পূর্বদিক নির্দেশ করিয়া হাত নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। এই বালির ফালিটা লম্বায় কতখানি? সমস্ত বনটাকেই ঘিরে আছে নাকি?'

কুমার বলিলেন, 'না। মাইল তিনেক লম্বা হবে—তারপরে আমার মাঠ আরম্ভ হয়েছে। এরই মধ্যে কোথায় এক জায়গায় খানিকটা চোরাবালি আছে—ঠিক কোন্‌খানটায় আছে কেউ জানে না, কিন্তু ভয়ে কোনো মানুষ বালির উপর দিয়ে হাঁটে না; এমন কি গরু বাছুর শেয়াল কুকুর পর্যন্ত একে এড়িয়ে চলে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বালিতে কোথাও জল নেই বোধহয়?'

কুমার অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, 'বলতে পারি না। শুনেছি ঐদিকে খানিকটা জায়গায় জল আছে, তাও সব সময় পাওয়া যায় না।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে যেখানে বালুর রেখা বাঁকিয়া বনের আড়ালে অদৃশ্য হইয়াছে সেই দিকে আঙুল দেখাইলেন।

এই সময় হঠাৎ অতি নিকটে বনের মধ্যে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমরা তিনজনেই এখানে রহিয়াছি, তবে কে আওয়াজ করিল—বিস্মিতভাবে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া এই কথা ভাবিতেছি, এমন সময় একজন বন্দুকধারী লোক একটা মৃত খরগোশ কান ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার পরিধানে যোধপুরী ব্রীচেস্, মাথায় বয়-স্কাউটের মত খাকি টুপি, চামড়ার কোমরবন্ধে সারি সারি কার্তুজ আঁটা রহিয়াছে।

কুমার ত্রিদিব উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, 'আরে হিমাংশু, এস এস।'

খরগোশ মাটিতে ফেলিয়া হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; বলিলেন, 'অভ্যর্থনা আমারই করা উচিত এবং করছিও। বিশেষতঃ এঁদের।' কুমার আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, তারপর হাসিয়া হিমাংশুবাবুকে বলিলেন, 'তুমি বুঝি আর লোভ সামলাতে পারলে না? কিম্বা ভয় হল, পাছে তোমার সব বাঘ আমরা ব্যাগ করে ফেলি?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আরে বল কেন? মহা ফ্যাসাদে পড়া গেছে। আজই আমার ত্রিপুরায় যাবার কথা ছিল, সেখান থেকে শিকারের নেমন্তন্ন পেয়েছি। কিন্তু যাওয়া হল না, দেওয়ানজী আটকে দিলেন। বাবার আমলের লোক, একটু ছুতো পেলেই জুলুম জবরদস্তি করেন, কিছু বলতেও পারি না। তাই রাগ করে আজ সকালবেলা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। দুত্তোর! কিছু না হোক দুটো বনপায়রাও তো মারা যাবে!'

কুমার বলিলেন, 'হায় হায়—কোথায় বাঘ ভাল্লুক আর কোথায় বনপায়রা! দুঃখ হবার কথা বটে—কিন্তু যাওয়া হল না কেন?'

হিমাংশুবাবু ইতিমধ্যে খাবার বাক্সটা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া তাহার ভিতর অনুসন্ধান করিতেছিলেন, প্রফুল্লমুখে কয়েকটা ডিম-সিদ্ধ ও কাটলেট বাহির করিয়া চর্বণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি এই অবসরে তাঁহার চেহারাখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। বয়স আমাদেরই সমান হইবে; বেশ মজবুত পেশীপুষ্ট দেহ। মুখে একজোড়া উগ্র জার্মান গোঁফ মুখখানাকে অনাবশ্যক রকম হিংস্র করিয়া তুলিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে পুরাতন বাঘ-শিকারীর নিষ্ঠুর সতর্কতা সর্বদাই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। এক নজর দেখিলে মনে হয় লোকটা ভীষণ দুর্দান্ত। কিন্তু তবু বর্তমানে তাঁহাকে পরম পরিতৃপ্তির সহিত অর্ধমুদিত নেত্রে কাটলেট চিবাইতে দেখিয়া আমার মনে হইল, চেহারাটাই তাঁহার সত্যকার পরিচয় নহে; বস্তুতঃ লোকটি অত্যন্ত সাদাসিধা অনাড়ম্বর—মনের মধ্যে কোনো মারপ্যাঁচ নাই। সাংসারিক বিষয়ে হয়তো একটু অন্যমনস্ক; নিদ্রায় জাগরণে নিরন্তর বাঘ ভাল্লুকের কথা চিন্তা করিয়া বোধ করি বুদ্ধিটাও সাংসারিক ব্যাপারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে।

কাটলেট ও ডিম্ব সমাপনান্তে চায়ের ফ্লাস্কে চুমুক দিয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন 'কি বললে? যাওয়া হল না কেন? নেহাত বাজে কারণ; কিন্তু দেওয়ানজী ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েছেন, পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়েছে। কাজেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য আমাকে এখানে ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে হবে।' তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

'হয়েছে কি?'

'হয়েছে আমার মাথা। জান তো, বাবা মারা যাবার পর থেকে গত পাঁচ বছর ধরে প্রজাদের সঙ্গে অনবরত মামলা মোকদ্দমা চলছে। আদায় তসিলও ভাল হচ্ছে না। এই নিয়ে অষ্টপ্রহর অশান্তি লেগে আছে;—উকিল মোক্তার পরামর্শ, সে সব তো তুমি জানোই। যাহোক আমমোক্তারনামা দিয়ে এক রকম নিশ্চিন্দি হওয়া গিছল, এমন সময় আবার এক নূতন ফ্যাচাং—। মাস-কয়েক আগে বেবির জন্য একটা মাস্টার রেখেছিলুম, সে হঠাৎ পরশু দিন থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে; যাবার সময় নাকি খানকয়েক পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গেছে। তাই নিয়ে একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। থানা পুলিস হৈ হৈ রৈ রৈ বেধে গেছে। দেওয়ানজীর বিশ্বাস, এটা আমার মামলাবাজ প্রজাদের একটা মারাত্মক প্যাঁচ।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'লোকটা এখনো ধরা পড়েনি?'

বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'না। এবং যতক্ষণ না ধরা পড়ছে—' হঠাৎ থামিয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আরে! এটা এতক্ষণ আমার মাথাতেই ঢোকেনি। আপনি তো একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ, চোর ডাকাতের সাক্ষাৎ যম! (ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে বলিল, সত্যান্বেষী) তাহলে মশায়, দয়া করে যদি দু'একদিনের মধ্যে লোকটাকে খুঁজে বার করে দিতে পারেন—তাহলে আমার ত্রিপুরার শিকারটা ফস্কায় না। কাল-পরশুর মধ্যে গিয়ে পড়তে পারলে—'

আমরা সকলে হাসিয়া উঠিলাম। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চোরের মন পুঁই আদাড়ে। তুমি বুঝি কেবল শিকারের কথাই ভাবছ?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাকে কিছু করতে হবে না, পুলিসই খুঁজে বার করবে অখন। এসব জায়গা থেকে একেবারে লোপাট হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়; কলকাতা হলেও বা কথা ছিল।'

হিমাংশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'পুলিসের কর্ম নয়। এই তিন দিনে সমস্ত দেশটা তারা তোলপাড় করে ফেলেছে, কাছাকাছি যত রেলওয়ে স্টেশন আছে সব জায়গায় পাহারা বসিয়েছে। কিন্তু এখনো তো কিছু করতে পারলে না। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আপনি কেসটা হাতে নিন; সামান্য ব্যাপার, আপনার দু'ঘণ্টাও সময় লাগবে না।'

ব্যোমকেশ তাঁহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আচ্ছা, ঘটনাটা আগাগোড়া বলুন তো শুনি।'

হিমাংশুবাবু সাক্ষাতে হাত উল্টাইয়া বলিলেন 'আমি কি সব জানি ছাই! তার সঙ্গে বোধহয় সাকুল্যে পাঁচ দিনও দেখা হয়নি। যা হোক, যতটুকু জানি বলছি শুনুন। কিছুদিন

আগে—বোধহয় মাস দুই হবে—একদিন সকালবেলা একটা ন্যালাখ্যাপা গোছের ছোকরা আমার কাছে এসে হাজির হল। তাকে আগে কখনো দেখিনি, এ অঞ্চলের লোক বলে বোধ হল না। তার গায়ে একটা ছেঁড়া কামিজ, পায়ে ছেঁড়া চটিজুতা—রোগা বেঁটে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত চেহারা; কিন্তু কথাবার্তা শুনে মনে হয় শিক্ষিত। বললে, চাকরীর অভাবে খেতে পাচ্ছে না, যা হোক একটা চাকরী দিতে হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? পকেট থেকে বি-এস্‌সি'র ডিগ্রি বার করে দেখিয়ে বললে, যে কাজ দেবেন তাই করব। ছোকরার অবস্থা দেখে আমার একটু দয়া হল, কিন্তু কি কাজ দেব? সেরেস্তায় তো একটা জায়গাও খালি নেই। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল, আমার মেয়ে বেবির জন্যে একজন মাস্টার রাখবার কথা গিন্নি কয়েকদিন আগে বলেছিলেন। বেবি এই সাতে পড়েছে, সুতরাং তার পড়াশুনোর দিকে এবার একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

'তাকে মাস্টার বাহাল করলুম, কারণ, অবস্থা যাই হোক, ছোকরা শিক্ষিত ভদ্রসন্তান। বাড়িতেই বাইরের একটা ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলুম। ছোকরা কৃতজ্ঞতায় একেবারে কেঁদে ফেললে। তখন কে ভেবেছিল যে—; নাম? নাম যতদূর মনে পড়ছে, হরিনাথ চৌধুরী—কায়স্থ।

'যা হোক, সে বাড়িতেই রইল। কিন্তু আমার সঙ্গে বড় একটা দেখা-সাক্ষাৎ হত না। বেবিকে দু'বেলা পড়াচ্ছে, এই পর্যন্তই জানতুম। হঠাৎ সেদিন শুনলুম, ছোকরা কাউকে না বলে কবে উধাও হয়েছে। উধাও হয়েছে, হয়েছে—আমার কোনো আপত্তি ছিল না, কিন্তু মাঝ থেকে কতকগুলো বাজে পুরনো হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়েই আমার সর্বনাশ করে গেল। এখন তাকে খুঁজে বার না করা পর্যন্ত আমার নিস্তার নেই।'

হিমাংশুবাবু নীরব হইলেন। ব্যোমকেশ ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া শুনিতেছিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ছোকরা খেত কোথায়?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমার বাড়িতেই খেত। আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না, বেবির মাস্টার বলে গিন্নি তাকে নিজে—'

এই সময় পিছনে একটা গাছের মাথায় ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শুনিয়া আমরা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড বন-মোরগ নানা বর্ণের পুচ্ছ ঝুলাইয়া এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া যাইতেছে। গাছ দু'টার মধ্যে ব্যবধান ত্রিশ হাতের বেশী হইবে না। কিন্তু নিমিষের মধ্যে বন্দুকের ব্রীচ্‌ খুলিয়া টোটা ভরিয়া হিমাংশুবাবু ফায়ার করিলেন। পাখীটা অন্য গাছ পর্যন্ত পেঁাছিতে পারিল না, মধ্য পথেই ধপ্‌ করিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি অদ্ভুত টিপ্‌।'

ব্যোমকেশ সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া বলিল, 'সত্যিই অসাধারণ।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ও আর কি দেখলেন? ওর চেয়েও ঢের বেশী আশ্চর্য বিদ্যে ওর পেটে আছে!—হিমাংশু, তোমার সেই শব্দভেদী প্যাঁচটা একবার দেখাও না।'

'আরে না না, এখন ওসব থাক। চল—আর একবার জঙ্গলে ঢোকা যাক—'

'সে হচ্ছে না—ওটা দেখাতেই হবে। নাও—চোখে রুমাল বাঁধো।'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'কি ছেলেমানুষী দেখুন দেখি। ও একটা বাজে ট্রীক্‌, আপনারা কতবার দেখেছেন—'

আমরাও কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলাম, বলিলাম, 'তা হোক, আপনাকে দেখাতে হবে।'

তখন হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা—দেখাচ্ছি। কিছুই নয়, চোখ বেঁধে কেবল শব্দ শুনে লক্ষ্যবেধ করা।' বন্দুকে একটা বুলেট ভরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনিই রুমাল দিয়ে চোখ বেঁধে দিন—কিন্তু দেখবেন কান দুটো যেন খোলা থাকে।'

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া তাঁহার চোখ বাঁধিয়া দিল। তখন কুমার ত্রিদিব একটা চায়ের পেয়ালা লইয়া তাহার হাতলে খানিকটা সুতা বাঁধিলেন। তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া—যাহাতে হিমাংশুবাবু বুঝিতে না পারেন তিনি কোনদিকে গিয়াছেন—প্রায়

পঁচিশ হাত দূরে একটা গাছের ডালে পেয়ালাটা ঝুলাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হিমাংশুবাবু এবার শুনুন।'

কুমার ত্রিদিব চামচ দিয়া পেয়ালাটায় আঘাত করিলেন, ঠুং করিয়া শব্দ হইল।

হিমাংশুবাবু বন্দুক কোলে লইয়া যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেই দিকে ঘুরিয়া বসিলেন। বন্দুকটা একবার তুলিলেন, তারপর বলিলেন, 'আর একবার বাজাও।'

কুমার ত্রিদিব আর একবার শব্দ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সরিয়া আসিলেন।

শব্দের রেশ সম্পূর্ণ মিলাইয়া যাইবার পূর্বেই বন্দুকের আওয়াজ হইল; দেখিলাম পেয়ালাটা চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে, কেবল তাহার ডাঁটিটা ডাল হইতে ঝুলিতেছে।

মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পেশাদার বাজীকরের সাজানো নাট্যমঞ্চে এরকম খেলা দেখ' যায় বটে কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক রকম জুয়াচুরি আছে। এ একেবারে নির্জলা খাঁটি জিনিস।

হিমাংশুবাবু চোখের রুমাল খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'হয়েছে?'

আমাদের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা শুনিয়া তিনি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ও কথা থাক, আপনাদের সুখ্যাতি আর বেশীক্ষণ শুনলে আমার গণ্ডদেশ ক্রমে বিলিতি বেগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। এখন উঠুন। চলুন, ইতর প্রাণীদের বিরুদ্ধে আর একবার অভিযানে বেরুনো যাক।'

বেলা দেড়টার সময়, শিকার-শ্রান্ত চারিজন মোটরের কাছে ফিরিয়া আসিলাম। হরিনাথ মাস্টারের খাতা চুরির কাহিনী চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। হিমাংশুবাবুরও কি জানি কেন, ব্যোমকেশের সাহায্য লইবার আর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। বোধহয় এরূপ তুচ্ছ ব্যাপারে সদ্য পরিচিত একজন লোককে খাটাইয়া লইতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেছিলেন; হয়তো তিনি ভাবিতেছিলেন যে পুলিসই শীঘ্র এই ব্যাপারের একটা সমাধান করিয়া ফেলিবে। সে যাহাই হোক, ব্যোমকেশই প্রসঙ্গটার পুনরুত্থাপন করিল, বলিল, 'আপনার হরিনাথ মাস্টারের গল্পটা ভাল করে শোনা হল না।'

হিমাংশুবাবু মোটরের ফুট-বোর্ডে পা তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি সবই প্রায় বলেছি, আর বিশেষ কিছু জানবার আছে বলে মনে হয় না।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না। কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'চল হিমাংশু, তোমাকে মোটরে বাড়ি পোঁছে দিয়ে যাই। তুমি বোধ হয় হেঁটেই এসেছ।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে রাস্তা দিয়ে ঘুর পড়ে বলে ওদিক দিয়ে মাঠে মাঠে এসেছি। ওদিক দিয়ে মাইলখানেক পড়ে।' বলিয়া দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'রাস্তা দিয়ে অন্তত মাইল দুই। চল তোমাকে পোঁছে দিই।' তারপর হাসিয়া বলিলেন, 'আর যদি নেমন্তন্ন কর তাহলে না হয় দুপুরের স্নানাহারটা তোমার বাড়িতেই সারা যাবে। কি বলেন আপনারা?'

আমাদের কোনো আপত্তিই ছিল না, আমোদ করিতে আসিয়াছি, গৃহস্বামী যেখানে লইয়া যাইবেন সেখানে যাইতেই রাজী ছিলাম। আমরা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়—সে আর বলতে। তোমরা তো আজ আমারই অতিথি—এতক্ষণ এ প্রস্তাব না করাই আমার অন্যায় হয়েছে। যা হোক, উঠে পড়ুন গাড়িতে, আর দেরী নয়; খাওয়া দাওয়া করে তবু একটু বিশ্রাম করতে পারেন। তারপর একেবারে বৈকালিক চা সেরে বাড়ি ফিরলেই হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এবং পারি যদি, ইতিমধ্যে আপনার পলাতক মাস্টারের একটা ঠিকানা করা যাবে।'

'হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে। আমার দেওয়ান হয়তো তার সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলতে পারবেন।' বলিয়া তিনি নিজে অগ্রবর্তী হইয়া গাড়িতে উঠিলেন।

হিমাংশুবাবু খুবই সমাদর সহকারে আমাদের আহ্বান করিলেন বটে কিন্তু তবু আমার একটা ক্ষীণ সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে তিনি মন খুলিয়া খুশী হইতে পারেন নাই।

দশ মিনিট পরে আমাদের গাড়ি তাঁহার প্রকাণ্ড উদ্যানের লোহার ফটক পার হইয়া প্রাসাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ির শব্দে একটি প্রৌঢ় গোছের ব্যক্তি ভিতর হইতে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন; তারপর হিমাংশুবাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে দেখিয়া তিনি খড়ম পায়ে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া বিচলিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা হিমাংশু, যা ভেবেছিলুম তাই। হরিনাথ মাস্টার শুধু খাতাই চুরি করেনি, সঙ্গে সঙ্গে তহবিল থেকে ছ'হাজার টাকাও গেছে।'

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল। শীতের অপরাহ্ণ ইহারই মধ্যে দিবালোকের উজ্জ্বলতা ম্লান করিয়া আনিয়াছিল।

'এবার ভট্টাচার্যি মশায়ের মুখে ব্যাপারটা শোনা যাক।' বলিয়া ব্যোমকেশ মোটা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া বসিল।

গুরু ভোজনের পর বৈঠকখানায় গদির উপর বিস্তৃত ফরাসের শয্যায় এক একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া আমরা চারিজনে গড়াইতেছিলাম। হিমাংশুবাবুর কন্যা বেবি ব্যোমকেশের কোলের কাছে বসিয়া নিবিষ্ট মনে একটা পুতুলকে কাপড় পরাইতেছিল; এই দুই ঘণ্টায় তাহাদের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব জন্মিয়া গিয়াছিল। দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য মহাশয় একটু তফাতে ফরাসের উপর মেরুদণ্ড সিধা করিয়া পদ্মাসনে বসিয়াছিলেন—যেন একটু সুবিধা পাইলেই ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবেন।

বস্তুতঃ তাঁহাকে দেখিলে জপতপ ধ্যানধারণার কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। আমি তো প্রথম দর্শনে তাঁহাকে জমিদার বাড়ির পুরোহিত বলিয়া ভুল করিয়াছিলাম। শীর্ণ গৌরবর্ণ দেহ, মুণ্ডিত মুখ, গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে আধুলির মত একটি সিন্দুরের টিকা। মুখে তপঃকৃশ শান্তির ভাব। বৈষয়িকতার কোনো চিহ্নই সেখানে বিদ্যমান নাই। অথচ এক শিকার-পাগল সংসার-উদাসী জমিদারের বৃহৎ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা যে এই লোকটির তীক্ষ্ণ সতর্কতার উপর নির্ভর করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মান্য অতিথির সংবর্ধনা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারীর সামান্য খুঁটিনাটি পর্যন্ত ইঁহারি কটাক্ষ ইঙ্গিতে সুনিয়ন্ত্রিত হইতেছে।

ব্যোমকেশের কথায় তিনি নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। ক্ষণকাল মুদিত চক্ষে নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হরিনাথ লোকটা আপাতদৃষ্টিতে এতই সাধারণ আর অকিঞ্চিৎকর যে তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে হয় বলবার কিছুই নেই। ন্যালা-ক্যাব্‌লা গোছের একটা ছোঁড়া—অথচ তার পেটে যে এতখানি শয়তানী লুকোনো ছিল তা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আমি মানুষ চিনতে বড় ভুল করি না, এক নজর দেখেই কে কেমন লোক বুঝতে পারি। কিন্তু সে-ছোঁড়া আমার চোখেও ধুলো দিয়েছে। একবারও সন্দেহ করিনি যে এটা তার ছদ্মবেশ, তার মনে কোনো কু-অভিপ্রায় আছে।

'প্রথম যেদিন এল সেদিন তার জামাকাপড়ের দুরবস্থা দেখে আমি ভাণ্ডার থেকে দু'জোড়া কাপড় দুটো গেঞ্জি দুটো জামা আর দু'খানা কম্বল বার করে দিলুম। একখানা ঘর হিমাংশু বাবাজী তাকে আগেই দিয়েছিলেন—ঘরটাতে পুরনো খাতাপত্র থাকত, তা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজে লাগত না; সেই ঘরে তক্তপোষ ঢুকিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। ঠিক হল, বেবি দু'বেলা ঐ ঘরেই পড়বে। তার খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আমি স্থির করেছিলুম, অনাদি সরকারের কিম্বা কোনো আমলার বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসবে। আমলারা সবাই কাছেপিঠেই থাকে। কিন্তু আমাদের মা-লক্ষ্মী সে প্রস্তাবে মত দিলেন না। তিনি অন্দর থেকে বলে পাঠালেন যে বেবির মাস্টার বাড়িতেই খাওয়া দাওয়া করবে। সেই ব্যবস্থাই ধার্য হল।

'তারপর সে বেবিকে নিয়মিত পড়াতে লাগল। আমি দু'দিন তার পড়ানো লক্ষ্য করলুম—দেখলুম ভালই পড়াচ্ছে। তারপর আর তার দিকে মন দেবার সুযোগ হয়নি। মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে বসত—ধর্ম সম্বন্ধে দু'চার কথা শুনতে চাইত। এমনিভাবে দু'মাস কেটে গেল।

'গত শনিবার আমি সন্ধ্যের পরই বাড়ি চলে যাই। আমি যে-বাড়িতে থাকি দেখেছেন বোধ হয়—ফটকে ঢুকতে ডান দিকে যে হলদে বাড়িখানা পড়ে সেইটে। কয়েক মাস হল আমি আমার স্ত্রীকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছি।—একলাই থাকি। স্বপাক খাই—আমার কোনো কষ্ট হয় না। শনিবার রাত্রে আমার পুরশ্চরণ করবার কথা ছিল—তাই সকাল সকাল গিয়ে উদ্যোগ আয়োজন করে পুজোয় বসলুম। উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল।

'পরদিন সকালে এসে শুনলুম মাস্টারকে পাওয়া যাচ্ছে না। ক্রমে বেলা বারোটা বেজে গেল তখনো মাস্টারের দেখা নেই। আমার সন্দেহ হল, তার ঘরে গিয়ে দেখলুম রাত্রে সে বিছানায় শোয়নি। তখন, যে আলমারিতে জমিদারীর পুরনো হিসেবের খাতা থাকে সেটা খুলে দেখলুম—গত চার বছরের হিসেবের খাতা নেই।

'গত চার বছর থেকে অনেক বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমা চলছে; সন্দেহ হল এ তাদেরই কারসাজি। জমিদারীর হিসেবের খাতা শত্রুপক্ষের হাতে পড়লে তাদের অনেক সুবিধা হয়; বুঝলুম, হরিনাথ তাদেরই গুপ্তচর, মাস্টার সেজে জমিদারীর জরুরী দলিল চুরি করবার জন্যে এসে ঢুকেছিল।

'পুলিসে খবর পাঠালুম। কিন্তু তখনো জানি না যে সিন্দুক থেকে ছ' হাজার টাকাও লোপাট হয়েছে।'

এ পর্যন্ত বলিয়া দেওয়ানজী থামিলেন, তারপর ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'নানা কারণে কিছুদিন থেকে তহবিলে টাকার কিছু টানাটানি পড়েছে। সম্প্রতি মোকদ্দমার খরচ ইত্যাদি বাবদ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল, তাই মহাজনের কাছ থেকে ছ' হাজার টাকা হাওলাত নিয়ে সিন্দুকে রাখা হয়েছিল। টাকাটা পুঁটলি বাঁধা অবস্থায় সিন্দুকের এক কোণে রাখা ছিল। ইতিমধ্যে অনেকবার সিন্দুক খুলেছি কিন্তু পুঁটলি খুলে দেখবার কথা একবারও মনে হয়নি। আজ সদর থেকে উকিল টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। পুঁটলি খুলে টাকা বার করতে গেলুম; দেখি, নোটের তাড়ার বদলে কতকগুলো পুরনো খবরের কাগজ রয়েছে।'

দেওয়ান নীরব হইলেন।

শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ আবার চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল, কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিল, 'তাহলে সিন্দুকের তালা ঠিকই আছে? চাবি কার কাছে থাকে?'

দেওয়ান বলিলেন, 'সিন্দুকের দুটো চাবি; একটা আমার কাছে থাকে, আর একটা হিমাংশু বাবাজীর কাছে। আমার চাবি ঠিকই আছে, কিন্তু হিমাংশু বাবাজীর চাবিটা শুনছি ক'দিন থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

হিমাংশুবাবু শুষ্কমুখে বলিলেন, 'আমারই দোষ। চাবি আমার কোনোকালে ঠিক থাকে না, কোথায় রাখি ভুলে যাই। এবারেও কয়েকদিন থেকে চাবিটা খুঁজে পাচ্ছিলুম না, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ উদ্বিগ্ন হইনি—ভেবেছিলুম কোথাও না কোথাও আছেই—'

'হুঁ'—ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, হাসিয়া বেবিকে নিজের কোলের উপর বসাইয়া বলিল, মা-লক্ষ্মীর মাস্টারটি জুটেছিল ভাল। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই আশ্চর্য। ভাল করে খোঁজ করা হচ্ছে তো?'

দেওয়ান কালীগতি বলিলেন, 'যতদূর সাধ্য ভাল করেই খোঁজ করানো হচ্ছে। পুলিস তো আছেই, তার ওপর আমিও লোক লাগিয়েছি। কিন্তু কোনো সংবাদই পাওয়া যাচ্ছে না।'

বেবি পুতুল রাখিয়া ব্যোমকেশের গলা জড়াইয়া ধরিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার মাস্টারমশাই কবে ফিরে আসবেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'জানি না। বোধ হয় আর আসবেন না।'

বেবির চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল; তাহা দেখিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি মাস্টারমশাইকে খুব ভালবাসো—না?'

বেবি ঘাড় নাড়িল—'হ্যাঁ—খুব ভালবাসি। তিনি আমাকে কত অঙ্ক শেখাতেন।—আচ্ছা বল তো, সাত-নাম্ কত হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কত? চৌষট্টি?'

বেবি বলিল, 'দুৎ! তুমি কিচ্ছু জান না। সাত-নাম্ তেষট্টি। আচ্ছা, তুমি মা কালীর স্তব জানো?'

ব্যোমকেশ হতাশ ভাবে বলিল, 'না। মা কালীর স্তবও কি তোমার মাস্টারমশায় শিখিয়েছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ—শুনবে?' বলিয়া বেবি সুর করিয়া আরম্ভ করিল—

'নমস্তে কালিকা দেবী করাল বদনী—'

কালীগতি ঈষদ্‌হাস্যে তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বেবি, তোমার কালীস্তব আমরা পরে শুনব, এখন তুমি বাগানে খেলা কর গে যাও।'

বেবি একটু ক্ষুণ্ণভাবে পুতুল লইয়া প্রস্থান করিল। কালীগতি আস্তে আস্তে বলিলেন, 'লোকটা মাস্টার হিসেবে মন্দ ছিল না—বেশ যত্ন করে পড়াত—অথচ—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'চলুন, মাস্টারের ঘরটা একবার দেখে আসা যাক।

বাড়ির সম্মুখস্থ লম্বা বারান্দার একপ্রান্তে একটি প্রকোষ্ঠ; দ্বারে তালা লাগানো ছিল, দেওয়ানজী কষি হইতে চাবির গুচ্ছ বাহির করিয়া তালা খুলিয়া দিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ঘরটি আয়তনে ছোট। গোটা-দুই কাঠের কবাটযুক্ত আলমারি, টেবিল চেয়ার তক্তপোষেই এমনভাবে ভরিয়া উঠিয়াছে যে মনে হয় পা বাড়াইবার স্থান নাই। দ্বারের বিপরীত দিকে একটা ছোট জানালা ছিল, সেটা খুলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার চোখ ফিরাইল। তক্তপোষের উপর বিছানাটা অবিন্যস্ত ভাবে পাট করা রহিয়াছে; টেবিলের উপর সূক্ষ্ম একপুরু ধুলোর প্রলেপ পড়িয়াছে; ঘরের অন্ধকার একটা কোণে দড়ি টাঙাইয়া কাপড়-চোপড় রাখিবার ব্যবস্থা। একটা আলমারির কবাট ঈষৎ উন্মুক্ত। দেওয়ালে লম্বিত একখানি কালীঘাটের পটের কালীমূর্তি হরিনাথ মাস্টারের কালীপ্রীতির পরিচয় দিতেছে।

ব্যোমকেশ তক্তপোষের নীচে উঁকি মারিয়া একজোড়া জুতা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, 'তাই তো, জুতোজোড়া যে একেবারে নূতন দেখছি। ও—আপনারাই কিনে দিয়েছিলেন বুঝি?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! আশ্চর্য!' জুতা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ দড়ির আলনাটার দিকে গেল। আলনায় কয়েকটা কাচা আকাচা কাপড় জামা ঝুলিতেছিল, সেগুলিকে তুলিয়া তুলিয়া দেখিল, তারপর আবার বলিল, 'ভারি আশ্চর্য!'

হিমাংশুবাবু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে?'

জবাব দিবার জন্য মুখ ফিরাইয়া ব্যোমকেশ থামিয়া গেল, তাহার দৃষ্টি ঘরের বিপরীত কোণে একটা কুলুঙ্গির উপর গিয়া পড়িল। সে দ্রুতপদে গিয়া কুলুঙ্গির ভিতর হইতে কি একটা তুলিয়া লইয়া জানালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সবিস্ময়ে বলিল, 'মাস্টার কি চশমা পরত?'

কালীগতি বলিলেন, 'ওটা বলতে ভুল হয়ে গেছে—পরত বটে। চশমা কি ফেলে গেছে নাকি?'

চশমার কাচের ভিতর দিয়া একবার দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া সহাস্যে সেটা আমার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ—আশ্চর্য নয়?'

কালীগতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'আশ্চর্য বটে। কারণ যার চোখ খারাপ তার পক্ষে চশমা ফেলে যাওয়া অস্বাভাবিক। এর কি কারণ হতে পারে

আপনার মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনেক রকম কারণ থাকতে পারে। হয়তো তার সত্যি চোখ খারাপ ছিল না, আপনাদের ঠকাবার জন্যে চশমা পরত।'

ইত্যবসরে আমি আর কুমার ত্রিদিব চশমাটা পরীক্ষা করিতেছিলাম। স্টীল ফ্রেমের নড়বড়ে বাহুযুক্ত চশমা, কাচ পুরু। কাচের ভিতর দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ধোঁয়া ছাড়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক নয়। চশমাটা অনেকদিনের ব্যবহারে পুরনো হয়ে গেছে, আর কাচের শক্তিও খুব বেশী।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ভুলও হতে পারে। তবে, মাস্টার আর কারুর পুরনো চশমা নিয়ে এসেছিল এটাও তো সম্ভব। যা হোক, এবার আলমারিটা দেখা যাক।'

খোলা আলমারিটার কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া দেখা গেল, তাহার মধ্যে থাকে থাকে খেরো-বাঁধানো স্থূলকায় হিসাবের খাতা সাজানো রহিয়াছে—বোধহয় সবসুদ্ধ পঞ্চাশ-ষাট খানা। ব্যোমকেশ উপরের একটা খাতা নামাইয়া দু'হাতে ওজন করিয়া বলিল, 'বেশ ভারী আছে, সের চারেকের কম হবে না। প্রত্যেক খাতায় বুঝি এক বছরের হিসেব আছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ খাতার গোড়ার পাতা উল্টাইয়া দেখিল, পাঁচ বছর আগেকার খাতা, ইহার পর হইতে শেষ চার বছরের খাতা চুরি গিয়াছে। আরো কয়েকখানা খাতা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ হিসাব রাখিবার প্রণালী মোটামুটি চোখ বুলাইয়া দেখিল। প্রত্যেকটি খাতা দুই অংশে বিভক্ত—অর্থাৎ একাধারে জাব্‌দা ও পাকা খাতা। এক অংশে দৈনন্দিন খুচরা আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখিত হইয়াছে—অন্য অংশে মোট দৈনিক খরচ তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ জমিদারী খাতা এরূপভাবে লিখিত হয় না, কিন্তু এরূপ লেখার সুবিধা এই যে অল্প পরিশ্রমে জাব্‌দা ও পাকা খাতা মিলাইয়া দেখা যায়।

গোড়া হইতে ব্যোমকেশ ব্যাপারটাকে খুব হাল্কাভাবে লইয়াছিল। অতি সাধারণ গতানুগতিক চুরি ছাড়া ইহার মধ্যে আর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বোধ হয় সে মনে করে নাই। কিন্তু ঘর পরীক্ষা শেষ করিয়া যখন সে বাহিরে আসিল তখন দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। ও দৃষ্টি আমি চিনি। কোথাও সে একটা গুরুতর কিছুর ইঙ্গিত পাইয়াছে; হয়তো যত তুচ্ছ মনে করা গিয়াছিল ব্যাপার তত তুচ্ছ নয়। আমিও মনে মনে একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

ঘরের বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হিমাংশুবাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি এ ব্যাপারের তদন্ত করি আপনি চান?'

মুহূর্তকালের জন্য হিমাংশুবাবু যেন একটু দ্বিধা করিলেন, তারপর বলিলেন 'হ্যাঁ—চাই বই কি। এতগুলো টাকা, তার একটা কিনারা হওয়া তো দরকার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আমাদের দু'জনকে এখানে থাকতে হয়।'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। সে আর বেশী কথা কি—'

ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু কুমার বাহাদুর যদি অনুমতি দেন তবেই আমরা থাকতে পারি। আমরা ওঁর অতিথি।'

কুমার ত্রিদিব লজ্জায় পড়িলেন। আমাদের ছাড়িবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না কিন্তু ব্যোমকেশের ইচ্ছাটাও তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। ব্যোমকেশ হিমাংশুবাবুর কাজ করিয়া কিছু উপার্জন করিতে চায় এরূপ সন্দেহও হয়তো তাঁহার মনে জাগিয়া থাকিবে। তাই তিনি কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'বেশ তো, আপনারা থাকলে যদি হিমাংশুর উপকার হয়—'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'তা বলতে পারি না। হয়তো কিছুই করে উঠতে পারবো না। হিমাংশুবাবু, আপনার যদি এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকে তো বলুন—চক্ষুলজ্জা করবেন না। আমরা কুমার ত্রিদিবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, বিষয়চিন্তাও কলকাতায় ফেলে এসেছি। তাই, আপনি যদি আমার সাহায্য দরকার না মনে করেন, তাহলে আমি বরঞ্চ খুশীই হব।'

ব্যোমকেশ কুমার বাহাদুরের ভিত্তিহীন সন্দেহটার আভাস পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি আরো লজ্জিত হইয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি বলিলেন, 'না না ব্যোমকেশবাবু, আপনারা থাকুন। যতদিন দরকার থাকুন। আপনারা থাকলে নিশ্চয় এ ব্যাপারের কিনারা করতে পারবেন। আমি রোজ এসে আপনাদের খবর নিয়ে যাব।'

হিমাংশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন করিলেন। আমাদের থাকাই স্থির হইয়া গেল।

অতঃপর চায়ের ডাক পড়িল; আমরা বৈঠকখানায় ফিরিয়া গেলাম। প্রায় নীরবেই চা পান সমাপ্ত হইল। কুমার ত্রিদিব ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'সাড়ে চারটে বাজে। হিমাংশু, আমি তাহলে আজ চলি। কাল আবার কোনো সময় আসব।' বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

কম্পাউণ্ডের বাহিরে মোটর অপেক্ষা করিতেছিল। আমি এবং ব্যোমকেশ কুমারের সঙ্গে ফটক পর্যন্ত গেলাম। কুমার বাহাদুর নিজের জমিদারীতে আমাদের জন্য অনেক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন—পুকুরে মাছ ধরা, খালে নৌ বিহার প্রভৃতি বহুবিধ ব্যসনের আয়োজন হইয়াছিল। সে সব ব্যর্থ হইয়া যাওয়ায় তিনি একটু ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। মোটরের কাছে পৌঁছিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কাজটায় আপনার কতদিন লাগবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছুই এখনো বলতে পারছি না—আপনি আমাকে ঘোর অকৃতজ্ঞ মনে করছেন, মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—আমোদ-আহ্লাদের অছিলায় একে উপেক্ষা করলে অন্যায় হবে।'

কুমার বাহাদুর সচকিত হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! কিন্তু আমার তো অতটা মনে হল না। অবশ্য অনেকগুলো টাকা গেছে—'

'টাকা যাওয়াটা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর।'

'তবে?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার বিশ্বাস হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আমরা দু'জনেই চমকিয়া উঠিলাম। কুমার বলিলেন, 'সে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই মনে হচ্ছে। আশা করি একথা শোনবার পর আমাকে সহজে ক্ষমা করতে পারবেন।'

কুমার উদ্বিগ্নমুখে বলিলেন, 'না না, ক্ষমার কোনো কথাই উঠছে না। আপনাকে ছেড়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। একটা লোক যদি খুন হয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুনই হয়েছে এমন কথা আমি বলছি না। তবে সে বেঁচে নেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যা হোক, ও আলোচনা আরও প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত মুলতুবি থাক। আপনি কাল আসবেন তো? তাহলে আমাদের সুটকেসগুলোও সঙ্গে করে আনবেন। আচ্ছা—আজ বেরিয়ে পড়ুন—পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে।'

কুমারের মোটর বাহির হইয়া যাইবার পর আমরা বাড়ির দিকে ফিরিলাম। ফটক হইতে বাড়ির সদর প্রায় একশত গজ দূরে, মধ্যের বিস্তৃত ব্যবধান নানা জাতীয় ছোট বড় গাছপালায় পূর্ণ। মাঝে মাঝে লোহার বেঞ্চি পাতিয়া বিশ্রামের স্থান করা আছে।

দেওয়ানের ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বাগানে প্রবেশ করিলাম। শীতকালের দীর্ঘ গোধূলি তখন নামিয়া আসিতেছে। অবসন্ন দিবার শেষ রক্তিম আভা পশ্চিমে জঙ্গলের মাথায় অলক্ষ্যে সংকুচিত হইয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ চিন্তিত নতমুখে পকেটে হাত পুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছিল; চিন্তার ধারা তাহার কোন্ সর্পিল পথে চলিয়াছে বুঝিবার উপায় ছিল না। হরিনাথ মাস্টারের ঘরে সে এমন কি পাইয়াছে যাহা হইতে তাহার মৃত্যু অনুমান করা যাইতে পারে—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমিও একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। নিঃঝুম পাড়াগাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মাঝখানে এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, অন্তর হইতে যেন গ্রহণ

করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু তবু কিছুই বলা যায় না—গূঢ়নক্র হ্রদের উপরিভাগ বেশ প্রসন্নই দেখায়। ব্যোমকেশের সংগে অনেক রহস্যময় ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া একটু বুঝিয়াছিলাম যে, মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যেমন কঠিন, কেবলমাত্র বহিরবয়ব দেখিয়া কোনো ঘটনার গুরুত্ব নির্ণয় করাও তেমনি দুঃসাধ্য।

একটা ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল, তারপর ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল, 'জুতো পরে না যাবার একটা কারণ থাকতে পারে, জুতো পরে হাঁটলে শব্দ হয়। যে লোক দুপুর রাত্রে চুপি চুপি করে পালাচ্ছে তার পক্ষে খালি পায়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে জামা পরবে না কেন? চশমাটাও ফেলে যাবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'চশমা সম্বন্ধে তুমি বলতে পার, কিন্তু জামা পরেনি একথা জানলে কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গুণে দেখলুম সবগুলো জামা রয়েছে। কাজেই প্রমাণ হল যে জামা পরে যায়নি।'

আমি বলিলাম, 'তার কতগুলো জামা ছিল তার হিসাব তুমি পেলে কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর কাছ থেকে। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করনি, ভাণ্ডার থেকে মাস্টারকে দুটো গেঞ্জি আর দুটো জামা দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সে নিজে একটা ছেঁড়া কামিজ পরে এসেছিল। সেগুলো সব আলনায় টাঙানো রয়েছে।'

আমি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, 'তাহলে তুমি অনুমান কর যে—'

ব্যোমকেশ পশ্চিম আকাশের ক্ষীণ শশিকলার দিকে তাকাইয়া ছিল, হঠাৎ সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'ওহে, দেখেছ? সবে মাত্র শুক্লপক্ষ পড়েছে। সে রাত্রে কি তিথি ছিল বলতে পারো?'

তিথি নক্ষত্রের সংগে কোনো দিনই সম্পর্ক নাই, নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'বোধহয়—অমাবস্যা ছিল। না, চল পাঁজি দেখা যাক।' তাহার কণ্ঠস্বরে একটা নূতন উত্তেজনার আভাস পাইলাম।

চাঁদের দিকে চাহিয়া কবি এবং নবপ্রণয়ীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে জানিতাম; কিন্তু ব্যোমকেশের মধ্যে কবিত্ব বা প্রেমের বাষ্পটুকু পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও সে চাঁদ দেখিয়া এমন উতলা হইয়া উঠিল কেন বুঝিলাম না। যা হোক, তাহার ব্যবহার অধিকাংশ সময়েই বুঝিতে পারি না—ওটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তাই সে যখন ফিরিয়া বাড়ির অভিমুখে চলিল তখন আমিও নিঃশব্দে তাহার সহগামী হইলাম।

আমরা বাগানের যে অংশটায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, সেখান হইতে বাড়ির ব্যবধান পঞ্চাশ গজের বেশী হইবে না। সিধা যাইলে মাঝে কয়েকটা বড় বড় ঝাউয়ের ঝোপ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। ঝাউয়ের ঝোপগুলা বাগানের কিয়দংশ ঘিরিয়া যেন পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

ঘাসের উপর দিয়া নিঃশব্দপদে আমরা প্রায় ঝাউ ঝোপের কাছে পৌঁছিয়াছি, এমন সময় ভিতর হইতে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ পাইয়া আমাদের গতি আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া আমাকে নীরব থাকিবার সংকেত জানাইতেছে।

কান্নার ভিতর হইতে একটা ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম—'বাবু, এই অনাদি সরকার আপনাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে—পুরনো চাকর বলে আমাকে দয়া করুন। মা-ঠাকরুণ ভুল বুঝেছেন। আমার মেয়ে অপরাধী—কিন্তু আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, ও মহাপাপ আমরা করিনি।'

কিছুক্ষণ আর কোনো শব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবুর কড়া কঠিন স্বর শুনা গেল—'ঠিক বলছ? তোমরা মারোনি?'

'ধর্ম জানেন হুজুর। আপনি মালিক—দেবতা, আপনার কাছে যদি মিথ্যে কথা বলি

তবে যেন আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়।'

আবার কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নাই, তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'কিন্তু রাধাকে আর এখানে রাখা চলবে না। কালই তাকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কর। একথা যদি জানাজানি হয় তখন আমি আর দয়া করতে পারব না—এমনিতেই বাড়িতে অশান্তির শেষ নেই।'

অনাদি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে হুজুর, কালই তাকে আমি কাশী পাঠিয়ে দেব; সেখানে তার এক মাসী থাকে—'

'বেশ—যদি খরচা চালাতে না পারো—'

ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল। পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা সরিয়া গেলাম।

মিনিট পনেরো পরে অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া কালীগতিবাবু একজন নিম্নতন কর্মচারীর সহিত কথা বলিতেছিলেন, বেবি তাঁহার হাত ধরিয়া আব্দারের সুরে কি একটা উপরোধ করিতেছিল—তাহার কথার খানিকটা শুনিতে পাইলাম, 'একবারটি ডাকো না—'

কালীগতি একটু বিরত হইয়া বলিলেন, 'আঃ পাগ্‌লি—এখন নয়।'

বেবি অনুনয় করিয়া বলিল, 'না দেওয়ানদাদু, একবারটি ডাকো, ঐ ওঁরা শুনবেন।' বলিয়া আমাদের নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

কালীগতি আমাদের দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, যে আমলাটি দাঁড়াইয়া ছিল তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, প্রশান্ত হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগানে বেড়াচ্ছিলেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ।—বেবি কি বলছে? কাকে ডাকতে হবে?'

কালীগতি মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'ওর যত পাগলামি। এখন শেয়াল-ডাক ডাকতে হবে।'

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, 'সে কি রকম?'

কালীগতি বেবির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'এখন কাজের সময়, এখন বিরক্ত করতে নেই। যাও—মা'র কাছে গিয়ে একটু পড়তে বসো গে।'

বেবি কিন্তু ছাড়িবার পাত্রী নয়, সে তাঁহার আঙুল মুঠি করিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'না দাদু, একবারটি—'

অগত্যা কালীগতি চুপি চুপি তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, 'তুমি যখন ঘুমুতে যাবে তখন শোনাব—কেমন? এখন যাও লক্ষ্মী দিদি আমার।'

বেবি খুশী হইয়া বলিল, 'নিশ্চয় কিন্তু! তা না হ'লে আমি ঘুমুব না।'

'আচ্ছা বেশ।'

বেবি প্রস্থান করিলে কালীগতি বলিলেন, 'এইমাত্র থানা থেকে খবর নিয়ে লোক ফিরে এল—মাস্টারের কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি।'

'ও!' ব্যোমকেশ একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'অনাদি বলে কোনো কর্মচারী আছে কি?'

'আছে। অনাদি জমিদার বাড়ির সরকার।' বলিয়া কালীগতি উৎসুক নেত্রে তাহার পানে চাহিলেন।

ব্যোমকেশ যেন একটু চিন্তা করিয়া বলিল, 'তাকে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। সে কি আমলাদের পাড়াতেই থাকে?'

কালীগতি বলিলেন, 'না। সে বহুকালের পুরনো চাকর। বাড়ির পিছন দিকে আস্তাবলের লাগাও কতকগুলো ঘর আছে, সেই ঘরগুলো নিয়ে সে থাকে।'

'একলা থাকে?'

'না, তার এক বিধবা মেয়ে আর স্ত্রী আছে। মেয়েটি ক'দিন থেকে অসুখে ভুগছে; অনাদিকে বললুম কবিরাজ ডাকো, তা সে রাজী নয়। বললে, আপনি সেরে যাবে।—কেন

বলুন দেখি?'

'না—কিছু নয়। কাছে পিঠে কারা থাকে তাই জানতে চাই। অন্যান্য আমলারা বুঝি হাতার বাইরে থাকে?'

'হ্যাঁ, তাদের জন্যে একটু দূরে বাসা তৈরী করিয়ে দেওয়া হয়েছে—সবসুদ্ধ সাত-আট ঘর আমলা আছে। শহর থেকে যাতায়াত করলে সুবিধা হয় না, তাই কর্তার আমলেই তাদের জন্যে একটা পাড়া বসানো হয়েছিল।'

'শহর এখান থেকে কতদূর?'

'মাইল পাঁচেক হবে। সামনের রাস্তাটা সিধা পূব দিকে শহরে গিয়েছে।'

এই সময় হিমাংশুবাবু বাড়ির ভিতর হইতে আসিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, 'আসুন ব্যোমকেশবাবু, আমার অস্ত্রাগার আপনাদের দেখাই।'

আমরা সাগ্রহে তাঁহার অনুসরণ করিলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান আহ্নিক করিবার সময় উপস্থিত বলিয়া খড়ম পায়ে অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন।

হিমাংশুবাবু একটি মাঝারি আয়তনের ঘরে আমাদের লইয়া গেলেন। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলের উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। দেখিলাম, মেঝেয় বাঘ ভাল্লুক ও হরিণের চামড়া বিছানো রহিয়াছে; দেওয়ালের ধারে ধারে কয়েকটি আলমারি সাজানো। হিমাংশুবাবু একে একে আলমারিগুলি খুলিয়া দেখাইলেন, নানাবিধ বন্দুক পিস্তল ও রাইফেলে আলমারি-গুলি ঠাসা। এই হিংস্র অস্ত্রগুলির প্রতি লোকটির অদ্ভুত স্নেহ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। প্রত্যেকটির গুণাগুণ—কোনটির দ্বারা কবে কোন্ জন্তু বধ করিয়াছেন, কাহার পাল্লা কতখানি, কোন্ রাইফেলের গুলি বামদিকে ঈষৎ প্রক্ষিপ্ত হয়—এ সমস্ত তাঁহার নখদর্পণে। এই অস্ত্রগুলি তিনি প্রাণান্তেও কাহাকেও ছুঁইতে দেন না; পরিষ্কার করা, তেল মাখানো সবই নিজে করেন।

অস্ত্র দেখা শেষ হইলে আমরা সেই ঘরেই বসিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলাম। নানা বিষয়ের কথাবার্তা হইল। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একই মানুষকে এত বিভিন্ন রূপে দেখা যায় যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে একটা অভ্রান্ত ধারণা করিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু কচিৎ স্বভাবছদ্মবেশী মানুষের মন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলে। এই ঘরে বসিয়া আয়াসহীন অনাড়ম্বর আলোচনার ভিতর দিয়া হিমাংশুবাবুর চিত্তটিও যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধরা দিল। লোকটি যে অতিশয় সরল চিত্ত—মনটিও তাঁহার বন্দুকের গুলির মত একান্ত সিধা পথে চলে, এ বিষয়ে অন্তত আমার মনে কোনো সন্দেহ রহিল না।

আমাদের সঞ্চরমান আলোচনা নানা পথ ঘুরিয়া কখন অজ্ঞাতসারে বিষয় সম্পত্তি পরিচালনা, দেশের জমিদারের অবস্থা ইত্যাদি প্রসঙ্গের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিল। হিমাংশু-বাবু এই সূত্রে নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। প্রজাদের সঙ্গে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া নিয়ত সংঘর্ষে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জমিদারীর আয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, অথচ মামলা মোকদ্দমায় খরচের অন্ত নাই; ফলে, এই কয় বছরে ঋণের মাত্রা প্রায় লক্ষের কোঠায় ঠেকিয়াছে। নিজের বিষয় সম্পত্তির সম্বন্ধে এই সব গুহ্য কথা তিনি অকপটে প্রকাশ করিলেন। দেখিলাম, জমিদারী সংক্রান্ত অশান্তি তাঁহাকে বিষয় সম্পত্তির প্রতি আরো বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিয়াছে। বিপদের গুরুত্ব অনভিজ্ঞতাবশতঃ ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না, তাই মাঝে মাঝে অনির্দিষ্ট আতঙ্কে মন শঙ্কিত হইয়া উঠে; তখন সেই শঙ্কাকে তাড়াইবার জন্য প্রিয় ব্যসন শিকারের প্রতি আরো আগ্রহে ঝুঁকিয়া পড়েন। তাঁহার মনের অবস্থা বর্তমানে এইরূপ।

কথায়বার্তায় রাত্রি সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। অতঃপর অন্দর হইতে আহারের ডাক আসিল। এই সময় অনাদি সরকারকে দেখিলাম; সে আমাদের ডাকিতে আসিয়াছিল। লোকটির বয়স বছর পঞ্চাশ হইবে; অত্যন্ত শীর্ণ কোলকুঁজা চেহারা। গালের মাংস চুপসিয়া অভ্যন্তরের কোন অতল গহ্বরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, ঝাঁকড়া গোঁফ ওষ্ঠাধর

লঙ্ঘন করিয়া চিবুকের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। চোখে একটা অস্বচ্ছন্দ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি —যেন কোনো দারুণ দুষ্কৃতি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে সর্বদা সশঙ্ক হইয়া আছে।

ব্যোমকেশ তাহাকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আপাদমস্তক দেখিয়া লইল। তারপর আমরা তিনজনে তাহাকে অনুসরণ করিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলাম।

আহারাদির পর একজন ভৃত্য আমাদের পথ দেখাইয়া শয়নকক্ষে লইয়া গেল। ভৃত্যটির নাম ভুবন—সেই হিমাংশুবাবুর খাস বেয়ারা। শয়নকক্ষে ইজিচেয়ারে বসিয়া আমরা সিগারেট ধরাইলাম; ভুবন মশারি ফেলিয়া, জলের কুঁজা হাতের কাছে রাখিয়া, ঘরের এটা ওটা ঝাড়িয়া ঝাড়ন স্কন্ধে প্রস্থান করিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি তো হরিনাথ মাস্টারকে ছ'মাস ধরে দেখেছ, সে কি সব সময় চশমা পরে থাকত?'

আমরা যে চুরির তদন্ত করিতে আসিয়াছি তাহা ভুবন বোধকরি জানিত, তাই কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া সে উৎসুকভাবে বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, চব্বিশ ঘণ্টাই তো চশমা পরে থাকতেন। একদিন চশমা না পরে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। বিনা চশমায় তিনি এক-পা চলতে পারতেন না বাবু।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আচ্ছা, তার জুতো ক'জোড়া ছিল বলতে পার?

ভুবন হাসিয়া বলিল, 'জুতো আবার ক'জোড়া থাকবে বাবু, এক জোড়া। তাও সরকার থেকে কিনিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যে-জোড়া পরে তিনি এসেছিলেন সে তো এমন ছেঁড়া যে কুকুরেও খায় না। আমরা সেই দিনই সে জুতো টান মেরে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।'

'বটে! আচ্ছা, মাস্টারের ঘরের দেয়ালে যে একটি মা-কালীর ছবি টাঙানো রয়েছে সেটা কি মাস্টার সঙ্গে করে এনেছিল?'

'আজ্ঞে না হুজুর, মাস্টারবাবু একটি খড়্‌কে কাঠিও সঙ্গে করে আনেননি। ও ছবি দেওয়ানজীর কাছ থেকে মাস্টারবাবু একদিন এনে নিজের ঘরে টাঙিয়েছিলেন।'

'বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।'

ভুবন জিজ্ঞাসা করিল, 'আর কিছু চাই না হুজুর?'

'না। ভাল কথা, একটা কাজ করতে পার? বাড়িতে পাঁজি আছে নিশ্চয়, একবার আনতে পার?'

ভুবন বোধকরি মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। কিন্তু সে জমিদার বাড়ির লেফাফা-দুরস্ত চাকর, সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিল, 'এখনি কি চাই হুজুর?'

'এখনি হলে ভাল হয়।'

'যে আজ্ঞে—এনে দিচ্ছি।'

ভুবন বাহির হইয়া গেল। আমরা নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। পাঁচ মিনিট কাটিয়া গেল।

তারপর, হঠাৎ অতি সন্নিকটে একটানা বিকট একটা আর্তনাদ শুনিয়া আমরা ধড়মড় করিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু তখনি বুঝিলাম, অনৈসর্গিক কিছু নয়—শেয়াল ডাকিতেছে। পাঁচ-ছয়টা শৃগাল একত্র হইয়া নিকটেরই কোনো স্থান হইতে সম্মিলিত ঊর্ধ্বস্বরে যাম ঘোষণা করিতেছে। এত নিকট হইতে শব্দটা আসিল বলিয়া হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়াছিলাম।

এই সময় ভুবন পাঁজি হাতে ফিরিয়া আসিল। আমি বলিয়া উঠিলাম, 'ও কি হে! বাড়ির এত কাছে শেয়াল ডাকছে?'

শেয়ালের ডাক তখন থামিয়াছে, ভুবন হাসি চাপিয়া বলিল, 'আসল শেয়াল নয় হুজুর। বৌবিদিদি আজ সন্ধ্যে থেকে বায়না ধরেছিলেন দেওয়ান ঠাকুরের কাছে শেয়াল ডাক শুনবেন। তাই তিনিই ডাকছেন।'

আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজ সন্ধ্যেবেলা বেবি বলছিল বটে। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতা তো দেওয়ানজীর! একেবারে অবিকল শেয়ালের ডাক, কিছু বোঝবার জো নেই!'

ভুবন বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। দেওয়ান ঠাকুর চমৎকার জন্তু-জানোয়ারের ডাক

ডাকতে পারেন।' বলিয়া পাঁজি ব্যোমকেশের পাশে টেবিলের উপর রাখিল।

ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন হঠাৎ পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে; চোখের দৃষ্টি স্থির, সর্বাঙ্গের পেশী টান হইয়া শক্ত হইযা আছে। আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, 'কি হে?'

ব্যোমকেশের চমক ভাঙিল। চোখের সম্মুখ দিয়া হাতটা একবার চালাইয়া বলিল, 'কিছু না।—এই যে পাঁজি এনেছ? বেশ, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভুবন প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ পাঁজিটা তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল। খানিক পরে একটা পাতায় আসিয়া তাহার দৃষ্টি রুদ্ধ হইল। সেই পাতাটা পড়িয়া সে পাঁজি আমার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, 'এই দ্যাখ।'

মনে হইল, তাহার গলার স্বর উত্তেজনায় ঈষৎ কাঁপিয়া গেল।

পাঁজির নির্দিষ্ট পাতাটা পড়িলাম। দেখিলাম, যে-রাত্রে মাস্টার নিরুদ্দেশ হইয়া যায় সে-রাত্রিটা ছিল অমাবস্যা।

পরদিন সকাল সাতটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম—তখনো সমস্ত বাড়িটা সুপ্ত। একজন ভৃত্য বারান্দা ঝাঁট দিতেছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে শীতকালে বেলা আটটা সাড়ে আটটার পূর্বে কেহ শয্যা ত্যাগ করে না। ইহাই এ বাড়ির রেওয়াজ।

এই দেড় ঘণ্টা সময় কি করিয়া কাটানো যায়? আকাশে একটু কুয়াশার আভাস ছিল; সূর্যের আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই। আমার মন উসখুস করিয়া উঠিল, বলিলাম, 'চল ব্যোমকেশ, এখন তো তোমার কোনো কাজ হবে না; জঙ্গলে গিয়ে দু'চারটে পাখী মারা যাক। তারপর এদের ঘুম ভাঙতে ভাঙতে ফিরে আসা যাবে।'

প্রথম বন্দুক চালাইতে শিখিয়া আগ্রহের মাত্রা কিছু বেশী হইয়াছিল, মনে হইতেছিল যাহা পাই তাহারই দিকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িয়া দিই। বিশেষতঃ কাল বন্দুক দুটা কুমার বাহাদুর এখানেই রাখিয়া গিয়াছিলেন, টোটাও কোটের পকেটে কয়েকটা অবশিষ্ট ছিল।

ব্যোমকেশ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল, 'চল।'

বন্দুক কাঁধে করিয়া বাহির হইলাম। যে চাকরটা ঝাঁট দিতেছিল তাহাকে প্রশ্ন করায় সে জঙ্গলে যাইবার রাস্তা দেখাইয়া দিল; বলিল, এই পথে সিধা যাইলে বালির পাশ দিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিতে পারিব। আমরা সবুজ ঘাসে ভরা চারণভূমির উপর দিয়া চলিলাম।

কুয়াশার জন্য ঘাসে শিশির পড়ে নাই, জুতা ভিজিল না। চলিতে চলিতে দেখিলাম, সম্মুখে এক মাইল দূরে বনের গাছগুলি গাঢ় বর্ণে আঁকা রহিয়াছে, তাহার কোলের কাছে বালু-বেলা অর্ধচন্দ্রাকারে পড়িয়া আছে—দূর হইতে অস্পষ্ট আলোকে দেখিয়া মনে হয় যেন একটা লম্বা খাল জঙ্গলের পাদমূল বেষ্টন করিয়া পড়িয়া আছে। আমরা যেদিকে চলিয়াছিলাম সেইদিকে উহার দক্ষিণ প্রান্তটা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া একটা অনুচ্চ পাড়ের কাছে আসিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে; অতঃপর দক্ষিণ দিকে আর বালি নাই।

মিনিট পনেরো হাঁটিবার পর পূর্বোক্ত পাড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম; দেখিলাম পাড় একটা নয়—দুইটা। কোনো কালে হয়তো বালুর দক্ষিণ দিকে জলরোধ করিবার জন্য একটা উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল—বর্তমানে সেটা দ্বিধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে আন্দাজ পনেরো হাত চওড়া একটা প্রণালী একদিকের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠের সহিত অপর দিকের বালুর চড়ার সংযোগ স্থাপন করিয়াছে।

আমরা নিকটতর ঢিবিটার উপর উঠিলাম। সম্মুখে নীচের দিকে চাহিয়া দেখিলাম গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত একটা ক্ষীণ রেখা ঘাসের সীমানা নির্দেশ করিয়া দিতেছে—তাহার পরেই অনিশ্চিত ভয়সঙ্কুল বালুর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঠিক কোনখানটার

সেই ভয়ানক চোরাবালি কে বলিতে পারে?

বাঁধের উপর উঠিয়া যে বস্তুটি প্রথমে চোখে পড়িয়াছিল তাহার কথা এখনো বলি নাই। সেটি একটি অতি জীর্ণ ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘর। বাঁধের ভাঙ্গনের দক্ষিণ মুখটি আগুলিয়া এই কুটীর পড়ি পড়ি হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে—উচ্চতা এত কম যে পাড়ের আড়াল হইতে তাহার মট্‌কা দেখা যায় না। ছিটা বেড়ার দেওয়াল, মাটি লেপিয়া জলবৃষ্টি নিবারণের চেষ্টা হইয়াছিল; এখন প্রায় সর্বত্র মাটি খসিয়া গিয়া জীর্ণ উই-ধরা হাড়-পাঁজর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরের দু'চালা খড়ের চালটিও প্রায় উলঙ্গ—খড় পচিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে, কোথায়ও বা গলিত অবস্থায় ঝুলিতেছে। বোধকরি চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ইহাতে কেহ বাস করে নাই।

বনের ধারে লোকালয় হইতে বহু দূরে এইরূপ নিঃসঙ্গ একটি কুটীর দেখিয়া আমাদের ভারি বিস্ময় বোধ হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই তো! চল, ঘরটা দেখা যাক।'

আমরা ফিরিয়া বাঁধ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় আকাশে শাঁই শাঁই শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি একঝাঁক বন-পায়রা মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে বন্দুকে টোটা ভরিয়া ফায়ার করিল। আমার একটু দেরী হইয়া গেল, যখন বন্দুক তুলিলাম তখন পায়রার ঝাঁক পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের আওয়াজে একটা পায়রা নিম্নে বালুর উপর পড়িয়াছিল। সেটাকে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মুখ দিয়া নামিতে গিয়া দেখিলাম সে-পথে নামা নিরাপদ নয়—পথ এত বেশী ঢালু যে পা হড়্‌কাইয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'এত তাড়াতাড়ি কিসের হে! মরা পাখী তো আর উড়ে পালাবে না। চল, ঐ দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক—কুঁড়ে ঘরটাও দেখা হবে।

তখন যে পথে উঠিয়াছিলাম সেই পথে নামিয়া বাঁধের ভাঙ্গনের মুখে উপস্থিত হইলাম। কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইটি দ্বার আছে, যেটা দিয়া প্রবেশ করিলাম তাহার কবাট নাই, কিন্তু যেটা বালুর দিকে সেটাতে এখনো একটা বাখারির আগড় লাগিয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মনুষ্যের ব্যবহারের উপযোগী কিছুই নাই। মেঝে বোধহয় পূর্বে গোময়-লিপ্ত ছিল, এখন তাহার উপর ঘাস গজাইয়াছে—পচা খড় চাল হইতে পড়িয়া স্থানটাকে আকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটি চওড়ায় ছয় হাতের বেশী হইবে না কিন্তু দৈর্ঘ্যে দুই বাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটা সমস্ত জুড়িয়া আছে। এদিক হইতে বালুর দিকে যাইতে হইলে ঘরের ভিতর দিয়া যাইতে হয়; অন্য পথ নাই।

ব্যোমকেশ ঘরের অপরিষ্কার মেঝে ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'সম্প্রতি এ ঘরে কোনো মানুষ এসেছে। এখানে খড়গুলো চেপে গেছে—দেখেছ? ঐ কোণে কিছু একটা টেনে সরিয়েছে। এ ঘরে মানুষের যাতায়াত আছে।'

মানুষের যাতায়াত থাকা কিছু বিচিত্র নয়। রাখাল বালকেরা এদিকে গরু চরাইতে আসে, হয়তো এই ঘরের মধ্যে খেলা করিয়া তাহারা দ্বিপ্রহর যাপন করে। 'তা হবে' বলিয়া আমি অন্য দ্বারের আগল খুলিয়া বালির দিকে বাহির হইলাম। মনটা পাখীর দিকেই পড়িয়া ছিল।

কিন্তু পাখী কোথায়? পাখীটা সম্মুখেই পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করিয়াছিলাম; অথচ কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র বিদ্যমান নাই। আমি আশ্চর্য হইয়া ব্যোমকেশকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওহে, তোমার পাখী কৈ? সত্যিই কি মরা পাখী উড়ে গেল নাকি?'

ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। সেও চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু পাখীর একটা পালকও কোথাও দেখা গেল না। ব্যোমকেশ আস্তে আস্তে বলিল, 'তাই তো।

একটু এগিয়ে দেখা যাক, হয়তো আশেপাশে কোথাও আছে।' বলিয়া আমি বালুর উপর পদার্পণ করিতে যাইব, ব্যোমকেশের একটা হাত বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া আমার কোটের কলার চাপিয়া ধরিল।

'থামো—'

'কি হল?' আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম।

'বালির ওপর পা বাড়িও না।'

সদ্য-ছোঁড়া কার্তুজের শূন্য খোলটা ব্যোমকেশ পকেটেই রাখিয়াছিল, এখন সেটা বাহির করিল। সম্মুখদিকে প্রায় বিশ হাত দূরে বালুর উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'ভাল করে লক্ষ্য কর।' চাপা উত্তেজনায় তাহার স্বর প্রায় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

লাল রঙের খোলটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। কি সর্বনাশ!

কার্তুজ খোলের ভারী দিকটা নামিয়া গিয়া সেটা খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তারপর নিঃশব্দে বালুর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই চোরাবালি! এবং ইহাতেই আমি গবেটের মত এখনি পদার্পণ করিতে যাইতেছিলাম। ব্যোমকেশ বাধা না দিলে আজ আমার কি হইত ভাবিয়া শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল, তাহার ওষ্ঠাধর বিভক্ত হইয়া দাঁতগুলো ক্ষণকালের জন্য দেখা গেল। সে বলিল, 'দেখলে! উঃ, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!'

আমি কম্পিতস্বরে বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

আমার কথা যেন শুনিতেই পায় নাই এমনি ভাবে সে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল, 'কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!' দেখিলাম, তাহার মুখের রং ফ্যাকাসে হইয়া গেলেও চোখের দৃষ্টি ও চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর ব্যোমকেশ কুটীরের চাল হইতে কয়েক টুকরা বাখারি ভাঙিয়া আনিল, একটি একটি করিয়া সেগুলি বালুর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। দেখা গেল, ঘাসের সীমানার প্রায় দশ হাত দূর হইতে চোরাবালি আরম্ভ হইয়াছে। কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে তাহা জানা গেল না, কারণ যতদূর পর্যন্ত বাখারি ফেলা হইল সব বাখারিই ডুবিয়া গেল। পুরাতন বাঁধের অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাহুবেষ্টন এই চোরাবালিকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। অতীত যুগের কোনো সদাশয় জমিদার হয়তো প্রজাদের জীবন রক্ষার্থেই এই বাঁধ করাইয়াছিলেন, তারপর কালক্রমে বাঁধও ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যও লোকে ভুলিয়া গিয়াছে।

চোরাবালির পরিধি নির্ণয় যথাসম্ভব শেষ করিয়া আমরা আবার কুটীরের ভিতর দিয়া বাহিরে আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, আমরা চোরাবালির সন্ধান পেয়েছি, একথা যেন ঘুণাক্ষরে কেউ না জানতে পারে। বুঝলে?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন কুটীরের সম্মুখে কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাঃ! ঘরটি কি চমৎকার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ? পিছনে পনের হাত দূরে চোরাবালি, সামনে বিশ হাত দূরে গভীর বন—দু'ধারে বাঁধ। কে এটি তৈরী করেছিল জানতে ইচ্ছে করে।'

কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল। আমি বনের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, গাছের ছায়ার নীচে দিয়া একজন হাফ্-প্যান্ট পরিহিত লোক, কাঁধে বন্দুক লইয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে আমাদের দিকে আসিতেছে। গাছের ছায়ার বাহিরে আসিলে দেখিলাম, হিমাংশুবাবু।

হিমাংশুবাবু দূর হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

ব্যোমকেশ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'অজিত, মনে থাকে যেন—চোরাবালি সম্বন্ধে কোনো কথা নয়।' তারপর গলা চড়াইয়া বলিল,—'অজিতের পাল্লায় পড়ে পাখী শিকারে বেরিয়ে পড়েছিলুম। পাখীরা অবশ্য বেশ অক্ষত শরীরে আছে, কিন্তু আর্মস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে অজিত যেরকম অভিযান আরম্ভ করেছে, শীগ্গির পুলিসের হাতে পড়বে।'

আমি বলিলাম, 'এবার কলকাতায় গিয়েই একটা বন্দুকের লাইসেন্স কিনব।'

হিমাংশুবাবু আমাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বন্দুক নামাইয়া বলিলেন, 'তারপর,

কিছু পেলেন?'

'কিছু না। আপনি একেবারে রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন যে!' বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহার অস্ত্রটির দিকে তাকাইল।

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—সকালে উঠেই শুনলুম জঙ্গলে নাকি বাঘের ডাক শোনা গেছে। তাই তাড়াতাড়ি রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম; চাকরটা বললে আপনারা এদিকে এসেছেন—একটু ভাবনা হল। কারণ, হঠাৎ যদি বাঘের মুখে পড়েন তাহলে আপনাদের পাখীমারা বন্দুক আর দশ নম্বরের ছর্‌রা কোনো কাজেই লাগবে না।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বাঘ এসেছে কার মুখে শুনলেন?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'ঠিক যে এসেছেই একথা জোর করে কেউ বলতে পারছে না। আমার গয়লাটা বলছিল যে গরুগুলো সমস্ত রাত খোঁয়াড়ে ছটফট করেছে, তাই তার আন্দাজ যে হয়তো তারা বাঘের গন্ধ পেয়েছে। তা ছাড়া, দেওয়ানজী বলছিলেন তিনি নাকি অনেক রাত্রে বাঘের ডাকের মতন একটা আওয়াজ শুনতে পেয়েছেন। যা হোক, চলুন এবার ফেরা যাক। এখনো চা খাওয়া হয়নি।'

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে আটটা। চলুন। আচ্ছা, এই পোড়ো ঘরটা কার? এরকম নির্জন স্থানে কে এই ঘর তৈরী করেছিল? কেনই বা করেছিল? কিছু জানেন কি?'

হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'জানি বৈকি। চলুন, যেতে যেতে বলছি।'

তিনজনে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। হিমাংশুবাবু চলিতে চলিতে বলিলেন, 'বছর চার-পাঁচ আগে—ঠিক ক'বছর হল বলতে পারছি না, তবে বাবা মারা যাবার পর—হঠাৎ একদিন আমার বাড়িতে এক বিরাট তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এসে হাজির হলেন। ভয়ঙ্কর চেহারা, মাথায় জটার মত চুল, অজস্র গোঁফদাড়ি, পাঁচ হাত লম্বা এক জোয়ান; পরনে স্রেফ একটি নেংটি, চোখ দুটো লাল টক্‌টক্‌ করছে—আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে 'তুইতোকারি' করে বললেন যে তিনি কিছুদিন আমার আশ্রয়ে অতিথি থেকে সাধনা করতে চান।

'সাধু-সন্ন্যাসীর উপর আমার বিশেষ ভক্তি নেই—ও সব বুজরুকি আমার সহ্য হয় না; বিশেষতঃ ভেকধারীদের ঔদ্ধত্য আর স্পর্ধা আমি বরদাস্ত করতে পারি না। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে দূর করে দিচ্ছিলুম; কিন্তু দেওয়ানজী মাঝ থেকে বাধা দিলেন। তাঁর বোধহয় তান্ত্রিক ঠাকুরকে দেখেই খুব ভক্তি হয়েছিল। তিনি আমাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, প্রত্যবায় অভিসম্পাত প্রভৃতির ভয়ও দেখালেন। কিন্তু আমি ঐ উলঙ্গ লোকটাকে বাড়িতে থাকতে দিতে কিছুতেই রাজী হলুম না। তখন দেওয়ানজী তান্ত্রিক ঠাকুরের সঙ্গে মোকাবিলা করে ঠিক করলেন যে তিনি আমার জমিদারীর মধ্যে কোথাও কুঁড়ে বেঁধে থাকবেন—আর ভাণ্ডার থেকে তাঁর নিয়মিত সিধে দেওয়া হবে। দেওয়ানজীর আগ্রহ দেখে আমি অগত্যা রাজী হলুম।

'বাবাজী তখন এই জায়গাটি পছন্দ করে কুঁড়ে বাঁধলেন। মাস ছয়েক এখানে ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তবে দেওয়ানজী প্রায়ই যাতায়াত করতেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভক্তি এতই বেড়ে গিয়েছিল যে শুনতে পাই তিনি বাবাজীর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অবশ্য উনি আগেও শাক্তই ছিলেন কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

'যা হোক, বাবাজী একদিন হঠাৎ সরে পড়লেন। সেই থেকে ও ঘরটা খালি পড়ে আছে।'

গল্প শুনিতে শুনিতে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলাম। চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল। বারান্দায় টেবিল পাতিয়া তাহার উপরে চা, কচুরি, পাখীর মাংসের কাটলেট, ডিমের অমলেট ইত্যাদি বহুবিধ লোভনীয় আহার্য ভুবন খানসামা সাজাইয়া রাখিতেছিল। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ার টানিয়া লইয়া উক্ত আহার্য বস্তুর সৎকারে প্রবৃত্ত হইলাম।

সৎকার কার্য অল্পদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। কুমার ত্রিদিব অবতরণ করিলেন।

মোটরের পশ্চাতে আমাদের সুটকেস কয়টা বাঁধা ছিল, সেগুলা নামাইবার হুকুম দিয়া কুমার আমাদের মধ্যে আসিয়া বসিলেন; ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কন্দূর?'

ব্যোমকেশ অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'বেশী দূর নয়। তবে দু'এক দিনের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে আশা করি। আজ একবার শহরে যাওয়া দরকার। পুলিসের কাছ থেকে কিছু খোঁজ খবর নিতে হবে।'

কুমার ত্রিদিব বলিলেন, 'বেশ তো, চলুন আমার গাড়িতে ঘুরে আসা যাক। এখন বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে ফেরা যাবে।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার একটু সময় লাগবে; সন্ধ্যের আগে ফেরা হবে না। একেবারে খাওয়া দাওয়া করে বেরুলে বোধহয় ভাল হয়।'

কুমার বলিলেন, 'সে কথাও মন্দ নয়। হিমাংশু, তুমি চল না হে, খুব খানিক হৈ হৈ করে আসা যাক। অনেকদিন শহরে যাওয়া হয়নি।'

হিমাংশুবাবু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, 'না ভাই, আমার আজ আর যাওয়ার সুবিধা হবে না। একটু কাজ—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, আপনার গিয়ে কাজ নেই। অজিতও থাকুক। আমরা দু'জনে গেলেই যথেষ্ট হবে।' বলিয়া কুমারের দিকে তাকাইল। তাহার চাহনিতে বোধহয় কোনো ইশারা ছিল, কারণ কুমার বাহাদুর পুনরায় কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলেন।

বেলা এগারোটার সময় ব্যোমকেশ কুমারের গাড়িতে বাহির হইয়া গেল। যাইবার আগে আমাকে বলিয়া গেল, 'চোখ দুটো বেশ ভাল করে খুলে রেখো। আমার অবর্তমানে যদি কিছু ঘটে লক্ষ্য করো।'

তাহাদের গাড়ি ফটক পার হইয়া যাইবার পর হিমাংশুবাবুর মুখ দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন পরিত্রাণের আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছেন। আমরা তাঁহার বাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হওয়াতে তিনি যে সুখী হইতে পারেন নাই, এই সন্দেহ আবার আমাকে পীড়া দিতে লাগিল।

দেওয়ান কালীগতিও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি; আমাদের মুখের ভাব হইতে মনের কথা আন্দাজ করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি আমাকে ডাকিয়া লইয়া বারান্দায় চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা বিষয়ে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। হিমাংশুবাবুও কথাবার্তায় যোগ দিলেন। ব্যোমকেশ সম্বন্ধেই আলোচনা বেশী হইল। ব্যোমকেশের কীর্তিকলাপ প্রচার করিতে আমি কোনদিনই পশ্চাৎপদ নই। সে যে কতবড় ডিটেক্‌টিভ তাহা বহু উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দিলাম। তাহার সাহায্য পাওয়া যে কতখানি ভাগ্যের কথা সে ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িলাম না। শেষে বলিলাম, 'হরিনাথ মাস্টার যে বেঁচে নেই একথা আর কেউ এত শীগগির বার করতে পারত না।'

দু'জনেই চমকিয়া উঠিলেন—'বেঁচে নেই!'

কথাটা বলিয়া ফেলা উচিত হইল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। ব্যোমকেশ অবশ্য বারণ করে নাই, তবু মনে হইল, না বলিলেই বোধহয় ভাল হইত। আমি নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া রহস্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালন করিলাম, বলিলাম, 'যথাসময় সব কথা জানতে পারবেন।'

অতঃপর বারোটা বাজিয়া গিয়াছে দেখিয়া আমরা উঠিয়া পড়িলাম। কালীগতি ও হিমাংশুবাবু আমার অনিচ্ছা লক্ষ্য করিয়া আর কোনো প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু হরিনাথের মৃত্যুসংবাদ যে তাঁহাদের দু'জনকেই বিশেষভাবে নাড়া দিয়াছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না।

দুপুরবেলাটা বোধ করি নিঃসঙ্গভাবে ঘরে বসিয়াই কাটাইতে হইত; কারণ হিমাংশু-বাবু আহারের পর একটা জরুরী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্দরমহলে প্রস্থান করিয়া-

ছিলেন। কিন্তু বেবি আসিয়া আমাকে সঙ্গদান করিল। সে আসিয়া প্রথমেই ব্যোমকেশের খোঁজ খবর লইল এবং সকালবেলা মেনির সন্তান প্রসবের জন্য আসিতে পারে নাই বলিয়া যথোচিত দুঃখ জ্ঞাপন করিল। তারপর আমাকে নানাপ্রকার বিচিত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ও নিজেদের পারিবারিক বহু গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া গল্প জমাইয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময় বেবি বলিল, 'মা আজ তিনদিন ভাত খাননি।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তাঁর অসুখ করেছে বুঝি?'

মাথা নাড়িয়া গম্ভীরমুখে বেবি বলিল, 'না, বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে।'

এবিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা ভদ্রোচিত হইবে কিনা ভাবিতেছি এমন সময় খোলা জানালা দিয়া দেখিলাম, একটা সবুজ রঙের সিডান বডির মোটর গ্যারাজের দিক হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। গাড়িখানি সাবধানে ফটক পার হইয়া শহরের দিকে মোড় লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। দেখিলাম, চালক স্বয়ং হিমাংশুবাবু। গাড়ির অভ্যন্তরে কেহ আছে কিনা দেখা গেল না।

বেবি আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'আমাদের নতুন গাড়ি।'

ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। হিমাংশুবাবু ঠিক যেন চোরের মত মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কোথায় গেলেন? সঙ্গে কেহ ছিল কি? তিনি গোড়া হইতেই আমাদের কাছে একটা কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের আগমন তাঁহার কোনো কাজে বাধা দিয়াছে; তাই তিনি ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন অথচ বাহিরে কিছু করিতে পারিতেছেন না—এই ধারণা ক্রমেই আমার মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। তবে কি তিনি হরিনাথের অন্তর্ধানের গূঢ় রহস্য কিছু জানেন? তিনি কি জানিয়া শুনিয়া কাহাকেও আড়াল করিবার চেষ্টা করিতেছেন? ভীত-দৃষ্টি রুগ্নকায় অনাদি সরকারের কথা মনে পড়িল। সে কাল প্রভুর পায়ে ধরিয়া কাঁদিতেছিল কি জন্য? 'ও মহাপাপ করিনি'—কোন্ মহাপাপ হইতে নিজেকে স্খালন করিবার চেষ্টা করিতেছিল!

বেবি আজ আবার একটা নূতন খবর দিল—হিমাংশুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলিতেছে। ঝগড়া এতদূর গড়াইয়াছে যে স্ত্রী তিনদিন আহার করেন নাই। কি লইয়া ঝগড়া? হরিনাথ মাস্টার কি এই কলহ-রহস্যের অন্তরালে লুকাইয়া আছে!

'তুমি ছবি আঁকতে জানো?' বেবির প্রশ্নে চিন্তাজাল ছিন্ন হইয়া গেল।

অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'জানি।'

ঝামর চুল উড়াইয়া বেবি ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথায় গেল ভাবিতেছি এমন সময় সে একটা খাতা ও পেন্সিল লইয়া ফিরিয়া আসিল। খাতা ও পেন্সিল আমার হাতে দিয়া বলিল, 'একটা ছবি এঁকে দাও না। খু—ব ভাল ছবি।'

খাতাটি বেবির অঙ্কের খাতা। তাহার প্রথম পাতায় পাকা হাতে লেখা রহিয়াছে, শ্রীমতী বেবিরাণী দেবী।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'একি তোমার মাস্টারমশায়ের হাতের লেখা?'

বেবি বলিল, 'হ্যাঁ।'

খাতার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বেশীর ভাগই উচ্চ গণিতের অঙ্ক; বেবির হাতে লেখা যোগ, বিয়োগ খুব অল্পই আছে। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম 'এসব অঙ্ক কে করেছে?'

বেবি বলিল, 'মাস্টারমশাই। তিনি খালি আমার খাতায় অঙ্ক করতেন।'

দেখিলাম, মিথ্যা নয়। খাতার অধিকাংশ পাতাই মাস্টারের কঠিন দীর্ঘ অঙ্কের অক্ষরে পূর্ণ হইয়া আছে। কি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। একটি ছোট মেয়েকে গণিতের গোড়ার কথা শিখাইতে গিয়া কলেজের শিক্ষিতব্য উচ্চ গণিতের অবতারণার সার্থকতা কি?

খাতার পাতাগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে একস্থানে দৃষ্টি পড়িল—

একটা পাতার আধখানা কাগজ কে ছিঁড়িয়া লইয়াছে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করিতে মনে হইল যেন পেন্সিল দিয়া খাতার উপর কিছু লিখিয়া পরে কাগজটা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কারণ, খাতার পরের পৃষ্ঠায় পেন্সিলের চাপা-দাগ অস্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে। আলোর সম্মুখে ধরিয়া নখচিহ্নের মত দাগগুলি পড়িবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পড়িতে পারিলাম না।

বেবি অধীর ভাবে বলিল, 'ও কি করছ। ছবি এঁকে দাও না!'

ছেলেবেলায় যখন ইস্কুলে পড়িতাম তখন এই ধরনের বর্ণহীন চিহ্ন কাগজের উপর ফুটাইয়া তুলিবার কৌশল শিখিয়াছিলাম, এখন তাহা মনে পড়িয়া গেল।

বেবিকে বলিলাম, 'একটা ম্যাজিক দেখবে?'

বেবি খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'হ্যাঁ—দেখব।'

তখন খাতা হইতে এক টুকরা কাগজ ছিঁড়িয়া লইয়া তাহার উপর পেন্সিলের শিষ ঘষিতে লাগিলাম; কাগজটা যখন কালো হইয়া গেল তখন তাহা সন্তর্পণে সেই অদৃশ্য লেখার উপর বুলাইতে লাগিলাম। ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্ যেমন রাসায়নিক জলে ধৌত করিতে করিতে তাহার ভিতর হইতে ছবি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে, আমার মৃদু ঘর্ষণের ফলেও তেমনি কাগজের উপর ধীরে ধীরে অক্ষর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সবগুলি অক্ষর ফুটিল না, কেবল পেন্সিলের চাপে যে অক্ষরগুলি কাগজের উপর গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছিল সেইগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ওঁ হ্রীং...ক্লীং...

রাত্রি ১১...৫...অম...পড়িবে।

অসম্পূর্ণ দুর্বোধ অক্ষরগুলার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ওঁ হ্রীং ক্লীং—বোধহয় কোনো মন্ত্র হইবে। কিন্তু সে যাহাই হোক, হস্তাক্ষর যে হরিনাথ মাস্টারের তাহাতে সন্দেহ রহিল না। প্রথম পৃষ্ঠার লেখার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম, অক্ষরের ছাঁদ একই প্রকারের।

বেবি ম্যাজিক দেখিয়া বিশেষ পরিতৃপ্ত হয় নাই; সে ছবি আঁকিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন তাহার খাতায় কুকুর বাঘ রাক্ষস প্রভৃতি বিবিধ জন্তুর চিত্তাকর্ষক ছবি আঁকিয়া তাহাকে খুশী করিলাম। মন্ত্র-লেখা কাগজটা আমি ছিঁড়িয়া লইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিলাম।

বেলা সাড়ে তিনটার সময় হিমাংশুবাবু ফিরিয়া আসিলেন। মোটর তেমনি নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া বাড়ির পশ্চাতে গ্যারাজের দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হিমাংশুবাবুর গলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম; তিনি ভুবন বেয়ারাকে ডাকিয়া চায়ের বন্দোবস্ত করিবার হুকুম দিতেছেন।

ব্যোমকেশ যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। কুমার গাড়ি হইতে নামিলেন না; ব্যোমকেশকে নামাইয়া দিয়া শরীরটা তেমন ভাল ঠেকিতেছে না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন ব্যোমকেশের অনারে আর একবার চা আসিল। চা পান করিতে করিতে কথাবার্তা আরম্ভ হইল। দেওয়ানজীও আসিয়া বসিলেন। ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হল?'

ব্যোমকেশ চায়ে চুমুক দিয়া বলিল, 'বিশেষ কিছু হল না। পুলিসের ধারণা হরিনাথ মাস্টারকে প্রজারা কেউ নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে।'

দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার তা মনে হয় না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। আমার ধারণা অন্য রকম।'

'আপনার ধারণা হরিনাথ বেঁচে নেই?'

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিতভাবে বলিল, 'আপনি কি করে বুঝলেন? ও, অজিত বলেছে। হ্যাঁ—আমার তাই ধারণা বটে। তবে আমি ভুলও করে থাকতে পারি।'

কিছুক্ষণ কোনো কথা হইল না। আমি অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া এমন কিছু বোধ হইল না যে সে আমার উপর চটিয়াছে; কিন্তু

মুখ দেখিয়া সকল সময় তাহার মনের ভাব বোঝা যায় না। কে জানে, হয়তো কথাটা ইহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া অন্যায় করিয়াছি, ব্যোমকেশ নির্জনে পাইলেই আমার মুণ্ড চিবাইবে।

কালীগতি হঠাৎ বলিলেন, 'আমার বোধ হয় আপনি ভুলই করেছেন ব্যোমকেশবাবু। হরিনাথ সম্ভবতঃ মরেনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ কালীগতির পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আপনি নতুন কিছু জানতে পেরেছেন?'

কালীগতি ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না—তাকে ঠিক জানা বলা চলে না; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐ বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ চমকিত হইয়া বলিল, 'বনের মধ্যে? এই দারুণ শীতে?'

'হ্যাঁ। বনের মধ্যে কাপালিকের ঘর বলে একটা কুঁড়ে ঘর আছে—রাত্রে বাঘ ভাল্লুকের ভয়ে সম্ভবতঃ সেই ঘরটায় লুকিয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'স্পষ্ট কোনো প্রমাণ পেয়েছেন কি?'

'না। তবে আমার স্থির বিশ্বাস সে ঐখানেই আছে।'

ব্যোমকেশ আর কিছু বলিল না।

রাত্রে শয়ন করিতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চোরাবালির কথাটাও চারিদিকে রাষ্ট্র করে দিয়েছ তো?'

'না না—আমি শুধু কথায় কথায় বলেছিলুম যে—'

'বুঝেছি।' বলিয়া সে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি তো ও কথা বলতে বারণ করনি।'

'তোমার মনের ভাব দেখছি রবিবাবুর গানের নায়কের মত—যদি বারণ কর তবে গাহিব না। এবং বারণ না করিলেই তারস্বরে গাহিব। যা হোক, আজ দুপুরবেলা কি করলে বল।'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ সত্যসত্যই চটে নাই; বোধহয় ভিতরে ভিতরে তাহার ইচ্ছা ছিল যে ও কথাটা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলি। অন্তত তাহার কাজের যে কোনো ব্যাঘাত হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহ।

আমি তখন দ্বিপ্রহরে যাহা যাহা জানিতে পারিয়াছি সব বলিলাম; মন্ত্র-লেখা কাগজটাও দেখাইলাম। কাগজটা ব্যোমকেশ মন দিয়া দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলিল, 'নূতন কিছুই নয়—এসব আমার জানা কথা। এই লেখাটার দ্বিতীয় লাইন সম্পূর্ণ করলে হবে—

'রাত্রি ১১টা ৪৫মিঃ গতে অমাবস্যা পড়িবে। অর্থাৎ হরিনাথও পাঁজি দেখেছিল।'

হিমাংশুবাবুর বহির্গমনের কথা শুনিয়া ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল, কোন মন্তব্য করিল না। আমি তখন বলিলাম, 'দ্যাখ ব্যোমকেশ, আমার মনে হয় হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে কিছু লুকোবার চেষ্টা করছেন। তুমি লক্ষ্য করেছ কি না জানি না, কিন্তু আমাদের অতিথিরূপে পেয়ে তিনি খুব খুশী হননি।'

ব্যোমকেশ মৃদুভাবে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'ঠিক ধরেছ। হিমাংশুবাবু যে কত উঁচু মেজাজের লোক তা ওঁকে দেখে ধারণা করা যায় না। সত্যি অজিত, ওঁর মতন সহৃদয় প্রকৃত ভদ্রলোক খুব কম দেখা যায়। যেমন করে হোক এ ব্যাপারে একটা রফা করতেই হবে।'

আমাকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ না দিয়া ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল, 'অনাদি সরকারের রাধা নামে একটি বিধবা মেয়ে আছে শুনেছ বোধহয়। তাকে আজ দেখলুম।'

আমি বোকার মত তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, সে বলিয়া চলিল, 'সতের-আঠার বছরের মেয়েটি—দেখতে মন্দ নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের পীড়নে আর লজ্জায় একেবারে নুয়ে পড়েছে।—দেখ অজিত, যৌবনের উন্মাদনার অপরাধকে আমরা বড় কঠিন শাস্তি দিই, বিশেষতঃ অপরাধী যদি স্ত্রীলোক হয়। প্রলোভনের বিরাট শক্তিকে হিসাবের মধ্যে নিই না, যৌবনের স্বাভাবিক অপরিণামদর্শিতাকেও হিসাব থেকে বাদ দিই। ফলে যে বিচার

করি সেটা সুবিচার নয়। আইনেও grave and sudden provocation বলে একটা সাফাই আছে। কিন্তু সমাজ কোনো সাফাই মানে না; আগুনের মত সে নির্মম, যে হাত দেবে তার হাত পুড়বে। আমি সমাজের দোষ দিচ্ছি না—সাধারণের কল্যাণে তাকে কঠিন হতেই হয়। কিন্তু যে-লোক এই কঠিনতার ভিতর থেকে পাথর ফাটিয়ে করুণার উৎস খুলে দেয় তাকে শ্রদ্ধা না করে থাকা যায় না।'

ব্যোমকেশকে কখনো সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেকচার দিতে শুনি নাই; অনাদি সরকারের কন্যাকে দেখিয়া তাহার ভাবের বন্যা উথলিয়া উঠিল কেন তাহাও বোধগম্য হইল না। আমি ফ্যালফ্যাল করিয়া কেবল তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস-মোচন করিয়া বলিল, 'আর একটা আশ্চর্য দেখছি, এসব ব্যাপারে মেয়েরাই মেয়েদের সব চেয়ে নিষ্ঠুর শাস্তি দেয়। কেন দেয় কে জানে!'

অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না; শেষে ব্যোমকেশ উঠিয়া পায়ের মোজা টানিয়া খুলিতে খুলিতে বলিল, 'রাত হল, শোয়া যাক। এ ব্যাপারটা যে কিভাবে শেষ হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। যা কিছু জ্ঞাতব্য সবই জানা হয়ে গেছে—অথচ লোকটাকে ধরবার উপায় নেই।' তারপর গলা নামাইয়া বলিল, 'ফাঁদ পাততে হবে, বুঝেছ অজিত, ফাঁদ পাততে হবে।'

আমি বলিলাম, 'যদি কিছু বলবে ঠিক করে থাকো তাহলে একটু স্পষ্ট করে বল। জ্ঞাতব্য কোনো কথাই আমি এখনো বুঝতে পারিনি।'

'কিছু বোঝোনি?'

'কিছু না।'

'আশ্চর্য! আমার মনে যা একটু সংশয় ছিল তা আজ শহরে গিয়ে ঘুচে গেছে। সমস্ত ঘটনাটি বায়স্কোপের ছবির মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।'

অধর দংশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শহরে সারাদিন কি করলে?'

ব্যোমকেশ জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'মাত্র দুটি কাজ। ইস্টিশানে অনাদি সরকারের মেয়েকে দেখলুম—তাকে দেখবার জন্যেই সেখানে লুকিয়ে বসেছিলুম। তারপর রেজিস্ট্রি অফিসে কয়েকটি দলিলের সন্ধান করলুম।'

'এইতেই এত দেরি হল?'

'হ্যাঁ। রেজিস্ট্রি অফিসের খবর সহজে পাওয়া যায় না—অনেক তদ্বির করতে হল '

'তারপর?'

'তারপর ফিরে এলুম।' বলিয়া ব্যোমকেশ লেপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বুঝিলাম, কিছু বলিবে না। তখন আমিও রাগ করিয়া শুইয়া পড়িলাম. আর কোনো কথা কহিলাম না।

ক্রমে তন্দ্রাবেশ হইল। নিদ্রাদেবীর ছায়া-মঞ্জীর মাথার মধ্যে রুমঝুম করিয়া বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় দরজার কড়া খুট্ খুট্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ব্যোমকেশের বোধ করি তখনো ঘুম আসে নাই, সে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

বাহির হইতে মৃদুকণ্ঠে আওয়াজ আসিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একবার দরজা খুলুন।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সবিস্ময়ে দেখিলাম, দেওয়ান কালীগতি একটি কালো রঙের কম্বল গায়ে জড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

কালীগতি বলিলেন, 'আমার সঙ্গে আসুন, একটা জিনিস দেখাতে চাই।—অজিতবাবু, জেগে আছেন নাকি? আপনিও আসুন।'

ব্যোমকেশ ওভারকোট গায়ে দিতে দিতে বলিল, 'এত রাত্রে! ব্যাপার কি?'

কালীগতি উত্তর দিলেন না। আমিও লেপ পরিত্যাগ করিয়া একটা শাল ভাল করিয়া

গায়ে জড়াইয়া লইলাম। তারপর দুইজনে কালীগতির অনুসরণ করিয়া বাহির হইলাম।

বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আমরা বাগানের ফটকের দিকে চলিলাম। অন্ধকার রাত্রি বহুপূর্বে চন্দ্রাস্ত হইয়াছে। ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ অথচ মন্থর একটা বাতাস যেন অলসভাবে বস্ত্রাচ্ছাদনের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, বৃদ্ধ এহেন রাত্রে আমাদের কোথায় লইয়া চলিল। কতদূর যাইতে হইবে! ব্যোমকেশই বা এমন নির্বিচারে প্রশ্নমাত্র না করিয়া চলিয়াছে কেন?

কিন্তু ফটক পর্যন্ত পেঁাছিবার পূর্বেই বুঝিলাম, আমাদের গন্তব্যস্থান বেশীদূর নয়। কালীগতির বাড়ির সদর দরজায় একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল, সেটিকে তুলিয়া লইয়া তাহার বাতি উস্কাইয়া দিয়া কালীগতি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন।'

কালীগতির বাড়িতে বোধহয় চাকর-বাকর কেহ থাকে না, কারণ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া জনমানবের সাড়াশব্দ পাইলাম না। লণ্ঠনের শিখা বাড়ির অংশমাত্র আলোকিত করিল, তাহাতে নিকটস্থ দরজা জানালা ও ঘরের অন্যান্য দু'একটা আসবাব ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িল না। একপ্রস্থ সিঁড়ি ভাঙিয়া আমরা দোতলায় উঠিলাম; তারপর আর এক প্রস্থ সিঁড়ি। এই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া কালীগতি লণ্ঠন কমাইয়া রাখিয়া দিলেন। দেখিলাম, আলিসা-ঘেরা খোলা ছাদে উপস্থিত হইয়াছি।

'এদিকে আসুন।' বলিয়া কালীগতি আমাদের আলিসার ধারে লইয়া গেলেন; তারপর বাহিরের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

উচ্চস্থান হইতে অনেক দূর পর্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে কিন্তু গাঢ় অন্ধকার দৃষ্টির পথরোধ করিয়া দিয়াছিল। তাই চারিদিকে অভেদ্য তমিস্রা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কেবল কালীগতির অঙ্গুলি-নির্দেশ অনুসরণ করিয়া দেখিলাম বহুদূরে একটি মাত্র আলোকের বিন্দু চক্রবালশায়ী মঙ্গলগ্রহের মত আরক্তিম ভাবে জ্বলিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আলো জ্বলছে। কিম্বা আগুনও হতে পারে। কোথায় জ্বলছে?'

কালীগতি বলিলেন, 'জঙ্গলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরটা আছে তারই মধ্যে।'

'ও—যাতে সেই কাপালিক মহাপ্রভু ছিলেন। তা—তিনি কি আবার ফিরে এলেন নাকি?' ব্যোমকেশের ব্যঙ্গহাসি শুনা গেল।

'না—আমার বিশ্বাস এ হরিনাথ মাস্টার।'

'ওঃ!' ব্যোমকেশ যেন চমকিয়া উঠিল—'আজ সন্ধ্যেবেলা আপনি বলছিলেন বটে। কিন্তু আলো জেবলে সে কি করছে?'

'বোধহয় শীত সহ্য করতে না পেরে আগুন জেবলেছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিল, শেষে মৃদুস্বরে বলিল, 'হতেও পারে—হতেও পারে। যদি সে বেঁচে থাকে—অসম্ভব নয়।'

কালীগতি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, সে বেঁচে আছে—ঐ আগুনই তার প্রমাণ। মনুষ্যসমাজ থেকে যে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে সে ছাড়া এই রাত্রে ওখানে আর কে আগুন জ্বালবে?'

'তা বটে!' ব্যোমকেশ 'আবার কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'হরিনাথ মাস্টার হোক বা না হোক, লোকটা কে জানা দরকার অজিত, এখন ওখানে যেতে রাজী আছ?'

আমি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'এখন? কিন্তু—'

কালীগতি বলিলেন, 'সব দিক বিবেচনা করে দেখুন। এখন গেলে যদি তাকে ধরতে পারেন তাহলে এখনি যাওয়া উচিত। কিন্তু এই অন্ধকারে কোনো রকম শব্দ না করে কুঁড়ে ঘরের কাছে এগুতে পারবেন কি? আলো নিয়ে যাওয়া চলবে না, কারণ আলো দেখলেই সে পালাবে। আর অন্ধকারে বন-বাদাড় ভেঙে যেতে গেলেই শব্দ হবে। কি করবেন, ভাল করে ভেবে দেখুন।'

তিনজনে মিলিয়া পরামর্শ করিলাম। সব দিক ভাবিয়া শেষে স্থির হইল যে আজ রাত্রে যাওয়া নিরাপদ হইবে না; কারণ আসামী যদি একবার টের পায় তাহা হইলে আর ওঘরে আসিবে না।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেওয়ানজীর পরামর্শই ঠিক, আজ যাওয়া সমীচীন নয়। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। আসামী যদি ভড়কে না যায় তাহলে কালও নিশ্চয় আসবে। কাল আমি আর অজিত আগে থাকতে গিয়ে ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকব—বুঝছেন? তারপর সে যেমনি আসবে—'

কালীগতি বলিলেন, 'এ প্রস্তাব মন্দ নয়। অবশ্য এর চেয়েও ভাল মতলব যদি কিছু থাকে তাও ভেবে দেখা যাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত থাক।'

ছাদ হইতে নামিয়া আমরা নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। দেওয়ানজী আমাদের দ্বার পর্যন্ত পেঁাছাইয়া দিয়া গেলেন। যাইবার সময় ব্যোমকেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি তান্ত্রিকধর্মে বিশ্বাস করেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না, ওসব বুজরুকি। আমি যত তান্ত্রিক দেখেছি, সব বেটা মাতাল আর লম্পট।'

কালীগতির চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য কেমন যেন ঘোলাটে হইয়া গেল, তিনি মুখে একটু ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আজ তবে শুয়ে পড়ুন। ভাল কথা, হিমাংশু বাবাজীকে আপাতত এসব কথা না বললেই বোধহয় ভাল হয়।'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, তাঁকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

কালীগতি প্রস্থান করিলেন।

আমরা আবার শয়ন করিলাম। কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'ব্রাহ্মণ আমার ওপর মনে মনে ভয়ঙ্কর চটেছেন।'

আমি বলিলাম, 'যাবার সময় তোমার দিকে যেরকম ভাবে তাকালেন তাতে আমারও তাই মনে হল। তান্ত্রিকদের সম্বন্ধে ওসব কথা বলবার কি দরকার ছিল? উনি নিজে তান্ত্রিক —কাজেই ওঁর আঁতে ঘা লেগেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমিও কায়মনোবাক্যে তাই আশা করছি।'

তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহারও ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দিয়া কথা কওয়া তাহার অভ্যাস নয়, অথচ এক্ষেত্রে সে জানিয়া বুঝিয়াই আঘাত দিয়াছে। বলিলাম, 'তার মানে? ব্রাহ্মণকে মিছিমিছি চটিয়ে কোন লাভ হল নাকি?'

'সেটা কাল বুঝতে পারব। এখন ঘুমিয়ে পড়।' বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পরদিন সকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। হিমাংশু-বাবুকে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখিলাম—নানা কথাবার্তায় হাসি তামাসায় শিকারের গল্পে আমাদের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। আমরা যে একটা গুরুতর রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের জন্য তাঁহার অতিথি হইয়াছি তাহা যেন তিনি ভুলিয়াই গেলেন; একবারও সে প্রসঙ্গের উল্লেখ করিলেন না।

বৈকালে চা-পান সমাপ্ত করিয়া ব্যোমকেশ কালীগতিকে একান্তে লইয়া গিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কালকের প্ল্যানই ঠিক আছে তো?'

কালীগতি চিন্তান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'আপনি কি বিবেচনা করেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার বিবেচনায় যাওয়াই ঠিক, এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। আজ রাত্রি দশটা নাগাদ চন্দ্রাস্ত হবে, তার আগেই আমি আর অজিত গিয়ে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকব। যদি কেউ আসে তাকে ধরব।'

কালীগতি বলিলেন, 'যদি না আসে?'

'তাহলে বুঝব আমার আগেকার অনুমানই ঠিক, হরিনাথ মাস্টার বেঁচে নেই।'

আবার কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কালীগতি বলিলেন, 'বেশ, কিন্তু ঘরটা এখন গিয়ে

একবার দেখে এলে ভাল হত। চলুন, আপনাদের নিয়ে যাই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন। ঘরটা বেলাবেলি দেখে না রাখলে আবার রাত্রে সেখানে যাবার অসুবিধা হবে।'

ঘরটা যে আমরা আগে দেখিয়াছি তাহা ব্যোমকেশ ভাঙিল না।

যথা সময় তিনজনে বনের ধারে কুটীরে উপস্থিত হইলাম। কালীগতি আমাদের কুটীরের ভিতরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, মেঝের উপর একস্তূপ ছাই পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ঘরের আর কোনো পরিবর্তন হয় নাই।

কালীগতি পিছনের কবাট খুলিয়া বালুর দিকে লইয়া গেলেন। বালুর উপর তখন সন্ধ্যার মলিনতা নামিয়া আসিতেছে। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ। এদিকটা তো বেশ, যেন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।'

আমিও দেখাদেখি বলিলাম, 'চমৎকার!'

কালীগতি বলিলেন, 'আপনারা আজ রাত্রে এই ঘরে থাকবেন বটে কিন্তু আমার একটু দুর্ভাবনা হচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি, একটা বাঘ নাকি সম্প্রতি জঙ্গলে এসেছে।'

আমি বলিলাম, 'তাতে কি, আমরা বন্দুক নিয়ে আসব।'

কালীগতি মৃদু হাসিয়া মাথা নাড়িলেন, 'বাঘ যদি আসে, অন্ধকারে বন্দুক কোনো কাজেই লাগবে না। যা হোক, আশা করি বাঘের গুজবটা মিথ্যে—বন্দুক আনবার দরকার হবে না; তবে সাবধানের মার নেই, আপনাদের সতর্ক করে দিই। যদি রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পান, ঘরের মধ্যে থাকবেন না, এই দিকে বেরিয়ে এসে আগল লাগিয়ে দেবেন, তারপর ঐ বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন। যদি বা বাঘ ঘরে ঢোকে বালির ওপর যেতে পারবে না।'

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল, 'সেই ভাল—বন্দুকের হাঙ্গামায় দরকার নেই। অজিত আবার নূতন বন্দুক চালাতে শিখেছে, হয়তো বিনা কারণেই আওয়াজ করে বসবে; ফলে শিকার আর এদিকে ঘেঁষবে না।'

তারপর বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। মনটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর হিমাংশুবাবুর অস্ত্রাগারে বসিয়া গল্পগুজব হইল। এক সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু, মনে করুন কেউ যদি একটা নিরীহ নির্ভরশীল লোককে জেনেশুনে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়, তার শাস্তি কি?'

হিমাংশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'মৃত্যু। A tooth for a tooth, an eye for an eye!

ব্যোমকেশ আমার দিকে ফিরিল—'অজিত, তুমি কি বল?'

'আমিও তাই বলি।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া রহিল। তারপর উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে উঁকি মারিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। মৃদুস্বরে বলিল, 'হিমাংশুবাবু, আজ রাত্রে আমরা দু'জনে গিয়ে কাপালিকের কুঁড়েয় লুকিয়ে থাকব।'

বিস্মিত হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'সে কি! কেন?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে কারণ ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, 'কিন্তু আমাদের একলা যেতে সাহস হয় না। আপনাকেও যেতে হবে।'

হিমাংশুবাবু সোৎসাহে বলিলেন, 'বেশ বেশ, নিশ্চয় যাব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনি যাচ্ছেন একথা যেন আকারে ইঙ্গিতেও কেউ না জানতে পারে। তা হলেই সব ভেস্তে যাবে। শুনুন, আমরা আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরুব; আপনি তার আধঘণ্টা পরে বেরুবেন, কেউ যেন জানতে না পারে। এমন কি, আমাদের যাবার কথা আপনি জানেন সে ইঙ্গিতও দেবেন না।'

'বেশ।'

'আর আপনার সব চেয়ে ভাল রাইফেলটা সঙ্গে নেবেন। আমরা শুধু হাতেই যাব।'

রাত্রি ন'টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া আমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। সাজগোজ করিয়া বাহির হইতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজিল।

বাগান পার হইয়া মাঠে পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় চাপা কণ্ঠে কে ডাকিল, 'ব্যোমকেশবাবু!'

পাশে তাকাইয়া দেখিলাম, একটা গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া কালীগতি আসিতেছেন। তিনি বোধহয় এতক্ষণ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'যাচ্ছেন? বন্দুক নেননি দেখছি। বেশ—মনে রাখবেন, যদি বাঘের ডাক শুনতে পান, বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াবেন।'

'হ্যাঁ—মনে আছে।'

চন্দ্র অস্ত যাইতে বিলম্ব নাই, এখনি বনের আড়ালে ঢাকা পড়িবে। কালীগতির মৃদু-কথিত 'দুর্গা দুর্গা' শুনিয়া আমরা চলিতে আরম্ভ করিলাম।

কুটীরে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ পকেট হইতে টর্চ বাহির করিল, নিমেষের জন্য একবার জ্বালিয়া ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইল। তারপর নিজে মাটির উপর উপবেশন করিয়া বলিল, 'বোসো।'

আমি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সিগারেট ধরাতে পারি?'

'পারো। তবে দেশলাইয়ের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রেখো।'

দু'জনে উক্তরূপে দেশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইয়া নীরবে টানিতে লাগিলাম। আধঘণ্টা পরে বাহিরে একটু শব্দ হইল। ব্যোমকেশ ডাকিল, 'হিমাংশুবাবু আসুন।'

হিমাংশুবাবু রাইফেল লইয়া আসিয়া বসিলেন। তখন তিনজনে সেই কুঁড়ে ঘরের মেঝেয় বসিয়া দীর্ঘ প্রতীক্ষা আরম্ভ করিলাম। মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে দু'একটা কথা হইতে লাগিল। হিমাংশুবাবুর কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির রেডিয়ম-দ্যুতি সময়ের নিঃশব্দ সঞ্চার জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বারোটা বাজিয়া পঁচিশ মিনিটের সময় একটা বিকট গম্ভীর শব্দ শুনিয়া তিনজনেই লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম। বন্য বাঘের ক্ষুধার্ত ডাক আগে কখনো শুনি নাই—বুকের ভিতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। হিমাংশুবাবু চাপা গলায় বলিলেন, 'বাঘ।' তাঁহার রাইফলে খুট্ করিয়া শব্দ হইল, বুঝিলাম তিনি রাইফেলে টোটা ভরিলেন।

বাঘের ডাকটা বনের দিক হইতে আসিয়াছিল। হিমাংশুবাবু পা টিপিয়া টিপিয়া খোলা দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার গাঢ়তর দেহরেখা অন্ধকারের ভিতর অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হইল। আমরা নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

হিমাংশুবাবু ফিসফিস করিয়া বলিলেন, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'শব্দভেদী'—ব্যোমকেশের স্বর যেন বাতাসে মিলাইয়া গেল।

হিমাংশুবাবু শুনিতে পাইলেন কি না জানি না, তিনি কুটীরের বাহিরে দুই পদ অগ্রসর হইয়া বন্দুক তুলিলেন।

এই সময় আবার সেই দীর্ঘ হিংস্র আওয়াজ যেন মাটি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিল। এবার শব্দ আরো কাছে আসিয়াছে, বোধহয় পঞ্চাশ গজের মধ্যে। শব্দের প্রতিধ্বনি মিলাইয়া যাইতে না যাইতে হিমাংশুবাবুর বন্দুকের নল হইতে একটা আগুনের রেখা বাহির হইল। শব্দ হইল—কড়াৎ!

সঙ্গে সঙ্গে দূরে একটা গুরুভার পতনের শব্দ। হিমাংশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'পড়েছে। ব্যোমকেশবাবু, টর্চ বার করুন।'

টর্চ ব্যোমকেশের হাতেই ছিল, সে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালিল; ঘর হইতে বাহির হইয়া আগে আগে যাইতে যাইতে বলিল, 'আসুন।'

আমরা তাহার পশ্চাতে চলিলাম। হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'বেশী কাছে যাবেন না; যদি শুধু জখম হয়ে থাকে—'

কিন্তু বাঘ কোথায়? বনের ঠিক কিনারায় একটা কালো কম্বল-ঢাকা কি যেন পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া টর্চের পরিপূর্ণ আলো তাহার উপর ফেলিতেই হিমাংশুবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'একি! এ যে দেওয়ানজী!'

দেওয়ান কালীগতি কাৎ হইয়া ঘাসের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহার রক্তাক্ত নগ্ন বক্ষ হইতে কম্বলটা সরিয়া গিয়াছে। চক্ষু উন্মুক্ত; মুখের একটা পাশবিক বিকৃতি তাঁহার অন্তিমকালের মনোভাব ব্যক্ত করিতেছে।

ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া তাঁহার বুকের উপর হাত রাখিল, তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'গতাসু। যদি প্রেতলোক বলে কোনো রাজ্য থাকে তাহলে এতক্ষণে হরিনাথ মাস্টারের সঙ্গে দেওয়ানজীর মুলাকাত হয়েছে।'

তাহার মুখে বা কণ্ঠস্বরে মর্মপীড়ার কোনো আভাসই পাওয়া গেল না।

হিসাবের খাতা কয়টা হিমাংশুবাবুর দিকে ঠেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন, এক লক্ষ টাকা দেনা কেন হয়েছে।'

আমরা তিনজনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়াছিলাম। কালীগতির মৃত্যুর পর দুই দিন অতীত হইয়াছে। তাঁহার লোহার সিন্দুক ভাঙিয়া হিসাবের খাতা চারিটা ও আরও অনেক দলিল ব্যোমকেশ বাহির করিয়াছিল।

হিমাংশুবাবুর চক্ষু হইতে বিভীষিকার ছায়া তখনো সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তিনি করতলে চিবুক রাখিয়া বসিয়াছিলেন, ব্যোমকেশের কথায় মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'এখনো যেন আমি কিছু বুঝতে পারছি না—ভাবতে গেলেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার বর্তমান মানসিক অবস্থায় গুলিয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। আমি টুকরো টুকরো প্রমাণ থেকে এই রহস্য কাহিনীর যে কাঠামো খাড়া করতে পেরেছি তা আপনাকে বলছি, শুনুন। কিন্তু তার আগে এই রেজিস্ট্রি দলিলগুলো নিন।'

'কি এগুলো?' বলিয়া হিমাংশুবাবু দলিলগুলি হাতে লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি যে-মহাজনের কাছে তমসুক লিখে টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই মহাজন সেই সব তমসুক রেজিস্ট্রি করে কালীগতিকে বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে সেই সব তমসুক আর তার বিক্রি কবালা।'

'কালীগতি এইসব তমসুক কিনেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আপনারই টাকায় কিনেছিলেন; যাকে বলে মাছের তেলে মাছ ভাজা।'

হিমাংশুবাবু উদ্‌ভ্রান্তভাবে দেয়ালের পানে তাকাইয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'ওগুলো এখন ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, কারণ কালীগতি আর আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে আসবেন না। তিনি ঋণের দায়ে আপনার আস্ত জমিদারীটাই নিলাম করে নেবেন ভেবেছিলেন—আরো বছর দুই এইভাবে চালাতে পারলে করতেনও তাই। কিন্তু মাঝ থেকে ঐ ন্যালাখ্যাপা অঙ্ক-পাগলা মাস্টারটা এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'না না, ব্যোমকেশ, গোড়া থেকে বল।'

ব্যোমকেশ ধীরভাবে একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'গোড়া থেকেই বলছি। হিমাংশু-বাবুর বাবা মারা যাবার পর কালীগতি যখন দেখলেন যে নূতন জমিদার বিষয় পরিচালনায় উদাসীন তখন তিনি ভারী সুবিধা পেলেন। হিসাবের খাতা তিনি লেখেন, তাঁর মাথার ওপর পরীক্ষা করবার কেউ নেই—সুতরাং তিনি নির্ভয়ে কিছু কিছু টাকা তছরূপ করতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে কিছুদিন চলল। কিন্তু নাল্পে সুখমস্তি—ও প্রবৃত্তিটা ক্রমশ বেড়েই চলে। এদিকে জমিদারীর আয়-ব্যয়ের একটা বাঁধা হিসেব আছে, বেশী গরমিল হলেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা। তিনি তখন এক মস্ত চাল চাললেন, বড় বড় প্রজাদের সঙ্গে মোকদ্দমা বাধিয়ে দিলেন। খরচ আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে রইল না; আদালতে ন্যায্য এবং ন্যায়-বহির্ভূত দুই রকমই খরচ আছে, সুতরাং স্বচ্ছন্দে গোঁজামিল দেওয়া চলে।

কালীগতির চুরির খুব সুবিধা হল।

'প্রথমটা বোধহয় কালীগতি কেবল চুরি করবার মতলবেই ছিলেন, তার বেশী উচ্চাশা করেননি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক তান্ত্রিক এসে হাজির হল—এবং আপনি প্রথমেই তার বিষ-নজরে পড়ে গেলেন। কালীগতি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কুমন্ত্রণা গ্রহণ করলেন। আমার বিশ্বাস এই কাপালিকই জমিদারী আত্মসাৎ করবার পরামর্শ কালীগতিকে দেয়; কারণ হিসেবের খাতা থেকে দেখতে পাচ্ছি, সে আসবার পর থেকেই চুরির মাত্রা বেড়ে গেছে।

'স্বাভাবিক লোভ ছাড়াও একটা ধর্মান্ধতার ভাব কালীগতির মধ্যে ছিল। ধর্মান্ধতা মানুষকে কত নৃশংস করে তুলতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নয়। কালীগতি গুরুর প্ররোচনায় অন্নদাতার সর্বনাশ করতে উদ্যত হলেন। তিনি যে কৌশলটি বার করলেন সেটি যেমন সহজ তেমনি কার্যকর। প্রথমে আপনার টাকা চুরি করে তহবিল খালি করে দিলেন, পরে খরচের টাকা নেই ওই অজুহাতে মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ালেন, এবং শেষে মহাজনের কাছ থেকে আপনারই টাকায় সেই তমসুক কিনে নিলেন। কালীগতি বিনা খরচে আপনার উত্তমর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন। আপনি কিছুই জানতে পারলেন না।

'এইভাবে বেশ আনন্দে দিন কাটছে, হঠাৎ একদিন কোথা থেকে হরিনাথ এসে হাজির হল। আপনি তাকে বেবির মাস্টার রাখলেন। বড় ভালমানুষ বেচারা, দু'চার দিনের মধ্যে কালীগতির ভক্ত হয়ে উঠল; কালীগতি তাকে তান্ত্রিক ধর্ম-মাহাত্ম্য শেখাতে লাগলেন। কালীমূর্তির এক পট হরিনাথ তাঁর কাছ থেকে এনে নিজের ঘরের দেওয়ালে ভক্তিভরে টাঙিয়ে রাখলে।

'কিন্তু শুধু ধর্মে তার পেট ভরে না—সে অঙ্ক-পাগল। বেবিকে সে যোগ বিয়োগ শেখায়, আর নিজের মনে বেবির খাতায় বড় বড় অঙ্ক কষে। কিন্তু তবু নিজের কল্পিত অঙ্কে সে সুখ পায় না।

'একদিন আলমারি খুলে সে হিসেবের খাতাগুলো দেখতে পেলে। অঙ্কের গন্ধ পেলে সে আর স্থির থাকতে পারে না—মহা আনন্দে সে খাতাগুলো পরীক্ষা করতে আরম্ভ করে দিলে। যতই হিসেবের মধ্যে ঢুকতে লাগল, ততই দেখলে হাজার হাজার টাকার গরমিল। হরিনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা সে কাকে বলবে? আপনার সঙ্গে তার বড় একটা দেখা হয় না, উপরন্তু আপনার সঙ্গে উপযাচক হয়ে দেখা করতে সে সাহস করে না। এ অবস্থায় যা সব চেয়ে স্বাভাবিক সে তাই করলে—কালীগতিকে গিয়ে হিসেব গরমিলের কথা বললে।

'কালীগতি দেখলেন—সর্বনাশ! তাঁর এতদিনের ধারাবাহিক চুরি ধরা পড়ে যায়। তিনি তখনকার মত হরিনাথকে স্তোকবাক্যে বুঝিয়ে মনে মনে সংকল্প করলেন যে, হরিনাথকে সরাতে হবে, এবং এই সঙ্গে ঐ খাতাগুলো। নইলে তাঁর দুষ্কৃতির প্রমাণ থেকে যাবে। এতদিন যে সেগুলো কোনো ছুতোয় নষ্ট করে ফেলেননি এই অনুতাপ তাঁকে ভীষণ নিষ্ঠুর করে তুললে।

'এইখানে এই কাহিনীর সবচেয়ে ভয়াবহ আর রোমাঞ্চকর ঘটনার আবির্ভাব। হরিনাথকে পৃথিবী থেকে সরাতে হবে, অথচ ছুরি ছোরা চালানো বা বিষ-প্রয়োগ চলবে না। তবে উপায়?

'যে চোরাবালি থেকে আপনার জমিদারীর নামকরণ হয়েছে সেই চোরাবালির সন্ধান কালীগতি জানতেন। সম্ভবতঃ তাঁর গুরু কাপালিকের কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন; কারণ চোরাবালিটা কাপালিকের কুঁড়ের ঠিক পিছনেই। আমরাও সেদিন সকালে পাখী মারতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই ভয়ঙ্কর চোরাবালির সন্ধান পেয়েছিলুম।

'কালীগতি মাস্টারকে সরাবার এক সম্পূর্ণ নূতন উপায় উদ্ভাবন করলেন। চমৎকার উপায়। হরিনাথ মাস্টার মরবে অথচ কেউ বুঝতেই পারবে না যে সে মরেছে। তাঁর ওপর সন্দেহের ছায়াপাত পর্যন্ত হবে না, বরঞ্চ খাতাগুলো অন্তর্ধানের বেশ একটা স্বাভাবিক কারণ পাওয়া যাবে।

'গত অমাবস্যার দিন তিনি হরিনাথকে বললেন, 'তুমি যদি মন্ত্রসিদ্ধ হতে চাও তো আজ রাত্রে ঐ 'কুড়ে ঘরে গিয়ে মন্ত্র সাধনা কর।' হরিনাথ রাজী হল; সে বেবির খাতায় মন্ত্রটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখল।

'রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিনাথ নিজের ঘর থেকে বার হল। সে সাধনা করতে যাচ্ছে, তার জামা জুতো পরবার দরকার নেই, এমন কি সে চশমাটাও সঙ্গে নিলে না—কারণ অমাবস্যার রাত্রে চশমা থাকা না থাকা সমান।

'কালীগতি তাকে কুটীর পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে এলেন। আসবার সময় বলে এলেন—'যদি বাঘের ডাক শুনতে পাও ভয় পেও না, পিছনের দরজা দিয়ে বালির ওপর গিয়ে দাঁড়িও; সেখানে বাঘ যেতে পারবে না।'

'হরিনাথ জপে বসল। তারপর যথাসময় বাঘের ডাক শুনতে পেল। সে কি ভয়ঙ্কর ডাক, তা আমরাও সেদিন শুনেছি। হিমাংশুবাবুর মতন পাকা শিকারীও বুঝতে পারেননি যে এ নকল ডাক। কালীগতি জন্তু-জানোয়ারের ডাক অদ্ভুত নকল করতে পারতেন। প্রথম দিন এখানে এসেই আমরা তাঁর শেয়াল ডাক শুনেছিলুম।

'বাঘের ডাক শুনে অভাগা হরিনাথ ছুটে গিয়ে বালির ওপর দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে চোরাবালির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। একটা চীৎকার হয়তো সে করেছিল কিন্তু তাও অর্ধপথে চাপা পড়ে গেল। তার ভয়ঙ্কর মৃত্যুর কথা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।'

একটু চুপ করিয়া ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল, 'কালীগতি কার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে এসে সেই রাত্রেই হরিনাথের ঘর থেকে খাতা সরিয়ে ফেললেন' তার পরদিন যখন হরিনাথকে পাওয়া গেল না তখন রটিয়ে দিলেন যে সে খাতা চুরি করে পালিয়েছে।

'হরিনাথের অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎ বেশ ভালই হয়েছিল কিন্তু তবু কালীগতি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। কে জানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, হরিনাথ শুধু খাতা নিয়ে পালাবে কেন? নিশ্চয় এর মধ্যে কোন গূঢ় তত্ত্ব আছে। তখন তিনি সিন্দুক থেকে দু'হাজার টাকাও সরিয়ে ফেললেন। এই সময়ে আপনার চাবি হারিয়েছিল, সুতরাং সন্দেহটা সহজেই কালী-গতির ঘাড় থেকে নেমে গেল—সবাই ভাবলে হারানো চাবির সাহায্যে হরিনাথই টাকা চুরি করেছে। কালীগতির ডবল লাভ হল, টাকাও পেলেন, আবার হরিনাথের অপরাধও বেশ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল।

'তারপর আমি আর অজিত এলুম। এই সময়ে বাড়িতে আর একটা ব্যাপার ঘটছিল যার সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা আমাদের সমাজের একটা চিরন্তন ট্র্যাজেডি—বিধবার পদস্খলন, নূতন কিছুই নয়। অনাদি সরকারের বিধবা মেয়ে রাধা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে। তারা অনেক যত্ন করে কথাটা লুকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু শেষে আপনার স্ত্রী জানতে পারেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আপনাকে এসে বলেন যে, এসব অনাচার এ বাড়িতে চলবে না, ওদের আজই বিদেয় করে দাও।—কেমন, ঠিক কি না?'

শেষের দিকে হিমাংশুবাবু বিস্ফারিত নেত্রে ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া ছিলেন, এখন একবার ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'কিন্তু আপনার মনে দয়া হল; আপনি ঐ অভাগী মেয়েটাকে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না। এই নিয়ে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু মনোমালিন্যও হয়েছিল। যা হোক, আপনি যখন বুঝলেন যে ওরা ভ্রূণহত্যার অপরাধে অপরাধী নয়, তখন রাধাকে চুপি চুপি তার মাসীর কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। পাছে আপনার আমলা বা চাকর-বাকরদের মধ্যেও জানাজানি হয়, এই জন্যে নিজে গাড়ি চালিয়ে তাকে স্টেশনে পেঁছে দিয়ে এলেন।

'অনাদি সরকারের ভাগ্য ভাল যে সে আপনার মত মনিব পেয়েছে; অন্য কোনো মালিক এতটা করত বলে আমার মনে হয় না।

'সে যা হোক, এই ব্যাপারের সঙ্গে হরিনাথের অন্তর্ধানের ঘটনা জড়িয়ে গিয়ে সমস্তটা আমার কাছে অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। তারপর অতি কষ্টে জট ছাড়ালুম;

রাধাকে দেখবার জন্যে স্টেশনে গিয়ে লুকিয়ে বসে রইলুম। তার চেহারা দেখেই বুঝলুম এ ব্যাপারের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই—তার ট্র্যাজেডি অন্য রকম। তখন আর সন্দেহ রইল না যে কালীগতিই হরিনাথকে খুন করেছেন। লোকটি কতবড় নৃশংস আর বিবেকহীন তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেলুম রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্তু তাঁকে ধরবার উপায় নেই; যে খাতাগুলো থেকে তাঁর চুরি-অপরাধ প্রমাণ হতে পারত সেগুলো তিনি আগেই সরিয়েছেন। হয়তো পুড়িয়ে ফেলেছেন, নয়তো হরিনাথের সঙ্গে ঐ চোরাবালিতেই ফেলে দিয়েছেন।

'কালীগতি প্রথমটা বেশ নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু যখন অজিতের মুখে শুনলেন যে হরিনাথের মৃত্যুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। প্রথমে তিনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে হরিনাথ মরেনি, প্রমাণস্বরূপ নিজেই কুঁড়ে ঘরে আগুন জেবলে রেখে এসে দুপুর রাত্রে আমাদের দেখালেন। আমি তখন এমন ভাব দেখাতে লাগলুম যেন তাঁর কথা সত্যি হলেও হতে পারে। আমরা ঠিক করলুম রাত্রে গিয়ে কুঁড়ে ঘরে পাহারা দেব। তিনি রাজী হলেন বটে কিন্তু কাউকে একথা বলতে বারণ করে দিলেন।

'আমাদের মারবার ফন্দি প্রথমে কালীগতির ছিল না; তাঁর প্রথম চেষ্টা ছিল আমাদের বোঝান যে হরিনাথ বেঁচে আছে। কিন্তু যখন দেখলেন যে আমরা হরিনাথের জন্যে কুঁড়ে ঘরে গিয়ে বসে থাকতে চাই, তখন তাঁর ভয় হল যে, এইবার তাঁর সব কল-কৌশল ধরা পড়ে যাবে। কারণ হরিনাথ যে কুঁড়ে ঘরে আসতেই পারে না, একথা তাঁর চেয়ে বেশী কে জানে? তখন তিনি আমাদের চোরাবালিতে পাঠাবার সংকল্প করলেন। আমিও এই সুযোগই খুঁজছিলুম; আমাদের খুন করবার ইচ্ছাটা যাতে তাঁর পক্ষে সহজ হয় সে চেষ্টারও ত্রুটি করিনি। তান্ত্রিক এবং তন্ত্র-ধর্মকে গালাগালি দেবার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

'পরদিন বিকেলে তিনি আমাদের নিয়ে কুঁড়ে ঘর দেখাতে গেলেন। সেখানে গিয়ে কথাচ্ছলে বললেন, রাত্রে যদি আমরা বাঘের ডাক শুনতে পাই তাহলে যেন বালির ওপর গিয়ে দাঁড়াই।

'এই হল সেদিন সন্ধ্যে পর্যন্ত যা ঘটেছিল তার বিবরণ। তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনি জানেন।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। অনেকক্ষণ কোনো কথা হইল না। তারপর হিমাংশুবাবু বলিলেন, 'আমাকে সে-রাত্রে রাইফেল নিয়ে যেতে কেন বলেছিলেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ কোনো উত্তর দিল না। হিমাংশুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি জানতেন আমি বাঘের ডাক শুনে শব্দভেদী গুলি ছুঁড়ব?'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, বলিল, 'সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন। হিমাংশুবাবু, আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না। মৃত্যুই ছিল কালীগতির একমাত্র শাস্তি। তিনি যে ফাঁসি-কাঠে না ঝুলে বন্দুকের গুলিতে মরেছেন এটা তাঁর ভাগ্য—আপনি নিমিত্ত মাত্র। মনে আছে, সেদিন রাত্রে আপনিই বলেছিলেন— a tooth for a tooth, an eye for an eye?'

এই সময় বাহিরের বারান্দার সম্মুখে মোটর আসিয়া থামিল। পরক্ষণেই ব্যস্ত-সমস্তভাবে কুমার ত্রিদিব প্রবেশ করিলেন, তাঁহার হাতে একখানা খবরের কাগজ। তিনি বলিলেন, 'হিমাংশু, এসব কি কাণ্ড! দেওয়ান কালীগতি বন্দুকের গুলিতে মারা গেছেন?' বলিয়া কাগজখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি কিছুই জানতাম না; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় পড়েছিলুম তাই কঁদিন আসতে পারিনি। আজ কাগজ পড়ে দেখি এই ব্যাপার। ছুটতে ছুটতে এলুম। ব্যোমকেশবাবু, কি হয়েছে বলুন দেখি।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার আগে কাগজখানা হাতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

'চোরাবালি নামক উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদারী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ

পাওয়া গিয়াছে। চোরাবালির জমিদার কয়েকজন বন্ধুর সহিত রাত্রিকালে নিকটবর্তী জঙ্গলে বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। বাঘের ডাক শুনিতে পাইয়া জমিদার হিমাংশু-বাবু বন্দুক ফায়ার করেন। কিন্তু মৃতদেহের নিকট গিয়া দেখিলেন যে বাঘের পরিবর্তে জমিদারীর পুরাতন দেওয়ান কালীগতি ভট্টাচার্য গুলির আঘাতে মরিয়া পড়িয়া আছেন।

'বৃদ্ধ দেওয়ান এই গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে কেন গিয়াছিলেন এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিতেছে না।

'জমিদার হিমাংশুবাবু দেওয়ানের মৃত্যুতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছেন, পুলিস-তদন্ত দ্বারা বুঝিতে পারা গিয়াছে যে এই দুর্ঘটনার জন্য হিমাংশুবাবু কোন অংশে দায়ী নহেন—তিনি যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গুলি ছুঁড়িয়াছিলেন।'

কাগজখানা রাখিয়া দিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। আলস্য ভাঙিয়া কুমার ত্রিদিবকে বলিল, 'চলুন, এবার আপনার রাজ্যে ফেরা যাক, এখানকার কাজ আমার শেষ হয়েছে। পথে যেতে যেতে কালীগতির শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী আপনাকে শোনাব।'

# অগ্নিবাণ

## ১

খবরের কাগজখানা হতাশ হস্ত-সঞ্চালনে আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'নাঃ—কোথাও কিছু নেই, একেবারে ফাঁকা। এর চেয়ে কাগজওয়ালারা সাদা কাগজ বের করলেই পারে। তাতে ছাপার খরচটা অন্তত বেঁচে যায়।'

আমি খোঁচা দিয়া বলিলাম, 'বিজ্ঞাপনেও কিছু পেলে না? বল কি? তোমার মতে তো দুনিয়ার যত কিছু খবর সব ঐ বিজ্ঞাপন-স্তম্ভের মধ্যেই ঠাসা আছে।'

বিমর্ষ-মুখে চুরুট ধরাইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'না, বিজ্ঞাপনেও কিছু নেই। একটা লোক বিধবা বিয়ে করতে চায় বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। কুমারী ছেড়ে বিধবা বিয়ে করবার জন্যেই গোঁ ধরেছে কেন, ঠিক বোঝা গেল না। নিশ্চয় কোনও বদ্ মতলব আছে।'

'তা তো বটেই। আর কিছু?'

'আর একটা বীমা কোম্পানী মহা ঘটা করে বিজ্ঞাপন দিয়েছে যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর জীবন একসঙ্গে বীমা করবে, এবং জোড়ার মধ্যে একটাকে কোনও রকমে পটল তোলাতে পারলেই অন্য জন টাকা পাবে। এইসব বীমা কোম্পানী এমন করে তুলেছে যে, মরেও সুখ নেই।'

'কেন, এর মধ্যেও বদ্ মতলব আছে নাকি?'

'বীমা কোম্পানীর নিজের স্বার্থ না থাকতে পারে, কিন্তু অন্যের মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়ে তোলাও সৎকার্য নয়।'

'অর্থাৎ? মানে হল কি?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, হৃদয়ভারাক্রান্ত একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিল, তারপর কড়িকাঠের দিকে অনুযোগপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া নীরবে ধূম উদ্গিরণ করিতে লাগিল।

শীতকাল; বড়দিনের ছুটি চলিতেছিল। কলিকাতার লোক বাহিরে গিয়া ও বাহিরের লোক কলিকাতায় আসিয়া মহা সমারোহে ছুটি উদ্যাপন করিতেছিল। কয়েক বছর আগেকার কথা, তখন ব্যোমকেশের বিবাহ হয় নাই।

আমরা দুই জনে চিরন্তন অভ্যাসমত সকালে উঠিয়া একত্র চা-পান ও সংবাদপত্রের ব্যবচ্ছেদ করিতেছিলাম। গত তিন মাস একেবারে বেকারভাবে বসিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের ধৈর্যের লৌহ-শৃঙ্খলও বোধ করি ছিঁড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। দিনের পর দিন সংবাদপত্রের নিষ্প্রাণ ও বৈচিত্র্যহীন পৃষ্ঠা হইতে অপদার্থ খবর সংগ্রহ করিয়া সময় আর কাটিতে চাহিতেছিল না। আমার নিজের মনের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা হইতেই বুঝিতেছিলাম, ব্যোমকেশের মস্তিষ্কের ক্ষুধা ইন্ধন অভাবে কিরূপ উগ্র ও দুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তবু সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করি নাই; বরঞ্চ এই অনীপ্সিত নৈষ্কর্মের জন্য যেন সে-ই মূলতঃ দায়ী, এমনিভাবে তাহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছি।

আজ প্রভাতে তাহার এই হতাশাপূর্ণ ভাব দেখিয়া আমার একটু অনুশোচনা হইল। মস্তিষ্কের খোরাক সহসা বন্ধ হইয়া গেলে সুস্থ বলবান মস্তিষ্কের কিরূপ দুর্দশা হয়, তাহা তো জানিই, উপরন্তু আবার বন্ধুর খোঁচা খাইতে হইলে ব্যাপারটা নিতান্তই নিষ্করুণ হইয়া পড়ে।

আমি আর তাহাকে প্রশ্ন না করিয়া অনুতপ্ত চিত্তে খবরের কাগজখানা খুলিলাম। এই সময়ে চারিদিকে সভা সমিতি ও অধিবেশনের ধূম পড়িয়া যায়, এবারেও তাহার

ব্যতিক্রম হয় নাই। সংবাদ-ব্যবসায়ীরা সরসতর সংবাদের অভাবে এইসব সভার মামুলি বিবরণ ছাপিয়া পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। তাহার ফাঁকে ফাঁকে সিনেমা ও থিয়েটার-সার্কাসের বিজ্ঞাপন সচিত্র ও বিচিত্ররূপে আমোদ-লোলুপ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে।

দেখিলাম, কলিকাতাতেই গোটা পাঁচেক বড় বড় সভা চলিতেছে। তা ছাড়া দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার অধিবেশন বসিয়াছে। ভারতের নানা দিগ্‌দেশ হইতে অনেক হোমরা-চোমরা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত একজোট হইয়াছেন এবং বাক্যধূমে বোধ করি দিল্লীর আকাশ বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। সংবাদপত্রের মারফত যতটুকু ধূম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহারই ঠেলায় মস্তিষ্ক কোটরে ঝুল পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।

আমি সময় সময় ভাবি, আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা কাজ না করিয়া এত বাগ্‌বিস্তার করেন কেন? দেখিতে পাই, যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি তার চতুর্গুণ বাগ্মী। বেশী কিছু নয়, স্টীম এঞ্জিন বা এরোপ্লেনের মত একটা যন্ত্রও যদি ইহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের বাচালতা ধৈর্য ধরিয়া শুনিতাম। কিন্তু ও সব দূরে থাক, মশা মারিবার একটা বিষও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। বুজরুকি আর কাহাকে বলে!

নিরুৎসুকভাবে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিবরণ পড়িতে পড়িতে একটা নাম দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইনি কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রফেসর ও বিজ্ঞান-গবেষক—নাম দেবকুমার সরকার। বিজ্ঞান-সভায় ইনি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। অবশ্য ইনি ছাড়া অন্য কোনও বাঙালী যে বক্তৃতা দেন নাই, এমন নয়, অনেকেই দিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ করিয়া দেব-কুমারবাবুর নামটা চোখে পড়িবার কারণ, কলিকাতায় তিনি আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের বাসার কয়েকখানা বাড়ির পরে গলির মুখে তাঁহার বাসা। তাঁহার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ আলাপ ছিল না, কিন্তু তাঁহার পুত্র হাবুলের সম্পর্কে আমরা তাঁহার সহিত নেপথ্য হইতেই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুল কিছুদিন হইতে ব্যোমকেশের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ছোকরার বয়স আঠারো উনিশ, কলেজের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত। ভালমানুষ ছেলে, আমাদের সম্মুখে বেশী কথা বলিতে পারিত না, তদ্গতভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া এই অস্ফুটবাক্‌ ভক্তের পূজা গ্রহণ করিত; কখনও চা খাইবার নিমন্ত্রণ করিত। হাবুল একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাইত।

এই হাবুলের পিতা কিরূপ বক্তৃতা দিয়াছেন, জানিবার জন্য একটু কৌতূহল হইল। পড়িয়া দেখিলাম, দেশী বৈজ্ঞানিকদের অভাব অসুবিধার সম্বন্ধে ভদ্রলোক যাহা বলিয়াছেন, তাহা নেহাত মিথ্যা নয়। ব্যোমকেশকে পড়িয়া শুনাইলে তাহার মনটা বিষয়ান্তরে সঞ্চারিত হইয়া হয়তো একটু প্রফুল্ল হইতে পারে, তাই বলিলাম, 'ওহে, হাবুলের বাবা দেবকুমারবাবু বক্তৃতা দিয়েছেন, শোনো।'

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইল না, বিশেষ ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিল না। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

'এ কথা সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত কোনও জাতি বড় হইতে পারে নাই। অনেকের ধারণা এইরূপ যে, ভারতবাসী বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরাঙ্মুখ এবং তাহাদের উদ্ভাবনী শক্তি নাই—এই জন্যই ভারত পরনির্ভর ও পরাধীন হইয়া আছে। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, ভারতের গরিমাময় অতীত তাহার প্রমাণ। নব্য-বিজ্ঞানের যাহা বীজমন্ত্র, তাহা যে ভারতেই প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল ও পরে কাশপুষ্পের বীজের ন্যায় বায়ুতাড়িত হইয়া দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা এই সুধীসমাজে উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। গণিত, জ্যোতিষ, নিদান, স্থাপত্য—এই চতুস্তম্ভের উপর আধুনিক বিজ্ঞান ও তৎপ্রসূত সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, অথচ ঐ চারিটি বিজ্ঞানেরই জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বর্তমানে আমাদের এই অসামান্য উদ্ভাবনী প্রতিভা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ কি? আমরা কি

মানসিক বলে পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছি? না—তাহা নহে। আমাদের প্রতিভা অ-ফলপ্রসূ হইবার অন্য কারণ আছে।

'পুরাকালে আচার্য ও ঋষিগণ—যাঁহাদের বর্তমানকালে আমরা savant বলিয়া থাকি—রাজ-অনুগ্রহের আওতায় বসিয়া সাধনা করিতেন। অর্থচিন্তা তাঁহাদের ছিল না, অর্থের প্রয়োজন হইলে রাজা সে অর্থ যোগাইতেন; সাধনার সাফল্যের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, রাজকোষের অসীম ঐশ্বর্য তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দিত। আচার্যগণ অভাবমুক্ত হইয়া কুণ্ঠাহীন-চিত্তে সাধনা করিতেন এবং অন্তিমে সিদ্ধি লাভ করিতেন।

'কিন্তু বর্তমান ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অবস্থা কিরূপ? রাজা বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পরিপোষক নহেন—ধনী ব্যক্তিরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমিত আয়োজনের উপর নির্ভর করিয়া উঞ্ছবৃত্তির সাহায্যে আমাদের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়; ফলে আমাদের সিদ্ধিও তদুপযুক্ত হইয়া থাকে। মূষিক যেমন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও হস্তীকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে না, আমরাও তেমনই বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় সফল হইতে পারি না; ক্ষুধাক্ষীণ মস্তিষ্ক বৃহতের ধারণা করিতে পারে না।

'তবু আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি, যদি আমরা অর্থের অভাবে পীড়িত না হইয়া অকুণ্ঠ-চিত্তে সাধনা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা জগতের কোনও জাতির নিকটেই ন্যূন হইয়া থাকিতাম না। কিন্তু হায়! অর্থ নাই—কমলার কৃপার অভাবে আমাদের বাণীর সাধনা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। তবু, এই দৈন্য-নির্জিত অবস্থাতেও আমরা যাহা করিয়াছি, তাহা নিন্দার বিষয় নহে—শ্লাঘার বিষয়। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ল্যাবরেটরিতে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া মাঝে মাঝে অতর্কিতে আবির্ভূত হইয়া আবিষ্কর্তাকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, কে তাহার সংবাদ রাখে। আবিষ্কারক নিজের গোপন আবিষ্কার সযত্নে বুকে লুকাইয়া নীরবে আরও অধিক জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরিতেছে; কিন্তু সে একাকী, তাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই; বরঞ্চ সর্বদাই ভয়, অন্য কেহ তাহার আবিষ্কার-কণিকার সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা আত্মসাৎ করিবে। লোলুপ, পরস্বগৃধ্নু চোরের দল চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

'তাই বলিতেছি—অর্থ চাই, সহানুভূতি চাই, গবেষণা করিবার অবাধ অফুরন্ত উপকরণ চাই, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে নিষ্কণ্টকে যশোলাভের নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা চাই। অর্থ চাই—'

'থামো।'

প্রফেসর মহাশয়ের ভাষাটি বেশ গাল-ভরা, তাই শব্দপ্রবাহে গা ভাসাইয়া পড়িয়া চলিয়াছিলাম। হঠাৎ ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'থামো।'

'কি হল?'

'চাই—চাই—চাই। আর আস্ফালন ভাল লাগে না। বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কর।'

আমি বলিলাম, 'ঐ তো মজা। মানুষ নিজের অক্ষমতার একটা-না-একটা সাফাই সর্বদাই তৈরী করে রাখে। আমাদের দেশের আচার্যরাও যে তার ব্যতিক্রম নয়, দেবকুমারবাবুর লেকচার পড়লেই তা বোঝা যায়।'

ব্যোমকেশের মুখের বিরক্তি ও অবসাদ ভেদ করিয়া একটা ব্যঙ্গ-বঙ্কিম হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল, 'হাবুল ছোকরা দেখতে হাবাগোবা ভালমানুষ হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ বুদ্ধিমান। তার বাবা হয়ে দেবকুমারবাবু এমন ইয়ের মত আদি-অন্তহীন বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান কেন, এই আশ্চর্য!'

আমি বলিলাম, 'বুদ্ধিমান ছেলের বাবা হলেই বুদ্ধিমান হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। দেবকুমারবাবুকে তুমি দেখেছ?'

'ঠিক বলতে পারি না। তাঁকে দেখবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা কখনও প্রাণে জাগে নি। তবে শুনেছি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছেন। নির্বুদ্ধিতার এর চেয়ে বড় প্রমাণ

আর কি থাকতে পারে?' বলিয়া ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে চক্ষু মুদিল।

ঘড়িতে সাড়ে আটটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর কি করিব ভাবিয়া না পাইয়া শেষে পুঁটিরামকে আর এক দফা চা ফরমাস দিব মনে করিতেছি, এমন সময় ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।' কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া আবার ঠেসান দিয়া বসিয়া বিরস স্বরে বলিল, 'হাবুল। তার আবার কি হল? বড্ড তাড়াতাড়ি আসছে।'

মুহূর্ত পরেই হাবুল সজোরে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটা যেন ভয়ে ও অভাবনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার আঘাতে ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। এমনিতেই তাহার চেহারাখানা খুব সুদর্শন নয়, একটু মোটাসোটা ধরনের গড়ন, মুখ গোলাকার, চিবুক ও গণ্ডে নবজাত দাড়ির অন্ধকার ছায়া—তাহার উপর এই পাগলের মত আবির্ভাব; আমি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, 'কি হে হাবুল! কি হয়েছে?'

হাবুলের পাগলের মত দৃষ্টি কিন্তু ব্যোমকেশের উপর নিবন্ধ ছিল; আমার প্রশ্ন বোধ করি সে শুনিতেই পাইল না, টলিতে টলিতে ব্যোমকেশের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'ব্যোমকেশদা, সর্বনাশ হয়েছে। আমার বোন রেখা হঠাৎ মরে গেছে।' বলিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ হাবুলকে হাত ধরিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ তাহাকে শান্ত করা গেল না, সে অসহায়ভাবে কাঁদিতেই লাগিল। বেচারার বয়স বেশী নয়, বালক বলিলেই হয়; তাহার উপর অকস্মাৎ এই দারুণ ঘটনায় একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল।

হাবুলের যে বোন আছে, এ খবর আমরা জানিতাম না; তাহার পারিবারিক খুঁটিনাটি জানিবার কৌতূহল কোনও দিন হয় নাই। শুধু এইটুকু শুনিয়াছিলাম যে, হাবুলের মাতার মৃত্যুর পর দেবকুমারবাবু আবার বিবাহ করিয়াছিলেন। বিমাতাটি সপত্নী-পুত্রকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন না, ইহাও আঁচে-আন্দাজে বুঝিয়াছিলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়া হাবুল ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। দেবকুমারবাবু কয়েক দিন হইল দিল্লী গিয়াছেন; বাড়িতে হাবুল, তাহার অনূঢ়া ছোট বোন রেখা ও তাহাদের সৎমা আছেন। আজ সকালে উঠিয়া হাবুল যথারীতি নিজের তে-তলার নিভৃত ঘরে পড়িতে বসিয়াছিল; আটটা বাজিয়া যাইবার পর নীচে হঠাৎ সৎমার কণ্ঠে ভীষণ চীৎকার শুনিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল; দেখিল, সৎমা রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বস্বরে প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহার প্রলাপের কোনও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হাবুল রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার বোন রেখা উনানের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আছে। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য হাবুল তাহাকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু রেখা উত্তর দিল না। তখন তাহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিতেই হাবুল বুঝিল, রেখা নাই, তাহার গা বরফের মত ঠাণ্ডা, হাত-পা ক্রমশঃ শক্ত হইয়া আসিতেছে।

এই পর্যন্ত বলিয়া হাবুল আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এখন কি করব, ব্যোমকেশদা? বাবা বাড়ি নেই, তাই আপনার কাছে ছুটে এলুম। রেখা মরে গিয়েছে—উঃ! কি করে এমন হল, ব্যোমকেশদা?'

হাবুলের এই শোক-বিহ্বল ব্যাকুলতা দেখিয়া আমার চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। ব্যোমকেশ হাবুলের পিঠে হাত দিয়া বলিল, 'হাবুল, তুমি পুরুষমানুষ, বিপদে অধীর হয়ো না। কি হয়েছিল রেখার, বল দেখি—বুকের ব্যামো ছিল কি?'

'তা তো জানি না।'

'কত বয়স?'

'ষোল বছর, আমার চেয়ে দু'বছরের ছোট।'

'সম্প্রতি কোনও অসুখ-বিসুখ হয়েছিল? বেরিবেরি বা ঐ রকম কিছু?'

'না।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকাল চিন্তা করিল, তারপর বলিল, 'চল তোমার বাড়িতে। নিজের চোখে না দেখলে কিছুই ধারণা করা যাচ্ছে না। তোমার বাবাকে 'তার' করা দরকার, তিনি এসে পড়ুন। কিন্তু সে দু'ঘণ্টা পরে করলেও চলবে। আপাতত একজন ডাক্তার চাই। তোমার বাড়ির কাছেই ডাক্তার রুদ্র থাকেন না? বেশ—এস অজিত।'

কয়েক মিনিট পরে দেবকুমারবাবুর বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাড়িখানার সম্মুখভাগ সঙ্কীর্ণ, যেন দুই দিকের বাড়ির চাপে চ্যাপ্টা হইয়া ঊর্ধ্বদিকে উঠিয়া গিয়াছে। নীচের তলায় কেবল একটি বসিবার ঘর, তা ছাড়া ভিতরদিকে কলঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি আছে। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইতেই অন্দর হইতে একটা তীক্ষ্ণ স্ত্রীকণ্ঠের ছেদ-বিরাম-হীন আওয়াজ কানে আসিল। কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও শোকের লক্ষণ বিশেষ পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, বিমাতা বিলাপ করিতেছেন।

একটা বৃদ্ধ গোছের ভৃত্য কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'তুমি এ বাড়ির চাকর? যাও, ঐ বাড়ি থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এস।'

চাকরটা কিছু একটা করিবার সুযোগ পাইয়া 'যে আজ্ঞে' বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। তখন হাবুলকে অগ্রবর্তী করিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

যাঁহার কণ্ঠস্বর বাহির হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম, তিনি উপরে উঠিবার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া একাকী অনর্গল বকিয়া চলিয়াছিলেন, আমাদের পদশব্দে তাঁহার চমক ভাঙিল; তিনি উচ্চকিতভাবে আমাদের পানে চাহিলেন। দুইজন অপরিচিত লোককে হাবুলের সঙ্গে দেখিয়া তিনি মাথার উপর আঁচলটা টানিয়া দিয়া ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠিয়া গেলেন। আমি মুহূর্তের জন্য তাঁহার মুখখানা দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, তাঁহার আরক্ত চোখের ভিতর একটা ত্রাস-মিশ্রিত বিরক্তির ছায়া দেখা দিয়াই অঞ্চলের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া গেল।

হাবুল অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমার মা—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। রান্নাঘর কোন্‌টা?'

হাবুল অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিল। অল্প-পরিসর চতুষ্কোণ উঠান ঘিরিয়া ছোট ছোট কয়েকটি কক্ষ; তাহার মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সেইটি রান্নাঘর। পাশে একটি জলের কল, তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জল পড়িয়া দ্বারের সম্মুখভাগ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে।

জুতা খুলিয়া আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটা প্রায় অন্ধকার, আলো-প্রবেশের কোনও পথ নাই। হাবুল দরজার পাশে হাত বাড়াইয়া সুইচ টিপিতেই একটা ধোঁয়াটে বৈদ্যুতিক বাল্‌ব জ্বলিয়া উঠিল। তখন ঘরের অভ্যন্তরভাগ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম।

দ্বারের অপর দিকে দেয়ালে সংলগ্ন পাশাপাশি দু'টি কয়লার উনান, তাহাতে ভাঙা পাথুরে কয়লা স্তূপীকৃত রহিয়াছে; কিন্তু আগুন নাই। এই অগ্নিহীন চুল্লীর সম্মুখে নতজানু হইয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে—যেন বেদীপ্রান্তে উপাসনারত একটি স্ত্রীমূর্তি। মেয়েটির দেহ সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া আছে, মাথাও বুকের উপর নামিয়া পড়িয়াছে; হাত দু'টি লম্বিত দেখিয়া মনে হয় না যে, সে মৃত। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে গিয়া তাহার নাড়ী টিপিল।

তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, নাড়ী নাই। ব্যোমকেশ হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে মেয়েটির চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিল। প্রাণহীন দেহে মৃত্যুকাঠিন্য দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—মুখ অল্প একটু উঠিল।

মেয়েটি বেশ সুশ্রী, হাবুলের মত নয়। রং ফর্সা, মুখের গড়ন ধারালো, নীচের ঠোঁট

অভিমানিনীর মত স্বভাবতঃই ঈষৎ স্ফুরিত। ষোলো বছর বয়সের অনুযায়ী দেহ-সৌষ্ঠবও বেশ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। মাথায় দীর্ঘ চুলগুলি বোধ হয় স্নানের পূর্বে বিনুনি খুলিয়া পিঠে ছড়াইয়া দিয়াছিল, সেই ভাবেই ছড়ানো আছে। পরিধানে একটি অর্ধ-মলিন গঙ্গা-যমুনা ডুরে; অলঙ্কারের মধ্যে হাতে তিনগাছি করিয়া সোনার চুড়ি, কানে মিনা-করা হাল্কা ঝুমকা, গলায় একটি সরু হার।

ব্যোমকেশ নিকট হইতে তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর দূর হইতে তাহার বসিবার ভঙ্গী ইত্যাদি সমগ্রভাবে দেখিবার জন্য কয়েক পা সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল।

খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকিয়া সে আবার নিকটে ফিরিয়া আসিল; মেয়েটির ডান হাতখানি তুলিয়া করতল পরীক্ষা করিয়া দেখিল। করতলে কয়লার কালি লাগিয়া আছে—সে নিজের হাতে উনানে কয়লা দিয়াছে, সহজেই অনুমান করা যায়। অঙ্গুলিগুলি ঈষৎ কুঞ্চিত, তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অঙ্গুলি দু'টি সাবধানে পৃথক করিতেই একটি ক্ষুদ্র জিনিস খসিয়া মাটিতে পড়িল। ব্যোমকেশ সেটি মাটি হইতে তুলিয়া নিজের করতলে রাখিয়া আলোর দিকে পরীক্ষা করিল। আমিও ঝুঁকিয়া দেখিলাম—একটি দেশলাইকাঠির অতি ক্ষুদ্র দগ্ধাবশেষ, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলিয়া জ্বলিয়া আঙুল পর্যন্ত পৌঁছিলে যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু।

গভীর মনঃসংযোগে কাঠিটা কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ সেটা ফেলিয়া দিল, তারপর মেয়েটির বাঁ হাত তুলিয়া দেখিল। বাঁ হাতটি মুষ্টিবদ্ধ ছিল, মুঠি খুলিতেই একটি দেশলাইয়ের বাক্স দেখা গেল। ব্যোমকেশ বাক্সটি লইয়া খুলিয়া দেখিল, কয়েকটি কাঠি রহিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'হুঁ। আমিও তাই প্রত্যাশা করেছিলুম। দেশলাই জেবলে উনুনে আগুন দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় মৃত্যু হয়েছে।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহ ছাড়িয়া ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইল; মেঝের উপর সিক্ত পদচিহ্ন শুকাইয়া অস্পষ্ট দাগ হইয়াছিল, সেগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। শেষে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মৃত্যুকালে ঘরে আর কেউ ছিল না। পরে একজন স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকেছিলেন, তারপর হাবুল ঢুকেছিল।'

এই সময় বাহিরে শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ বলিল, 'বোধ হয় ডাক্তার রুদ্র এলেন। হাবুল, তাঁকে নিয়ে এস।'

হাবুল বাহিরে গেল। আমি এই অবসরে ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝলে?'

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িল, 'কিছু না। কেবল এইটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, মেয়েটি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জানত না যে, মৃত্যু এত নিকট।'

ডাক্তার রুদ্রকে লইয়া হাবুল ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার রুদ্র বয়স্থ লোক; কলিকাতার একজন নামজাদা চিকিৎসক। কিন্তু অত্যন্ত রূঢ় ও কটুভাষী বলিয়া তাঁহার দুর্নাম ছিল। মেজাজ সর্বদাই সপ্তমে চড়িয়া থাকিত; এমন কি মুমূর্ষু রোগীর ঘরেও তিনি এমন ব্যবহার করিতেন যে, তিনি না হইয়া অন্য কোনও ডাক্তার হইলে তাঁহার পেশা চলা কঠিন হইয়া পড়িত। একমাত্র চিকিৎসা-শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার বলে তিনি পসার-প্রতিপত্তি বজায় রাখিয়াছিলেন; এছাড়া তাঁহার মধ্যে অন্য কোনও গুণ আজ পর্যন্ত কেহ দেখিতে পায় নাই।

ডাক্তার রুদ্রের চেহারা হইতেও তাঁহার চরিত্রের আভাস পাওয়া যাইত। নিকষ কৃষ্ণ গায়ের রং, ঘোড়ার মত লম্বা কদাকার মুখে রক্তবর্ণ দুটা চক্ষুর দৃষ্টি দুর্বিনীত আত্মম্ভরি-তায় যেন মানুষকে মানুষ বলিয়াই গণ্য করে না। অধরোষ্ঠের গঠনেও ঐ সার্বজনীন অবজ্ঞা ফুটিয়া উঠিতেছে। তিনি যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন, তখন মনে হইল, মূর্তিমান দম্ভ কোট-প্যাণ্টালুন ও জুতা সুদ্ধ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাবুল নীরবে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভগিনীর দেহ দেখাইয়া দিল। ডাক্তার রুদ্র স্বভাব-কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে? মারা গেছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই দেখুন।'

ডাক্তার রুদ্র ব্যোমকেশের দিকে দম্ভ-কষায় নেত্র তুলিয়া বলিলেন, 'আপনি কে?'

'আমি পারিবারিক বন্ধু।'

'ও!'—ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ডাক্তার রুদ্র হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এটি কে—দেবকুমারবাবুর মেয়ে?'

হাবুল ঘাড় নাড়িল।

ডাক্তার রুদ্রের উত্থিত-ভ্রূ-ললাটে ঈষৎ কৌতূহল প্রকাশ পাইল। তিনি মৃতদেহের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'এরই নাম রেখা?'

হাবুল আবার ঘাড় নাড়িল।

'কি হয়েছিল?'

'কিছু না—হঠাৎ—'

ডাক্তার রুদ্র তখন হাঁটু গাড়িয়া রেখার পাশে বসিলেন; মুহূর্তের জন্য একবার নাড়ীতে হাত দিলেন, একবার চোখের পাতা টানিয়া চক্ষু-তারকা দেখিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মারা গেছে। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে। Rigor mortis set in করেছে।' কথাগুলি তিনি এমন পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন—যেন অত্যন্ত সুসংবাদ শুনিবামাত্র শ্রোতারা খুশী হইয়া উঠিবে।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'কিসে মৃত্যু হয়েছে, বলতে পারেন কি?'

'সেটা অটপ্সি না করে বলা অসম্ভব। আমি চললুম—আমার ভিজিট বত্রিশ টাকা বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। আর, পুলিসে খবর দেওয়া দরকার, মৃত্যু সন্দেহজনক।' বলিয়া ডাক্তার রুদ্র প্রস্থান করিলেন।

## ৩

রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুলিসে খবর পাঠানোই উচিত, নইলে আরও অনেক হাঙ্গামা হতে পারে। আমাদের থানার দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ আছে, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।'

এক টুকরা কাগজে তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ব্যোমকেশ চাকরের হাতে দিয়া থানায় পাঠাইয়া দিল। তারপর বলিল, 'মৃতদেহ এখন নাড়াচাড়া করে কাজ নেই, পুলিস এসে যা হয় করবে।' দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া কহিল, 'হাবুল, একবার রেখার ঘরটা দেখতে গেলে ভাল হত।'

ভারী গলায় 'আসুন' বলিয়া হাবুল আমাদিগকে উপরে লইয়া চলিল। প্রথম খানিকটা কান্নাকাটি করিবার পর সে কেমন যেন আচ্ছন্নের মত হইয়া পড়িয়াছিল; যে যাহা বলিতেছিল, কলের পুতুলের মত তাহাই পালন করিতেছিল।

দ্বিতলে গোটা তিনেক ঘর, তাহার সর্বশেষেরটি রেখার; বাকী দুইটি বোধ করি দেবকুমারবাবু ও তাহার গৃহিণীর শয়নকক্ষ। রেখার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ঘরটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও পরিপাটীভাবে গোছানো। আসবাব বেশী নাই, যে কয়টি আছে, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এক ধারে একখানি ছোট খাটের উপর বিছানা; অপর দিকে জানালার ধারে লিখিবার টেবিল। পাশে ক্ষুদ্র সেল্‌ফে দুই সারি বাঙ্গালা বই সাজানো। দেয়ালে ব্র্যাকেটের উপর একটি আয়না, তাহার পদমূলে চিরুণী, চুলের ফিতা, কাঁটা ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরটির সর্বত্র গৃহকর্মে সুনিপুণা ও শিক্ষিতা মেয়ের হাতের চিহ্ন যেন আঁকা রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ ঘরের এটা-ওটা নাড়িয়া একবার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, চুলের ফিতা ও কাঁটা লইয়া পরীক্ষা করিল; তারপর জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। জানালাটা ঠিক

গলির উপরেই; গলির অপর দিকে একটু পাশে ডাক্তার রুদ্রের প্রকাণ্ড বাড়ি ও ডাক্তারখানা। বাড়ির খোলা ছাদ জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল; তারপর ফিরিয়া টেবিলের দেরাজ ধরিয়া টানিল।

দেরাজে চাবি ছিল না, টান দিতেই খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহাতে বিশেষ কিছু নাই; দু' একটা খাতা, চিঠি লেখার প্যাড, গন্ধদ্রব্যের শিশি, ছুঁচ-সুতা ইত্যাদি রহিয়াছে। একটা শিশি তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ দেখিল, ভিতরে কয়েকটা সাদা ট্যাবলয়েড রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'অ্যাস্পিরিন। রেখা কি অ্যাস্পিরিন খেত?'

হাবুল বলিল, 'হ্যাঁ—মাঝে মাঝে তার মাথা ধরত—'

শিশি রাখিয়া দিয়া আবার ব্যোমকেশ চিন্তিতভাবে ঘরময় পরিভ্রমণ করিল, শেষে বিছানার সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। বিছানায় শয়নের চিহ্ন বিদ্যমান, লেপটা এলোমেলো ভাবে পায়ের দিকে পড়িয়া আছে, মাথার বালিশে মাথার চাপের দাগ। কিছুক্ষণের জন্য শ্মশান-বৈরাগ্যের মত একটা ভাব মনকে বিষণ্ণ করিয়া দিল—এই তো মানুষের জীবন—যাহার শয়নের দাগ এখনও শয্যা হইতে মিলাইয়া যায় নাই, সে প্রভাতে উঠিয়াই কোন্ অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ভাবে মাথার বালিশটা তুলিল; এক খণ্ড ফিকা সবুজ রঙের কাগজ বালিশের তলায় চাপা ছিল, বালিশ সরাইতেই সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্যোমকেশ সচকিতে কাগজখানা তুলিয়া লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, ভাঁজকরা চিঠির কাগজ। সে একবার একটু ইতস্তত করিল, তারপর চিঠির ভাঁজ খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।

আমিও গলা বাড়াইয়া চিঠিখানি পড়িলাম। মেয়েলী ছাঁদের অক্ষরে তাহাতে লেখা ছিল—

নন্তুদা,

আমাদের বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে গেল। তোমার বাবা দশ হাজার টাকা চান, অত টাকা বাবা দিতে পারবেন না।

আর কাউকে আমি বিয়ে করতে পারব না, এ বোধ হয় তুমি জানো। কিন্তু এ বাড়িতে থাকাও আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমাকে একটু বিষ দিতে পার? তোমাদের ডাক্তারখানায় তো অনেক রকম বিষ পাওয়া যায়। দিও; যদি না দাও, অন্য যে-কোনও উপায়ে আমি মরব। তুমি তো জানো, আমার কথার নড়চড় হয় না। ইতি—

তোমার রেখা

চিঠিখানা পড়িয়া ব্যোমকেশ নীরবে হাবুলের হাতে দিল। হাবুল পড়িয়া আবার ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রু-উদ্গলিত কণ্ঠে বলিল, 'আমি জানতুম এই হবে, রেখা আত্মহত্যা করবে—'

'নন্তু কে?'

'নন্তুদা ডাক্তার রুদ্রর ছেলে। রেখার সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধও হয়েছিল। নন্তুদা বড় ভাল, কিন্তু ঐ চামারটা দশ হাজার টাকা চেয়ে বাবাকে রাগিয়ে দিলে—'

ব্যোমকেশ নিজের মুখের উপর দিয়া একবার হাত চালাইয়া বলিল, 'কিন্তু—; যাক।' তারপর হাবুলের হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া স্নিগ্ধস্বরে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। হাবুল রুদ্ধস্বরে বলিল, 'ব্যোমকেশদা, নিজের বলতে আমার ঐ বোনটি ছাড়া আর কেউ ছিল না। মা নেই—বাবাও আমাদের কথা ভাববার সময় পান না—' বলিয়া সে মুখে কাপড় দিয়া ফুঁপাইতে লাগিল।

যা হোক, ব্যোমকেশের স্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্যে কিছুক্ষণ পরে সে অনেকটা শান্ত হইল। তখন ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, এখনই পুলিস আসবে। তার আগে তোমার মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

হাবুলের বিমাতা নিজের ঘরে ছিলেন। হাবুল গিয়া ব্যোমকেশের আবেদন জানাইল, তিনি আড়ঘোমটা টানিয়া দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইতিপূর্বে তাঁহাকে এক-নজর

মাত্র দেখিয়াছিলাম, এখন আরও ভাল করিয়া দেখিলাম।

তাঁহার বয়স বোধ হয় সাতাশ-আটাশ বছর; রোগা লম্বা ধরনের চেহারা, রং বেশ ফর্সা, মুখের গড়নও সুন্দর। কিন্তু তবু তাঁহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলা তো দূরের কথা, চলনসই বলিতেও দ্বিধা হয়। চোখের দৃষ্টিতে একটা স্থায়ী প্রখরতা ভ্রূযুগলের মধ্যে দুইটি ছেদ-রেখা টানিয়া দিয়াছে; পাৎলা সুগঠিত ঠোঁট এমনভাবে ঈষৎ বাঁকা হইয়া আছে, যেন সর্বদাই অন্যের দোষ-ত্রুটি দেখিয়া শ্লেষ করিতেছে। তাঁহার অসন্তোষ-চিহ্নিত মুখ দেখিয়া আমার মনে হইল, বিবাহের পর হইতে ইনি এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই। মানসিক উদারতার অভাবে সপত্নী-সন্তানদের কখনও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন নাই, নিজেরও সন্তান হয় নাই; তাই তাঁহার স্নেহহীন চিত্ত মরুভূমির মত ঊষর ও শুষ্ক রহিয়া গিয়াছে।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—তাঁহার বোধহয় শুচিবাই আছে। তিনি যেরূপ ভঙ্গীতে দ্বারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে মনে হইল, তিনি নিজেকে ও নিজের ঘরটিকে সর্বপ্রকার অশুদ্ধি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। পাছে আমরা তাঁহার ঘরে পদার্পণ করিয়া ঘরের নিষ্কলুষ পবিত্রতা নষ্ট করিয়া দিই, তিনি দ্বার আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

আমরা অবশ্য ঘরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলাম না, বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'আজ সকালে রেখার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?'

প্রত্যুত্তরে মহিলাটি একগঙ্গা কথা বলিয়া গেলেন। দেখিলাম, অন্যান্য নারীসুলভ সদ্‌গুণের মধ্যে বাচালতাও বাদ যায় নাই—একবার কথা কহিবার অবকাশ পাইলে আর থামিতে পারেন না। ব্যোমকেশের স্বল্পাক্ষর প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁহার মনের ও সংসারের অধিকাংশ কথাই বলিয়া ফেলিলেন। আজ সকালে ঝি আসে নাই দেখিয়া তিনি রেখাকে রান্নাঘর নিকাইয়া উনানে আগুন দিতে বলিয়াছিলেন। অবশ্য সপত্নী-সন্তানদের তিনি কখনও আঙুল নাড়িয়াও সংসারের কোনও কাজ করিতে বলেন না—নিজের গতর যতদিন আছে, নিজেই সব করেন। কিন্তু তবু সংসারের ঊনকুটি-চৌষট্টি কাজ তো আর একা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়, তাই তিনি রেখাকে উনান ধরাইতে বলিয়া স্বয়ং নিজের শয়ন-কক্ষের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন। স্নান সারিয়া উপরে চলিয়া আসিয়া-ছিলেন, রান্নাঘরে কি হইতেছে না হইতেছে, দেখেন নাই। তারপর কাপড় ছাড়িয়া চুল মুছিয়া দশবার ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া নীচে গিয়া দেখেন—ঐ কাণ্ড! সপত্নী-সন্তানদের কোনও কথায় তিনি থাকেন না, অথচ এমনই তাঁহার দুর্দৈব যে, যত ঝঞ্ঝাট তাঁহাকেই পোহাইতে হয়। এখন যে ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে সকলে হয়তো তাঁহাকেই দুষিবে, বিশেষতঃ কর্তা ফিরিয়া আসিয়া যে কি মহামারী কাণ্ড বাধাইবেন, তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। একে তো তিনি কর্তার চক্ষুঃশূল, তিনি মরিলেই কর্তা বাঁচেন।

বাক্যস্রোত কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আজ সকালে আপনি রেখাকে কি কোনও রূঢ় কথা বলেছিলেন?'

এবার মহিলাটি একবারে ঝাঁকিয়া উঠিলেন, 'রূঢ় কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয় না তেমন ভদ্রলোকের মেয়ে আমি নই। এ বাড়িতে ঢুকে অবধি সতীন-পো সতীন-ঝি নিয়ে ঘর করছি, কিন্তু কেউ বলুক দেখি যে, একটা কড়া কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। তবে আজ সকালে রেখাকে উনুন ধরাতে পাঠালুম, সে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে, 'দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না।'—বলে ঘরে ঢুকে ব্র্যাকেটের উপর থেকে দেশলাই নিলে। আমি তখন মেঝে মুছছিলুম, বললুম, 'বাসি কাপড়ে ঘরে ঢুকলে? এতবড় মেয়ে হয়েছ, এটুকু হুঁস নেই? দেশলাইয়ের দরকার ছিল, দোকান থেকে একটা আনিয়ে নিলেই পারতে।' এইটুকু বলেছি, এ ছাড়া আর একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয় নি। এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ঘাট মানছি।'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'অপরাধের কথা নয়; কিন্তু দেশলাই নিতে রেখা আপনার ঘরে এল কেন? আপনার ঘরেই কি দেশলাই থাকে?'

গৃহিণী বলিলেন, 'হ্যাঁ। রাত্তিরে আমি অন্ধকারে ঘুমতে পারি না, তেলের ল্যাম্প জ্বেলে শুই—তাই ঘরে দেশলাই রাখতে হয়। ঐ ব্র্যাকেটের উপর ল্যাম্প আর দেশলাই থাকে। সবাই জানে, রেখাও জানত।'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, খাটের শিয়রের দিকে দেয়ালে একটি ক্ষুদ্র কাঠের ব্র্যাকেট, তাহার উপর ছোট একটি ল্যাম্প রহিয়াছে। ঘরের অন্যান্য অংশও এই সুযোগে দেখিয়া লইলাম। পরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে ঘরের আসবাবপত্র যেন আড়ষ্ট হইয়া আছে। এমন কি দেয়ালে লম্বিত মা কালীর ছবিখানিও যেন ঘরের শুচিতা-ভঙ্গের ভয়ে সন্ত্রস্তভাবে জিভ বাহির করিয়া আছেন।

চিন্তাকুঞ্চিত ললাটে ব্যোমকেশ বলিল,—"ও—তাহলে এই সময় রেখাকে আপনি শেষ দেখেন? তারপর আর তাকে জীবিত দেখেননি?"

'না'—বলিয়া গৃহিণী বোধ করি আবার একপ্রস্থ বক্তৃতা শুরু করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হইতে চাকর জানাইল যে, দারোগাবাবু আসিয়াছেন।

আমরা নীচে নামিয়া গেলাম।

দারোগা বীরেনবাবুর সহিত ব্যোমকেশের ঘনিষ্ঠতা ছিল, দুজনেই দুজনের কদর বুঝিতেন। বীরেনবাবু মধ্যবয়স্ক লোক, হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা—বিচক্ষণ ও চতুর কর্মচারী বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার মধ্যে পুলিস-সুলভ আত্মম্ভরিতা বা অন্যের কৃতিত্ব লঘু করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। কয়েকটা জটিল ব্যাপারে ব্যোমকেশকে তাঁহার সাহায্য লইতেও দেখিয়াছি। শহরের নিম্নশ্রেণীর গাঁটকাটা ও গুন্ডাদের চালচলন সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ অভিজ্ঞতা ছিল।

ব্যোমকেশের সহিত মুখোমুখি হইতেই বীরেনবাবু বলিলেন, 'কি খবর, ব্যোমকেশ-বাবু! গুরুতর কিছু না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি নিজেই তার বিচার করুন। বলিয়া তাঁহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

## ৪

মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের জন্য রওনা করিয়া দিয়া, দেবকুমারবাবুকে 'তার' পাঠাইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিতে বেলা দুটা বাজিয়া গেল। বাসায় ফিরিয়া আমরা যখন আহারাদি সম্পন্ন করিয়া উঠিলাম, তখন শীতের বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বিমনা ও নীরব হইয়া রহিল। আমিও মনের মধ্যে অনুতাপের মত একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। মস্তিষ্কের যে খোরাকের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তাহা এমন নির্মমভাবে দেখা দিবে, কে ভাবিয়াছিল? বেচারা হাবুলের কথা বার বার মনে পড়িয়া মনটা ব্যথা-পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল, ব্যোমকেশ দৃষ্টিহীন চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া নীরব হইয়াই রহিল। তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আত্মহত্যাই তাহলে? কি বল?'

ব্যোমকেশ চমকিয়া উঠিল, 'অ্যাঁ! ও—রেখার কথা বলছ? তোমার কি মনে হয়?'

যদিও মন সম্পূর্ণ সংশয়মুক্ত ছিল না, তবু বলিলাম, 'আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? চিঠি থেকে তো ওর অভিপ্রায় বেশ বোঝাই যাচ্ছে।'

'তা যাচ্ছে। কি উপায়ে আত্মহত্যা করেছে, তুমি মনে কর?'

'বিষ খেয়ে। সে কথাও তো চিঠিতে—'

'আছে। কিন্তু বিষ পাবার আগেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা কি করে হতে পারে, আমি ভেবে পাচ্ছি না। চিঠিতে রেখা বিষ চেয়েছিল, কিন্তু চিঠি যখন যথাস্থানে পৌঁছায়নি লেখিকার বালিশের তলাতেই থেকে গিয়েছিল, তখন বিষ এল কোত্থেকে?'

আমি বলিলাম, 'চিঠিতে আছে. সে বিষ না পেলে অন্য যে কোনও উপায়ে—'

'কিন্তু চিঠি পাঠাবার আগেই সে অন্য উপায় অবলম্বন করবে. এটা তুমি সম্ভব মনে কর?'

আমি নিরুত্তর হইলাম।

কিয়ৎকাল পরে ব্যোমকেশ বলিল, 'তা ছাড়া উনুন জ্বালতে জ্বালতে কেউ আত্মহত্যা করে না। রেখার মৃত্যু এসেছিল অকস্মাৎ—নির্মেঘ আকাশ থেকে বিদ্যুতের মত। এত ক্ষিপ্র এমন অমোঘ এই মৃত্যুবাণ যে. সে একটু নড়বার অবকাশ পায়নি, দেশলাইয়ের কাঠি হাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।'

'কি করে এমন মৃত্যু সম্ভব হল?'

'সেইটেই বুঝতে পারছি না। জানি তো বিষের মধ্যে এক হাইড্রোসায়েনিক অ্যাসিড ছাড়া এত ভয়ংকর শক্তি আর কারুর নেই। কিন্তু—' ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা চিন্তার মধ্যে নির্বাণ লাভ করিল।

আমি একটু সংকুচিতভাবে বলিলাম, 'আমি ডাক্তারী সম্বন্ধে কিছু জানি না, কিন্তু হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু সম্ভব নয় কি?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ঐ সম্ভাবনাটাই দেখছি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছে। রেখা মাথাধরার জন্যে অ্যাস্‌পিরিন খেত, হয়তো ভেতরে ভেতরে হৃদযন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কিন্তু না, কোথায় যেন বেধে যাচ্ছে, হার্টফেলের সম্ভাবনাটা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করতে পারছি না, যদিও যুক্তি-প্রমাণ সব ঐ দিকেই নির্দেশ করছে।' ব্যোমকেশ অপ্রতিভভাবে হাসিল—'বুদ্ধির সঙ্গে মনের আপোষ করতে পারছি না; কেবলই মনে হচ্ছে, মৃত্যুটা সহজ নয়. সাধারণ নয়, কোথায় এর একটা মস্ত গলদ আছে। কিন্তু যাক, এখন মিথ্যে মাথা গরম করে লাভ নেই। কাল ডাক্তারের রিপোর্ট পেলেই সব বোঝা যাবে।'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশ উঠিয়া আলো জ্বালিল। এই সময় বহির্দ্বারে আস্তে আস্তে টোকা মারার শব্দ হইল। সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যায় নাই, ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'কে? ভেতরে এস!'

একটি অপরিচিত যুবক নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। স্বাস্থ্যপূর্ণ বলিষ্ঠ দেহ. সুশ্রী চেহারা —কিন্তু শুষ্ক বিবর্ণ মুখে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে। পায়ে রবার-সোল জুতা ছিল বলিয়া তাহার পদধ্বনি শুনিতে পাই নাই। সে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, 'আমার নাম মন্মথনাথ রুদ্র—'

ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল. 'আপনিই নন্তুবাবু? আসুন।'—বলিয়া একটা চেয়ার দেখাইয়া দিল।

চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া যুবক থামিয়া থামিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে চেনেন?

ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিয়া বলিল, 'সম্প্রতি আপনার নাম জানবার সুযোগ হয়েছে। আপনি রেখার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে চান?'

যুবকের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপিয়া গেল, সে বলিল. 'হ্যাঁ। কি করে তার মৃত্যু হল ব্যোমকেশবাবু?

'তা এখনও জানা যায়নি।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চক্ষু ব্যোমকেশের মুখের উপর রাখিয়া মন্মথ বলিল, 'আপনার কি সন্দেহ সে আত্মহত্যা করেছে?'

'সম্ভব নয়।'

'তবে কি কেউ তাকে—'

'এখনও জোর করে কিছু বলা যায় না।'

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মন্মথ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া অস্পষ্ট-স্বরে বলিল, 'আপনারা হয়তো শুনেছেন, রেখার সঙ্গে আমার—'

'শুনেছি।'

মন্মথ এতক্ষণ জোর করিয়া সংযম রক্ষা করিতেছিল, এবার ভাঙিয়া পড়িল. অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল. 'ছেলেবেলা থেকে ভালবাসতুম; যখন রেখার ছ'বছর বয়স. আমি ওদের বাড়িতে খেলা করতে যেতুম. তখন থেকে। তারপর যখন বিয়ের সম্বন্ধ হল. তখন বাবা এমন এক শর্ত দিলেন যে. বিয়ে ভেঙে গেল। তবু আমি ঠিক করেছিলুম. বাবার মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করব। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। বাবা বললেন বাড়ি থেকে দূর করে দেবেন। তবু আমি—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল. 'বাবার সঙ্গে আপনার কখন ঝগড়া হয়েছিল?'

'কাল দুপুরবেলা। আমি বলেছিলুম. রেখাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না! তখন কে জানত যে রেখা—কিন্তু কেন এমন হল. ব্যোমকেশবাবু? রেখাকে প্রাণে মেরে কার কি লাভ হল?'

ব্যোমকেশ একটা পেন্সিল লইয়া টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছিল. মুখ না তুলিয়া বলিল. 'আপনার বাবার কিছু লাভ হতে পারে।'

মন্মথ চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল. 'বাবা! না না—এ আপনি কি বলছেন? বাবা—'

ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে শূন্যের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া. মন্মথ আর কোনও কথা না বলিয়া স্খলিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে গাঢ় মনঃসংযোগে টেবিলের উপর হিজিবিজি কাটিতেছে।

৫

পরদিন সকালবেলাটা ডাক্তারের রিপোর্টের প্রতীক্ষায় কাটিয়া গেল। কিন্তু রিপোর্ট আসিল না। ব্যোমকেশ ফোন করিয়া থানায় খবর লইল, কিন্তু সেখানে কোনও খবর পাওয়া গেল না।

বৈকালে বেলা আন্দাজ সাড়ে চারটার সময় দেবকুমারবাবু আসিলেন। আলাপ না থাকিলেও তাঁহার সহিত মুখচেনা ছিল; আমরা খাতির করিয়া তাঁহাকে বসাইলাম। তিনি হাবুলের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র দিল্লী ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিলেন, আজ দ্বিপ্রহরে আসিয়া পেঁছিয়াছেন।

তাঁহার বয়স চল্লিশ কি একচল্লিশ বৎসর; কিন্তু চেহারা দেখিয়া আরও বর্ষীয়ান মনে হয়। মোটাসোটা দেহ. মাথায় টাক. চোখে পুরু কাচের চশমা। তিনি স্বভাবতঃ একটু অন্যমনস্ক প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হয়—অর্থাৎ বাহিরের জগতের চেয়ে অন্তর্লোকেই বেশী বাস করেন। তাঁহার গলাবন্ধ কোট ও গোল চশমা-পরিহিত পেচকের ন্যায় চেহারা কলিকাতার ছাত্রমহলে কাহারও অপরিচিত ছিল না. প্রতিবেশী বলিয়া আমিও পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি। কিন্তু এখন দেখিলাম, তাঁহার চেহারা কেমন যেন শুকাইয়া উঠিয়াছে। চোখের কোলে গভীর কালির দাগ. গালের মাংস চুপসিয়া গিয়াছে. পূর্বের সেই পরিপুষ্ট ভাব আর নাই।

চশমার কাচের ভিতর দিয়া আমার পানে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তিনি বলিলেন. 'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

আমি ব্যোমকেশকে দেখাইয়া দিলাম। তিনি ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন. 'ও।' —বলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা টেবিলের উপর রাখিলেন।

ব্যোমকেশ অস্ফুটস্বরে মামুলি দু'একটা সহানুভূতির কথা বলিল; দেবকুমারবাবু বোধ হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষু একবার ঘরের চারিদিক পরিভ্রমণ করিল, তারপর তিনি ক্লান্তিশিথিল স্বরে বলিলেন. 'কাল বেলা দশটায় দিল্লী থেকে বেরিয়ে আজ আড়াইটার সময় এসে পেঁছেছি। প্রায় ত্রিশ ঘণ্টা ট্রেনে—'

আমরা চুপ করিয়া রহিলাম; দৈহিক শ্রান্তির পরিচয় তাঁহার প্রতি অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

দেবকুমার অতঃপর ব্যোমকেশের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া বলিলেন, 'হাবুলের মুখে আপনার কথা শুনেছি—বিপদের সময় সাহায্য করেছেন, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সে কি কথা, যদি একটু সাহায্য করতে পেরে থাকি, সে তো প্রতিবেশীর কর্তব্য।'

'তা বটে; কিন্তু আপনি কাজের লোক—' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছিল মেয়েটার? কিছু বুঝতে পেরেছেন কি? বাড়িতে ভাল করে কেউ কিছু বলতে পারলে না।'

ব্যোমকেশ তখন যতখানি দেখিয়াছিল ও বুঝিয়াছিল, দেবকুমারবাবুকে বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে দেবকুমারবাবু অন্যমনস্কভাবে পকেট হইতে সিগার বাহির করিলেন সিগার মুখে ধরিয়া তারপর আবার কি মনে করিয়া সেটি টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, দেখিলাম, ব্যোমকেশের কথা শুনিতে শুনিতে তিনি এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, স্নায়বিক উত্তেজনার বশে তাঁহার অস্থির হাত দু'টা যে কি করিতেছে, সে দিকে লক্ষ্য নাই। একবার তিনি চশমা খুলিয়া বড় বড় চোখ দু'টা নিষ্পলকভাবে প্রায় দু'মিনিট আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; তারপর আবার চশমা পরিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশের বিবরণ শেষ হইলে দেবকুমারবাবু অনেকক্ষণ নীরব হইয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'হুঁ, ঐ ডাক্তার রুদ্রটা আমার বাড়িতে ঢুকেছিল! চামার! চণ্ডাল! টাকার জন্য ও পারে না, এমন কাজ নেই। একটা জীবন্ত পিশাচ!' উত্তেজনার বশে তিনি লাঠিটা মুঠি করিয়া ধরিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার মুখ হঠাৎ ভীষণ হিংস্রভাব ধারণ করিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই কিন্তু আবার তাঁহার মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমাদের চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয় মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, 'আমি যাই। ব্যোমকেশবাবু, আর একবার আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কি চিন্তা করিলেন; তারপর ফিরিয়া বলিলেন, 'আমার পয়সা থাকলে এ ব্যাপারের অনুসন্ধানে আপনাকে নিযুক্ত করতুম। কিন্তু আমি গরীব—আমার পয়সা নেই।' ব্যোমকেশ কি একটা বলিতে চাহিলে তিনি লাঠি নাড়িয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, 'বিনা পারিশ্রমিকে আমি কারুর সাহায্য গ্রহণ করতে পারব না। পুলিস অনুসন্ধান করছে, তারাই যা পারে করুক। আর, অনু-সন্ধান করবার আছেই বা কি? হাজার অনুসন্ধান করলেও আমার মেয়ে তো আর আমি ফিরিয়ে পাব না।' বলিয়া কোনও প্রকার অভিবাদন না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

এই অদ্ভুত মনুষ্যটি চলিয়া যাইবার পর দীর্ঘকাল আমরা হতবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা ভ্রম সংশোধন হল। আমার ধারণা হয়েছিল, দেবকুমারবাবু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়েদের ভালবাসেন না—সেটা ভুল। অন্তত মেয়েকে তিনি খুব বেশী ভালবাসেন।'

সিগারটা দেবকুমারবাবু ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেটার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য অন্যমনস্ক লোক।' বলিয়া ধীরে ধীরে পায়চারি করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, 'ডাক্তার রুদ্র'র ওপর ভয়ঙ্কর রাগ দেখলুম।'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না।

সন্ধ্যার পর দারোগা বীরেনবাবু স্বয়ং ডাক্তারের রিপোর্ট লইয়া আসিলেন। বলিলেন, 'রিপোর্ট বড় disappointing, বারবার পরীক্ষা করেও মৃত্যুর কারণ ধরতে পারা যায়নি।'

রিপোর্ট পড়িয়া দেখিলাম, ডাক্তার লিখিয়াছেন, দেহের কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই;

শরীরের অভ্যন্তরেও কোনও বিষ পাওয়া যায় নাই। হৃদযন্ত্র সবল ও স্বাভাবিক, সুতরাং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার জন্য মৃত্যু হয় নাই। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অকস্মাৎ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষাঘাত ঘটিল, তাহা বলিতে ডাক্তার অক্ষম। এরূপ অদ্ভুত লক্ষণহীন মৃত্যু তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই।

ব্যোমকেশ কাগজখানা হাতে লইয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তিতমুখে বসিয়া রহিল।

বীরেনবাবু বলিলেন, 'এ কেস অবশ্য করোনারের কোর্টে যাবে; সেখানে 'অজ্ঞাত কারণে মৃত্যু' রায় বেরুবে। তারপর আমরা—অর্থাৎ পুলিস—ইচ্ছে করলে অনুসন্ধান চালাতে পারি, আবার না-ও চালাতে পারি। ব্যোমকেশবাবু, আপনি কি বলেন? এই রিপোর্টের পর অনুসন্ধান করলে কোনও ফল হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফল হবে কি না বলতে পারি না; কিন্তু অনুসন্ধান চালানো উচিত।'

বীরেনবাবু উৎসুকভাবে বলিলেন, 'কেন বলুন দেখি? আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'ঠিক যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সন্দেহ করি, তা নয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর মধ্যে গোলমাল আছে।'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'আমারও তাই মনে হয়। আচ্ছা, দেবকুমারবাবুর স্ত্রীকে আপনার কি রকম মনে হল?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, 'দেখুন, আমার মনে হয়, ও-পথে গেলে হবে না। এ মৃত্যু-রহস্যের জট ছাড়াতে হলে সর্বপ্রথম জানতে হবে—কি উপায়ে মৃত্যু হয়েছিল। এটা যতক্ষণ না জানতে পারছেন, ততক্ষণ একে ওকে সন্দেহ করে কোনও ফল হবে না। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, মেয়েটির মৃত্যুর সময় তার সৎমা আর সহোদর ভাই ছাড়া বাড়িতে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাই বলে আসল জিনিসটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিলে চলবে না।'

'কিন্তু ডাক্তার যে-কথা বলতে পারছে না—'

'ডাক্তার কেবল শব পরীক্ষা করেছেন, আমরা শব ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখেছি। সুতরাং ডাক্তার যা পারেননি আমরাও তা পারব না, এমন কোনও কথা নেই।'

দ্বিধাপূর্ণস্বরে বীরেনবাবু বলিলেন, 'তা বটে—কিন্তু; যা হোক, আপনি তো দেবকুমার-বাবুর পক্ষ থেকে গোড়া থেকেই আছেন, শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় থাকবেন—দুজনে পরামর্শ করে চলা যাবে।'

মৃদু হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। এই খানিক আগে দেবকুমারবাবু এসেছিলেন —তিনি আমাকে বরখাস্ত করে গেছেন।'

বিস্মিত বীরেনবাবু বলিলেন, 'সে কি?'

'হ্যাঁ। আমার অবৈতনিক সাহায্য তিনি চান না—আর টাকা দিয়ে আমাকে নিয়োগ করতে তিনি অক্ষম।'

'বটে! তিনি অক্ষম কিসে? তিনি তো মোটা মাইনের চাকরী করেন, সাত আটশ' টাকা মাইনে পান শুনেছি।'

'তা হবে।'

বীরেনবাবুর ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, 'হুঁ, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আপনার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করবার কি কারণ থাকতে পারে? তিনি কাউকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন না তো?'

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। দেবকুমারবাবু অপরাধীকে আড়াল করিবার জন্য কৌশলে ব্যোমকেশের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এ কথা শুনিতে যেমন অদ্ভুত, তেমনিই হাস্যকর।

বীরেনবাবু ঈষৎ তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, 'হাসছেন যে?'

আমি অপ্রস্তুত হইয়া বলিলাম, 'আপনি দেবকুমারবাবুকে দেখেছেন?'

'না।'

'তাঁকে দেখলেই বুঝবেন, কেন হাসছি।'

অতঃপর বীরেনবাবু উঠিলেন। বিদায়কালে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আমি এ ব্যাপারের তল পর্যন্ত অনুসন্ধান করে দেখব, যদি কিনারা করতে পারি।—আপনি কিন্তু ছাড়া পাবেন না। দেবকুমারবাবু আপনাকে বরখাস্ত করেছেন বটে, কিন্তু দরকার হলে আমি আপনার কাছে আসব মনে রাখবেন।'

ব্যোমকেশ খুশী হইয়া বলিল, 'সে তো খুব ভাল কথা। আমার যতদূর সাধ্য আপনাকে সাহায্য করব। হাবুলের সম্পর্কে এ ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত আকর্ষণও রয়েছে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আচ্ছা, উপস্থিত কোন্ পথে চললে ভাল হয়, কিছু ইঙ্গিত দিতে পারেন কি? যা হোক একটা সূত্র ধরে কাজ আরম্ভ করতে হবে তো।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'ডাক্তার রুদ্র'র দিক থেকে কাজ আরম্ভ করুন; এ গোলক-ধাঁধার সত্যিকার পথ হয়তো ঐ দিকেই আছে।'

বীরেনবাবু চকিতভাবে চাহিলেন, 'ও—আচ্ছা—'

তিনি নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন।

ইহার পর পাঁচ ছয় দিন একটানা ঘটনাহীনভাবে কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ আবার যেন ঝিমাইয়া পড়িল। সকালে কাগজ পড়া এবং বৈকালে টেবিলের উপর পা তুলিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষু শূন্যে মেলিয়া থাকা ছাড়া তাহার আর কাজ রহিল না।

বীরেনবাবুও এ কয়দিনের মধ্যে দেখা দিলেন না, তাই তাঁহার তদন্ত কতদূর অগ্রসর হইল, জানিতে পারিলাম না। আগন্তুকের মধ্যে কেবল হাবুল একবার করিয়া আসিত। সে আসিলে ব্যোমকেশ নিজের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া নানাবিধ আলোচনায় তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু হাবুলের মনে যেন একটা বিমর্ষ অবসন্নতা স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সে নৈরাশ্যপূর্ণ দীপ্তিহীন চোখে চাহিয়া নীরবে বসিয়া থাকিত, তারপর আস্তে আস্তে উঠিয়া চলিয়া যাইত।

বাড়িতে কি হইতেছে না হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলেও সে ভালরূপ জবাব দিতে পারিত না। বিমাতার রসনা নরম না হইয়া আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথার ভঙ্গীতে ইহার আভাস পাইতাম। শেষদিন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বাবা আজ রাত্রে পাটনা যাচ্ছেন; সেখানে য়ুনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে হবে।' বুঝিলাম, শোকের উপর অহর্নিশি কথার কচকচি সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পলায়ন করিতেছেন। এই নির্লিপ্তস্বভাব বৈজ্ঞানিকের পারিবারিক অশান্তির কথা ভাবিয়া দুঃখ হইল।

সেদিন হাবুল প্রস্থান করিবার পর বীরেনবাবু আসিলেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, বিশেষ সুবিধা করিতে পারেন নাই। যাহোক ব্যোমকেশ তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইল।

আমাদের বৈকালিক চায়ের সময় হইয়াছিল, অচিরাৎ চা আসিয়া পৌঁছিল। তখন ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর—খবর কিছু আছে?'

পেয়ালায় চুমুক দিয়া বিমর্ষভাবে বীরেনবাবু বলিলেন, 'কোনও দিকেই কিছু সুবিধা হচ্ছে না। যেদিকে হাত বাড়াচ্ছি কিছু ধরতে ছুঁতে পারছি না, প্রমাণ পাওয়া তো দূরের কথা, একটা সন্দেহের ইশারা পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ, আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে, এর ভেতর একটা গভীর রহস্য লুকোনো রয়েছে; যতই প্রতিপদে ব্যর্থ হচ্ছি, ততই এ বিশ্বাস দৃঢ় হচ্ছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নূতন কিছু জানতে পেরেছেন

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম। তিনি অবশ্য রিপোর্টের বাইরে যেতে রাজী নন, তবু মনে হল, তাঁর একটা থিয়োরি আছে। তিনি মনে করেন, কোনও অজ্ঞাত বিষের বাষ্প নাকে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয়েছে। তিনি খুব অস্পষ্ট আবছায়াভাবে কথাটা বললেন বটে, তবু মনে হল, তাঁর ঐ বিশ্বাস।'

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল, 'উনুন ধরাবার সময় মৃত্যু হয়েছিল, এ কথা ডাক্তারকে বলেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর এ দিকে? ডাক্তার রুদ্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। যতদূর জানতে পারলুম, লোকটা নির্জলা পাষণ্ড আর অর্থপিশাচ। কয়েকজন ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর উপর নিজের আবিষ্কৃত ইন্‌জেক্‌শান পরীক্ষা করতে গিয়ে তাদের সাবাড় করেছে, এ গুজবও শুনেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ব্যাপারে তাকে খুনের আসামী করা যায় না। দেবকুমারবাবুর মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের সম্বন্ধ হয়েছিল, এ খবরও ঠিক। লোকটা দশ হাজার টাকা বরপণ দাবী করেছিল। দেবকুমারবাবুর অত টাকা দেবার ক্ষমতা নেই, কাজেই তাঁকে সম্বন্ধ ভেঙে দিতে হল। ডাক্তার রুদ্র'র ছেলেটা কিন্তু ভদ্রলোক বাপের সঙ্গে এই নিয়ে তার ভীষণ ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এ বাড়িতে এই কাণ্ড—মেয়েটি হঠাৎ মারা গেল। তারপর ছোকরাটি শুনলুম বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে গেছে: তার বিশ্বাস, তার বাপই প্রকারান্তরে মেয়েটির মৃত্যুর কারণ।'

মন্মথ যে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ সংবাদ নূতন বটে, কিন্তু আর সব কথাই আমরা পূর্বে হইতে জানিতাম। তাই পুরাতন কথা শুনিতে শুনিতে ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। বীরেনবাবু থামিলে সে প্রশ্ন করিল, দেবকুমারবাবুর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন বলেছিলেন, করেছিলেন না কি?'

'করেছিলুম। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। ধারকর্জ নেই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে দশ-বারো হাজার টাকা খরচ করা তাঁর অসাধ্য। লোকটি বোধ হয় বেহিসাবী, সাংসারিক বুদ্ধি কম। কলেজ থেকে বর্তমানে তিনি আটশ' টাকা মাইনে পান। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন, এই আটশ' টাকার অধিকাংশই যায় তাঁর বীমা কোম্পানীর পেটে। পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স করিয়েছেন, তাও এত বেশী বয়সে যে প্রিমিয়াম দিয়ে হাতে বড় কিছু থাকে না।'

ব্যোমকেশ বিস্মিতভাবে বলিল, 'পঞ্চাশ হাজার টাকার লাইফ ইন্সিওরেন্স! নিজের নামে করেছেন?'

'শুধু নিজের নামে নয়—জয়েণ্ট পলিসি, নিজের আর স্ত্রীর নামে। মাত্র এক বছর হল পলিসি নিয়েছেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তিনি মারা গেলে পাছে বিধবাকে পথে দাঁড়াতে হয়, এই জন্যেই বোধ হয় দু'জনে একসঙ্গে বীমা করিয়েছেন। এ টাকায় উত্তরাধিকারীদের দাবী থাকবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। আর কিছু?'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'আর কি? দেবকুমারবাবুর ছেলে হাবুলের পিছনেও লোক লাগিয়েছিলুম—যদি কিছু জানতে পারা যায়। সে ছোকরা কেমন যেন পাগলাটে ধরনের, কলেজে বড় একটা যায় না, রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, কখনও পার্কে চুপ করে বসে থাকে। আপনার কাছেও রোজ একবার করে আসে, জানতে পেরেছি।'

এই সময় হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, ব্যোমকেশের সে শৈথিল্য আর নাই, সে যেন অন্তরে-বাহিরে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অনেক দিন পরে তাহার চোখে সেই চাপা উত্তেজনার প্রখর দৃষ্টি দেখিতে পাইলাম। কিছু না বুঝিয়াও আমার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ কিন্তু বাহিরে কোনও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না, পূর্ববৎ বিরসস্বরে বলিল, 'হাবুলকে বাদ দিতে পারেন। উঠছেন না কি? থানাতেই থাকবেন তো? আচ্ছা

যদি দরকার হয়, ফোনে খবর নেব।'

বীরেনবাবু একটু অবাক্ হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিবার পর ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ পিছনে হাত দিয়া ঘরময় পায়চারি করিল; দেখিলাম, তাহার চোখে সেই-পুরাতন আলো জ্বলিতেছে। বীরেনবাবুকে সে হঠাৎ এমনভাবে বিদায় দিল কেন, জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছি এমন সময় সে চেয়ারের পিঠ হইতে শালখানা তুলিয়া লইয়া বলিল, 'চল, একটু বেড়িয়ে আসা যাক। বন্ধ ঘরে বসে মাথাটা গরম বোধ হচ্ছে।'

দু'জনে বাহির হইলাম। অকারণে বাড়ির বাহির হইতে ব্যোমকেশের একটা মজ্জাগত বিমুখতা ছিল; কাজ না থাকিলে সে ঘরের কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসিত। আমিও তাহার সংগদোষে কুনো হইয়া পড়িয়াছিলাম, একাকী কোথাও যাইবার অভ্যাসও ছাড়িয়া গিয়াছিল। তাই আজ তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ফাঁকা জায়গার বিশুদ্ধ বাতাস কামনা করিতেছে দেখিয়া খুশী হইয়া উঠিলাম।

পথে চলিতে চলিতে কিন্তু খুশীর ভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। জনসংকুল পথে ব্যোমকেশ এমনই বাহ্যজ্ঞানহীন উদ্‌ভ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল যে, ভয় হইল এখনই হয়তো একটা কান্ড বাধিয়া যাইবে। আমি তাহাকে সামলাইয়া লইয়া চলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অপ্রশমিত বেগে ইহাকে উহাকে ধাক্কা দিয়া, একবার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পা মাড়াইয়া দিয়া কয়েক মুহূর্ত পরে পুস্তকহস্তা এক তরুণীকে ঠেলা দিয়া দৃক্‌পাত না করিয়া জগন্নাথের অপ্রতিহত রথের মত অগ্রসর হইয়া চলিল। বাস্তবিক, এতটা আত্মবিস্মৃত তাহাকে আর কখনও দেখি নাই। তাহার মন যে অকস্মাৎ শিকারের সন্ধান পাইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হারাইয়া ছুটিয়াছে, তাহা আমি বুঝিতেছিলাম বটে, কিন্তু তাহার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন পথচারী তাহা বুঝিবে কেন?

ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটির স্রোত পিছনে ফেলিয়া কোনক্রমে কলেজ স্কোয়ার্ পর্যন্ত আসিয়া পেঁৗছিলাম। হাস্য-আলাপরত ছাত্রদের আবর্তমান জনতায় স্থানটি ঘূর্ণিচক্রের মত পাক খাইতেছে। আমি আর দ্বিধা না করিয়া ব্যোমকেশের হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। এখানে আর যাহাই হউক, বৃদ্ধ এবং তরুণীকে বিমর্দিত করিবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অশিষ্টতা যদি কিছু ঘটিয়া যায়, ফাঁড়াটা সহজেই কাটিয়া যাইবে। আমাদের দেশের ছাত্ররা স্বভাবত কলহপ্রিয় নয়।

পুকুরকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি জনপ্রবাহ বিপরীত মুখে ঘুরিতেছে; আমরা একটি প্রবাহে মিশিয়া গেলাম, সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। ব্যোমকেশ তখনও স্থানকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, তাহার ললাট একাগ্রচিন্তার সংকোচনে ভ্রূকুটিবন্ধুর; কাঁধের শাল মাঝে মাঝে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

আমি ভাবিতে লাগিলাম, বীরেনবাবুর কথার মধ্যে এমন কি ছিল, যাহা ব্যোমকেশের নিষ্ক্রিয় মনকে অকস্মাৎ পাঞ্জাব মেলের এঞ্জিনের মত সক্রিয় করিয়া তুলিয়াছে? তবে কি রেখার মৃত্যু-সমস্যার সমাধান আসন্ন?

সমাধান যে কত আসন্ন, তখনও তাহা বুঝিতে পারি নাই।

আধ ঘণ্টা এইভাবে পরিভ্রমণ করিবার পর ব্যোমকেশের বাহ্য-চেতনা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল; সে সহজ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকাইল। বলিল, 'আজ দেবকুমারবাবু পাটনা যাবেন—না?'

আমি ঘাড় নাড়িলাম।

'তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না—' ব্যোমকেশ সম্মুখদিকে তাকাইয়া কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ক্ষিপ্রচরণে অগ্রসর হইয়া গেল। দেখিলাম, এক কোণে একখানি বেঞ্চি ঘিরিয়া অনেক ছেলে জড়ো হইয়াছে এবং উত্তেজিতভাবে কথা বলিতেছে। ভিড়ের বাহিরে যাহারা ছিল, তাহারা গলা বাড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইল অসাধারণ কিছু ঘটিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া ব্যোমকেশ একটি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে?'

ছেলেটি বলিল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধ হয়, কেউ হঠাৎ বেঞ্চে বসে বসে মারা গেছে।'

ব্যোমকেশ ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল, আমিও তাহার পশ্চাতে রহিলাম। বেঞ্চির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি ছোকরা ঠেসান দিয়া বসিয়া আছে—যেন বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, পা সম্মুখদিকে প্রসারিত। অধরোষ্ঠ হইতে একটি সিগারেট ঝুলিতেছে—সিগারেটে অগ্নিসংযোগ হয় নাই। মুষ্টিবদ্ধ বাঁ হাতের মধ্যে একটি দেশলাইয়ের বাক্স।

একটি মেডিক্যাল ছাত্র নাড়ী ধরিয়া দেখিতেছিল, বলিল, 'নাড়ী নেই—মারা গেছে।'

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ভিড়ের মধ্যে ভাল দেখা যাইতেছিল না। ব্যোমকেশ চিবুক ধরিয়া মৃতের আনমিত মুখ তুলিয়াই যেন বিদ্যুদাহতের মত ছাড়িয়া দিল।

আমারও বুকে হাতুড়ির মত একটা প্রবল আঘাত লাগিল; দেখিলাম—আমাদের হাবুল।

পুলিস আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। আমরা দেবকুমারবাবুর ঠিকানা পুলিসকে জানাইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

তখন রাস্তায় গ্যাস জ্বলিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিতে ফিরিতে ব্যোমকেশ কয়েকবার যেন ভয়ার্ত শ্বাস-সংহত স্বরে বলিল, 'উঃ! নিয়তির কি নির্মম প্রতিশোধ! কি নিদারুণ পরিহাস!'

আমার মাথার ভিতর বুদ্ধিবৃত্তি যেন স্তম্ভিত নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল; তবু অসীম অনুশোচনার সঙ্গে কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল—পরলোক যদি থাকে, তবে যাহার মৃত্যুতে হাবুল এত কাতর হইয়াছিল সেই পরম স্নেহাস্পদ ভগিনীর সহিত তাহার এতক্ষণে মিলন হইয়াছে।

বাসায় পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ নিজের লাইব্রেরী-ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। শুনিতে পাইলাম, সে টেলিফোনে কথা বলিতেছে।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্লান্তস্বরে পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিতে বলিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যে ট্র্যাজেডির শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, তাহার সম্বন্ধে বৃথা প্রশ্ন করিয়া আমি আর তাহাকে বিরক্ত করিলাম না।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বীরেনবাবু আসিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওয়ারেন্ট এনেছেন?'

বীরেনবাবু ঘাড় নাড়িলেন।

তখন আবার আমরা বাহির হইলাম।

দেবকুমারবাবুর বাসায় আসিতে তিন চার মিনিট লাগিল। দেখিলাম, বাড়ি নিস্তব্ধ, উপরের ঘরগুলির জানালায় আলো নাই, কেবল নীচে বসিবার ঘরে বাতি জ্বলিতেছে।

বীরেনবাবু কড়া নাড়িলেন, কিন্তু ভিতর হইতে সাড়া আসিল না। তখন তিনি দ্বার ঠেলিলেন, ভেজানো দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোষ পাতা, তাহার উপর দেবকুমারবাবু নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। আমরা প্রবেশ করিলে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু তুলিয়া আমাদের পানে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর তাঁহার মুখে একটা তিক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'সকলি গরল ভেল—'

বীরেনবাবু অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, আপনার নামে ওয়ারেন্ট আছে।'

দেবকুমারবাবুর যেন চমক ভাঙিল, তিনি দারোগাবাবুর পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত

করিয়া বলিলেন, 'আপনারা এসেছেন—ভালই হল। আমি নিজেই থানায় যাচ্ছিলুম—' দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'হাতকড়া লাগান।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তার দরকার নেই। কোন্ অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল শুনুন—' বলিয়া অভিযোগ পড়িয়া শুনাইবার উপক্রম করিলেন।

দেবকুমারবাবু কিন্তু ইতিমধ্যে আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; পকেটে হাত দিয়া তিনি যেন কি খুঁজিতে খুঁজিতে নিজ মনে বলিলেন, 'নিয়তি! নইলে হাবুলও ঐ বাক্স থেকেই দেশলায়ের কাঠি বার করতে গেল কেন? কি ভেবেছিলুম, কি হল! ভেবেছিলুম, রেখার ভাল বিয়ে দেব, নিজের একটা বড় ল্যাবরেটরী করব, হাবুলকে বিলেত পাঠাব—' পকেট হইতে সিগার বাহির করিয়া তিনি মুখে ধরিলেন।

ব্যোমকেশ নিজের দেশলাই জ্বালিয়া তাঁহার সিগারে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিল; তারপর বলিল, 'দেবকুমারবাবু, আপনার দেশলাইটা আমাদের দিতে হবে।'

দেবকুমারবাবুর চোখে আবার সচেতন দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল, তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু? আপনিও এসেছেন? ভয় নেই—আমি আত্মহত্যা করব না। ছেলেকে মেরেছি—মেয়েকে মেরেছি, আমি খুনী আসামীর মত ফাঁসিকাঠে ঝুলতে চাই—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেশলাইয়ের বাক্সটা তবে দিন।'

পকেট হইতে বাক্স বাহির করিয়া দেবকুমার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, নিন, কিন্তু সাবধান, বড় ভয়ানক জিনিস। প্রত্যেকটি কাঠি এক-একটি মৃত্যুবাণ। একবার জ্বালালে আর রক্ষে নেই—' ব্যোমকেশ দেশলাইয়ের বাক্সটা বীরেনবাবুর হাতে দিল, তিনি সন্তর্পণে সেটা পকেটে রাখিলেন। দেবকুমারবাবু বলিয়া চলিলেন, 'কি অদ্ভুত আবিষ্কারই করেছিলুম; পলকের মধ্যে মৃত্যু হবে, কিন্তু কোথাও এতটুকু চিহ্ন থাকবে না। আধুনিক যুদ্ধ-নীতির আমূল পরিবর্তন হয়ে যেত! বিষ নয়—এ মহামারী। কিন্তু সকলি গরল ভেল—' তিনি বুকভাঙা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

বীরেনবাবু মৃদুস্বরে বলিলেন, 'দেবকুমারবাবু, এবার যাবার সময় হয়েছে।'

'চলুন'—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্যোমকেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার স্ত্রী কি বাড়িতেই আছেন?'

'স্ত্রী!'—দেবকুমারবাবুর চোখ পাগলের চোখের মত ঘোলা হইয়া গেল তিনি হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'স্ত্রী! আমার ফাঁসির পর ইন্সিওরেন্সের সব টাকা সে-ই পাবে! প্রকৃতির পরিহাস নয়? চলুন।'

একটা ট্যাক্সি ডাকা হইল। ব্যোমকেশ হাত ধরিয়া দেবকুমারবাবুকে তাহাতে তুলিয়া দিল; বীরেনবাবু তাঁহার পাশে বসিলেন। দুই জন কনস্টেবল ইতিমধ্যে কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহারাও ট্যাক্সিতে চাপিয়া বসিল।

দেবকুমারবাবু গাড়ির ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমার রেখার মৃত্যুর কিনারা করতে চেয়েছিলেন—আপনাকে ধন্যবাদ—'

আমরা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া রহিলাম, ট্যাক্সি চলিয়া গেল।

দিন দুই ব্যোমকেশ এ বিষয়ে কোনও কথা কহিল না। তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া আমিও পীড়াপীড়ি করিলাম না।

তৃতীয় দিন বৈকালে সে নিজেই বলিতে আরম্ভ করিল; এলোমেলো ভাবে কতকটা যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিল—

'ইংরেজীতে একটা কথা আছে— vengeance coming home to roost, দেবকুমারবাবুর হয়েছিল তাই! নিজের স্ত্রীকে তিনি মারতে চেয়েছিলেন কিন্তু এমনই অদৃষ্টের খেলা, দু'বার তিনি তাঁর অমোঘ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করলেন, দু'বারই সে অগ্নিবাণ লাগল গিয়ে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র-কন্যার বুকে।

'দেবকুমার অপ্রত্যাশিত ভাবে এক আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। কিন্তু টাকার অভাবে সে আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করতে পারছিলেন না। এ এমনই আবিষ্কার যে, তার পেটেন্ট নেওয়া চলে না; কারণ, সাধারণ ব্যবসায়-জগতে এর ব্যবহার নেই। কিন্তু ঘুণাক্ষরে এর ফরমুলা জানতে পারলে জাপান জার্মানী ফ্রান্স প্রভৃতি যুদ্ধোদ্যত রাজ্যলোলুপ জাতি নিজেদের কারখানায় এই প্রাণঘাতী বিষ তৈরী করতে আরম্ভ করে দেবে। আবিষ্কর্তা কিছুই করতে পারবেন না, এতবড় আবিষ্কার থেকে তাঁর এক কপর্দক লাভ হবে না।

'সুতরাং আবিষ্কারের কথা দেবকুমারবাবু চেপে গেলেন। প্রথমে টাকা চাই, কারণ এ বিষ কি করে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে আরও অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করা দরকার। কিন্তু টাকা কোথায়? এত বড় এক্সপেরিমেণ্ট গোপনে চালাতে গেলে নিজের ল্যাবরেটরী চাই—তাতে অনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা আসে কোথা থেকে?

'এ দিকে বাড়িতে দেবকুমারবাবুর স্ত্রী তাঁর জীবন দুর্বহ করে তুলেছিলেন। মানসিক পরিশ্রম যারা করে, তারা চায় সাংসারিক ব্যাপারে শান্তি, অথচ তাঁর জীবনে ঐ জিনিসটির একান্ত অভাব হয়ে উঠেছিল। এক শুচিবায়ুগ্রস্ত মুখরা স্নেহহীনা স্ত্রীর নিত্য সাহচর্য তাঁকে পাগলের মত করে তুলেছিল। এটা অনুমানে বুঝতে পারি: দেবকুমারবাবু স্বভাবত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, শান্তিতে নিজের বৈজ্ঞানিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারলে তিনি আর কিছু চান না। তাঁর মনটি যে খুব স্নেহপ্রবণ, তাঁর ছেলেমেয়ের প্রতি ভালবাসা দেখেই আন্দাজ করা যায়। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীও চেষ্টা করলে এই স্নেহের অংশ পেতে পারতেন; কিন্তু স্বভাবদোষে তিনি তা পেলেন না; বরঞ্চ দেবকুমারবাবু তাঁকে বিষবৎ ঘৃণা করতে আরম্ভ করলেন।

'নিজের স্ত্রীকে হত্যা করবার ইচ্ছা মানুষের স্বাভাবিক নয়; যখন এ প্রবৃত্তি তার হয় তখন বুঝতে হবে—সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। দেবকুমারবাবুরও সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তারপর তিনি যখন এই ভয়ংকর বিষ আবিষ্কার করলেন, তখন বোধ হয়, প্রথমেই তাঁর মনে হল স্ত্রীর কথা। তিনি মনে মনে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন।

'তারপর তাঁর সব সংশয়ের সমাধান করে বীমা কোম্পানীর যুগ্মজীবন পলিসির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল—স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বীমা করতে পারে, একজন মরলে অন্য জন টাকা পাবে। এমন সুযোগ তিনি আর কোথায় পাবেন? যদি এইভাবে জীবনবীমা করে তাঁর আবিষ্কৃত বিষ দিয়ে স্ত্রীকে মারতে পারেন—এক ঢিলে দুই পাখী মরবে; তিনি তাঁর বাঞ্ছিত টাকা পাবেন, স্ত্রীও মরবে এমন ভাবে যে কেউ বুঝতে পারবে না, কি করে মৃত্যু হল।

'দেবকুমারবাবু একেবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করালেন, তারপর অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি করলে চলবে না, বীমা কোম্পানীর সন্দেহ হতে পারে। এইভাবে এক বছর কেটে গেল। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, এই বড়দিনের ছুটিতে তাঁর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করবেন।

'তাঁর আবিষ্কৃত বিষের প্রকৃতি অনেকটা বিস্ফোরক বারুদের মত; এমনিতে সে অতি নিরীহ, কিন্তু একবার আগুনের সংস্পর্শে এলে তার ভয়ংকর শক্তি বাষ্পরূপ ধরে বেরিয়ে আসে। সে-বাষ্প কারুর নাকে কণামাত্র গেলেও আর রক্ষে নেই, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

'দেবকুমারবাবু তাঁর স্ত্রীর উপর এই বিষ প্রয়োগ করবার এক চমৎকার উপায় বার করলেন। বৈজ্ঞানিক মাথা ছাড়া এমন বুদ্ধি বেরোয় না। তিনি কতকগুলি দেশলাইয়ের কাঠির বারুদের সঙ্গে এই বিষ মাখিয়ে দিলেন। কি উপায়ে মাখালেন, বলতে পারি না, কিন্তু ফল দাঁড়ালো—যিনি সেই কাঠি জ্বালবেন, তাঁকেই মরতে হবে। এইভাবে বিষাক্ত দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী করে তিনি দিল্লীতে বিজ্ঞান-সভার অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। ক্রমে দিল্লীতে যাবার সময় উপস্থিত হল; তখন তিনি সময় বুঝে তাঁর স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সতে একটি কাঠি রেখে দিয়ে দিল্লীতে যাত্রা করলেন। তিনি জানতেন, তাঁর স্ত্রী রোজ রাত্রিতে শোবার আগে ঐ দেশলাই দিয়ে ল্যাম্প জ্বালেন—

এ দেশলাইয়ের বাক্স অন্যত্র ব্যবহার হয় না। আজ হোক, কাল হোক, গৃহিণী সেই কাঠিটি জ্বালাবেন। দেবকুমারবাবু থাকবেন তখন ন'শ মাইল দূরে—এ যে তাঁর কাজ, এ কথা কেউ মনেও আনতে পারবে না।

'সবই ঠিক হয়েছিল, কিন্তু রাম উল্টো বুঝলেন। স্ত্রীর বদলে রেখা উনুন ধরাতে গিয়ে সেই কাঠিটি জ্বাললে।

'দিল্লী থেকে দেবকুমারবাবু ফিরে এলেন। এই বিপর্যয়ে তাঁর মন স্ত্রীর বিরুদ্ধে আরও বিষিয়ে উঠল। তাঁর জিদ চড়ে গেল, মেয়ে যখন গিয়েছে, তখন ওকেও তিনি শেষ করে ছাড়বেন। কয়েকদিন কেটে গেল, তারপর আবার তিনি স্ত্রীর দেশলাইয়ের বাক্সে একটি কাঠি রেখে পাটনা যাবার জন্য তৈরী হলেন।

'কিন্তু এবার আর তাঁকে যেতে হল না। হাবুল সিগারেট খেত; বোধহয়, তার দেশলাইয়ের বাক্সটা খালি হয়ে গিয়েছিল, তাই সে সৎমার ঘরের দেশলাইয়ের বাক্স থেকে কয়েকটি কাঠি নিজের বাক্সে পুরে নিয়ে বেড়াতে চলে গেল। তারপর—

'কি ভয়ংকর সর্বনাশা কালকূট যে দেবকুমারবাবু বিজ্ঞানসাগর মন্থন করে তুলেছিলেন তাঁর জীবনে—সকলি গরল ভেল।'

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, দেবকুমারবাবু যে অপরাধী, এটা তুমি প্রথম বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যে মুহূর্তে শুনলুম যে, দেবকুমারবাবু পঞ্চাশ হাজার টাকার জীবনবীমা করিয়েছেন, সেই মুহূর্তে। তার আগে রেখাকে হত্যা করবার একটা সন্তোষজনক উদ্দেশ্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। কে তাকে মেরে লাভবান হল, কার স্বার্থে সে ব্যাঘাত দিচ্ছিল—এ কথাটার ভাল রকম জবাব পাওয়া যাচ্ছিল না। রেখা যে হত্যাকারীর লক্ষ্য নয়, তা তো আমরা জানতুম না।

'কিন্তু আর একদিক থেকে একটি ছোট্ট সূত্র হাতে এসেছিল। রেখার দেহ-পরীক্ষায় যখন বিষ পাওয়া গেল না, তখন কেবল একটা সম্ভাবনাই গ্রহণযোগ্য রইল—অর্থাৎ যে-বিষে তার মৃত্যু হয়েছে, সে-বিষ বৈজ্ঞানিকদের অপরিচিত। মানে, নূতন আবিষ্কার। মনে আছে—দিল্লীতে দেবকুমারবাবুর বক্তৃতা? আমরা তখন সেটা অক্ষমের বাহ্বাস্ফোট বলে উড়িয়ে দিয়েছিলুম। কে জানত, তিনি সত্যিই এক অদ্ভুত আবিষ্কার করে বসে আছেন; আর, তারই চাপা ইঙ্গিত তাঁর বক্তৃতায় ফুটে বেরুচ্ছে!

'সে যা হোক, কথা দাঁড়ালো—এই নূতন আবিষ্কার কোথা থেকে এল? দু'জন বৈজ্ঞানিক হাতের কাছে রয়েছে—এক, ডাক্তার রুদ্র, দ্বিতীয় দেবকুমারবাবু। এ'দের দু'জনের মধ্যে একজন এই অজ্ঞাত বিষের আবিষ্কর্তা। কিন্তু ডাক্তার রুদ্র'র উপর সন্দেহটা বেশী হয়, কারণ তিনি ডাক্তার, বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া তাঁরই বেশী। তা ছাড়া দেবকুমারবাবু বিষের আবিষ্কর্তা হলে তিনি কি নিজের মেয়ের উপর সে বিষ প্রয়োগ করবেন?

'কাজেই সব সন্দেহ পড়ল গিয়ে ডাক্তার রুদ্র'র উপর। কিন্তু তবু আমার মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। ডাক্তার রুদ্র লোকটা অতি পাজি, কিন্তু তাই বলে সে এত সামান্য কারণে একটি মেয়েকে খুন করবে? আর, যদিই বা সে তা করতে চায়, রেখার নাগাল পাবে কি করে? কোন্ উপায়ে আর একজনের বাড়িতে বিষ পাঠাবে? রেখার সঙ্গে মন্মথর ছাদের উপর থেকে দেখাদেখি চিঠি-ফেলাফেলি চলত; কিন্তু রুদ্র'র সঙ্গে তো সে রকম কিছু ছিল না।

'কোনও বিষাক্ত বাষ্পই যে মৃত্যুর কারণ, এ চিন্তাটা গোড়া থেকে আমার মাথায় ধোঁয়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে করে দেখ, রেখার এক হাতে পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, আর এক হাতে বাক্স ছিল; অর্থাৎ দেশলাই জ্বালার পরই মৃত্যু হয়েছে। সংযোগটা সম্পূর্ণ আকস্মিক হতে পারে, আবার কার্য-কারণ সম্বন্ধও থাকতে পারে। দেবকুমারবাবু কিন্তু বড় চালাকি করেছিলেন, বাক্সে একটি বৈ বিষাক্ত কাঠি দেননি—যাতে বাক্সের অন্যান্য কাঠি পরীক্ষা করে কোনও হদিস পাওয়া না যায়। আমি সে বাক্সটা এনেছিলুম, পরীক্ষাও

করেছিলুম, কিন্তু কিছু পাইনি। হাবুলের বেলাতেও বাক্সে একটি বিষাক্ত কাঠিই ছিল, কিন্তু এমনই দুর্দৈব যে, সেইটেই হাবুল পকেটে করে নিয়ে এল—আর প্রথমেই জ্বাললে।

'অজিত, তুমি তো লেখক, দেবকুমারবাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড রূপক দেখতে পাচ্ছ না? মানুষ যেদিন প্রথম অন্যকে হত্যা করবার অস্ত্র আবিষ্কার করেছিল, সেদিন সে নিজেরই মৃত্যুবাণ নির্মাণ করেছিল; আর আজ সারা পৃথিবী জুড়ে গোপনে গোপনে এই যে হিংসার কুটিল বিষ তৈরী হচ্ছে, এও মানুষ জাতটাকে একদিন নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলবে—ব্রহ্মার ধ্যান-উদ্ভূত দৈত্যের মত সে স্রষ্টাকেও রেয়াৎ করবে না। মনে হয় না কি?'

ঘর অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশকে ভাল দেখা যাইতেছিল না। আমার মনে হইল, তাহার শেষ কথাগুলো কেবল জল্পনা নয়—ভবিষ্যদ্‌বাণী।

## উপসংহার

হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। শীতের প্রকোপ অল্পে অল্পে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া অদূর বসন্তের বার্তা জানাইয়া দিলেও, সকাল-বেলায় সোনালী রৌদ্রটুকু এখনও বেশ মিঠা লাগে।

সেদিন সকালে আমি একাকী জানালার ধারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। ব্যোমকেশ প্রাতরাশ শেষ করিয়াই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে দশটা বাজিবে।

খবরের কাগজে দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমার শেষ কিস্তির বিবরণ বাহির হইয়াছিল। কাগজে বিবরণ পড়িবার আমার কোনও দরকার ছিল না, কারণ আমি ও ব্যোমকেশ মোকদ্দমার সময় বরাবরই এজলাসে হাজির ছিলাম। তাই অলসভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভাবিতেছিলাম—দেবকুমারবাবুর অসম্ভব জিদের কথা। তিনি একটু নরম হইলে হয়তো এতবড় খুনের মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া যাইত; কারণ উচ্চ রাজনীতি পিনাল কোডের শাসন মানিয়া চলে না। কিন্তু সেই যে তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন আবিষ্কারের ফরমূলা কাহাকেও বলিবেন না—সে-জিদ হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। দেশলাই কাঠি বিশ্লেষণ করিয়াও বিষের মূল উপাদান ধরা গেল না। অগত্যা আইনের নাটিকা যথারীতি অভিনীত হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

চিন্তা ও কাগজ পড়ার মধ্যে মনটা আনাগোনা করিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। দারোগা বীরেনবাবু থানা হইতে ফোন করিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজিত ব্যগ্রতার আভাস পাইলাম।

'ব্যোমকেশবাবু আছেন?'

'তিনি বেরিয়েছেন। কোনও জরুরী দরকার কি?'

'হাঁ—তিনি কখন ফিরবেন?'

'দশটার সময়।'

'আচ্ছা, আমিও দশটার সময় গিয়ে পৌঁছুব। একটা খারাপ খবর আছে!'

খবরটা কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বীরেনবাবু ফোন কাটিয়া দিলেন।

ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম বেলা ন'টা। মন ছটফট করিতে লাগিল, তবু সংবাদপত্রটা তুলিয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে দশটা বাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, সাড়ে ন'টার পরই ব্যোমকেশ ফিরিল। বীরেনবাবু ফোন করিয়াছেন শুনিয়া সচকিতভাবে বলিল, 'তাই নাকি! আবার কি হল?

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল; কারণ, বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে চায়ের আয়োজন চাই; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময় অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

চায়ের হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট বাহির করিল; একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিতে করিতে বলিল, 'বীরেনবাবু যখন বলেছেন খারাপ খবর, তার মানে গুরুতর কিছু। হয়তো—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে হস্তধৃত দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যোমকেশ মুখ হইতে অ-জ্বালিত সিগারেট নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখছি! এ দেশলায়ের বাক্স আমার পকেটে কোথা থেকে এল?'

'কোন্ দেশলায়ের বাক্স?'

ব্যোমকেশ বাক্সটা আমার দিকে ফিরাইল। দেখিয়া কিছু বুঝিতে পারিলাম না সাধারণ দেশলায়ের বাক্স যেমন হইয়া থাকে উহাও তেমনি, কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আমি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছি দেখিয়া ব্যোমকেশ পূর্ববৎ ধীরস্বরে বলিল 'দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, বাক্সটার ওপর যে লেবেল মারা আছে তাতে একজন সত্যাগ্রহী কুড়ুল কাঁধে করে তালগাছ কাটতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের বাসায়—'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'বুঝেছি, ঘোড়া মার্কা ছাড়া অন্য দেশলাই আসে না।'

'ঠিক। সুতরাং আমি যখন বেরিয়েছিলুম তখন আমার পকেটে স্বভাবতই ঘোড়া মার্কা দেশলাই ছিল। ফিরে এসে দেখছি সেটা সত্যাগ্রহীতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকালকার এই স্বরাজ-সাধনার যুগেও এতটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কি করে?' তারপর গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম আসিল।

'এবার বাজার থেকে কোন্ মার্কা দেশলাই এনেছ?'

'আজ্ঞে, ঘোড়া মার্কা।'

'কত এনেছ?'

'আজ্ঞে, এক বাণ্ডিল।'

'সত্যাগ্রহী মার্কা আনোনি?'

'আজ্ঞে, না।'

'বেশ, যাও।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেশলায়ের বাক্সটার দিকে তাকাইয়া রহিল; ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'মনে পড়ছে, ট্রামে যেতে যেতে সিগারেট ধরিয়েছিলুম, তখন পাশের ভদ্রলোক দেশলাইটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন, আমি না দেখেই পকেটে ফেললুম;—অজিত!'

'কি?'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'অজিত, সেই লোকটাই দেশলায়ের বাক্স বদলে নিয়েছে।' দেখিলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটা কে? তার চেহারা মনে আছে?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'না, ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে মাথায় মাঙ্কিক্যাপ ছিল, আর চোখে কালো চশমা—' ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বীরেনবাবু কখন আসবেন বলেছেন?'

'দশটায়।'

'তাহলে তিনি এলেন বলে। অজিত, বীরেনবাবু আজ কেন আসছেন জানো?'

'না—কেন?'

'আমার মনে হয়—আমার সন্দেহ হয়—'

এই সময় সিঁড়িতে বীরেনবাবুর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, ব্যোমকেশ কথাটা শেষ করিল না।

বীরেনবাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে উপবেশন করিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'নিজের দেশলাই দিয়ে ধরান। দেবকুমারবাবুর দেশলায়ের বাক্স কবে চুরি গেল?'

'পরশু'—বলিয়াই বীরেনবাবু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন—'আপনি জানলেন কোত্থেকে? একথা তো চাপা আছে, বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি।'

'স্বয়ং চোর আমাকে খবর পাঠিয়েছে'—বলিয়া ব্যোমকেশ ট্রামে দেশলাই বদলের ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বীরেনবাবু গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তারপর দেশলায়ের বাক্সটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে একটি মারাত্মক কাঠি আছে—বাপ্‌! লোকটা কে আপনার কিছু সন্দেহ হয় না?'

'না। তবে যেই হোক, আমাকে যে মারতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু কেন? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা মারতে চাইবে কেন?'

আমি বলিলাম, 'হয়তো সে মনে করে, ব্যোমকেশকে মারতে পারলে তাকে ধরা কঠিন হবে তাই আগেভাগেই ব্যোমকেশকে সরাতে চায়।'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—'আমার তা মনে হয় না। পুলিসের অসংখ্য কর্মচারী রয়েছেন যাঁরা বুদ্ধিতে কর্মদক্ষতায় আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বীরেনবাবুর কথাই ধর না। চোরের যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে সে আমাকে না মেরে বীরেনবাবুকে মারবার চেষ্টা করত।'

প্রশংসাটা কিছু মারাত্মক জাতীয় হইলেও দেখিলাম বীরেনবাবু মনে মনে খুশী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, 'না—না—তবে—অন্য কি কারণ থাকতে পারে?'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'সেইটেই ঠিক ধরতে পারছি না। যতদূর মনে পড়ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু কেউ নেই।'

বীরেনবাবু ঈষৎ বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'বলেন কি মশায়! আপনি এতদিন ধরে চোর-ছ্যাঁচড় বদ্‌মায়েসের পিছনে লেগে আছেন, আর আপনার শত্রু নেই! আমাদের পেশাই তো শত্রু তৈরী করা।'

এই সময় পুঁটিরাম চা লইয়া আসিল। একটা পেয়ালা বীরেনবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ মৃদুহাস্যে বলিল, 'তা বটে। কিন্তু আমার অধিকাংশ শত্রুই বেঁচে নেই। যাহোক, এবার বলুন তো কি করে জিনিসটা চুরি গেল?'

বীরেনবাবু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, 'ঠিক কি করে চুরি গেল তা বলা কঠিন। আপনি তো জানেন দেশলায়ের বাক্সটা দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমায় এক্‌জিবিট্‌ ছিল, কাজেই সেটা পুলিসের তত্ত্বাবধান থেকে কোর্টের এলাকায় গিয়ে পড়েছিল। পরশু মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, তারপর থেকে আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি! সন্দেহের ওপর কয়েকজন আর্দালি আর নিম্নতন কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর কিছু হচ্ছে না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে, খোদ গভর্নমেণ্টের পর্যন্ত টনক নড়েছে। এখন আপনি একমাত্র ভরসা!'

'আমাকে কি করতে হবে?'

'খাস ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্ট থেকে হুকুম এসেছে, চোর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, দেশলায়ের বাক্স উদ্ধার করা চাই। এর ওপর নাকি আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভর করছে।'

'বুঝলুম। কিন্তু আমাকে যে আপনি এ কাজে ডাকছেন—এতে কর্তৃপক্ষের মত আছে কি?'

'আছে। আপনাকে তাহলে সব কথা বলি। দেশলায়ের বাক্স লোপাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেসটা সি আই ডি পুলিসের হাতে যায়। কিন্তু আজ তিন দিন ধরে অনুসন্ধান করেও তারা কোনও হদিস বার করতে পারেনি। এদিকে প্রত্যহ তিন চার বার গভর্নমেণ্টের কড়া তাগাদা আসছে। তাই শেষ পর্যন্ত বড়সাহেব আপনার সাহায্য তলব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারের সমাধান যদি কেউ করতে পারে তো সে আপনি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিল, তারপর বলিল, 'তাহলে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু—আমি একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আপনি যখন যাবেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।'

'বেশ—' একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর নয়, কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দিতে হবে।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'কিন্তু যতই দেরী হবে—'

'সে আমি বুঝেছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাহোক একটা কিছু করলেই তো হবে না। একটা অজানা অচেনা লোককে ধরতে হবে, অথচ এমন সূত্র কোথাও নেই যা ধরে তার কাছে পৌঁছুতে পারা যায়। একটু বিবেচনা করে পন্থা স্থির করতে হবে না?'

'তা বটে—'

'ইতিমধ্যে যে লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেন তার চেষ্টা করুন। যদি—'

বীরেনবাবু গম্ভীর মুখে একটু হাসিলেন—'তিন দিন ধরে অনবরত সে চেষ্টা হচ্ছে, কোনো ফল হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখতে পারেন।'

ব্যোমকেশ বিরসস্বরে বলিল, 'পুলিসের চেষ্টা যখন বিফল হয়েছে তখন আমি কিছু করতে পারব মনে হয় না। তারা হয়তো নির্দোষ। যাক, তাহলে ঐ কথা রইল, কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব; তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে, কারণ চোর মহাশয় প্রথমে আমার ওপরেই কৃপা-দৃষ্টিপাত করেছেন।'

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ বসিয়া বীরেনবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া দেশলায়ের বাক্সটা নিজের লাইব্রেরী ঘরে রাখিয়া আসিল। তারপব পিছনে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভ্রূকুঞ্চিত মুখে ঘরে পায়চারি করিতে লাগিল।

এগারোটা বাজিয়া গেলে পুঁটিরাম আসিয়া স্নানের তাগাদা দিয়া গেল, কিন্তু তাহার কথা ব্যোমকেশের কানে পৌঁছিল না। সে অন্যমনস্কভাবে একটা 'হুঁ' দিয়া পূর্ববৎ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় ডাকপিওন আসিল। একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, 'দেখুন তো এটা আপনার চিঠি কি না।'

ব্যোমকেশ খামের শিরোনামা দেখিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, আমারই। কেন বল দেখি?'

পিওন কহিল, 'নীচের মেসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা তাঁর চিঠি.'

'সে কি! ব্যোমকেশ বক্সী আরো আছে নাকি?'

'তিনি বললেন, তাঁর নাম ব্যোমকেশ বোস।'

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'ও—তা হতেও পারে বাগবাজারের মোহর দেখছি—কলকাতা থেকেই চিঠি আসছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে খামে চিঠি কে লিখবে? যাহোক, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে। যদি আমার না হয়—কিন্তু নীচের মেসে ব্যোমকেশ নামে আর একজন আছেন এ খবর তো জানতুম না।'

পিওন প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ কাগজ-কাটা ছুরি দিয়া খাম কাটিয়া চিঠি বাহির করিল, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, 'আমার নয়। কোকনদ গুপ্ত—অদ্ভুত নাম—কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না।'

চিঠিতে লেখা ছিল—

সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

ব্যোমকেশবাবু, অনেকদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। চিনিতে পারিবেন তো? কি জানি, অনেকদিন পরে দেখা, হয়তো অধমকে না চিনিতেও পারেন।

আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী, আপনার কাছে আমার জীবন বিক্রীত হইয়া আছে। কিন্তু কর্মের জন্য বহুকাল স্থানান্তরে ছিলাম বলিয়া সে-ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ
শ্রীকোকনদ গুপ্ত

চিঠিখানা পড়িয়া আমি বলিলাম, 'এ চিঠি আমাদের পড়া উচিত হয়নি। অবশ্য গোপনীয় কিছু নেই, তবু এমন আন্তরিক কথা আছে যা অন্যের পড়া অপরাধ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বুঝছি। প্রেমিক প্রেমিকার চিঠি চুরি করে পড়ার মত এ চিঠিখানা পড়লেও মনটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বল! চিঠি আমার কিনা যাচাই করা চাই তো। কোকনদ গুপ্ত বলে কাউকে আমি চিনি না, আর চিনলেও তার কোনও মহৎ উপকার করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।'

'তাহলে যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'হাঁ। পুঁটিরামকে ডাকি।'

কিন্তু পুঁটিরাম আসিবার পূর্বেই চিঠির মালিক নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের মেসের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি ছিল, ইঁহাকে কিন্তু পূর্বে দেখি নাই। লোকটি বেঁটে-খাটো দোহারা, বোধ করি মধ্যবয়স্ক—কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই। কপাল হইতে গলা পর্যন্ত মুখখানা পুড়িয়া, চামড়া কুঁচ্‌কাইয়া এমন একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্বে তাঁহার চেহারা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটা বিকট মুখোশ পরিয়া আছেন। মুখে গোঁফ দাড়ি নাই, এমন কি চোখের পল্লব পর্যন্ত চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায় অনাবৃত নিষ্পলক ভাব দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সহজ সাধারণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি দ্বারের নিকট হইতে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বসু। একখানা চিঠি—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আসুন। চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলুম। আপনি এসেছেন—ভালই হল। বসুন। কিছু মনে করবেন না, নিজের মনে করে খাম খুলেছিলুম। এই নিন।'

পত্রটা হাতে লইয়া ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কোকনদ গুপ্ত! কৈ আমার তো—' ব্যোমকেশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনার চিঠি নয়? আপনি পড়েছেন নিশ্চয়।'

অপ্রস্তুতভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'পড়েছি, নিজের মনে করে—কিন্তু পড়ে দেখলুম আমার নয়। পিওন বলেছিল বটে কিন্তু খামের ওপর 'বোস' কথাটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে 'বক্সী' বলে ভুল হয়। জানেন বোধহয়, আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী?'

'জানি বৈকি। আপনি এ মেসের গৌরব; এখানে এসেই আপনার নাম শুনেছি। কিন্তু চিঠিটা আমার কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। কোকনদ গুপ্ত নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, তবু—, যাহোক, আপনি যখন বলছেন আপনার নয় তখন আমারই হবে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মহৎ লোকের পক্ষে উপকার করে ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'না না, তা নয়—অনেক দিনের কথা, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে না। পরে হয়তো পড়বে। —আচ্ছা, নমস্কার।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ মেসে কত দিন এসেছেন?'

'বেশী দিন নয়। এই তো দিন পাঁচ-সাত।'

'ও'—ব্যোমকেশ হাসিল, 'যাহোক, তবু এতদিনে একজন মিতে পাওয়া গেল। আচ্ছা, নমস্কার। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

ভদ্রলোক আনন্দিত ভাবে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর দেশলাই চুরির মামলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবা যাবে। অনেক ভাববার কথা আছে; যে-বনে শিকার নেই সেই বন থেকে বাঘ মেরে আনতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এই দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুটিকে আগে কোথাও দেখেছ বলে বোধ হচ্ছে কি?'

আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম, 'না, ও-মুখ কদাচ দেখিনি। তুমি দেখেছ নাকি?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'উহুঁ। কিন্তু ওঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়—অনেক দিন আগে। যাক্‌গে, এখন আর বাজে চিন্তা নয়।' বলিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না, কিন্তু আজ দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সে যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম—কোনও কারণে তাহার একাগ্র চিন্তার পথে বিঘ্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও সে মনকে ঐকান্তিক চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। তারপর সে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ হল কি তোমার! অমন ফিজেট্ করছ কেন?'

ব্যোমকেশ লজ্জিতভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কি জানি আজ কিছুতেই মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাজে কথা মনে আসছে—'

আমি বলিলাম, 'গুরুতর কাজ যখন হাতে রয়েছে তখন বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কি ইচ্ছে করে বাজে চিন্তা করছি? আজ সকালের ঐ চিঠিখানা—'

'কোন্ চিঠি?'

'আরে ঐ যে কোকনদ গুপ্ত। ঘুরে ফিরে কেবল ঐ কথাই মনে আসছে।'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ও চিঠিতে এমন কি আছে—'

'কিছুই নেই। তবু মনে হচ্ছে চিঠিখানা যদি আমাকেই লিখে থাকে-যদি—'

'ঠিক বুঝলুম না। চিঠির লেখককে তুমি চেনো না, আর একজন লোক সে-চিঠি নিজের বলে দাবী করছেন, তবু চিঠি তোমার হবে কি করে?'

'তা বটে—কিন্তু—চিঠির কথাগুলো তোমার মনে আছে?'

'খুব গদ্‌গদ ভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া তাতে তো আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে এত দুর্ভাবনা কেন?'

'ঠিক বলেছ'—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'মস্তিষ্ককে বাজে চিন্তা করবার প্রশ্রয় দেওয়া কিছু নয়, ক্রমে একটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নাঃ—এখন কেবল দেশলায়ের বাক্স ধ্যান জ্ঞান করব। আমি লাইব্রেরীতে চললুম, চা তৈরী হলে ডেকো।' বলিয়া লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া, যেন বাজে চিন্তাকে বাহিরে রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর বিকাল কাটিয়া গেল; রাত্রি হইল। কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অস্থির বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা দূর হইল না। বুঝিলাম, সে এখনও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

গভীর রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ ব্যোমকেশের ঠেলা খাইয়া জাগিয়া

উঠিলাম। বলিলাম, 'কি হয়েছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওহে, একটা মতলব মাথায় এসেছে—'

মাথার উপর লেপ চাপা দিয়া বলিলাম, 'এত রাত্রে মতলব?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শোনো। যে লোক দেশলাই চুরি করেছে, সেই আমাকে মারবার চেষ্টা করছে—কেমন? এখন মনে কর, আমি যদি সত্যিই—'

আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে বলিলাম, 'কাল রাত্রে তুমি কি সব বলছিলে; শেষ পর্যন্ত শুনিনি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তা শুনবে কেন? কাল রাত্রে আমার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে দিলুম, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলে। এমন না হলে বন্ধু!'

আমি আঁৎকাইয়া উঠিলাম, 'মৃত্যু-সংবাদ! মানে?'

'মানে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার আগে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার।' ঘড়ির দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'এখন সওয়া আটটা। ন'টার সময় বেরুলেই হবে।'

'কি আবোল-তাবোল বকছ বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া কাগজে মন দিল। বুঝিলাম, কাল গভীর রাত্রে উত্তেজনার ঝোঁকে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল এখন আর তাহা সহজে বলিবে না। নিশ্চয় কোনও অদ্ভুত ফন্দি বাহির করিয়াছে; জানিবার জন্য মনটা ছটফট করিতে লাগিল। রাত্রে তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়া ভাল করি নাই।

মিনিট পাঁচেক নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশকে খোঁচা দিয়া কথাটা বাহির করা যাইতে পারে কিনা ভাবিতেছি, হঠাৎ সে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাক্স দেশলাই কিনবে?'

'সে আবার কি?'

'একজন ভদ্রলোক বিক্রী করতে চান। এই দ্যাখ।' বলিয়া সে সংবাদপত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে ব্র্যাকেট দিয়া ঘেরা এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—

> এক বাক্স দিয়াশলাই বিক্রী আছে। দাম—এক লক্ষ টাকা। বাক্সে কুড়িটি কাঠি আছে; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হৌন।

আমি যতক্ষণ এই বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম ততক্ষণ ব্যোমকেশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি হতভম্ব মুখ তাহার পানে তুলিতেই সে বলিল, 'অতি বিচক্ষণ লোক। দেশলায়ের বাক্স চুরি করে এখন আবার সেইটেই গভর্নমেণ্টকে বিক্রী করতে চান। গভর্নমেণ্ট না কিনলে, জাপান কিম্বা ইটালিকে বিক্রী করবেন এ ভয়ও দেখিয়েছেন।—চল।'

'কোথায়?'

'খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। যদিও সে সম্ভাবনা কম।'

দ্রুত জুতা জামা পরিয়া ব্যোমকেশের সহিত বাহির হইলাম।

'কালকেতু' অফিসে গিয়া কার্যাধ্যক্ষ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইতে বিলম্ব হইল না। ব্যোমকেশের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বিজ্ঞাপন বিভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবু এ বিজ্ঞাপনটা সম্বন্ধে আমি জানি। ইন্সিওর-করা খামখানা আমার হাতেই এসেছিল। মনেও আছে, তার কারণ এমন আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আমরা কখনও পাইনি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা লোকটিকে আপনি দেখেননি?'

'না। বলল্ম তো, ডাকে বিজ্ঞাপনটা এসেছিল। খামের মধ্যে কুড়ি টাকার নোট আর বিজ্ঞাপনের খসড়া ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম; কিন্তু তখন আমাদের কাজের সময়, তাই বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে ডেকে খসড়া তাঁর জিম্মা করে দিই, তারপর ভুলে গিয়েছি। ব্যাপার কি বলুন তো? দেশলায়ের বাক্স দেখে সন্দেহ হচ্ছে, গুরুতর কিছু নাকি?'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'আপনাদের কানে পেঁছুবার মত এখনও কিছু হয়নি আচ্ছা, প্রেরক সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারেন না? তার ঠিকানা?'

কার্যাধ্যক্ষ মাথা নাড়িলেন, 'খামের মধ্যে নোট আর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

'ইন্সিওর-করা খামে বিজ্ঞাপন এসেছিল বলছেন। খামের ওপরেও প্রেরকের নাম ঠিকানা ছিল না?'

কার্যাধ্যক্ষ সচকিত ভাবে বলিলেন, 'ওটা তো খেয়াল করিনি। নিশ্চয় ছিল। অন্তত থাকা উচিত। যতদূর জানি প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলে পোস্ট-অফিসে রেজিস্ট্রী চিঠি নেয় না—'

টেবিলের পাশে একটা প্রকাণ্ড ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া তাহার মধ্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয়গর্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'পেয়েছি—এই, এই নিন।'

সাধারণ সরকারী রেজিস্ট্রি খাম, তাহার কোণে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা রহিয়াছে—

বি কে সিংহ

১৮/১, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকানা টুকিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আমাদের পাড়াতেই দেখছি।—এখন তাহলে উঠলুম, অকারণে বসে থেকে আপনার কাজের ক্ষতি করব না—বহু ধন্যবাদ!'

অধ্যক্ষ বলিলেন, 'ধন্যবাদের দরকার নেই; যদি নতুন খবর কিছু থাকে, আগে যেন পাই। জানেন তো, দেবকুমারবাবুর কেস আমরাই আগে ছেপেছিলুম।'

'আচ্ছা, তাই হবে' বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

'কালকেতু' অফিস হইতে আমরা সোজা সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে ফিরিলাম। ১৮/১ নম্বর বাড়িখানা দ্বিতল ও ক্ষুদ্র, রেলিং-এর উপর লেপ তোষক শুকাইতেছে, ভিতর হইতে কয়েকটি ছেলেমেয়ের পড়ার গুঞ্জন আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভুল ঠিকানা। যাহোক, যখন এসেছি তখন খোঁজ নিয়ে যাওয়া যাক।'

ডাকাডাকি করিতে একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল—'কাকে চান বাবু?'

'বাবু বাড়ি আছেন?'

'না।'

'এ বাড়িতে কে থাকে?'

'দারোগাবাবু থাকেন।'

'দারোগাবাবু? নাম কি?'

'বীরেনবাবু!'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাকরটার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'ও—বুঝেছি। তোমার বাবু বাড়ি এলে বোলো ব্যোমকেশবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।' বলিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া চলিল।

আমি বলিলাম, 'তুমি বড় খুশী হয়েছ দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খুশী হওয়া ছাড়া উপায় কি! লোকটি এমন প্রচণ্ড রসিক যে মহাপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর রসিকতা করতে বাধে না। এমন লোক যদি আমার সঙ্গে একটু তামাসা করেন তাহলে আমার খুশী না হওয়াই তো ধৃষ্টতা!—তুমি এখন বাসায় যাও, আমি অন্য কাজে চললুম। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পরামর্শ হবে।'

হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লাফাইয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আমাকে তাঁহার প্ল্যান প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্ল্যান শুনিয়া বিশেষ আশাপ্রদ বোধ হইল না; এ যেন অজ্ঞাত পুকুরে মাছের আশায় ছিপ ফেলা, চারে মাছ আসিবে কিনা কোনও স্থিরতা নাই।

আমার মন্তব্য শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে তো বটেই, অন্ধকারে ঢিল ফেলছি, লাগবে কিনা জানি না। যদি না লাগে তখন অন্য উপায় বার করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কমিশনার সাহেবের মত আছে?'

'আছে।'

'আমাকে কিছু করতে হবে?'

'স্রেফ মুখ বুজে থাকতে হবে, আর কিছু নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যাব; কারণ মরতে হলে আজই মরতে হয়, একটা দেশলায়ের বাক্স আর ক'দিন চলে? তুমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে শ্রীরামপুরে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দর্শন করতে পার।'

'ইতিমধ্যে এখানে যদি কেউ তোমার খোঁজ করে, তাকে কি বলব?'

'বলবে, আমি গোপনীয় কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছি, কবে ফিরব ঠিক নেই।'

'বীরেনবাবু আজ বিকেলে আসতে পারেন, তাঁকেও ঐ কথাই বলব?'

কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হাঁ, তাঁকেও ঐ কথাই বলবে। মোট কথা, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কইবে না।'

'বেশ'—মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম। বীরেনবাবু পুলিসের লোক, বিশেষতঃ এ ব্যাপারে তিনিই এক প্রকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; তবু তাঁহার নিকট হইতেও গোপন করিতে হইবে কেন?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুঝিতে পারিয়াই ব্যোমকেশ বলিল, 'বীরেনবাবুকে না বলার কোনও বিশেষ কারণ নেই, মামুলি সতর্কতা। বর্তমানে তুমি আমি আর কমিশনার সাহেব ছাড়া এ প্ল্যানের কথা আর কেউ জানে না, অবশ্য কাল আরও কেউ কেউ জানতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় কথাটা চেপে রাখাই বাঞ্ছনীয়! চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মন্ত্রগুপ্তিই হচ্ছে কূটনীতির মুখবন্ধ; অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকবে।'

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার আধঘণ্টা পরে বীরেনবাবু ফোন করিলেন।

'ব্যোমকেশবাবু কোথায়?'

'তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবেন?'

'কিছুই ঠিক নেই। তিন চার দিন দেরী হতে পারে।'

'তিন চার দিন! আজ সকালে আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন কেন?'

ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, 'তা জানি না।'

তারের অপর প্রান্তে বীরেনবাবু একটা অসন্তোষ-সূচক শব্দ করিলেন, 'আপনি যে কিছুই জানেন না দেখছি। ব্যোমকেশবাবু কোন্ কাজে গেছেন তাও জানেন না?'

'না।'

বীরেনবাবু সশব্দে তার কাটিয়া দিলেন।

ক্রমে চারিটা বাজিল। পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়া, এবার কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল।

উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্বদিনের পরিচিত দগ্ধানন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহার হাতে একটি সংবাদপত্র।

তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু বেরিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, পূর্বদিনের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া গল্প-গুজব করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও একলা বৈকালটা কি করিয়া কাটাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, বোসজা মহাশয়কে পাইয়া অনন্দিত হইলাম।

বোসজা আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'আজ কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে. সেইটে আপনাদের দেখাতে এনেছিলুম। হয়তো আপনাদের চোখে পড়েনি—' কাগজটা খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখেছেন কি?'

সেই বিজ্ঞাপন! বড় দ্বিধায় পড়িলাম। মিথ্যা কথা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া বলিতে পারি না, বলিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাই। অথচ ব্যোমকেশ চাণক্য-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া মুখ বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। এইরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া কি বলিব ভাবিতেছি, এমন সময় বোসজা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'পড়েছেন, অথচ ব্যোমকেশবাবু কোনও কথা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—না?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, 'সম্প্রতি দেশলায়ের কাঠি নিয়ে একটা মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে। এই সেদিন দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমা শেষ হল, তাতেও দেশলাই; আবার দেখছি দেশলাইয়ের বাক্সের বিজ্ঞাপন—মূল্য এক লক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বভাবতই সন্দেহ হয়, দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে।' বলিয়া সপ্রশ্ন চক্ষে আমার পানে চাহিলেন।

আমি এবারও নীরব হইয়া রহিলাম। কথা কহিতে সাহস হইল না, কি জানি আবার হয়তো বেফাঁস কিছু বলিয়া ফেলিব।

তিনি বলিলেন, 'যাক ও কথা, আপনি হয়তো মনে করবেন আমি আপনাদের গোপনীয় কথা বার করবার চেষ্টা করছি।' বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। চায়ের সঙ্গে ক্রিকেট, রাজনীতি, সাহিত্য, নানাবিধ আলোচনা হইল। দেখিলাম লোকটি বেশ মিশুক ও সদালাপী—অনেক বিষয়ে খবর রাখেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আপনার কি করা হয়? কিছু মনে করবেন না, আমাদের দেশে প্রশ্নটা অশিষ্ট নয়।'

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'সরকারী চাকরি করি।'

'সরকারী চাকরি?'

'হাঁ। তবে সাধারণ চাকুরের মত দশটা চারটে অফিস করতে হয় না। চাকরিটা একটু বিচিত্র রকমের।'

'ও—কি করতে হয়?' প্রশ্নটা ভদ্ররীতিসম্মত নয় বুঝিতেছিলাম, তবে কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'রাজ্য শাসন করবার জন্যে গভর্নমেণ্টকে প্রকাশ্যে ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়, অনেক খবর রাখতে হয়; নিজের চাকরদের ওপর নজর রাখতে হয়। আমার কাজ অনেকটা ঐ ধরনের।'

বিস্মিতকণ্ঠে বলিলাম, 'সি আই ডি পুলিস?'

তিনি মৃদু হাসিলেন 'পুলিসের ওপরেও পুলিস থাকতে পারে তো। আপনাদের এই বাসাটি দিব্যি নিরিবিলি, মেসের মধ্যে থেকেও মেসের ঝামেলা ভোগ করতে হয় না। কতদিন এখানে আছেন?'

কথা পাল্টাইয়া লইলেন দেখিয়া আমিও আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না; বলিলাম, 'আমি আছি বছর আন্টেক, ব্যোমকেশ তার আগে থেকে আছে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণ ভাবে কথাবার্তা হইল। তাঁহার মুখের এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েক বছর আগে ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অ্যাসিডের শিশি ভাঙিয়া মুখে পড়িয়া যায়। সেই অবধি মুখের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি উঠিলেন। দ্বারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা আছে। কেমন লোক বলতে পারেন?'

'কেমন লোক? তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের সূত্রে আলাপ। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তো কিছু জানি না।'

'তাঁকে খুব লোভী বলে মনে হয় কি?'

'মাফ করবেন ব্যোমকেশবাবু, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।'

'ও—আচ্ছা। আজ চললুম।'

তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলো আমার মনে কাঁটার মত বিঁধিয়া রহিল। বীরেনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইনি অনুসন্ধিৎসু কেন? বীরেনবাবু কি লোভী? পুলিসের কর্মচারী সাধারণত অর্থগৃধ্নু হয় শুনিয়াছি। তবে বীরেনবাবু সম্বন্ধে কখনও কোনো কানাঘুষাও শুনি নাই। তবে এ প্রশ্নের তাৎপর্য কি? এবং গভর্নমেণ্টের এই গোপন ভৃত্যটি কোন্ মতলবে আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন?

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই খবরের কাগজ খুলিলাম। যাহা প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম তাহা বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার শুরুতেই রহিয়াছে—

"গতকল্য বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীরামপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক যুবকের লাস পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহে কোথাও ক্ষতচিহ্ন নাই। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, সুশ্রী চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। পরিধানে বাদামী রংয়ের গরম পাঞ্জাবী ও সাদা শাল ছিল। যুবক কলিকাতা হইতে ৪-৫৩ মিঃ লোকাল ট্রেনে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিল; পকেটে টিকিট পাওয়া গিয়াছে। যদি কেহ লাস সনাক্ত করিতে পারেন, শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধান করুন।"

তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম।

দ্বিতলে নামিয়া একতলার সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে যাইব, পিছু ডাক পড়িল, 'অজিতবাবু, সক্কাল না হতে কোথায় চলেছেন?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশবাবু নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না, বেশ সড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—'যাচ্ছি ডায়মণ্ড হারবারে —এক বন্ধুর বাড়ি। ব্যোমকেশ কবে ফিরবে কিছু তো ঠিক নেই, দুদিন ঘুরে আসি।'

'তা বেশ। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'কালকেতু'খানা বগলে করিয়া লইয়াছিলাম, বলিলাম, 'না, গাড়িতে পড়তে পড়তে যাব।' বলিয়া নামিয়া গেলাম।

রাস্তায় নামিয়া শিয়ালদহের দিকে কিছুদূর হাঁটিয়া গেলাম, তারপর সেখান হইতে ট্রাম ধরিয়া হাওড়া অভিমুখে রওনা হইলাম। নূতন মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে একটা অসুবিধা এই হয় যে ধরা পড়িবার লজ্জাটা সর্বদা মনে জাগরূক থাকে। ক্রমশ পরিপক্ক হইয়া উঠিলে বোধকরি ও দুর্বলতা কাটিয়া যায়।

যাহোক, হাওড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ শ্রীরামপুর পৌঁছিলাম।

হাসপাতালের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অদূরে একটি ছোট কুঠরী নির্দেশ করিয়া দিলেন। কুঠরীটি মূল হাসপাতাল হইতে পৃথক, সম্মুখে একজন পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

কাচ ও তার নির্মিত ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম; ভিতরে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে শানের মত লম্বা

বেদির উপরে ব্যোমকেশ শুইয়া আছে—তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত একটা কাপড় দিয়া ঢাকা। মুখখানা মৃত্যুর কাঠিন্যে স্থির।

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আবুহোসেন জাগো।'

ব্যোমকেশ চক্ষু খুলিল।

'কতক্ষণ এইভাবে অবস্থান করছ?'

'প্রায় দু'ঘণ্টা। একটা সিগারেট পেলে বড় ভাল হত।'

'অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি পিণ্ডি খেতে পারে শুনেছি, কিন্তু সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।'

'ঠিক জানো? মনুসংহিতায় কোনও বিধান নেই?'

'না। তারপর, ক'জন লোক দেখতে এল?'

'মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোক, নিতান্তই লোফার ক্লাশের।'

'তবে?'

'এখনও হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আজ সারাদিন আছে—কালকেও অন্তত সকালবেলাটা পাওয়া যাবে।'

'দু'দিন ধরে এইখানে পড়ে থাকবে? মনে কর যদি বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে না পড়ে?'

'চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি এখন অনবরত বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করছেন।'

'তা বটে! যাহোক, এখন আমি কি করব বল দেখি।'

'তুমি এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকো, যারা আসছে তাদের ওপরে লক্ষ্য রাখো। অবশ্য পুলিস নজর রেখেছে; যিনি এই হতভাগ্যকে পরিদর্শন করতে আসছেন তাঁরই পিছনে গুপ্তচর লাগছে। কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি যদি কোনো চেনা লোক দেখতে পাও, তখনি এসে আমাকে খবর দেবে। আমার মুশকিল হয়েছে চোখ খুলতে পারছি না, কাজেই যাঁরা এখানে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন তাঁদের শ্রীমুখ দর্শন করা হচ্ছে না। মড়া যদি মিটমিট করে তাকাতে আরম্ভ করে তাহলে বিষম হৈ চৈ পড়ে যাবে কিনা।'

'বেশ। আমি কাছাকাছিই রইলুম। পুলিস আবার হাঙ্গামা করবে না তো?'

'দ্বারের প্রহরীকে চুপি চুপি নিজের পরিচয় দিয়ে যেও, তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। তিনি একটি বর্ণচোরা আম; দেখতে পুলিস কনেস্টবল বটে কিন্তু আসলে একজন সি আই ডি দারোগা।'

বাহিরে আসিয়া ছদ্মবেশী প্রহরীকে আত্মপরিচয় দিলাম; তিনি অদূরে একটা মেতির ঝাড় দেখাইয়া দিলেন। মেতির ঝাড়টি এমন জায়গায় অবস্থিত যে তাহার আড়ালে লুকাইয়া বসিলে ব্যোমকেশের কুঠরীর দ্বার পরিষ্কার দেখা যায়, অথচ বাহির হইতে ঝোপের ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না।

ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিলাম। চারিদিক ঘেরা থাকিলেও মাথার উপর খোলা; দিব্য আরামে রোদ পোহাইতে পোহাইতে সিগারেট ধরাইলাম।

ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, দর্শন-অভিলাষী লোকের সংখ্যাও একটি দুইটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। উৎসুক ভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সকলেই অপরিচিত. চেহারা দেখিয়া বোধ হইল,,অধিকাংশই বেকার লোক একটা নূতন ধরনের মজা পাইয়াছে।

ক্রমে এগারোটা বাজিল, মাথার উপর সূর্যদেব প্রখর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। র‍্যাপারটা মাথায় চাপা দিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-ব্যক্তি দেশলাই চুরি করিয়াছে, সে শ্রীরামপুরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দেখিতে আসিবে কেন? আর, যদি বা আসে, এতগুলা লোকের মধ্যে তাহাকে দেশলাই-চোর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে কিরূপে? সত্য, সকলের পিছনেই পুলিস লাগি'ব, কিন্তু তাহাতেই বা কি সুবিধা হইতে পারে? মনে হইল, ব্যোমকেশ বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে।

ব্যোমকেশের ঘরের দিকে চাহিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া

গেল। একটি লোক দ্রুতপদে আসিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিল; বোধহয় পাঁচ সেকেন্ড পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল—প্রহরীর প্রশ্নে একবার মাথা নাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল

লোকটি আমাদের মেসের নূতন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহাকে দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে তিনি চলিয়া যাইবার পরও কিয়ৎকাল বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলাম তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া সেই ঘরের অভিমুখে ছুটিলাম।

ব্যোমকেশ বোধকরি আমার পদশব্দ শুনিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়া ছিল, আমি তাহার কাছে গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'ওহে, কে এসেছিলেন জানো? তোমার মিতে —মেসের সেই নূতন ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ সটান উঠিয়া বসিয়া আমার পানে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল। তারপর বেদী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল, 'ঠিক দেখেছ? কোনও ভুল নেই?'

'কোনও ভুল নেই।'

'যাঃ, এতক্ষণে হয়তো পালাল।'

ব্যোমকেশের গায়ে জামা কাপড় ছিল বটে কিন্তু জুতা পায়ে ছিল না, সেই অবস্থাতেই সে বাহিরের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গেল? এখনি যে-লোকটা এসেছিল?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'সেই নাকি?'

'হ্যাঁ—তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!'

'সে কলকাতা থেকে ট্যাক্সিতে এসেছিল, আবার ট্যাক্সিতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের মোটর-বাইকের বন্দোবস্ত করা হয়নি, তাই—'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এর জবাবদিহি আপনি করবেন।—এস অজিত, যদি একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়—হয়তো এখনও—'

কিন্তু ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। অগত্যা বাসে চড়িয়াই কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনিই তাহলে?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হুঁ।'

'কিন্তু বুঝলে কি করে?'

'সে অনেক কথা—পরে বলব।'

'আচ্ছা, উনি অত তাড়াতাড়ি পালালেন কেন? তুমি যদি মরে গিয়েই থাকো—'

'উনি শিকারী বেরাল, ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুঝেছিলেন যে ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাই চট্‌পট্‌ সরে পড়লেন।'

সাড়ে বারোটার সময় মেসে পৌঁছিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির মুখে মেসের ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছিলেন?'

ম্যানেজার সবিস্ময়ে নগ্নপদ ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দু' নম্বর ব্যোমকেশবাবু? তিনি তো এই খানিকক্ষণ হল চলে গেলেন। বাড়ি থেকে জরুরী খবর পেয়েছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তিনিও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি যেন দুঃখ না করেন, শীগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

## ৪

শিষ্টতার এই প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ঘর কোনটা?'

'ঐযে পাঁচ নম্বর ঘর।'

পাঁচ নম্বর ঘরের দ্বারে তালা লাগানো ছিল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর চাবি কোথায়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আমার কাছে একটা চাবি আছে, কিন্তু—'

'খুলুন।'

চাবির থোলো পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে ম্যানেজার উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'কি—কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু?'

'বিশেষ কিছু নয়; যে ভদ্রলোকটি এই ঘরে ছিলেন তিনি একজন দাগী আসামী।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তিনি তো কিছুই নিয়ে যাননি দেখছি। বাক্স বিছানা সবই রয়েছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'তিনি কেবল ছোট হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে গেছেন—আর সবই রেখে গেছেন। বললেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরবেন, আমিও ভাবলুম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক কথা। আপনি এবার থানার দারোগা বীরেনবাবুর কাছে খবর পাঠান—তাঁকে জানান যে চোরের সন্ধান পাওয়া গেছে, তিনি যেন শীগ্‌গির আসেন।—আমরা ততক্ষণ এই ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ম্যানেজার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। এই মেসের প্রায় সব ঘরগুলিই বড় বড়, প্রত্যেকটিতে দু' বা তিনজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। কেবল এই পাঁচ নম্বর ঘরটি ছিল ছোট, একজনের বেশী থাকা চলিত না। ভাড়াও কিছু বেশী পড়িত, তাই ঘরটা অধিকাংশ সময় খালি পড়িয়া থাকিত। যিনি মেসে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য ও নিভৃততা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ঘরটি চমৎকার।

ঘরে গোটা দুই ট্রাঙ্ক ও বিছানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যোমকেশ বিছানাটা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'শীতের সময়, অথচ লেপ তোষক বালিশ কিছুই নিয়ে যাননি। অর্থাৎ—বুঝেছ?'

'না। কি?'

'অন্যত্র আর একসেট বন্দোবস্ত আছে।'

ব্যোমকেশ বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি আশা করছ দেশলায়ের বাক্সটা তিনি এই ঘরে রেখে গেছেন?'

'না—তাহলে তিনি ফিরে এলেন কেন? আমি খুঁজছি তার বর্তমান ঠিকানা; যদি কোথাও কিছু পাই যা-থেকে তাঁর প্রকৃত নামধামের কিছু ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর সত্যিকারের নাম যে ব্যোমকেশ বসু নয় এটা বোধ হয় তুমিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ।'

'মানে—কি বলে—হ্যাঁ, পেরেছি বৈকি। কিন্ত 'ব্যোমকেশ' ছদ্মনাম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য কি?'

বিছানার উপর বসিয়া ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিল, 'উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা সাধন। অজিত, প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বটা বড় আশ্চর্য। তুমি গল্প-লেখক, সুতরাং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবই জানো। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে নেপথ্য থেকে প্রতিহিংসা সাধন করে মানুষ সুখ পায় না; প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা নিচ্ছে। শত্রু যদি জানতে না পারে কোথা থেকে আঘাত আসছে. তাহলে প্রতিহিংসার অর্ধেক আনন্দই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইনি তাই একেবারে আমার বুকের ওপর এসে চেপে বসেছিলেন। এটা যদি সুসভ্য বিংশ শতাব্দী না হয়ে প্রস্তর-যুগ হত, তাহলে এত ছল

চাতুরীর দরকার হত না, উনি একেবারে পাথরের মুগুর নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা চলে না, ফাঁসি যাবার ভয় রয়েছে। মোট কথা, প্রতিহিংসার পদ্ধতিটা বদলেছে বটে কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বদলায়নি। আজ যে উনি আমার মৃত মুখখানা দেখবার জন্যে শ্রীরামপুরে ছুটেছিলেন, সেও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।' ব্যোমকেশ খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'চিঠিখানার কথা মনে আছে তো, সেটা আমারই উদ্দেশ্যে লেখা এবং উনি নিজেই লিখেছিলেন। তার বাহ্য কৃতজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অতি ক্রূর ইঙ্গিত। তিনি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ভাবেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি ভোলেননি—ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। আমরা অবশ্য তখন চিঠির মানে ভুল বুঝেছিলাম, তবু—আমার মনে একটু খটকা লেগেছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

সেই চিঠিতে লিখিত কথাগুলো যেন এখন নূতন চক্ষে দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, 'মনে আছে। কিন্তু তখন কে জানত—; আচ্ছা, লোকটা তোমার কোনও পুরনো শত্রু—না?'

'তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'লোকটা কে তা কিছু বুঝতে পারছ না?'

'বোধহয় একটু একটু পারছি। কিন্তু এখন ও কথা যাক, আগে তাঁর বাক্সগুলো দেখি।'

একটা বাক্সের চাবি খোলাই ছিল, তাহাতে দৈনিক ব্যবহার্য কাপড় চোপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। অন্যটার তালা লইয়া ব্যোমকেশ দু'একবার নাড়াচাড়া করিয়া একটু চাপ দিতেই সেটাও খুলিয়া গেল। ভিতরে কয়েকটা গরম কোট পাঞ্জাবী ইত্যাদি রহিয়াছে। সেগুলা বাহির করিয়া তলায় অনুসন্ধান করিতে এক শিশি স্পিরিট-গাম ও কিছু বিনুনিকরা ক্রেপ চুল বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, মুখে যার অ্যাসিড ছাপ মেরে দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে গোঁফ দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় বৈকি। এই সব পরে সম্ভবতঃ ইনি ট্রামে আমার দেশলাই বদলে নিয়েছিলেন।'

ক্রেপ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ আবার কয়েকটা জিনিস দুই হাতে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করিল, বলিল, 'কিন্তু এগুলো কি?'

মোমজামার মত খানিকটা কাপড়ে কি কতকগুলা জড়ানো রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সাবধানে সেগুলা মেঝের উপর রাখিয়া মোড়ক খুলিল। একটি আধ আউন্সের খালি শিশি, কয়েক-খণ্ড সীলমোহর করিবার লাল রংয়ের গালা ও অর্ধ দগ্ধ একটি মোমবাতি রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ শিশির ছিপি খুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল, মোমবাতি ও গালা খুব মনো-যোগের সহিত দেখিল। শেষে মোমজামাটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। দেখিলাম সাধারণ মোমজামা নয়, খুব ভাল জাতীয় ওয়াটার-প্রুফ কাপড়—ঈষৎ নীলাভ এবং স্বচ্ছ—আয়তনে একটা রুমালের মত। বর্তমানে তাহার একটা কোণের প্রায় সিকি ভাগ কাপড় নাই—মনে হয় কোনও কারণে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'শিশি, গালা, মোমবাতি এবং ওয়াটারপ্রুফের একত্র সমাবেশ। মানে বুঝতে পারলে?'

'না—কি মানে?'

'ওয়াটারপ্রুফ থেকেও কিছু আন্দাজ করতে পারলে না?'

হতাশভাবে বলিলাম, 'কিছু না। তুমি কি বুঝলে?'

'সবই বুঝেছি, শুধু ভদ্রলোকের বর্তমান ঠিকানা ছাড়া।—চল, এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে।'

এই সময় ম্যানেজারবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'দারোগাবাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।'

'বেশ।—আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আমার এই মিতেটি যখন চলে গেলেন তখন আপনি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সদর পর্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।'

'ট্যাক্সির নম্বরটা আপনার চোখে পড়েনি?'

মাথা নাড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, 'আজ্ঞে না! নীল রঙের পুরনো ট্যাক্সি—ড্রাইভার একজন শিখ—এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলুম।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে সময় দোরের কাছে আর কেউ ছিল?'

ম্যানেজার ভাবিয়া বলিলেন, 'ভদ্রলোক কেউ ছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না, তবে আপনাদের চাকর পুঁটিরাম দাওয়ায় বসেছিল। আপনারা বাসায় ছিলেন না, তাই সে বোধহয় একটু—'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম থাকা না-থাকা সমান। সে তো আর ইংরিজি জানে না, কাজেই ট্যাক্সির নম্বর চোখে দেখলেও পড়তে পারবে না।—চল অজিত, দেড়টা বাজল, পেটও বাপান্ত করছে। ম্যানেজারবাবু, এবেলা দু'টি ভাত আমাদের দিতে হবে। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।'

ম্যানেজার সানন্দে বলিলেন, 'বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের! ব্যোমকেশবাবুর—মানে, দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু—ভাত হাঁড়িতেই আছে, তিনি তো খাননি। আপনারা স্নান করুনগে, আমি ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মন্দ ব্যবস্থা নয়। দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুর বাড়া ভাত এক নম্বর ব্যোমকেশবাবু খাবেন। দুনিয়াতে এই ব্যাপার তো হরদম চলছে—কি বল অজিত? এখন দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু কোথায় বসে কার ভাত খাচ্ছেন সেইটে জানতে পারলে বড় খুশী হতুম।'

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বীরেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও রকমে অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিতেই বীরেনবাবু উঠিয়া প্রশ্ন-ব্যাকুল নেত্রে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলেন। তাহার সমস্ত দেহ একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকার ধারণ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার এখনো খাওয়া হয়নি দেখছি।'

'না। খাবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছিলুম এমন সময় আপনার ডাক পেলুম।—কি হল ব্যোমকেশবাবু? ধরেছেন তাকে?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছু খাবার আনিয়ে দিই।'

'খাবার দরকার নেই। তবে যদি এক পেয়ালা চা—'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ। এবং সেই সঙ্গে দুটো নিষিদ্ধ ডিম।—পুঁটিরাম।'

পুঁটিরাম হুকুম লইয়া প্রস্থান করিলে পর, ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাঁহাকে না বলিয়া এত কাজ করা হইয়াছে, ইহাতে বীরেনবাবু একটু আহত হইলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে যথা সম্ভব মিষ্ট করিয়া সান্ত্বনা দিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমি যদি জানতুম তাহলে সে এমন হাত-ফস্‌কে পালাতে পারত না। এখন তাকে ধরা কঠিন হবে। এতক্ষণে সে হয়তো কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে গেছে।'

ব্যোমকেশ মেঝের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'আমার কিন্তু মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে। কারণ সে মার্কা-মারা লোক, ওরকম মুখ নিয়ে মানুষ বেশী দূর পালাতে পারে না। কলকাতা শহরই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'তাহলে এখন কর্তব্য কি? তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইস্তাহার জারি করা ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না।'

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'ওটা তো হাতেই আছে। কিন্তু তার আগে—যদি ট্যাক্সির নম্বরটা পাওয়া যেত—'

ইতিমধ্যে পুঁটিরাম চা ইত্যাদি আনিয়া বীরেনবাবুর সম্মুখে রাখিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'পুঁটিরাম, তোমার ইংরিজি শেখা দরকার, আজই একখানা প্যারী সরকারের ফার্স্টবুক কিনে আনবে। অজিত আজ থেকে তোমাকে ইংরিজি শেখাবে।'

অবান্তর কথায় বীরেনবাবু বিস্মিত ভাবে ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'ও যদি ইংরিজি জানত তাহলে আজ কোনও হাঙ্গামাই হত না।' পুঁটিরামের দ্বারের কাছে অবস্থিতি ও ট্যাক্সি দর্শনের কথা বলিয়া ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

পুঁটিরাম মুখের সম্মুখে মুষ্টি তুলিয়া সসম্ভ্রমে একটু কাশিল—

'আজ্ঞে—'

'কি?'

'আজ্ঞে, টেক্সির লম্বর আমি দেখেছি।'

'তা দেখেছ—কিন্তু পড়তে তো পারোনি।'

'আজ্ঞে, পড়তে পেরেছি। চারের পিঠে দুটো শুন্যি, তারপর আবার একটা চার।'

আমরা তিনজনে অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুই ইংরিজি পড়তে জানিস?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'বাংলাতে লেখা ছিল বাবু, সেই জন্যেই তো চোখে পড়ল।'

আমরা চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'বুঝেছি।' পুঁটিরামের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা! পুঁটিরাম, আজ থেকে তোমার মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলুম।'

পুঁটিরাম সহর্ষে এবং সলজ্জে বলিল, 'আজ্ঞে, বাইরের দাওয়ায় বসেছিলুম, ট্যাক্সিতে বাংলা লম্বর দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। তাইতো লম্বরটা মনে আছে হুজুর।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? ট্যাক্সিতে বাংলা নম্বর এল কোত্থেকে?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাংলা নয়—ইংরিজি নম্বরই ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেটা বাংলা হয়ে পড়েছিল। বুঝলেন না? আসলে নম্বরটা ৮০০৮, পুঁটিরাম তাকে পড়েছে 4004।'

'ওঃ—' বীরেনবাবুর চক্ষুর্দ্বয় ও অধরোষ্ঠ কিছুক্ষণ বর্তুলাকার হইয়া রহিল।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? বীরেনবাবু, এ তো আপনার কাজ। নীল রংয়ের গাড়ি, চালক শিখ, নম্বর ৮০০৮—খুঁজে বার করতে বেশী কষ্ট হবে না। আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, খবরটা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল।'

'আমি এখনি যাচ্ছি—' বীরেনবাবু উঠিয়া এক চুমুকে চা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যের আগেই আশা করি খবর নিয়ে আসতে পারব।'

'শুধু খবর নয়, একেবারে গাড়ি ড্রাইভার সব নিয়ে হাজির হবেন। ইতিমধ্যে আমি কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন যোগে খবরটা জানিয়ে দিই। তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

গমনোদ্যত বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসামীর নাম বা পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আপনি কোনও খবর দিতে পারেন না?'

'নির্ভুল খবর এখন দিতে পারি কিনা জানি না, তবু—' এক টুকরা কাগজে একটা নম্বর লিখিয়া তাঁহার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আলিপুর জেলে এই কয়েদীর ইতিহাস খুঁজলে হয়তো কিছু পরিচয় পাবেন।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'লোকটা তাহলে দাগী?'

'আমার তো তাই মনে হয়। কাল সকালে তার খোঁজ করে নম্বরটা বার করেছিলুম, কিন্তু তার জেলের ইতিহাস পড়বার ফুরসত হয়নি। আপনি সরকারী লোক, এ কাজটা সহজেই পারবেন—অফিসের মারফত। কেমন?'

'নিশ্চয়।'

বীরেনবাবু কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে বীরেনবাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ব্যোমকেশ তাহার রিভলবারটা তেল ও ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল।

আমি বলিলাম, 'বীরেনবাবু তো এখনো এলেন না।'

'এইবার আসবেন।' ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, লোকটার আসল নাম কি? তুমি নিশ্চয় জানো?'

'আমি তো বলেছি, এখনও ঠিক জানি না।'

'তবু আন্দাজ তো করেছ।'

'তা করেছি।'

'কে লোকটা? আমার চেনা নিশ্চয়—না?'

'শুধু চেনা নয়, তোমার একজন পুরনো বন্ধু।'

'কি রকম?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সেই চিঠিখানাতে কোকনদ গুপ্ত নাম ছিল মনে আছে বোধ হয়। তা থেকে কিছু অনুমান করতে পার না?'

'কি অনুমান করব। কোকনদ গুপ্ত তো ছদ্মনাম।'

'সেই জন্যই তো তাতে আরো বেশী করে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ—আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম-দুটোর কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু মানুষ যখন ভেবে চিন্তে ছদ্মনাম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে অনেকখানি ইঙ্গিত পুরে দেবার চেষ্টা করে। কোকনদ শব্দটা তোমাকে কিছু মনে করিয়ে দিচ্ছে না? কোনও একটা শব্দগত সাদৃশ্য?'

আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'কি জানি, আমি তো এক কোকেন ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, 'কোকনদের সঙ্গে কোকেনের সাদৃশ্য মোটেই কাব্যানুমোদিত নয়, তাই তোমার মন উঠ্‌ছে না—কেমন? কিন্তু—ঐ বীরেনবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একজন। অজিত, আলোটা জেলে দাও, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু প্রবেশ করিলেন; তাঁহার সঙ্গে একটি দীর্ঘাকৃতি শিখ। শিখের মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি—গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা কিঞ্চিৎ সংযত করা হইয়াছে। মাথায় বেণী। ব্যোমকেশ উভয়কে আদর করিয়া বসাইল।

কালব্যয় না করিয়া ব্যোমকেশ শিখকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল। শিখ বলিল, আজ সকালের আরোহীকে তাহার বেশ মনে আছে। তিনি বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তাহার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া শ্রীরামপুরে যান; সেখানে হাসপাতালের অনতিদূরে গাড়ি রাখিয়া তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার লৌটিয়া আসিয়া দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। কলিকাতায় পহুঁছিয়া তিনি এই বাসায় নামেন, তারপর সামান্য কিছু সামান্ লইয়া আবার গাড়িতে আরোহণ করেন। এখান হইতে বউবাজারের কাছাকাছি একটা স্থানে গিয়া তিনি শেষবার নামিয়া যান। তিনি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরন্তু দুই টাকা বখ্‌শিশ দিয়াছেন; ইহা হইতে শিখের ধারণা জন্মিয়াছে সে লোকটি অতিশয় সাধু ব্যক্তি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি শেষবার নেমে গিয়ে কি করলেন?'

শিখ বলিল, তাহার যতদূর মনে পড়ে তিনি একজন ঝাঁকামুটের মাথায় তাঁহার বেগ্ ও জলের সোরাহি চড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; কোনদিকে গিয়াছিলেন তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তোমার গাড়ি এনেছ। সেই বাবুটিকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ঠিক সেইখানে পেঁছে দিতে পারবে?'

শিখ জানাইল যে বে-শক্ পারিবে।

তখন আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া নীচে নামিলাম। নীল রংয়ের গাড়ি বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ৮০০৮ নম্বর গাড়িই বটে। আমরা তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শিখ গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল।

রাত্রি হইয়াছিল। গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া বীরেনবাবু হঠাৎ বলিলেন, 'আপনার কয়েদীর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। ইনি তিনিই বটে। মাস ছয়েক হল জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই। মুখ পুড়েছিল কি করে?'

'ইনি শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বিজ্ঞানবিৎ বলে এঁকে জেল-হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের শিশি ভেঙে গিয়ে মুখের ওপর পড়ে। বাঁচবার আশা ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন।'

আর কোনও কথা হইল না। মিনিট পনেরো পরে আমাদের গাড়ি এমন একটা পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইল যে আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যোমকেশ, এ কি! এ যে আমাদের—' বহুদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পাড়ারই একটা মেসে ব্যোমকেশের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।*

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' চালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'এইখানেই তিনি গিয়েছিলেন?'

চালক বলিল, 'হাঁ।'

একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, এবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, নামবেন না?'

'দরকার নেই। আমাদের শিকার কোথায় আছে আমি জানি।'

'তাহলে তাকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার।'

ব্যোমকেশ বীরেনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে? দেশলায়ের বাক্সটা চাই না?'

'না না—তা চাই বৈ কি। তাহলে কি করতে চান?'

'আগে দেশলায়ের বাক্সটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর তাকে ধরতে চাই। চলুন, কি করতে হবে বাসায় গিয়ে বলব।'

আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম।

রাত্রি আটটার সময় আমি, ব্যোমকেশ ও বীরেনবাবু একটা অন্ধকার গলির মোড়ে এক ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া বসিলাম। এইখানে একটা গাড়ির স্ট্যান্ড আছে—তাই, আমাদের গাড়িটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমাদের সেই পুরাতন মেস। বাড়িখানা এ কয় বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই, যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল দ্বিতলের মেসটা উঠিয়া গিয়াছে; উপরের সারি সারি জানালাগুলিতে কোথাও আলো নাই।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অপেক্ষা করিবার পর আমি বলিলাম, 'আমরা ধরনা দিচ্ছি, কিন্তু উনি যদি আজ রাত্রে না বেরোন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেরুবেন বৈ কি। রাত্রে আহার করতে হবে তো।'

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ গাড়ির খড়খড়ির ভিতর চক্ষু নিবন্ধ করিয়াছিল, সহসা চাপা গলায় বলিল, 'এইবার! বেরুচ্ছেন তিনি।'

*'সত্যান্বেষী' গল্প দ্রষ্টব্য।

আমরাও খড়খড়িতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, একজন লোক আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া সেই বাড়ির দরজা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তারপর একবার ক্ষিপ্র-দৃষ্টিতে রাস্তার দুইদিকে তাকাইয়া দ্রুতপদে দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই হয়। সে অদৃশ্য হইয়া গেলে আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলাম।

সম্মুখের দরজায় তালা বন্ধ। ব্যোমকেশ মৃদু স্বরে বলিল, 'এদিকে এস।'

পাশের যে-দরজা দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, সে দরজাটা খোলা ছিল; আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এইখানে সরু একফালি বারান্দা, তাহাতে একটি দরজা নীচের ঘরগুলিকে উপরের সিঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। ব্যোমকেশ পকেট হইতে একটা টর্চ বাহির করিয়া দরজাটা দেখিল; বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় দরজা কীটদষ্ট ও কমজোর হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ জোরে চাপ দিতেই হুড়্কা ভাঙিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ভাঙা দরজা স্বাভাবিক রূপে ভেজাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ টর্চের আলো চারিদিকে ফিরাইল। ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত, মেঝেয় পুরু হইয়া ধুলা পড়িয়াছে, কোণে ঝুল ও মাকড়সার জাল। ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা নয়, ওদিকে চল।'

ঘরের একটা দ্বার ভিতরের দিকে গিয়াছিল, সেটা দিয়া আমরা অন্য একটা ঘরে উপস্থিত হইলাম। এ ঘরটা আমাদের পরিচিত, বহুবার এখানে বসিয়া আড্ডা দিয়াছি। টর্চের আলোয় দেখিলাম ঘরটি সম্প্রতি পরিষ্কৃত হইয়াছে, একপাশে একটি তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা, মধ্যস্থলে একটি টেবিল ও চেয়ার। ব্যোমকেশ ঘরটার চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ, এই ঘরটা। বীরেনবাবু, এবার আসুন অন্ধকারে বসে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করা যাক।'

বীরেনবাবু ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্সটা এই বেলা—'

'সেজন্যে ভাবনা নেই। রিভলবার আর হাতকড়া পকেটে আছে তো?'

'আছে।'

'বেশ। মনে রাখবেন, লোকটি খুব শান্ত-শিষ্ট নয়।'

আমি এবং বীরেনবাবু তক্তপোষের উপর বসিলাম, ব্যোমকেশ চেয়ারটা দখল করিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টা তখনও অতীত হয় নাই, বাহিরের দরজায় খুট্‌ করিয়া শব্দ হইল। আমরা খাড়া হইয়া বসিলাম; নিশ্বাস আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অতি মৃদু পদক্ষেপ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তারপর সহসা ঘরের আলো দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সহজ স্বরে বলিল, 'আসতে আজ্ঞা হোক অনুকূলবাবু। আমরা আপনার পুরনো বন্ধু, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না।'

অনুকূল ডাক্তার—অর্থাৎ দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু—সুইচে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। তাঁহার পক্ষ্মহীন চক্ষু দু'টি একে একে আমাদের তিনজনকে পরিদর্শন করিল। তারপর তাঁহার বিবর্ণ বিকৃত মুখে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দেখা দিল; তিনি দাঁতের ভিতর হইতে বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু যে! সঙ্গে পুলিস দেখছি। কি চাই? কোকেন?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না না, অত দামী জিনিস চেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করব না। আমরা অতি সামান্য জিনিস চাই—একটা দেশলায়ের বাক্স।'

অনুকূলবাবুর অনাবৃত চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেশলায়ের বাক্স! তার মানে?'

'মানে, যে-বাক্স থেকে একটি কাঠি সম্প্রতি ট্রামে যেতে যেতে আপনি আমায় উপহার

দিয়েছিলেন, তার বাকি কাঠিগুলি আমার চাই। আপনি তাদের যে মূল্য ধার্য করেছেন অত টাকা তো আমি দিতে পারব না, তবে আশা আছে বন্ধুজ্ঞানে সেগুলি আপনি বিনামূল্যেই আমায় দেবেন।'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।'

'পারছেন বৈকি। কিন্তু হাতটা আপনি সুইচ থেকে সরিয়ে নিন। ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের চেয়ে আপনারই বিপদ হবে বেশী। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি, দু'টি রিভলবার আপনার বুকের দিকে স্থির লক্ষ্য করে আছে।'

অনুকূলবাবু সুইচ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মুখে পাশবিক ক্রোধ এতক্ষণে উলঙ্গ মূর্তি ধরিয়া দেখা দিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, '(ছাপিবার যোগ্য নয়) আমার জীবনটা তুই নষ্ট করে দিয়েছিস! তো...' অনুকূলবাবুর ঠোঁটের কোণে ফেনা গাঁজাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'ডাক্তার, জেলখানায় থেকে তোমার ভাষাটা বড় ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি। দেবে না তাহলে দেশলায়ের বাক্সটা?'

'না—দেব না। আমি জানি না কোথায় দেশলায়ের বাক্স আছে। তোর সাধ্য হয় খুঁজে নে, —কোথাকার।'

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—'খুঁজেই নিই তাহলে।—বীরেনবাবু, আপনি সতর্ক থাকবেন।'

ব্যোমকেশ তক্তপোষের শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজাটা সেখানে রাখা ছিল, সেটা দু'হাতে তুলিয়া লইয়া সে মেঝের উপর আছাড় মারিল। কুঁজা সশব্দে ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল।

কুঁজার ভগ্নাংশগুলির মধ্য হইতে নীল কাপড়ে মোড়া শিশির মত একটা জিনিস তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ আলোর সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, 'ওয়াটারপ্রুফ, শিশি, সীলমোহর, সব ঠিক আছে—শিশিটা ভাঙেনি দেখছি—বীরেনবাবু, দেখলাই পাওয়া গেছে—এবার চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।'

## ৬

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'এই কাহিনীর মরাল হচ্ছে—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। পুঁটিরাম যদি দাওয়ায় বসে না থাকত এবং ট্যাক্সির নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু দেশলাই-চোর যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার কি করে হল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার সত্যান্বেষী জীবনে যতগুলি ভয়ঙ্কর শত্রু তৈরী করেছি, তার মধ্যে কেবল তিনজন বেঁচে আছে। প্রথম—পেশোয়ারী আমীর খাঁ, যে মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সূক্ষ্ম ললিতকলায় পরিণত করেছিল। বিচারে পীনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর জেল হয়। দ্বিতীয়—পলিটিকাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার, যে সরকারী অর্থনৈতিক গুপ্ত সংবাদ চুরি করে শেয়ার মার্কেটে বিক্রি করত। বছর দুই আগে তার সাত বছর শ্রীঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয়—আমাদের অনুকূল ডাক্তার। ইনি কোকেনের ব্যবসা এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে দশ বছর জেলে যান। হিসেব করে দেখছি, বর্তমানে কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে। সুতরাং অনুকূলবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'তা বটে। কিন্তু এই দগ্ধানন ভদ্রলোকটিই যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার হয়েছিল?'

'না। ওঁর হাঁটার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ওঁকে সন্দেহ করিনি।

তারপর সেই কোকনদ গুপ্তর চিঠিখানা—সেটাও মনে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকনদ নামটা এতই অস্বাভাবিক যে ছদ্মনাম বলে সন্দেহ হয়, উপরন্তু আবার 'গুপ্ত'। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের দেশের লোক ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলেই নামের শেষে একটা 'গুপ্ত' বসিয়ে দেয়। তাই, দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবু যখন চিঠিখানা নিজের বলে স্পষ্টভাবে দাবী করতে না পেরেও নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কোকনদ শব্দটা কোকেনের কথাই মনে করিয়ে দেয়—তুমি ঠিক ধরেছিলে। কিন্তু তখন দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুর ওপর কোনও সন্দেহ হয়নি, তাই মনের সংশয় জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর শ্রীরামপুর হাসপাতালে তুমি যখন বললে, উনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখন নিমেষের মধ্যে সংশয়ের সব অন্ধকার কেটে গেল। বুঝলুম উনিই অনুকূলবাবু এবং দেশলাই-চোর।

'উনি ব্যোমকেশ নাম গ্রহণ করে এ বাসায় উঠেছিলেন কেন?'

'আগেই বলেছি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড় অদ্ভুত জিনিস। ঐ চিঠিখানা আমাকে দিয়ে, আমি বুঝতে পারি কি না দেখবার জন্যে উনি এত কাণ্ড করেছিলেন: আর ঐ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়েই শ্রীরামপুরে আমার মৃত মুখ দেখতে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, ওঁর মুখের চেহারা এমন বদলে গেছে যে আমরা ওঁকে চিনতে পারব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা, জলের কুঁজোর মধ্যে দেশলায়ের কাঠি লুকিয়ে রেখেছেন, এটা ধরলে কি করে?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'এইখানে অনুকূলবাবুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশলায়ের কাঠি জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে এ কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই, যদি কোনও কারণে তাঁর ঘর খানাতল্লাস হয়, জলের কুঁজোর মধ্যে কেউ তা খুঁজতে যাবে না। আমার সন্দেহ হল যখন শুনলুম, তিনি একটি হ্যাণ্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে চলে গেছেন। হ্যাণ্ডব্যাগ না হয় বুঝলুম, কিন্তু জলের কুঁজো নিয়ে গেলেন কেন? শীতকালে যে-লোক লেপ বিছানা নিয়ে গেল না, সে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে কি জন্যে? জলের কুঁজো কি এতই দরকারী? তারপর তাঁর বাক্স থেকে যখন গালা ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি বেরুল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। কাঠিগুলি তিনি শিশিতে পুরে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে জড়িয়ে সীলমোহর করে তাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে জলের মধ্যে থেকেও নষ্ট না হয়। অনুকূলবাবুর বুদ্ধি ছিল অসামান্য, কিন্তু বিপথগামী হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল!'

পুঁটিরাম চায়ের শূন্য বাটিগুলা সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, ফার্স্টবুক এনেছ?'

লজ্জিতভাবে পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। অজিত, আজ থেকেই তাহলে পুঁটিরামের হায়ার এডুকেশন আরম্ভ হোক। কারণ প্রত্যেক বারই যে ৮০০৮ নম্বর ট্যাক্সিতে আসামী পালাবে এমন তো কোনো কথাই নেই।'

# রক্তমুখী নীলা

টেবিলের উপর পা তুলিয়া ব্যোমকেশ পা নাচাইতেছিল। খোলা সংবাদপত্রটা তাহার কোলের উপর বিস্তৃত। শ্রাবণের কর্মহীন প্রভাতে দু'জনে বাসায় বসিয়া আছি; গত চারদিন ঠিক এইভাবে কাটিয়াছে। আজিকারও এই ধারাস্রাবি ধূসর দিনটা এইভাবে কাটিবে, ভাবিতে ভাবিতে বিমর্ষ হইয়া পড়িতেছিলাম।

ব্যোমকেশ কাগজে মগ্ন; তাহার পা স্বেচ্ছামত নাচিয়া চলিয়াছে। আমি নীরবে সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি; কাহারও মুখে কথা নাই। কথা বলার অভ্যাস যেন ক্রমে ছুটিয়া যাইতেছে।

কিন্তু চুপ করিয়া দু'জনে কাঁহাতক বসিয়া থাকা যায়? অবশেষে যা হোক একটা কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই বলিলাম, 'খবর কিছু আছে?'

ব্যোমকেশ চোখ না তুলিয়া বলিল, 'খবর গুরুতর—দু'জন দাগী আসামী সম্প্রতি মুক্তিলাভ করেছে।'

একটু আশান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে তাঁরা?'

'একজন হচ্ছেন শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—তিনি মুক্তিলাভ করেছেন বিচিত্রা নামক টকি হাউসে; আর একজনের নাম শ্রীযুত রমানাথ নিয়োগী—ইনি মুক্তিলাভ করেছেন আলিপুর জেল থেকে। দশ দিনের পুরনো খবর, তাই আজ 'কালকেতু' দয়া করে জানিয়েছেন।' বলিয়া সে ক্রুদ্ধ-হতাশ ভঙ্গিতে কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুঝিলাম সংবাদের অপ্রাচুর্যে বেচারা ভিতরে ভিতরে ধৈর্য হারাইয়াছে। অবশ্য আমাদের পক্ষে নৈষ্কর্মের অবস্থাই স্বাভাবিক; কিন্তু তাই বলিয়া এই বর্ষার দিনে তাজা মুড়ি-চালভাজার মত সংবাদপত্রে দু' একটা গরম গরম খবর থাকিবে না—ইহাই বা কেমন কথা। বেকারের দল তবে বাঁচিয়া থাকিবে কিসের আশায়?

তবু, 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।' বলিলাম, 'শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীনকে তো চিনি, কিন্তু রমানাথ নিয়োগী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। তিনি কে?'

ব্যোমকেশ ঘরময় পায়চারি করিল, জানালা দিয়া বাহিরে বৃষ্টি-ঝাপ্সা আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'নিয়োগী মহাশয় নিতান্ত অপরিচিত নয়। কয়েক বছর আগে তাঁর নাম খবরের কাগজে খুব বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ পাঠকের স্মৃতি এত হ্রস্ব যে দশ বছর আগের কথা মনে থাকে না।'

'তা ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর তো পেলুম না। কে তিনি?'

'তিনি একজন চোর। ছিঁচ্‌কে চোর নয়, ঘটিবাটি চুরি করেন না। তাঁর নজর কিছু উঁচু—'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার।' বুদ্ধিও যেমন অসাধারণ সাহসও তেমনি অসীম।'—ব্যোমকেশ স-খেদ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, 'আজকাল আর এরকম লোক পাওয়া যায় না।'

বলিলাম, 'দেশের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু ওঁর নাম বড় বড় অক্ষরে খবরের কাগজে উঠেছিল কেন?'

'কারণ শেষ পর্যন্ত তিনি ধরা পড়ে গিয়েছিলেন এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁর বিচার হয়েছিল।' টেবিলের উপর সিগারেটের টিন রাখা ছিল, একটা সিগারেট তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ যত্ন সহকারে ধরাইল; তারপর আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'দশ বছর হয়ে গেল কিন্তু এখনও ঘটনাগুলো বেশ মনে আছে। তখন আমি সবেমাত্র এ কাজ আরম্ভ করেছি—তোমার সঙ্গে দেখা হবারও আগে—'

দেখিলাম, ঔদাস্যভরে বলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই নিজের স্মৃতিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। বর্ষার দিনে যখন অন্য কোনও মুখরোচক খাদ্য হাতের কাছে নাই, তখন স্মৃতিকথাই চলুক—এই ভাবিয়া আমি বলিলাম, 'গল্পটা বল শুনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্প কিছু নেই। তবে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা কারণে রহস্যময় হয়ে আছে। পুলিস খেটেছিল খুব এবং বাহাদুরিও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আসল জিনিসটি উদ্ধার করতে পারেনি।

'আসল জিনিসটি কি?'

'তবে বলি শোন। সে সময় কলকাতা শহরে হঠাৎ জহরত চুরির খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল; আজ জহরলাল হীরালালের দোকানে চুরি হচ্ছে, কাল দত্ত কোম্পানীর দোকানে চুরি হচ্ছে—এই রকম ব্যাপার। দিন পনেরোর মধ্যে পাঁচখানা বড় বড় দোকান থেকে প্রায় তিন চার লক্ষ টাকার হীরা জহরত লোপাট হয়ে গেল। পুলিস সজোরে তদন্ত লাগিয়ে দিলে।

'তারপর একদিন মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের বাড়িতে চুরি হল। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের পরিচয় দিয়ে তোমায় অপমান করব না, বাঙালীর মধ্যে তাঁর নাম জানে না এমন লোক কমই আছে। যেমন ধনী তেমনি ধার্মিক। তাঁর মত সহৃদয় দয়ালু লোক আজকালকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না। সম্প্রতি তিনি একটু বিপদে জড়িয়ে পড়েছেন—কিন্তু সে থাক। ভাল ভাল জহরত সংগ্রহ করা তাঁর একটা শখ ছিল; বাড়িতে দোতলার একটা ঘরে তাঁর সংগৃহীত জহরতগুলি কাচের শো-কেসে সাজান থাকত। সতর্কতার অভাব ছিল না; সেপাই সান্ত্রী চৌকিদার অষ্টপ্রহর পাহারা দিত। কিন্তু তবু একদিন রাত্রিবেলা চোর ঢুকে দু'জন চৌকিদারকে অজ্ঞান করে তাঁর কয়েকটা দামী জহরত নিয়ে পালাল।

'মহারাজের সংগ্রহে একটা রক্তমুখী নীলা ছিল, সেটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নীলাটাকে মহারাজ নিজের ভাগ্যলক্ষ্মী মনে করতেন; সর্বদা আঙুলে পরে থাকতেন। কিন্তু কিছুদিন আগে সেটা আংটিতে আলগা হয়ে গিয়েছিল বলে খুলে রেখেছিলেন। বোধহয় ইচ্ছে ছিল, স্যাকরা ডাকিয়ে মেরামত করে আবার আঙুলে পরবেন। চোর সেই নীলাটাও নিয়ে গিয়েছিল।

'নীলা সম্বন্ধে তুমি কিছু জান কি না বলতে পারি না। নীলা জিনিসটা হীরে, তবে নীল হীরে। অন্যান্য হীরের মত কিন্তু কেবল ওজনের ওপরই এর দাম হয় না: অধিকাংশ সময়—অন্তত আমাদের দেশে—নীলার দাম ধার্য হয় এর দৈবশক্তির ওপর। নীলা হচ্ছে শনিগ্রহের পাথর। এমন অনেক শোনা গেছে যে পয়মন্ত নীলা ধারণ করে কেউ কোটিপতি হয়ে গেছে, আবার কেউ বা রাজা থেকে ফকির হয়ে গেছে। নীলার প্রভাব কখনও শুভ কখনও বা ঘোর অশুভ।

'একই নীলা যে সকলের কাছে সমান ফল দেবে তার কোনও মানে নেই। একজনের পক্ষে যে নীলা মহা শুভকর, অন্যের পক্ষে সেই নীলাই সর্বনেশে হতে পারে। তাই নীলার দাম তার ওজনের ওপর নয়। বিশেষতঃ রক্তমুখী নীলার। পাঁচ রতি ওজনের একটি নীলার জন্যে আমি একজন মাড়োয়ারীকে এগারো হাজার টাকা দিতে দেখেছি। লোকটা যুদ্ধের বাজারে চিনি আর লোহার ব্যবসা করে ডুবে গিয়েছিল, তারপর—: কিন্তু সে গল্প আর একদিন বলব। আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া হিন্দু নই, ভূত-প্রেত মারণ-উচাটন বিশ্বাস করি না কিন্তু রক্তমুখী নীলার অলৌকিক শক্তির উপর আমার অটল বিশ্বাস।

'সে যাক, যা বলছিলুম। মহারাজ রমেন্দ্র সিংহের নীলা চুরি যাওয়াতে তিনি মহা হৈ চৈ বাধিয়ে দিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকার মণি-মুক্তো চুরি গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কাছে নীলাটা যাওয়াই সবচেয়ে মর্মান্তিক। তিনি ঘোষণা করে দিলেন যে চোর ধরা পড়ুক আর না পড়ুক, তাঁর নীলা যে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে, তাকে তিনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। পুলিস তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলই এখন আরও উঠে পড়ে লেগে গেল। পুলিসের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা নির্মলবাবু তদন্তের ভার গ্রহণ করলেন।

'নির্মলবাবুর নাম বোধ হয় তুমি শোননি, সত্যিই বিচক্ষণ লোক। তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় ছিল, এখন তিনি রিটায়ার করেছেন। যা হোক, নির্মলবাবু তদন্ত হাতে নেবার সাত দিনের মধ্যেই জহরত-চোর ধরা পড়ল। চোর আর কেউ নয়—এই রমানাথ

নিয়োগী। তার বাড়ি খানাতল্লাস করে সমস্ত চোরাই মাল বেরুল, কেবল সেই রক্তমুখী নীলাটা পাওয়া গেল না।

'তারপর যথাসময়ে বিচার শেষ হয়ে রমানাথ বারো বছরের জন্যে জেলে গেল। কিন্তু নীলার সন্ধান তখনও শেষ হল না। রমানাথ কোনও স্বীকারোক্তি করলে না, শেষ পর্যন্ত মুখ টিপে রইল। ওদিকে মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ পুলিসের পিছনে লেগে রইলেন। পুরস্কারের লোভে পুলিস অনুসন্ধান চালিয়ে চলল।

'রমানাথ জেলে যাবার মাস তিনেক পরে নির্মলবাবু খবর পেলেন যে নীলাটা রমানাথের কাছেই আছে, কয়েকজন কয়েদী নাকি দেখেছে। জেলে পুলিসের গুপ্তচর কয়েদীর ছদ্মবেশে থাকে তা তো জান, তারাই খবর দিয়েছে। খবর পেয়ে নির্মলবাবু হঠাৎ একদিন রমানাথের 'সেলে' গিয়ে খানাতল্লাস করলেন, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। রমানাথ তখন আলিপুর জেলে ছিল, কোথায় যে নীলাটা সরিয়ে ফেললে কেউ খুঁজে বার করতে পারলে না।

'সেই থেকে নীলাটা একেবারে লোপাট হয়ে গেছে। পুলিস অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে—'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর কতকটা যেন নিজ মনেই বলিল, 'মন্দ প্রবলেম নয়। এলাচের মত একটা নীল রঙের পাথর—একজন জেলের কয়েদী সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখলে! কেসটা যদি আমার হাতে আসত চেষ্টা করে দেখতুম দু'হাজার টাকা পুরস্কারও ছিল—'

ব্যোমকেশের অর্ধ স্বগতোক্তি ব্যাহত করিয়া সিঁড়ির উপর পদশব্দ শোনা গেল। আমি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, 'লোক আসছে। ব্যোমকেশ, বোধ হয় মক্কেল।'

ব্যোমকেশ কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, 'বুড়ো লোক, দামী জুতো—এই বর্ষাতেও মচমচ করছে; সম্ভবতঃ গাড়িমোটরে ঘুরে বেড়ান, সুতরাং বড় মানুষ। একটু খুঁড়িয়ে চলেন।'—হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, 'অজিত, তাও কি সম্ভব? জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো প্রকাণ্ড একখানা রোল্‌স রয়েস্‌ সামনে দাঁড়িয়ে আছে কিনা—আছে। ঠিক ধরেছি তাহলে। কি আশ্চর্য যোগাযোগ, অজিত! যাঁর কথা হচ্ছিল সেই মহারাজ রমেন্দ্র সিংহ আসছেন—কেন আসছেন জান?'

আমি সোৎসাহে বলিলাম, 'জানি, খবরের কাগজে পড়েছি। তাঁর সেক্রেটারী হরিপদ রক্ষিত সম্প্রতি খুন হয়েছে—সেই বিষয়ে হয়তো—'

দ্বারে টোকা পড়িল।

দ্বার খুলিয়া ব্যোমকেশ 'আসুন মহারাজ' বলিয়া যে লোকটিকে সসম্ভ্রমে আহ্বান করিল, সাময়িক কাগজ-পত্রে তাঁহার অনেক ছবি দেখিয়া থাকিলেও আসল মানুষটিকে এই প্রথম চাক্ষুষ করিলাম। সঙ্গে লোকলস্করের আড়ম্বর নাই—অত্যন্ত সাদাসিধা ধরনের মানুষ; ঈষৎ রুগ্ন ক্ষীণ চেহারা—পায়ের একটু দোষ থাকাতে একটু খোঁড়াইয়া চলেন। বয়স বোধ করি ষাট পার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বার্ধক্যের লোলচর্ম তাঁহার মুখখানিকে কুৎসিত করিতে পারে নাই—বরং একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতা মুখের জরাজনিত বিকারকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

মহারাজ একটু হাসিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ঈষৎ বিস্ময়ও প্রকাশ পাইল। বলিলেন, 'আপনার ভাব দেখে মনে হচ্ছে, আপনি আমার প্রতীক্ষা করছিলেন। আমি আসব সেটা কি আগে থাকতে অনুমান করে রেখেছিলেন নাকি?'

ব্যোমকেশও হাসিল।

'এত বড় সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও পারিনি। কিন্তু আপনার সেক্রেটারীর মৃত্যুর কোন কিনারাই যখন পুলিস করতে পারলে না, তখন আশা হয়েছিল হয়তো মহারাজ স্মরণ করবেন। কিন্তু আসুন, আগে বসুন।'

মহারাজ চেয়ারে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল, পুলিস তো কিছুই করতে পারলে না; তাই ভাবলুম দেখি যদি আপনি কিছু করতে

পারেন। হরিপদর ওপর আমার একটা মায়া জন্মে গিয়েছিল—তা ছাড়া তার মৃত্যুর ধরনটাও এমন ভয়ঙ্কর—' মহারাজ একটু থামিলেন—'অবশ্য সে সাধু লোক ছিল না; কিন্তু আপনারা তো জানেন, ঐরকম লোককে সৎপথে আনবার চেষ্টা করা আমার একটা খেয়াল। আর, সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে হরিপদ নেহাত মন্দ লোক ছিল না। কাজকর্ম খুবই ভাল করত; আর কৃতজ্ঞতাও যে তার অন্তরে ছিল সে প্রমাণও আমি অনেকবার পেয়েছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মাপ করবেন, হরিপদবাবু সাধু লোক ছিলেন না, এ খবর তো জানতুম না। তিনি কোন দুষ্কার্য করেছিলেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'সাধারণে যাকে দাগী আসামী বলে, সে ছিল তাই। অনেকবার জেল খেটেছিল। শেষবার জেল থেকে বেরিয়ে যখন আমার কাছে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দয়া করে সব কথা গোড়া থেকে বলুন। খবরের কাগজের বিবরণ আমি পড়েছি বটে, কিন্তু তা এত অসম্পূর্ণ যে, কিছুই ধারণা করা যায় না। আপনি মনে করুন, আমরা কিছুই জানি না। সব কথা আপনার মুখে স্পষ্টভাবে শুনলে ব্যাপারটা বোঝবার সুবিধা হবে।'

মহারাজ বলিলেন, 'বেশ, তাই বলছি।' তারপর গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'আন্দাজ মাস ছয়েকের কথা হবে; ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হরিপদ প্রথম আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। আগের দিন জেল থেকে বেরিয়েছে, আমার কাছে কোন কথাই গোপন করলে না। বললে, আমি যদি তাকে সৎপথে চলবার একটা সুযোগ দিই, তাহলে সে আর বিপথে যাবে না। তাকে দেখে তার কথা শুনে দয়া হল। বয়স বেশী নয়, চল্লিশের নীচেই, কিন্তু এরি মধ্যে বার চারেক জেল খেটেছে। শেষবারে চুরি, জালিয়াতি, নাম ভাঁড়িয়ে পরের দস্তখতে টাকা নেওয়া ইত্যাদি কয়েকটা গুরুতর অপরাধে লম্বা মেয়াদ খেটেছে। দেখলুম অনুতাপও হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম, কি কাজ করতে পার? বললে, লেখাপড়া বেশী শেখবার অবকাশ পাইনি, ঊনিশ বছর থেকে ক্রমাগত জেলই খাটছি। তবু নিজের চেষ্টায় সর্টহ্যাণ্ড টাইপিং শিখেছি; যদি দয়া করে আপনি নিজের কাছে রাখেন, প্রাণ দিয়ে আপনার কাজ করব।

'হরিপদকে প্রথম দেখেই তার ওপর আমার একটা মায়া জন্মেছিল; কি জানি কেন, ঐ জাতীয় লোকের আবেদন আমি অবহেলা করতে পারি না। তাই যদিও আমার সর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্টের দরকার ছিল না, তবু পঞ্চাশ টাকা মাইনে দিয়ে তাকে নিজের কাছে রাখলুম। তার আত্মীয়-স্বজন কেউ ছিল না। কাছেই একখানা ছোট বাসা ভাড়া করে থাকতে লাগল।

'কিছুদিনের মধ্যেই দেখলুম, লোকটি অসাধারণ কর্মপটু আর বুদ্ধিমান; যে কাজ তার নিজের নয় তাও এমন সুচারুভাবে করে রাখে যে কারুর কিছু বলবার থাকে না। এমন কি, ভবিষ্যতে আমার কি দরকার হবে তা আগে থাকতে আন্দাজ করে তৈরি করে রাখে। মাস দুই যেতে না যেতেই সে আমার কাছে একেবারে অপরিহার্য হয়ে উঠল। হরিপদ না হলে কোন কাজই চলে না।

'এই সময় আমার প্রাচীন সেক্রেটারী অবিনাশবাবু মারা গেলেন। আমি তাঁর জায়গায় হরিপদকে নিযুক্ত করলুম। এই নিয়ে আমার আমলাদের মধ্যে একটু মন কষাকষিও হয়েছিল —কিন্তু আমি সে সব গ্রাহ্য করিনি। সবচেয়ে উপযুক্ত লোক বুঝেই হরিপদকে সেক্রেটারীর পদ দিয়েছিলুম।

'তারপর গত চার মাস ধরে হরিপদ খুব দক্ষতার সঙ্গেই সেক্রেটারীর কাজ করে এসেছে, কখনও কোন ত্রুটি হয়নি। নিম্নতন কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কাছে তার নামে নালিশ করত, কিন্তু সে সব নিতান্তই বাজে নালিশ। হরিপদর নামে কলঙ্ক পড়েছিল বটে—জেলের দাগ সহজে মোছে না—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার চরিত্র যে একেবারে বদলে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় অভাবের তাড়নায় সে অসৎপথে গিয়েছিল, তাই অভাব দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তার দুষ্প্রবৃত্তিও কেটে গিয়েছিল। আমাদের জেলখানা খুঁজলে এই ধরনের কত লোক যে বেরোয় তার সংখ্যা নেই।

'সে যা হোক, হঠাৎ গত মঙ্গলবারে যে ব্যাপার ঘটল তা একেবারে অভাবনীয়। খবরের কাগজে অল্পবিস্তর বিবরণ আপনারা পড়েছেন, তাতে যোগ করবার আমার বিশেষ কিছু নেই। সকালবেলা খবর পেলুম হরিপদ খুন হয়েছে। পুলিসে খবর পাঠিয়ে নিজে গেলুম তার বাসায়। দেখলুম, শোবার ঘরের মেঝেয় সে মরে পড়ে আছে; রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। হত্যাকারী তার গলাটা এমন ভয়ঙ্করভাবে কেটেছে যে ভাবতেও আতঙ্ক হয়। গলার নলী কেটে চিরে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। আপনারা অনেক হত্যাকাণ্ড নিশ্চয় দেখেছেন, কিন্তু এমন পাশবিক নৃশংসতা কখনও দেখেছেন বলে বোধ হয় না।'

এই পর্যন্ত বলিয়া মহারাজ যেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা পুনরায় প্রত্যক্ষ করিয়া শিহরিয়া চক্ষু মুদিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তার দেহে আর কোথাও আঘাত ছিল না?'

মহারাজ বলিলেন, 'ছিল। তার বুকে ছুরির একটা আঘাত ছিল। ডাক্তার বলেন, ঐ আঘাতেই মৃত্যুর কারণ। গলার আঘাতগুলো তার পরের। অর্থাৎ, হত্যাকারী প্রথমে তার বুকে ছুরি মেরে তাকে মর্মান্তিক আহত করে, তারপর তার গলা ঐ ভাবে ছিন্নভিন্ন করেছে। কি ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা, ভাবুন তো? আমি শুধু ভাবি, কি উন্মত্ত আক্রোশের বশে মানুষ তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে এমন হিংস্র জন্তুতে পরিণত হয়।'

কিছুক্ষণ আর কোনও কথা হইল না। মহারাজ বোধ করি মনুষ্য নামক অদ্ভুত জীবের অমানুষিক দুষ্কৃতি করিবার অফুরন্ত শক্তির কথাই ভাবিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ঘাড় হেঁট করিয়া চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল।

সহসা ব্যোমকেশের অর্ধ-মুদিত চোখের দিকে আমার নজর পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম—সেই দৃষ্টি! বহুবার দেখিয়াছি, ভুল হইবার নয়।

ব্যোমকেশ কোথাও একটা সূত্র পাইয়াছে।

মহারাজ অবশেষে মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'আমি যা জানি আপনাকে বললুম। এখন আমার ইচ্ছে, পুলিস যা পারে করুক, সেই সঙ্গে আপনিও আমার পক্ষ থেকে কাজ করুন। এতবড় একটা নৃশংস হত্যাকারী যদি ধরা না পড়ে, তাহলে সমাজের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা—আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিছু না। পুলিসের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই, বরঞ্চ বিশেষ প্রণয় আছে। আপত্তি কিসের?—আচ্ছা, হরিপদ শেষবার ক'বছর জেল খেটেছিল আপনি জানেন?'

মহারাজ বলিলেন, 'হরিপদর মুখেই শুনেছিলুম, আইনের কয়েক ধারা মিলিয়ে তার চৌদ্দ বছর জেল হয়েছিল; কিন্তু জেলে শান্তশিষ্ট ভাবে থাকলে কিছু সাজা মাপ হয়ে থাকে, তাই তাকে এগারো বছরের বেশী খাটতে হয়নি।'

ব্যোমকেশ প্রফুল্লস্বরে বলিল, 'বেশ চমৎকার! হরিপদ সম্বন্ধে আপনি আর কিছু বলতে পারেন না?'

মহারাজ বলিলেন, 'আপনি ঠিক কোন্ ধরনের কথা জানতে চান বলুন, দেখি যদি বলতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মৃত্যুর দু'চার দিন আগে তার আচার-ব্যবহারে এমন কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছিলুম। মৃত্যুর তিন-চার দিন আগে একদিন সকালবেলা হরিপদ আমার কাছে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ে। তার ভাব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কোন কারণে সে ভারি ভয় পেয়েছে।'

'সে সময় আর কেউ আপনার কাছে ছিল না?'

মহারাজ একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'সে সময় কতকগুলি ভিক্ষার্থীর আবেদন আমি দেখছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, একজন ভিক্ষার্থী তখন সেখানে উপস্থিত ছিল।'

'তার সামনেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়ে?'

'হ্যাঁ।'

একটু নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। আর কিছু? অন্য সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণ করতে পারেন না?'

মহারাজ প্রায় পাঁচ মিনিট গালে হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিলেন, তারপর বলিলেন, 'একটা সামান্য কথা মনে পড়ছে। নিতান্তই অবান্তর ঘটনা, তবু বলছি আপনার যদি সাহায্য হয়। আপনি বোধ হয় জানেন না, কয়েক বছর আগে আমার বাড়ি থেকে একটা দামী নীলা চুরি যায়—'

'জানি বৈকি।'

'জানেন? তাহলে এও নিশ্চয় জানেন যে, সেই নীলাটা ফিরে পাবার জন্যে আমি দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলুম?'

'তাও জানি। তবে সে ঘোষণা এখনও বলবৎ আছে কিনা জানি না।'

মহারাজ বলিলেন, 'ঠিক ঐ প্রশ্নই হরিপদ করেছিল। তখন সে আমার টাইপিস্ট, সবে মাত্র কাজে ঢুকেছে। একদিন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'মহারাজ, আপনার যে নীলাটা চুরি গিয়েছিল, সেটা এখন ফিরে পেলে কি আপনি দু'হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন?' তার প্রশ্নে কিছু আশ্চর্য হয়েছিলাম; কারণ এতদিন পরে নীলা ফিরে পাবার আর কোনও আশাই ছিল না, পুলিস আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।'

'আপনি হরিপদর প্রশ্নের কি উত্তর দিয়েছিলেন?'

'বলেছিলুম, যদি নীলা ফিরে পাই নিশ্চয়ই দেব।'

ব্যোমকেশ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মহারাজ, আমি যদি আজ ঐ প্রশ্ন করি, তাহলে কি সেই উত্তরই দেবেন?'

মহারাজ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ আবার বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানতে চান?'

মহারাজের হতবুদ্ধি ভাব আরও বর্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি হরিপদর হত্যাকারীর নাম জানেন নাকি?'

'জানি, তবে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা আমার কাজ নয়—সে কাজ পুলিস করুক। আমি শুধু তার নাম বলে দেব; তারপর তার বাড়ি তল্লাস করে প্রমাণ বার করা বোধ হয় শক্ত হবে না।'

অভিভূত কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, 'কিন্তু এ যে ভেল্কিবাজির মত মনে হচ্ছে। সত্যিই আপনি তার নাম জানেন? কি করে জানলেন?'

'আপাতত অনুমান মাত্র। তবে অনুমান মিথ্যে হবে না। হত্যাকারীর নাম হচ্ছে—রমানাথ নিয়োগী।'

'রমানাথ নিয়োগী! কিন্তু—কিন্তু নামটা পরিচিত মনে হচ্ছে।'

'হবারই তো কথা। বছর দশেক আগে ইনিই আপনার নীলা চুরি করে জেলে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

'মনে পড়েছে। কিন্তু সে হরিপদকে খুন করলে কেন? হরিপদর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?'

'সম্বন্ধ আছে—পুরনো কয়েকটা নথি ঘাঁটলেই সেটা বেরুবে। কিন্তু মহারাজ, বেলা প্রায় এগারটা বাজে, আর আপনাকে ধরে রাখব না। বিকেলে চারটের সময় যদি দয়া করে আবার পায়ের ধুলো দেন তাহলে সব জানতে পারবেন। আর হয়তো নীলাটাও ফিরে পেতে পারেন। আমি ইতিমধ্যে সব ব্যবস্থা করে রাখব।'

## ২

হতভম্ব মহারাজকে বিদায় দিয়া ব্যোমকেশ নিজেও বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এত বেলায় তুমি আবার কোথায় চললে?'

সে বলিল, 'বেরুতে হবে। জেলের কিছু পুরনো কাগজপত্র দেখা দরকার। তাছাড়া অন্য কাজও আছে। কখন ফিরব কিছু ঠিক নেই। যদি সময় পাই, হোটেলে খেয়ে নেব।' বলিয়া ছাতা ও বর্ষাতি লইয়া বিরামহীন বৃষ্টির মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল।

যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা তিনটা। জামা, জুতা খুলিতে খুলিতে বলিল, 'বেজায় ক্ষিদে পেয়েছে, কিছু খাওয়া হয়নি। স্নান করে নিই। পুঁটিরাম, চট্ করে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা কর।—আজ ম্যাটিনি—ঠিক চারটের সময় অভিনয় আরম্ভ হবে।'

বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'সে কি! কিসের অভিনয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভয় নেই—এই ঘরেই অভিনয় হবে। অজিত, দর্শকদের জন্যে আরও গোটাকয়েক চেয়ার এ ঘরে আনিয়ে রাখ।' বলিয়া স্নান-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

স্নানান্তে আহার করিতে বসিলে বলিলাম, 'সমস্ত দিন কি করলে বল।'

ব্যোমকেশ অনেকখানি অমলেট মুখে পুরিয়া দিয়া তৃপ্তির সহিত চিবাইতে চিবাইতে বলিল, 'জেল ডিপার্টমেন্টের অফিসে আমার এক বন্ধু আছেন, প্রথমে তাঁর কাছে গেলুম। সেখানে পুরনো রেকর্ড বার করে দেখা গেল যে, আমার অনুমান ভুল হয়নি।'

'তোমার অনুমানটা কি?'

প্রশ্নে কর্ণপাত না করিয়া ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'সেখানকার কাজ শেষ করে বন্ধুবাবু—থুড়ি—বিধুবাবুর কাছে গেলুম। হরিপদর খুনটা তাঁরই এলাকায় পড়ে। কেসের ইন্‌চার্জ হচ্ছেন ইন্সপেক্টর পূর্ণবাবু। পূর্ণবাবুকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে এবং বিধুবাবুর পদদ্বয়ে যথোচিত তৈল প্রয়োগ করে শেষ পর্যন্ত কার্যোদ্ধার হল।'

'কিন্তু কার্যটা কি তাই যে আমি এখনও জানি না।'

'কার্যটা হচ্ছে প্রথমতঃ রমানাথ নিয়োগীর ঠিকানা বার করা এবং দ্বিতীয়তঃ তাকে গ্রেপ্তার করে তার বাসা খানাতল্লাস করা। ঠিকানা সহজেই বেরুল, কিন্তু খানাতল্লাসে বিশেষ ফল হল না। অবশ্য রমানাথের ঘর থেকে একটা ভীষণাকৃতি ছোরা বেরিয়েছে; তাতে মানুষের রক্ত পাওয়া যায় কি না পরীক্ষার জন্যে পাঠান হয়েছে। কিন্তু যে জিনিস পাব আশা করেছিলুম তা পেলুম না। লোকটার লুকিয়ে রাখবার ক্ষমতা অসামান্য।'

'কি জিনিস?'

'মহারাজের নীলাটা!'

'তারপর? এখন কি করবে?'

'এখন অভিনয় করব। রমানাথের কুসংস্কারে ঘা দিয়ে দেখব যদি কিছু ফল পাই—ঐ বোধ হয় মহারাজ এলেন। বাকি অভিনেতারাও এসে পড়ল বলে।' বলিয়া ঘড়ির দিকে তাকাইল।

'আর কারা আসবে?'

'রমানাথ এবং তার রক্ষীরা।'

'তারা এখানে আসবে?'

'হ্যাঁ, বিধুবাবুর সঙ্গে সেই রকম ব্যবস্থাই হয়েছে।—পুঁটিরাম, খাবারের বাসনগুলো সরিয়ে নিয়ে যাও।'

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলাম না, মহারাজ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। দেখিলাম, মহারাজ রাজোচিত শিষ্টতা রক্ষা করিয়াছেন।

মহারাজকে সমাদর করিয়া বসাইতে না বসাইতে আরও কয়েকজনের পদশব্দ শুনা গেল। পরক্ষণেই বিধুবাবু, পূর্ণবাবু ও আরও দুইজন সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে রমানাথ প্রবেশ করিল।

রমানাথের চেহারায় এমন কোন বিশেষত্ব নাই যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করে; চুরি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে বোধহয় চেহারাটি নিতান্ত চলনসই হওয়া দরকার। রমানাথের মাথায় ছোট করিয়া চুল ছাঁটা, কপাল অপরিসর, চিবুক ছুঁচালো—চোখে সতর্ক চঞ্চলতা। তাহার গায়ে বহু বৎসরের পুরাতন (সম্ভবতঃ জেলে যাইবার আগেকার) চামড়ার বোতাম আঁটা পাঁচ মিশালি রঙের স্পোর্টিং কোট ও পায়ে অপ্রত্যাশিত একজোড়া রবারের বুট জুতা দেখিয়া সহসা হাস্যরসের উদ্রেক হয়। ইনি যে একজন সাংঘাতিক ব্যক্তি সে সন্দেহ কাহারও মনে উদয় হয় না।

ব্যোমকেশ অঙ্গুলি নির্দেশে তাহাকে দেখাইয়া বলিল, 'মহারাজ, লোকটিকে চিনতে পারেন কি?'

মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ, এখন চিনতে পারছি। এই লোকটাই সেদিন ভিক্ষে চাইতে গিয়েছিল।'

'বেশ। এখন তাহলে আপনারা সকলে আসন গ্রহণ করুন। বিধুবাবু, মহারাজের সঙ্গে নিশ্চয় পরিচয় আছে। আসুন, আপনি মহারাজের পাশে বসুন। রমানাথ, তুমি এইখানে বস।' বলিয়া ব্যোমকেশ রমানাথকে টেবিলের ধারে একটা চেয়ার নির্দেশ করিয়া দিল।

রমানাথ বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উপবেশন করিল। দুই জন সাব-ইন্সপেক্টর তাহার দুই পাশে বসিলেন। বিধুবাবু অভ্রভেদী গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। এই সম্পূর্ণ আইন-বিগর্হিত ব্যাপার ঘটিতে দিয়া তিনি যে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অস্বস্তি বোধ করিতেছেন তাহা তাঁহার ভাবভঙ্গীতে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে ব্যোমকেশ টেবিলের সম্মুখে বসিল। বলিল, 'আজ আমি আপনাদের একটা গল্প বলব। অজিতের গল্পের মত কাল্পনিক গল্প নয়—সত্য ঘটনা। যতদূর সম্ভব নির্ভুল ভাবেই বলবার চেষ্টা করব; যদি কোথাও ভুল হয়, রমানাথ সংশোধন করে দিতে পারবে। রমানাথ ছাড়া আর একজন এ কাহিনী জানত, কিন্তু আজ সে বেঁচে নেই।'

এইটুকু ভূমিকা করিয়া ব্যোমকেশ তাহার গল্প আরম্ভ করিল। রমানাথের মুখ কিন্তু নির্বিকার হইয়া রহিল। সে মুখ তুলিল না, একটা কথা বলিল না, নির্লিপ্তভাবে আঙুল দিয়া টেবিলের উপর দাগ কাটিতে লাগিল।

'রমানাথ জেলে যাবার পর থেকেই গল্প আরম্ভ করছি। রমানাথ জেলে গেল, কিন্তু মহারাজের নীলাটা সে কাছছাড়া করলে না সঙ্গে করে নিয়ে গেল। কি কৌশলে সকলের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে নিয়ে গেল—তা আমি জানি না, জানবার চেষ্টাও করিনি। রমানাথ ইচ্ছে করলে বলতে পারে।'

পলকের জন্য রমানাথ ব্যোমকেশের মুখের দিকে চোখ তুলিয়াই আবার নিবিষ্ট মনে টেবিলে দাগ কাটিতে লাগল।

ব্যোমকেশ বলিতে লাগিল, 'রমানাথ অনেক ভাল ভাল দামী জহরত চুরি করেছিল; কিন্তু তার মধ্যে থেকে কেবল মহারাজের রক্তমুখী নীলাটাই যে কেন সঙ্গে রেখেছিল তা অনুমান করাই দুষ্কর। সম্ভবতঃ পাথরটার একটা সম্মোহন শক্তি ছিল; জিনিসটা দেখতেও চমৎকার—গাঢ় নীল রঙের একটা হীরা, তার ভেতর থেকে রক্তের মত লাল রঙ ফুটে বেরুচ্ছে। রমানাথ সেটাকে সঙ্গে নেবার লোভ সামলাতে পারেনি। পাথরটা খুব পয়মন্ত একথাও সম্ভবতঃ রমানাথ শুনেছিল। দুর্নিয়তি যখন মানুষের সঙ্গ নেয়, তখন মানুষ তাকে বন্ধু বলেই ভুল করে।

'যা হোক, রমানাথ আলিপুর জেলে রইল। কিছুদিন পরে পুলিস জানতে পারল যে, নীলাটা তার কাছেই আছে। যথাসময়ে রমানাথের 'সেল' খানাতল্লাস হল। রমানাথের সেলে আর একজন কয়েদী ছিল, তাকেও সার্চ করা হল। কিন্তু নীলা পাওয়া গেল না। কোথায় গেল নীলাটা?

'রমানাথের সেলে যে দ্বিতীয় কয়েদী ছিল তার নাম হরিপদ রক্ষিত। হরিপদ পুরনো

ঘাগী আসামী, ছেলেবেলা থেকে জেল খেটেছে—তার অনেক গুণ ছিল। যাঁরা জেলের কয়েদী নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তাঁরাই জানেন, এক জাতীয় কয়েদী আছে যারা নিজেদের গলার মধ্যে পকেট তৈরি করে। ব্যাপারটা শুনতে খুবই আশ্চর্য কিন্তু মিথ্যে নয়। কয়েদীরা টাকাকড়ি জেলে নিয়ে যেতে পারে না; অথচ তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই নেশাখোর। তাই, ওয়ার্ডারদের ঘুষ দিয়ে বাইরে থেকে মাদকদ্রব্য আনাবার জন্যে টাকার দরকার হয়। গলায় পকেট তৈরি করবার ফন্দি এই প্রয়োজন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে; যারা কাঁচা বয়স থেকে জেলে আছে তাদের মধ্যেই এ জিনিসটা বেশী দেখা যায়। প্রবীণ পুলিস কর্মচারী মাত্রেই এসব কথা জানেন।

'হরিপদ ছেলেবেলা থেকে জেল খাটছে, সে নিজের গলায় পকেট তৈরি করেছিল। রমানাথ যখন তার সেলে গিয়ে রইল তখন দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। ক্রমে হরিপদর পকেটের কথা রমানাথ জানতে পারল।

'তারপর একদিন হঠাৎ পুলিস জেলে হানা দিল। সেলের মধ্যে নীলা লুকোবার জায়গা নেই; রমানাথ নীলাটা হরিপদকে দিয়ে বললে, তুমি এখন গলার মধ্যে লুকিয়ে রাখ। হরিপদকে সে নীলাটা আগেই দেখিয়েছিল এবং হরিপদরও সেটার উপর দারুণ লোভ জন্মেছিল। সে নীলাটা নিয়েই টপ্ করে গিলে ফেলল; তার কণ্ঠনালীর মধ্যে নীলাটা গিয়ে রইল। বলা বাহুল্য, পুলিস এসে যখন তল্লাস করল তখন কিছুই পেল না।

'এই ঘটনার পরদিনই হরিপদ হঠাৎ অন্য জেলে চালান হয়ে গেল, জেলের রেকর্ডে তার উল্লেখ আছে। হরিপদর ভারি সুবিধা হল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করল—যাবার আগে নীলাটা রমানাথকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল না। রমানাথ কিছু বলতে পারল না—চোরের মা'র কান্না কেউ শুনতে পায় না—সে মন গুমরে রয়ে গেল। মনে মনে তখন থেকেই বোধ করি ভীষণ প্রতিহিংসার সংকল্প আঁটিতে লাগল।'

এই সময় লক্ষ্য করিলাম, রমানাথের মুখের কোন বিকার ঘটে নাই বটে, কিন্তু রগ ও গলার শিরা দপ্‌দপ্ করিতেছে, দুই চক্ষু রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল, 'তারপর একে একে দশটি বছর কেটে গেছে। ছ'মাস আগে হরিপদ জেল থেকে মুক্তি পেল। মুক্তি পেয়েই সে মহারাজের কাছে এল। তার ইচ্ছে ছিল মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ক্রমে নীলাটা তাঁকে ফেরত দেবে। বিনামূল্যে নয়—দু'হাজার টাকা পুরস্কারের কথা সে জানত। ও নীলা অন্যত্র বিক্রি করতে গেলেই ধরা পড়ে যেতে হবে, তাই সে-চেষ্টাও সে করল না।

'কিন্তু প্রথম থেকেই মহারাজ তার প্রতি এমন সদয় ব্যবহার করলেন যে, সে ভারি লজ্জায় পড়ে গেল। তবু সে একবার নীলার কথা মহারাজের কাছে তুলেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীলার বদলে মহারাজের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে তার বিবেকে বেধে গেল। মহারাজের দয়ার গুণে হরিপদর মত লোকের মনেও যে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল, এটা বড় কম কথা নয়।

'ক্রমে হরিপদর দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। দশদিন আগে রমানাথ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে বেরুল। হরিপদ কোথায় তা সে জানত না, কিন্তু এমনি দৈবের খেলা যে, চারদিন যেতে না যেতেই মহারাজের বাড়িতে রমানাথ তার দেখা পেয়ে গেল। রমানাথকে দেখার ফলেই হরিপদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বার তার আর কোনও কারণ ছিল না।

'যে প্রতিহিংসার আগুন দশ বছর ধরে রমানাথের বুকে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, তা একেবারে দুর্বার হয়ে উঠল। হরিপদর বাড়ির সন্ধান সে সহজেই বার করল। তারপর সেদিন রাত্রে গিয়ে—'

এ পর্যন্ত ব্যোমকেশ সকলের দিকে ফিরিয়া গল্প বলিতেছিল, এখন বিদ্যুতের মত রমানাথের দিকে ফিরিল। রমানাথও মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত নিষ্পলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া ছিল; ব্যোমকেশ তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া চাপা তীব্র স্বরে বলিল, 'রমানাথ, সে-রাত্রে হরিপদর গলা ছিঁড়ে তার কণ্ঠনালীর ভেতর থেকে তুমি নীলা

নায় করে নিয়েছিলে। সে নীলা কোথায়?'

রমানাথ ব্যোমকেশের চক্ষু হইতে চক্ষু সরাইতে পারিল না। সে একবার জিহ্বা দ্বারা অধর লেহন করিল, একবার চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল, তারপর যেন অসীম বলে নিজেকে ব্যোমকেশের সম্মোহন দৃষ্টির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'আমি, আমি জানি না—হরিপদকে আমি খুন করিনি—হরিপদ কার নাম জানি না। নীলা আমার কাছে নেই—' বলিয়া আরক্ত বিদ্রোহী চক্ষে চাহিয়া সে দুই হাত বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশের অঙ্গুলি তখনও তাহার দিকে নির্দেশ করিয়া ছিল। আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন একটা মর্মগ্রাসী নাটকের অভিনয় দেখিতেছি, দুইটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি পরস্পরের সহিত মরণান্তক যুদ্ধ করিতেছে; শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হইবে তাহা দেখিবার একাগ্র আগ্রহে আমরা চিত্রার্পিতের মত বসিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বরে একটা ভয়ঙ্কর দৈববাণীর সুর ঘনাইয়া আসিল; সে রমানাথের দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পূর্ববৎ তীব্র অনুচ্চ স্বরে বলিল, 'রমানাথ, তুমি জানো না কী ভয়ানক অভিশপ্ত ওই রক্তমুখী নীলা! তাই ওর মোহ কাটাতে পারছ না। ভেবে দ্যাখ, যতদিন তুমি ঐ নীলা চুরি না করেছিলে, ততদিন তোমাকে কেউ ধরতে পারেনি—নীলা চুরি করেই তুমি জেলে গেলে। তারপর হরিপদর পরিণামটাও একবার ভেবে দ্যাখ। সে গলার মধ্যে নীলা লুকিয়ে রেখেছিল, তার গলার কী অবস্থা হয়েছিল তা তোমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। এখনও যদি নিজের ইষ্ট চাও, ঐ সর্বনাশা নীলা ফেরত দাও। নীলা নয়—ও কেউটে সাপের বিষ। যদি হাতে সে নীলা পর, তোমার হাতে হাতকড়া পড়বে; যদি গলায় পর, ঐ নীলা ফাঁসির দড়ি হয়ে তোমার গলা চেপে ধরবে।'

অব্যক্ত একটা শব্দ করিয়া রমানাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের ভিতর কিরূপ প্রবল আবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা আমরাও সম্যক বুঝিতে পারি নাই। পাগলের মত সে একবার চারিদিকে তাকাইল, তারপর নিজের কোটের চামড়ার বোতামটা সজোরে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'চাই না—চাই না! এই নাও নীলা, আমাকে বাঁচাও!' বলিয়া একটা দীর্ঘ শিহরিত নিশ্বাস ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যোমকেশ কপাল হইতে ঘাম মুছিল। দেখিলাম তাহার হাত কাঁপিতেছে—ইচ্ছাশক্তির যুদ্ধে সে জয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে নয়।

রমানাথের নিক্ষিপ্ত বোতামটা ঘরের কোণে গিয়া পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া তাহার খোলস ছাড়াইতে ছাড়াইতে ব্যোমকেশ স্খলিত-স্বরে বলিল, 'মহারাজ, এই নিন আপনার রক্তমুখী নীলা।'

# ব্যোমকেশ ও বরদা

## ১

বেশী দিনের কথা নয়, ভূতান্বেষী বরদাবাবুর সহিত সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের একবার সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। ব্যোমকেশের মনটা স্বভাবতঃ বহির্বিমুখ, ঘরের কোণে মাকড়সার মত জাল পাতিয়া বসিয়া থাকিতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সেবার সে পাক্কা তিনশ' মাইলের পাড়ি জমাইয়া সকলকে চমকিত করিয়া দিয়াছিল।

ব্যোমকেশের এক বাল্যবন্ধু বেহার প্রদেশে ডি.এস.পি'র কাজ করিতেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি মুঙ্গেরে বদলি হইয়াছিলেন এবং সেখান হইতে ব্যোমকেশকে নিয়মিত পত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাদর নিমন্ত্রণের অন্তরালে বোধ হয় কোনো গরজ প্রচ্ছন্ন ছিল; নচেৎ পুলিসের ডি.এস.পি বিনা প্রয়োজনে পুরাতন অর্ধবিস্মৃত বন্ধুত্ব ঝালাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবেন ইহা কল্পনা করিতেও মনটা নারাজ হইয়া উঠে।

ভাদ্র মাসের শেষাশেষি; আকাশের মেঘগুলা অপব্যয়ের প্রাচুর্যে ফ্যাকাশে হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় একদিন ব্যোমকেশ পুলিস-বন্ধুর পত্র পাইয়া এক রকম মরিয়া হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'চল, মুঙ্গের ঘুরে আসা যাক।'

আমি পা বাড়াইয়াই ছিলাম। পূজার প্রাক্কালে শরতের বাতাসে এমন একটা কিছু আছে যাহা ঘরবাসী বাঙালীকে পশ্চিমের দিকে ও প্রবাসী বাঙালীকে ঘরের দিকে নিরন্তর ঠেলিতে থাকে। সানন্দে বলিলাম, 'চল।'

যথাসময়ে মুঙ্গের স্টেশনে উতরিয়া দেখিলাম ডি.এস.পি সাহেব উপস্থিত আছেন। ভদ্রলোকের নাম শশাঙ্কবাবু; আমাদেরই সমবয়স্ক হইবেন, ত্রিশের কোঠা এখনো পার হয় নাই; তবু ইহারি মধ্যে মুখে ও চালচলনে একটা বয়স্থ ভারিক্কি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অধিক দায়িত্ব ঘাড়ে পড়িয়া তাঁহাকে প্রবীণ করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমাদের সঙ্গে লইয়া কেল্লার মধ্যে তাঁহার সরকারী কোয়ার্টারে আনিয়া তুলিলেন।

মুঙ্গের শহরে 'কেল্লা' নামে যে স্থানটা পরিচিত তাহার কেল্লাত্ব এখন আর কিছু নাই; তবে এককালে উহা মীরকাশিমের দুর্ধর্ষ দুর্গ ছিল বটে। প্রায় সিকি মাইল পরিমিত বৃত্তাকৃতি স্থান প্রাকার ও গড়খাই দিয়া ঘেরা—পশ্চিম দিকে গঙ্গা। বাহিরে যাইবার তিনটি মাত্র তোরণদ্বার আছে। বর্তমানে এই কেল্লার মধ্যে আদালত ও সরকারী উচ্চ কর্মচারিদের বাসস্থান, জেলখানা, বিস্তীর্ণ খেলার মাঠ ছাড়া সাধারণ ভদ্রলোকের বাসগৃহও দু'চারিটি আছে। শহর বাজার ও প্রকৃত লোকালয় ইহার বাহিরে; কেল্লাটা যেন রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত লোকের জন্য একটু স্বতন্ত্র অভিজাত পল্লী।

শশাঙ্কবাবুর বাসায় পৌঁছিয়া চা ও প্রাতরাশের সহযোগে তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আমাদের আদর অভ্যর্থনা খুবই করিলেন; কিন্তু দেখিলাম লোকটি ভারি চতুর, কথাবার্তায় অতিশয় পটু। নানা অবান্তর আলোচনার ভিতর দিয়া পুরাতন বন্ধুত্বের স্মৃতির উল্লেখ করিতে করিতে মুঙ্গেরে কি কি দর্শনীয় জিনিস আছে তাহার ফিরিস্তি দিতে দিতে কখন যে অজ্ঞাতসারে তাঁহার মূল বক্তব্যে পৌঁছিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য না করিলে ঠাহর করা যায় না। অত্যন্ত কাজের লোক তাহাতে সন্দেহ নাই, বাক্যের মুন্সিয়ানার দ্বারা কাজের কথাটি এমনভাবে উত্থাপন করিতে পারেন যে কাহারো ক্ষোভ বা অসন্তোষের কারণ থাকে না।

বস্তুতঃ আমরা তাঁহার বাসায় পৌঁছিবার আধঘণ্টার মধ্যেই তিনি যে কাজের কথাটা পাড়িয়া ফেলিয়াছেন তাহা আমি প্রথমটা ধরিতেই পারি নাই; কিন্তু ব্যোমকেশের চোখে

কৌতুকের একটু আভাস দেখিয়া সচেতন হইয়া উঠিলাম। শশাঙ্কবাবু তখন বলিতেছিলেন, 'শুধু ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপ বা গরম জলের প্রস্রবণ দেখিয়েই তোমাদের নিরাশ করব না, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার যদি দেখতে চাও তাও দেখাতে পারি। সম্প্রতি শহরে একটি রহস্যময় ভূতের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁকে নিয়ে কিছু বিব্রত আছি।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূতের পেছনে বিব্রত থাকাও কি তোমাদের একটা কর্তব্য নাকি?'

শশাঙ্কবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আরে না না। কিন্তু ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে—। হয়েছে কি, মাস ছয়েক আগে এই কেল্লার মধ্যেই একটি ভদ্রলোকের ভারী রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়। এখনো সে-মৃত্যুর কিনারা হয়নি, কিন্তু এরি মধ্যে তাঁর প্রেতাত্মা তাঁর পুরনো বাড়িতে হানা দিতে আরম্ভ করেছে।'

ব্যোমকেশ শূন্য চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিল; দেখিলাম তাহার চোখের ভিতর গভীর কৌতুক ক্রীড়া করিতেছে। সে সযত্নে রুমাল দিয়া মুখ মুছিল, তারপর একটি সিগারেট ধরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'শশাঙ্ক, তোমার কথা বলবার ভঙ্গীটি আগেকার মতই চমৎকার আছে দেখছি, এবং সদা-ব্যবহারে আরো পরিমার্জিত হয়েছে। এখনো এক ঘণ্টা হয়নি মুঙ্গেরে পা দিয়েছি, কিন্তু এরি মধ্যে তোমার কথা শুনে স্থানীয় ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।—ঘটনাটা কি, খুলে বল।'

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। শশাঙ্কবাবু ব্যোমকেশের ইঙ্গিতটা বুঝিলেন এবং বোধ করি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া কিছুই ধরা গেল না। সহজভাবে বলিলেন, 'আর এক পেয়ালা চা? নেবে না? পান নাও। নিন্ অজিতবাবু। আচ্ছা—ঘটনাটা বলি তাহলে; যদিও এমন কিছু রোমাঞ্চকর কাহিনী নয়। ছ'মাস আগেকার ঘটনা—'

শশাঙ্কবাবু জর্দা ও পান মুখে দিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'এই কেল্লার মধ্যেই দক্ষিণ ফটকের দিকে একটি বাড়ি আছে। বাড়িটি ছোট হলেও দোতলা, চারিদিকে একটু ফাঁকা জায়গা আছে। কেল্লার মধ্যে সব বাড়িই বেশ ফাঁকা—শহরের মত ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি নেই; প্রত্যেক বাড়িরই কম্পাউন্ড আছে। এই বাড়িটির মালিক স্থানীয় একজন 'রইস'—তিনি বাড়িটি ভাড়া দিয়ে থাকেন।

'গত পনেরো বছর ধরে এই বাড়িতে যিনি বাস করছিলেন তাঁর নাম—বৈকুণ্ঠ দাস। লোকটির বয়স হয়েছিল—জাতিতে স্বর্ণকার। বাজারে একটি সোনারুপার দোকান ছিল; কিন্তু দোকানটা নামমাত্র। তাঁর আসল কারবার ছিল জহরতের। হিসাবের খাতাপত্র থেকে দেখা যায়, মৃত্যুকালে তাঁর কাছে একান্নখানা হীরা মুক্তা চুণী পান্না ছিল—যার দাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

'এই সব দামী মণি-মুক্তা তিনি বাড়িতেই রাখতেন—দোকানে রাখতেন না। অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর বাড়িতে একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না। কোথায় তিনি তাঁর মূল্যবান মণি-মুক্তা রাখতেন কেউ জানে না। খরিদ্দার এলে তাকে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসতেন, তারপর খরিদ্দারকে বাইরের ঘরে বসিয়ে নিজে ওপরে গিয়ে শোবার ঘর থেকে প্রয়োজন মত জিনিস এনে দেখাতেন।

'হীরা জহরতের বহর দেখেই বুঝতে পারছ লোকটি বড় মানুষ। কিন্তু তাঁর চাল-চলন দেখে কেউ তা সন্দেহ করতে পারত না। নিতান্ত নিরীহ গোছের আধাবয়সী লোক, দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তি, গলায় তুলসীকণ্ঠি—সর্বদাই জোড়হস্ত হয়ে থাকতেন। কিন্তু কোন সৎকার্যের জন্য চাঁদা চাইতে গেলে এত বেশী বিমর্ষ এবং কাতর হয়ে পড়তেন যে শহরের ছেলেরা তাঁর কাছে চাঁদা আদায়ের চেষ্টা ছেড়েই দিয়েছিল। তাঁর নামটাও এই সূত্রে একটু বিকৃত হয়ে পরিহাসচ্ছলে 'ব্যয়-কুণ্ঠ' আকার ধারণ করেছিল। শহরসুদ্ধ বাঙালী তাঁকে ব্যয়-কুণ্ঠ জহুরী বলেই উল্লেখ করত।

'বাস্তবিক লোকটি অসাধারণ কৃপণ ছিলেন। মাসে সত্তর টাকা তাঁর খরচ ছিল, তার

মধ্যে চল্লিশ টাকা বাড়িভাড়া। বাকি ত্রিশ টাকায় নিজের, একটি মেয়ের আর এক হাবাকালা চাকরের গ্রাসাচ্ছাদন চালিয়ে নিতেন; আমি তাঁর দৈনন্দিন খরচের খাতা দেখেছি, কখনও সত্তরের কোঠা পেরোয়নি। আশ্চর্য নয়?—আমি ভাবি, লোকটি যখন এতবড় কৃপণই ছিলেন তখন এত বেশী ভাড়া দিয়ে কেল্লার মধ্যে থাকবার কারণ কি? কেল্লার বাইরে থাকলে তো ঢের কম ভাড়ায় থাকতে পারতেন।'

ব্যোমকেশ ডেক-চেয়ারে লম্বা হইয়া অদূরের পাষাণ-নির্মিত দুর্গ-তোরণের পানে তাকাইয়া শুনিতেছিল; বলিল, 'কেল্লার ভিতরটা বাইরের চাইতে নিশ্চয় বেশী নিরাপদ, চোর-বদমাসের আনাগোনা কম। সুতরাং যার কাছে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত আছে সে তো নিরাপদ স্থান দেখেই বাড়ি নেবে। বৈকুণ্ঠবাবু ব্যয়-কুণ্ঠ ছিলেন বটে কিন্তু অসাবধানী লোক বোধ হয় ছিলেন না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই আন্দাজ করেছিলুম। কিন্তু কেল্লার মধ্যে থেকেও বৈকুণ্ঠবাবু যে চোরের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে পারেননি সেই গল্পই বলছি। সম্ভবতঃ তাঁর বাড়িতে চুরি করবার সংকল্প অনেকদিন থেকেই চলছিল। মুঙ্গের জায়গাটি ছোট বটে, তাই বলে তাকে তুচ্ছ মনে কোরো না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, সে কি কথা!'

'এখানে এমন দু' চারটি মহাপুরুষ আছেন যাঁদের সমকক্ষ চৌকশ চোর দাগাবাজ খুনে তোমাদের কলকাতাতেও পাবে না। বলব কি তোমাকে, গভর্নমেণ্টকে পর্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে হে। এখান মীরকাশিমের আমলের অনেক দিশী বন্দুকের কারখানা আছে জান তো? কিন্তু সে-সব কথা পরে হবে, আগে বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্পটাই বলি।'

এইভাবে সামান্য অবান্তর কথার ভিতর দিয়া শশাঙ্কবাবু পুলিসের তথা নিজের বিবিধ গুরুতর দায়িত্বের একটা গূঢ় ইঙ্গিত দিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'গত ছাব্বিশে এপ্রিল—অর্থাৎ বাংলার ১২ই বৈশাখ—বৈকুণ্ঠবাবু আটটার সময় তাঁর দোকান থেকে বাড়ি ফিরে এলেন। নিতান্তই সহজ মানুষ, মনে আসন্ন দুর্ঘটনার পূর্বাভাস পর্যন্ত নেই। আহারাদি করে রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় তিনি দোতলার ঘরে শুতে গেলেন। তাঁর মেয়ে নীচের তলায় ঠাকুরঘরে শুতো, সেও বাপকে খাইয়ে দাইয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করে দিলে। হাবাকালা চাকরটা রাত্রে দোকান পাহারা দিত, মালিক বাড়ি ফেরবার পরই সে চলে গেল। তারপর বাড়িতে কি ঘটেছে, কেউ কিছু জানে না।

'সকালবেলা যখন দেখা গেল যে বৈকুণ্ঠবাবু ঘরের দোর খুলছেন না, তখন দোর ভেঙে ফেলা হল। পুলিস ঘরে ঢুকে দেখলে বৈকুণ্ঠবাবুর মৃতদেহ দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। কোথাও তাঁর গায়ে আঘাত-চিহ্ন নেই, আততায়ী গলা টিপে তাঁকে মেরেছে; তারপর তাঁর সমস্ত জহরত নিয়ে খোলা জানলা দিয়ে প্রস্থান করেছে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আততায়ী তাহলে জানলা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'তাই তো মনে হয়। ঘরের একটি মাত্র দরজা বন্ধ ছিল, সুতরাং জানলা ছাড়া ঢোকবার আর পথ কোথায়! আমার বিশ্বাস, বৈকুণ্ঠবাবু রাত্রে জানলা খুলে শুয়েছিলেন; গ্রীষ্মকাল—সে-রাত্রিটা গরমও ছিল খুব। জানলার গরাদ নেই, কাজেই মই লাগিয়ে চোরেরা সহজেই ঘরে ঢুকতে পেরেছিল।'

'বৈকুণ্ঠবাবুর হীরা জহরত সবই চুরি গিয়েছিল?'

'সমস্ত। আড়াই লক্ষ টাকার জহরত একেবারে লোপাট। একটিও পাওয়া যায়নি! এমন কি তাঁর কাঠের হাত-বাক্সে যে টাকা-পয়সা ছিল তাও চোরেরা ফেলে যায়নি—সমস্ত নিয়ে গিয়েছিল।'

'কাঠের হাত-বাক্সে বৈকুণ্ঠবাবু হীরা জহরত রাখতেন?'

'তাছাড়া রাখবার জায়গা কৈ? অবশ্য হাত-বাক্সেই যে রাখতেন তার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর শোবার ঘরে কারু ঢোকবারই হুকুম ছিল না, মেয়ে পর্যন্ত জানত না তিনি কোথায় কি রাখেন। কিন্তু আগেই বলেছি, তাঁর একটা লোহার সিন্দুক পর্যন্ত ছিল না;

অথচ হীরা মুক্তা যা-কিছু সব শোবার ঘরেই রাখতেন। সুতরাং হাত-বাক্সেই সেগুলো থাকত, ধরে নিতে হবে।'

'ঘরে আর কোনো বাক্স-প্যাঁট্‌রা বা ঐ ধরনের কিছু ছিল না?'

'কিছু না। শুনলে আশ্চর্য হবে, ঘরে একটা মাদুর, একটা বালিশ, ঐ হাত-বাক্সটা, পানের বাটা আর জলের কলসী ছাড়া কিছু ছিল না। দেয়ালে একটা ছবি পর্যন্ত না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পানের বাটা! সেটা ভাল করে দেখেছিলে তো?'

শশাঙ্কবাবু ক্ষুব্ধভাবে ঈষৎ হাসিলেন—'ওহে, তোমরা আমাদের যতটা গাধা মনে কর, সত্যিই আমরা ততটা গাধা নই। ঘরের সব জিনিসই আঁতিপাঁতি করে তল্লাস করা হয়েছিল। পানের বাটার মধ্যে ছিল একদলা চূণ, খানিকটা করে খয়ের সুপুরি লবঙ্গ—আর পানের পাতা। বাটাটা পিতলের তৈরী, তাতে চূণ খয়ের সুপুরির জন্য আলাদা খুবরি কাটা ছিল। বৈকুণ্ঠবাবু খুব বেশী পান খেতেন, অন্যের সাজা পান পছন্দ হত না বলে নিজে সেজে খেতেন।—আর কিছু জানতে চাও এ সম্বন্ধে?'

ব্যোমকেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না না, ওই যথেষ্ট। তোমাদের ধৈর্য আর অধ্যবসায় সম্বন্ধে তো কোনো প্রশ্ন নেই; সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। সেই সঙ্গে যদি একটু বুদ্ধি—কিন্তু সে যাক। মোট কথা দাঁড়াল এই যে বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে তাঁর আড়াই লক্ষ টাকার জহরত নিয়ে চোর কিম্বা চোরেরা চম্পট দিয়েছে। তারপর ছ'মাস কেটে গেছে কিন্তু তোমরা কোনো কিনারা করতে পারোনি। জহরতগুলো বাজারে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে কি না—সে খবর পেয়েছ?'

'এখনো জহরত বাজারে আসেনি। এলে আমরা খবর পেতুম। চারিদিকে গোয়েন্দা আছে।'

'বেশ। তারপর?'

'তারপর আর কি—ঐ পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। তিনি নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেননি; কোথাও একটি পয়সা পর্যন্ত ছিল না। দোকানের সোনা-রূপা বিক্রি করে যা সামান্য কিছু টাকা পেয়েছে সেইটুকুই সম্বল। বাঙালী ভদ্রঘরের মেয়ে, বিদেশে পয়সার অভাবে পরের গলগ্রহ হয়ে রয়েছে দেখলেও কষ্ট হয়।'

'কার গলগ্রহ হয়ে আছে?'

'স্থানীয় একজন প্রবীণ উকিল—নাম তারাশঙ্করবাবু। তিনিই নিজের বাড়িতে রেখেছেন। লোকটি উকিল হলেও ভাল বলতে হবে। বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে প্রণয়ও ছিল, প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা দু'জনে দাবা খেলতেন—'

'হুঁ। মেয়েটি বিধবা?'

'না, সধবা। তবে বিধবা বললেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। কম বয়সে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীটা অল্প বয়সে বয়াটে হয়ে যায়। মাতাল দুশ্চরিত্র—থিয়েটার যাত্রা করে বেড়াত, তারপর হঠাৎ নাকি এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে দেশ ছেড়ে চলে যায়। সেই থেকে নিরুদ্দেশ। তাই মেয়েকে বৈকুণ্ঠবাবু নিজের কাছেই রেখেছিলেন।'

'মেয়েটির বয়স কত?'

'তেইশ-চব্বিশ হবে।'

'চরিত্র কেমন?'

'যতদূর জানি, ভাল। চেহারাও ভাল থাকার অনুকূল—অর্থাৎ জলার পেত্নী বললেই হয়। স্বামী বেচারাকে নেহাৎ দোষ দেওয়া যায় না—'

'বুঝেছি। দেশে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই?'

'না-থাকারই মধ্যে। নবদ্বীপে খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়েকজন ছুটে এসেছিল। কিন্তু যখন দেখলে এক ফোঁটাও রস নেই, সব চোরে নিয়ে গেছে, তখন যে-যার খসে পড়ল।'

ব্যোমকেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,

'ব্যাপারটার মধ্যে অনেকখানি অভিনবত্ব রয়েছে। কিন্তু এত বেশী দেরি হয়ে গেছে যে আর কিছু করতে পারা যাবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া আমি বিদেশী, দু'দিনের জন্য এসেছি, তোমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তুমিও বোধ হয় তা পছন্দ করবে না।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'না না, হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন? আমি অফিসিয়ালি তোমাকে কিছু বলছি না; তবে তুমিও এই কাজের কাজী, যদি দেখে শুনে তোমার মনে কোনো আইডিয়া আসে তাহলে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পার। তুমি বেড়াতে এসেছ, তোমার ওপর কোনো দায়িত্ব চাপিয়ে তোমাকে বিব্রত করতে আমি চাই না।'

শশাঙ্কবাবুর মনের ভাবটা অজ্ঞাত রহিল না। সাহায্য লইতে তিনি পুরাদস্তুর রাজী, কিন্তু 'অফিসিয়ালি' কাহারো কৃতিত্ব স্বীকার করিয়া যশের ভাগ দিতে নারাজ।

ব্যোমকেশও হাসিল, বলিল, 'বেশ, তাই হবে। দায়িত্ব না নিয়েই তোমাকে সাহায্য করব। —ভাল কথা, ভূতের উপদ্রবের কথা কি বলছিলে?'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার কিছুদিন পরে ঐ বাড়িতে আর একজন বাঙালী ভাড়াটে এসেছেন, তিনি আসার পর থেকেই বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে। সব কথা অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু যে সব ব্যাপার ঘটছে তাতে রোমাঞ্চ হয়। পনেরো হাত লম্বা একটি প্রেতাত্মা রাত্রে ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারে। বাড়ির লোক ছাড়াও আরো কেউ কেউ দেখেছে।'

'বল কি?'

'হ্যাঁ।—এখানে বরদাবাবু বলে এক ভদ্রলোক আছেন—আরে! নাম করতে না করতেই এসে পড়েছেন যে! অনেকদিন বাঁচবেন। শৈলেনবাবুও আছেন—বেশ বেশ। আসুন। ব্যোমকেশ, বরদাবাবু হচ্ছেন ভূতের একজন বিশেষজ্ঞ। ভূতুড়ে ব্যাপার ওঁর মুখেই শোনো।'

## ২

প্রাথমিক নমস্কারাদির পর নবাগত দুইজন আসন গ্রহণ করিলেন। বরদাবাবুর চেহারাটি গোলগাল বেঁটে-খাটো, রং ফরসা, দাড়ি গোঁফ কামানো, সব মিলাইয়া নৈনিতাল আলুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাঁহার সঙ্গী শৈলেনবাবু ইহার বিপরীত; লম্বা একহারা গঠন, অথচ ক্ষীণ বলা চলে না। কথায় বার্তায় উভয়ের পরিচয় জানিতে পারিলাম। বরদাবাবু এখানকার বাসিন্দা, পৈতৃক কিছু জমিজমা ও কয়েকখানা বাড়ির উপস্বত্ব ভোগ করেন এবং অবসরকালে প্রেততত্ত্বের চর্চা করিয়া থাকেন। শৈলেনবাবু ধনী ব্যক্তি—স্বাস্থ্যের জন্য মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন; কিন্তু স্থানটি তাঁহার স্বাস্থ্যের সহিত এমন খাপ খাইয়া গিয়াছে যে বাড়ি কিনিয়া এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বয়স উভয়েরই চল্লিশের নীচে।

আমাদের পরিচয়ও তাঁহাদিগকে দিলাম—কিন্তু দেখা গেল ব্যোমকেশের নাম পর্যন্ত তাঁহারা শোনেন নাই। খ্যাতি এমনই জিনিস!

যা হোক, পরিচয় আদান-প্রদানের পর বরদাবাবু বলিলেন, 'বৈকুণ্ঠ জহুরীর গল্প শুনছিলেন বুঝি? বড়ই শোচনীয় ব্যাপার—অপঘাত মৃত্যু। আমার বিশ্বাস গয়ায় পিণ্ড না দিলে তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হবে না।'

ব্যোমকেশ একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিল। তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি প্রেতযোনি বিশ্বাস করেন না?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'অবিশ্বাসও করি না। প্রেতযোনি আমার হিসেবের বাইরে।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনি হিসেবের বাইরে রাখতে চাইলেও তারা যে থাকতে চায় না। ঐখানেই তো মুশকিল। শৈলেনবাবু, আপনিও তো আগে ভূত বিশ্বাস করতেন না, বুজরুকি বলে হেসে উড়িয়ে দিতেন। কিন্তু এখন?'

বরদাবাবুর সঙ্গী বলিলেন, 'এখন গোঁড়া ভক্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক

ব্যোমকেশবাবু, আগে আমিও আপনার মত ছিলুম, ভূত-প্রেত নিয়ে মাথা ঘামাতুম না। কিন্তু এখানে এসে বরদাবাবুর সঙ্গে আলাপ হবার পর যতই এ বিষয়ে আলোচনা করছি ততই আমার ধারণা হচ্ছে যে ভূতকে বাদ দিয়ে এ সংসারে চলা একরকম অসম্ভব।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি! আমাদের তো এখন পর্যন্ত বেশ চলে যাচ্ছে। আর দেখুন, এমনিতেই মানুষের জীবনযাত্রাটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে তার ওপর আবার—'

শশাঙ্কবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, 'ও সব যাক। বরদাবাবু, আপনি ব্যোমকেশকে বৈকুণ্ঠবাবুর ভূতুড়ে কাহিনীটা শুনিয়ে দিন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ: সেই ভাল। তত্ত্ব আলোচনার চেয়ে গল্প শোনা ঢের বেশী আরামের।'

বরদাবাবুর মুখে তৃপ্তির একটা ঝিলিক খেলিয়া গেল। জগতে গল্প বলিবার লোক অনেক আছে—কিন্তু অনুরাগী শ্রোতা সকলের ভাগ্যে জোটে না। অধিকাংশই অবিশ্বাসী ও ছিদ্রান্বেষী, গল্প শোনার চেয়ে তর্ক করিতেই অধিক ভালবাসে। তাই ব্যোমকেশ যখন তত্ত্ব ছাড়িয়া গল্প শুনিতেই সম্মত হইল তখন বরদাবাবু যেন অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বুঝিলাম, শিষ্ট এবং ধৈর্যবান শ্রোতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে বড় একটা ঘটিয়া উঠে না।

শশাঙ্কবাবুর কৌটা হইতে একটি সিগারেট লইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগপূর্বক বরদাবাবু ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের গল্প বলিবার ভঙ্গী এক নয়; বরদাবাবুর ভঙ্গীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। হুড়াহুড়ি তাড়াতাড়ি নাই—ধীরমন্থর তালে চলিয়াছে; ঘটনার বাহুল্যে গল্প কণ্টকিত নয়, অথচ এরূপ নিপুণভাবে ঘটনাগুলি বিন্যস্ত যে শ্রোতার মনকে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলিত করিয়া ফেলে। চোখের দৃষ্টি ও মুখের ভঙ্গিমা এমনভাবে গল্পের সহিত সঙ্গত করিয়া চলে যে সব মিশাইয়া একটি অখণ্ড রসবস্তুর আস্বাদ পাইতেছি বলিয়া ভ্রম হয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর কথা আপনারা শুনেছেন। অপঘাত মৃত্যু: পরলোকের জন্য প্রস্তুত হবার অবকাশ তিনি পাননি। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মানুষের আত্মা সহসা অতর্কিতভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তার দেহাভিমান দূর হয় না—অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না যে তার দেহ নেই। আবার কখনো কখনো বুঝতে পারলেও সংসারের মোহ ভুলতে পারে না, ঘুরে ফিরে তার জীবিতকালের কর্মক্ষেত্রে আনাগোনা করতে থাকে।

'এসব থিয়োরি আপনাদের বিশ্বাস করতে বলছি না। কিন্তু যে অলৌকিক কাহিনী আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি—এ ছাড়া তার আর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ঘটনা যে সত্য সে বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। আমি আষাঢ়ে গল্প বলি এই রকম একটা অপবাদ আছে; কিন্তু এক্ষেত্রে অতি বড় অবিশ্বাসীকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে আমি একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। কি বলেন শৈলেনবাবু?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। অমূল্যবাবুকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে ঘটনা মিথ্যে নয়।'

বরদাবাবু বলিতে লাগিলেন, 'সুতরাং কারণ যাই হোক, ঘটনাটা নিঃসংশয়। বৈকুণ্ঠবাবু মারা যাবার পর কয়েক হপ্তা তাঁর বাড়িখানা পুলিসের কবলে রইল; ইতিমধ্যে বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে তারাশঙ্করবাবু নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এ কয়দিনের মধ্যে কিছু ঘটেছিল কি না বলতে পারি না, পুলিসের যে দু'জন কনস্টেবল সেখানে পাহারা দেবার জন্য মোতায়েন হয়েছিল তারা সম্ভবত সন্ধ্যের পর দু'ঘটি ভাঙ্ চড়িয়ে এমন নিদ্রা দিত যে ভূত-প্রেতের মত অশরীরী জীবের গতিবিধি লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের থাকত না। যা হোক, পুলিস সেখান থেকে থানা তুলে নেবার পরই একজন নবাগত ভাড়াটে বাড়িতে এলেন। ভদ্রলোকের নাম কৈলাসচন্দ্র মল্লিক—রোগজীর্ণ বৃদ্ধ—স্বাস্থ্যের অন্বেষণে মুঙ্গেরে এসে কেল্লায় একখানা বাড়ি খালি হয়েছে দেখে খোঁজখবর না নিয়েই বাড়ি দখল

করে বসলেন—বাড়ির মালিকও খুনের ইতিহাস তাঁকে জানাবার জন্য বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেন না।

'কয়েকদিন নিরুপদ্রবেই কেটে গেল। দোতলায় একটি মাত্র শোবার ঘর—যে-ঘরে বৈকুণ্ঠ-বাবু মারা গিয়েছিলেন—সেই ঘরটিতেই কৈলাসবাবু শুতে লাগলেন। নীচের তলায় তাঁর চাকর বামুন সরকার রইল। কৈলাসবাবুর অবস্থা বেশ ভাল, পাড়াগেঁয়ে জমিদার। একমাত্র ছেলের সঙ্গে ঝগড়া চলছে, স্ত্রীও জীবিত নেই—তাই কেবল চাকর বামুনের ওপর নির্ভর করেই হাওয়া বদলাতে এসেছেন।

'ছয় সাত দিন কেটে যাবার পর একদিন ভূতের আবির্ভাব হল। রাত্রি ন'টার সময় ওষুধ খেয়ে তিনি নিদ্রার আয়োজন করছেন, এমন সময় নজর পড়ল জানালার দিকে। গ্রীষ্মকাল, জানালা খোলাই ছিল—দেখলেন, কদাকার একখানা মুখ ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। কৈলাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন, চাকর-বাকর নীচে থেকে ছুটে এল। কিন্তু মুখখানা তখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'তারপর আরো দুই রাত্রি ওই ব্যাপার হল। প্রথম রাত্রির ব্যাপারটা রুগ্ন কৈলাসবাবুর মানসিক ভ্রান্তি বলে সকলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না। খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের সঙ্গে তখনো কৈলাসবাবুর আলাপ হয়নি, কিন্তু আমরাও জানতে পারলুম।

'ভূত-প্রেত সম্বন্ধে আমার একটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল আছে। নেই বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারি না, আবার চোখ বুজে তাকে মেনে নিতেও পারি না। তাই, অন্য সকলে যখন ঘটনাটাকে পরিহাসের একটি সরস উপাদান মনে করে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, আমি তখন ভাবলুম—দেখিই না: অপ্রাকৃত বিষয় বলে মিথ্যেই হতে হবে এমন কি মানে আছে?

'একদিন আমি এবং আরো কয়েকজন বন্ধু কৈলাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। তিনি রোগে পঙ্গু—হার্টের ব্যারাম—নীচে নামা ডাক্তারের নিষেধ; তাঁর শোবার ঘরেই আমাদের ডেকে পাঠালেন। খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক হলেও তাঁর বাহ্য আদব-কায়দা বেশ দুরস্ত, আমাদের ভালভাবেই অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর কাছ থেকে ভৌতিক ব্যাপারের সঠিক বিবরণ পাওয়া গেল।

'তিনি বললেন—গত পনেরো দিনের মধ্যে চারবার প্রেতমূর্তির আবির্ভাব হয়েছে; চারবারই সে জানালার সামনে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরেছে—তারপর মিলিয়ে গেছে। তার আসার সময়ের কিছু ঠিক নেই; কখনো দুপুর রাত্রে এসেছে, কখনো শেষ রাত্রে এসেছে, আবার কখনো বা সন্ধ্যের সময়েও দেখা দিয়েছে। মূর্তিটা সুশ্রী নয়, চোখে একটা লুব্ধ ক্ষুধিত ভাব। যেন ঘরে ঢুকতে চায়, কিন্তু মানুষ আছে দেখে সাক্ষাতে ফিরে চলে যাচ্ছে।

'কৈলাসবাবুর গল্প শুনে আমরা স্থির করলুম, স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে। কৈলাসবাবুও আমাদের সাগ্রহে আমন্ত্রণ করলেন। পরদিন থেকে আমরা প্রত্যহ তাঁর বাড়িতে পাহারা আরম্ভ করলুম। সন্ধ্যে থেকে রাত্রি দশটা—কখনো বা এগারোটা বেজে যায়। কিন্তু প্রেতযোনির দেখা নেই। যদি বা কদাচিৎ আসে, আমরা চলে যাবার পর আসে; আমরা দেখতে পাই না।

'দিন দশেক আনাগোনা করবার পর আমার বন্ধুরা একে একে খসে পড়তে লাগলেন; শৈলেনবাবুও ভগ্নোদ্যম হয়ে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। আমি কেবল একলা লেগে রইলুম। সন্ধ্যের পর যাই, কৈলাসবাবুর সঙ্গে বসে গল্প-গুজব করি, তারপর সাড়ে-দশটা এগারোটা নাগাদ ফিরে আসি।

'এইভাবে আরো এক হপ্তা কেটে গেল। আমিও ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়তে লাগলুম। এ কি রকম প্রেতাত্মা যে কৈলাসবাবু ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। কৈলাসবাবুর ওপর নানা রকম সন্দেহ হতে লাগল।

'তারপর একদিন হঠাৎ আমার দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পুরস্কার পেলুম। কৈলাসবাবুর

ওপরে সন্দেহও ঘুচে গেল।'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ একমনে শুনিতেছিল, বলিল, 'আপনি দেখলেন?'

গম্ভীর স্বরে বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—আমি দেখলুম।'

ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল।—'তাই তো!' তারপর কিয়ৎকাল যেন চিন্তা করিয়া বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুকে চিনতে পারলেন?'

বরদাবাবু মাথা নাড়িলেন—'তা ঠিক বলতে পারি না।—একখানা মুখ, খুব স্পষ্ট নয় তবু মানুষের মত তাতে সন্দেহ নেই। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আবছায়া ছবির মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি আশ্চর্য! প্রত্যক্ষভাবে ভূত দেখা সকলের ভাগ্যে ঘটে ওঠে না; অধিকাংশ স্থলেই ভৌতিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়—হয় শোনা কথা, নয় তো রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

ব্যোমকেশের কথার মধ্যে অবিশ্বাসের যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল তাহা বোধ করি শৈলেনবাবুকে বিদ্ধ করিল; তিনি বলিলেন, 'শুধু বরদাবাবু নয়, তারপর আরো অনেকে দেখেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিও দেখেছেন নাকি?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি। হয়তো বরদাবাবুর মত অত স্পষ্টভাবে দেখিনি, তবু দেখেছি। বরদাবাবু দেখবার পর আমরা কয়েকজন আবার যেতে আরম্ভ করেছিলুম। একদিন আমি নিমেষের জন্য দেখে ফেললুম!'

বরদাবাবু বলিলেন, 'সেদিন শৈলেনবাবু উত্তেজিত হয়ে একটু ভুল করে ফেলেছিলেন বলেই ভাল করে দেখতে পাননি। আমরা কয়েকজন—আমি, অমূল্য আর ডাক্তার শচী রায়—কৈলাসবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলুম; তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার পরামর্শ দিতে দিতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু শৈলেনবাবু শিকারীর মত জানালার দিকে তাকিয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ উনি 'ঐ—ঐ—' করে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমরা ধড়মড় করে ফিরে চাইলুম, কিন্তু তখন আর কিছু দেখা গেল না। শৈলেনবাবু দেখেছিলেন, একটা কুয়াসার মত বাষ্প যেন ক্রমশ আকার পরিগ্রহ করছে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণরূপে Materialise করবার আগেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাই সব নষ্ট হয়ে গেল।'

শৈলেননাবু বলিলেন, 'তবু, কৈলাসবাবুও নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিলেন। মনে নেই, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, একে তাঁর হার্ট দুর্বল—; ভাগ্যে শচী ডাক্তার উপস্থিত ছিল, তাই তখনি ইন্‌জেকশন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে। নইলে হয়তো আর একটা ট্র্যাজেডি ঘটে যেত।'

অতঃপর প্রায় পাঁচ মিনিট আমরা সকলে নীরবে বসিয়া রহিলাম। প্রত্যক্ষদর্শীর কথা, অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। অন্তত দুইটি বিশিষ্ট ভদ্রসন্তানকে চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী বলিয়া ধরিয়া না লইলে বিশ্বাস করিতে হয়। আবার গল্পটা এতই অপ্রাকৃত যে সহসা মানিয়া লইতেও মন সরে না।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আপনাদের মতে বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মাই তাঁর শোবার ঘরের জানালার কাছে দেখা দিচ্ছেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তাছাড়া আর কি হতে পারে?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের এ বিষয়ে মতামত কি?'

'তাঁর মতামত ঠিক বোঝা যায় না। গয়ায় পিণ্ড দেবার কথা বলেছিলুম, তা কিছুই করলেন না। বিশেষতঃ তারাশঙ্করবাবু তো এসব কথা কানেই তোলেন না—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেন।' বরদাবাবু একটি ক্ষোভপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের একটা কিনারা হলে হয়তো তাঁর আত্মার সদ্‌গতি হত। আমি প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জানি না; তবু মনে হয়, পরলোক যদি থাকে, তবে

প্রেতযোনির পক্ষে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিটা অস্বাভাবিক নয়।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'তা তো নয়ই। প্রেতযোনির কেবল দেহ নেই, আত্মা তো অটুট আছে। গীতায়—নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—'

বাধা দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিয়ে দিতে পারেন? তাঁকে দু-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতুম।'

বরদাবাবু ভাবিয়া বলিলেন, 'চেষ্টা করতে পারি। আপনি ডিটেক্‌টিভ শুনলে হয়তো তারাশঙ্করবাবু আপত্তি করবেন না। আজ বার লাইব্রেরীতে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব; যদি তিনি রাজী হন, ওবেলা এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তাহলে তাই কথা রইল।'

অতঃপর বরদাবাবু উঠি-উঠি করিতেছেন দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আমরা ভূত দেখতে পাই না?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'একদিনেই যে দেখতে পাবেন এমন কথা বলি না; তবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লেগে থাকতে পারলে নিশ্চয় দেখবেন। চলুন না, আজই তারাশঙ্করবাবুর বাড়ি হয়ে আপনাদের কৈলাসবাবুর বাড়ি নিয়ে যাই। কি বলেন ব্যোমকেশবাবু?'

'বেশ কথা। ওটা দেখবার আমারও বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনাদের দেশে এসেছি, একটা নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে চাই।'

'তাহলে এখন উঠি। দশটা বাজে। ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আবার আসব।'

বরদাবাবু ও শৈলেনবাবু প্রস্থান করিবার পর শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি মনে হল? আশ্চর্য নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার খুনের গল্প আর বরদাবাবুর ভূতের গল্প—দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী আজগুবি বুঝতে পারছি না।'

'আমার খুনের গল্পে আজগুবি কোন্‌খানটা পেলে?'

'ছ'মাসের মধ্যে যে খুনের কিনারা হয় না তাকে আজগুবি ছাড়া আর কি বলব? বৈকুণ্ঠবাবু খুন হয়েছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো? হার্টফেল করে মারা যাননি?'

'কি যে বল—; ডাক্তারের পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট রয়েছে, গলা টিপে দম বন্ধ করে তাঁকে মারা হয়েছে। গলায় sub-cutaneous abrasions—

'অথচ আততায়ীর কোনো চিহ্ন নেই, একটা আঙুলের দাগ পর্যন্ত না। আজগুবি আর কাকে বলে? বরদাবাবুর তো তবু একটা প্রত্যক্ষদৃশ্য ভূত আছে, তোমার তাও নেই।'—ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিতে ভাঙিতে বলিল, 'অজিত, ওঠো—স্নান করে নেওয়া যাক্। ট্রেনে ঘুম হয়নি; দুপুরবেলা দিব্যি একটি নিদ্রা না দিলে শরীর ধাতস্থ হবে না।'

অপরাহ্ণে বরদাবাবু আসিলেন। তারাশঙ্করবাবু রাজী হইয়াছেন; যদিও একটি শোক-সন্তপ্তা ভদ্রমহিলার উপর এইসব অযথা উৎপাত তিনি অত্যন্ত অপছন্দ করেন।

বরদাবাবুর সঙ্গে দুইজনে বাহির হইলাম। শশাঙ্কবাবু যাইতে পারিলেন না, হঠাৎ কি কারণে উপরওয়ালার নিকট তাঁহার ডাক পড়িয়াছে।

পথে যাইতে যাইতে বরদাবাবু জানাইলেন যে, তারাশঙ্করবাবু লোক নেহাৎ মন্দ নয়, তাঁহার মত আইনজ্ঞ তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিলও জেলায় আর দ্বিতীয় নাই; কিন্তু মুখ বড় খারাপ। হাকিমরা পর্যন্ত তাঁহার কটু-তিক্ত ভাষাকে ভয় করিয়া চলেন। হয়তো তিনি আমাদের খুব সাদর সংবর্ধনা করিবেন না; কিন্তু তাহা যেন আমরা গায়ে না মাখি।

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ একটু হাসিল। যেখানে কার্যোদ্ধার করিতে হইবে সেখানে তাহার গায়ে গণ্ডারের চামড়া—কেহই তাহাকে অপমান করিতে পারে না। সংসর্গগুণে আমার ত্বক্‌ও বেশ পুরু হইয়া আসিতেছিল।

কেল্লার দক্ষিণ দুয়ার পার হইয়া বেলুনবাজার নামক পাড়ায় উপস্থিত হইলাম প্রধানতঃ বাঙালী পাড়া. তাহার মধ্যস্থলে তারাশঙ্করবাবুর প্রকাণ্ড ইমারৎ। তারাশঙ্করবাবু যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি উকিল তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

তাঁহার বৈঠকখানায় উপনীত হইয়া দেখিলাম তক্তাপোষে ফরাস পাতা এবং তাহার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া গৃহস্বামী তাম্রকূট সেবন করিতেছেন। শীর্ণ দীর্ঘাকৃতি লোক, দেহে মাংসের বাহুল্য নাই বরং অভাব; কিন্তু মুখের গঠন ও চোখের দৃষ্টি অতিশয় ধারালো। বয়স ষাটের কাছাকাছি; পরিধানে থান ও শুভ্র পিরান। আমাদের আসিতে দেখিয়া তিনি গড়গড়ার নল হাতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, 'এস বরদা। এঁরাই বুঝি কলকাতার ডিটেক্‌টিভ?'

ইঁহার কণ্ঠস্বর ও কথা বলিবার ভঙ্গীতে এমন একটা কিছু আছে যাহা শ্রোতার মনে অস্বস্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি করে। সম্ভবতঃ বড় উকিলের ইহা একটা লক্ষণ; বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষী এই কণ্ঠস্বর শুনিয়া যে রীতিমত বিচলিত হইয়া পড়ে তাহা অনুমান করিতে কষ্ট হইল না।

বরদাবাবু সংকুচিতভাবে ব্যোমকেশের পরিচয় দিলেন। ব্যোমকেশ বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া বলিল. 'আমি একজন সত্যান্বেষী।'

তারাশঙ্করবাবুর বাম ভ্রূর প্রান্ত ঈষৎ উত্থিত হইল. বলিলেন, 'সত্যান্বেষী? সেটা কি?'

ব্যোমকেশ কহিল, 'সত্য অন্বেষণ করাই আমার পেশা—আপনার যেমন ওকালতি।'

তারাশঙ্করবাবুর অধরোষ্ঠ শ্লেষ-হাস্যে বক্র হইয়া উঠিল; তিনি বলিলেন. 'ও—আজকাল ডিটেক্‌টিভ কথাটার বুঝি আর ফ্যাশন নেই? তা আপনি কি অন্বেষণ করে থাকেন?'

'সত্য।'

'তা তো আগেই শুনেছি। কোন্ ধরনের সত্য?'

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'এই ধরুন. বৈকুণ্ঠবাবু আপনার কাছে কত টাকা জমা রেখে গেছেন—এই ধরনের সত্য জানতে পারলেও আপাতত আমার কাজ চলে যাবে।'

নিমেষের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের সমস্ত চিহ্ন তারাশঙ্করবাবুর মুখ হইতে মুছিয়া গেল। তিনি বিস্ফারিত স্থির নেত্রে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাবপরে মহাবিস্ময়ে বলিলেন. 'বৈকুণ্ঠ আমার কাছে টাকা রেখে গেছে, একথা আপনি জানলেন কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল. 'আমি সত্যান্বেষী।'

এক মিনিট কাল তারাশঙ্করবাবু নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে; সম্ভ্রম-প্রশংসা মিশ্রিত কণ্ঠে কহিলেন, 'ভারি আশ্চর্য! এরকম ক্ষমতা আমি আজ পর্যন্ত কারুর দেখিনি।—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?—বোসো বরদা। বলি, ব্যোমকেশবাবুরও কি তোমার মত পোষা ভূত-টুত আছে নাকি?'

আমরা চৌকিতে উপবেশন করিলে তারাশঙ্করবাবু কয়েকবার গড়গড়ার নলে ঘন ঘন টান দিয়া মুখ তুলিলেন, ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন. 'অবশ্য আন্দাজে ঢিল ফেলেছেন. এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু আন্দাজটা পেলেন কোত্থেকে? অনুমান করতে হলেও কিছু মাল-মশলা চাই তো।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কিছু মাল-মশলা তো ছিল। বৈকুণ্ঠবাবুর মত ধনী ব্যবসায়ী নগদ টাকা কিছু রেখে যাবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অথচ ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা ছিল না। সম্ভবতঃ ব্যাঙ্ক-জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তবে কোথায় টাকা রাখতেন? নিশ্চয় কোনো বিশ্বাসী বন্ধুর কাছে। বৈকুণ্ঠবাবু প্রতি রবিবারে দুপুরবেলা আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। তিনি মারা যাবার পর তাঁর মেয়েকে আপনি নিজের আশ্রয়ে রেখেছেন; সুতরাং বুঝতে হবে. আপনিই তাঁর সবচেয়ে বিশ্বাসী এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু।'

তারাশঙ্করবাবু বলিলেন, 'আপনি ঠিক ধরেছেন। ব্যাঙ্কের ওপর বৈকুণ্ঠের বিশ্বাস

ছিল না। তার নগদ টাকা যা-কিছু সব আমার কাছেই থাকত এবং এখনো আছে। টাকা বড় কম নয়, প্রায় সতের হাজার। কিন্তু এ টাকার কথা আমি প্রকাশ করিনি; তার মৃত্যুর পর কথাটা জানাজানি হয় আমার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু যখন ধরে ফেলেছেন তখন স্বীকার না করে উপায় নেই। তবু আমি চাই, যেন বাইরে কথাটা প্রকাশ না হয়। আপনারা তিনজন জানলেন; আর কেউ যেন জানতে না পারে। বুঝলে বরদা?'

বরদাবাবু দ্বিধা-প্রতিবিম্বিত মুখে ঘাড় নাড়িলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কথাটা গোপন রাখবার কোনো বিশেষ কারণ আছে কি?'

তারাশঙ্করবাবু পুনরায় বারকয়েক তামাক টানিয়া বলিলেন, 'আছে। আপনারা ভাবতে পারেন আমি বন্ধুর গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কথাটা চেপে রাখবার অন্য কারণ আছে।'

'সেই কারণটি জানতে পারি না কি?

তারাশঙ্করবাবু কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিলেন; তারপর অন্দরের দিকের পর্দা-ঢাকা দরজার প্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া খাটো গলায় বলিলেন, 'আপনারা বোধ হয় জানেন না, বৈকুণ্ঠের একটা বকাটে লক্ষ্মীছাড়া জামাই আছে। মেয়েটাকে নেয় না, সার্কাস পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। উপস্থিত সে কোথায় আছে জানি না, কিন্তু সে যদি কোন গতিকে খবর পায় যে তার স্ত্রীর হাতে অনেক টাকা এসেছে তাহলে মেয়েটাকে জোর করে নিয়ে যাবে। দু'দিনে টাকাগুলো উড়িয়ে আবার সরে পড়বে। আমি তা হতে দিতে চাই না—বুঝেছেন?'

ব্যোমকেশ ফরাসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'বুঝেছি।'

তারাশঙ্করবাবু বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠের যথাসর্বস্ব তো চোরে নিয়ে গেছে, বাকি আছে কেবল এই হাজার কয়েক টাকা। এখন জামাই বাবাজী এসে যদি ওগুলোকে ফুঁকে দিয়ে যান, তাহলে অভাগিনী মেয়েটা দাঁড়াবে কোথায়? সারা জীবন ওর চলবে কি করে? আমি তো আর চিরদিন বেঁচে থাকব না।'

ব্যোমকেশ গালে হাত দিয়া শুনিতেছিল, বলিল, 'ঠিক কথা। তাঁকে গোটাকয়েক কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তিনি বাড়িতেই আছেন তো? যদি অসুবিধা না হয়—'

'বেশ। তাকে জেরা করে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আপনি যখন চান, এইখানেই তাকে নিয়ে আসছি।' বলিয়া তারাশঙ্করবাবু অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে আমি চক্ষু এবং ভ্রূর সাহায্যে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলাম—প্রত্যুত্তরে সে ক্ষীণ হাসিল। বরদাবাবুর সম্মুখে খোলাখুলি বাক্যালাপ হয়তো সে পছন্দ করিবে না, তাই স্পষ্টভাবে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিতে লাগিল—তারাশঙ্করবাবু লোকটি কি রকম?

পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহার পশ্চাতে একটি যুবতী নিঃশব্দে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথায় একটু আধ-ঘোমটা, মুখ দেখিবার পক্ষে কোনো প্রতিবন্ধক নাই; পরিধানে অতি সাধারণ সধবার সাজ। চেহারা একেবারে জলার পেত্নী না হইলেও সুশ্রী বলা চলে না। তবু চেহারার সর্বাপেক্ষা বড় দোষ বোধ করি মুখের পরিপূর্ণ ভাবহীনতা। এমন ভাবলেশশূন্য মুখ চীন-জাপানের বাহিরে দেখা যায় কি না সন্দেহ। মুখাবয়বের এই প্রাণহীনতাই রূপের অভাবকে অধিক স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যতক্ষণ সে আমাদের সম্মুখে রহিল, একবারও তাহার মুখের একটি পেশী কম্পিত হইল না, চক্ষু পলকের জন্য মাটি হইতে উঠিল না, ব্যঞ্জনাহীন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশের প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া যন্ত্রচালিতের মত পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যাহোক, সে আসিয়া দাঁড়াইতেই ব্যোমকেশ সেই দিকে ফিরিয়া ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইল; তারপর সহজ স্বরে প্রশ্ন করিল, 'আপনার বাবার মৃত্যুতে আপনি যে একেবারে নিঃস্ব হননি তা বোধ হয় জানেন?'

'হাঁ।'

'তারাশঙ্করবাবু নিশ্চয় আপনাকে বলেছেন যে আপনার সতের হাজার টাকা তাঁর কাছে জমা আছে?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ যেন একটু দমিয়া গেল। একটু ভাবিয়া আবার আরম্ভ করিল, 'আপনার স্বামী কতদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন?'

'আট বছর।'

'এই আট বছরের মধ্যে আপনি তাঁকে দেখেননি?'

'না।'

'তাঁর চিঠিপত্রও পাননি?'

'না।'

'তিনি এখন কোথায় আছেন জানেন না?'

'না।'

'আপনি পৈতৃক টাকা পেয়েছেন জানাজানি হলে তিনি ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইবেন—এ সম্ভাবনা আছে কি?'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর—

'হ্যাঁ।'

'আপনি তাঁর কাছে যেতে চান না?'

'না।'

লক্ষ্য করিলাম তারাশঙ্করবাবু নিগূঢ় হাস্য করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার অন্য পথ ধরিল।

'আপনার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?'

'যশোরে।'

'শ্বশুরবাড়িতে কে আছে?'

'কেউ না।'

'শ্বশুর-শাশুড়ী?'

'মারা গেছেন।'

'আপনার বিয়ে হয়েছিল কোথা থেকে?'

'নবদ্বীপ থেকে।'

'নবদ্বীপে আপনার খুড়তুত জাঠতুত ভায়েরা আছে, তাদের সংসারে গিয়ে থাকেন না কেন?'

উত্তর নাই।

'তাদের আপনি বিশ্বাস করেন না?'

'না।'

'তারাশঙ্করবাবুকেই সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করেন?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ দেয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর আবার অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল—

'আপনার বাবার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ড দেবার প্রস্তাব বরদাবাবু করেছিলেন। রাজী হননি কেন?'

নিরুত্তর।

'ওসব আপনি বিশ্বাস করেন না?'

তথাপি উত্তর নাই।

'যাক। এখন বলুন দেখি, যে-রাত্রে আপনার বাবা মারা যান, সে-রাত্রে আপনি কোনো শব্দ শুনেছিলেন?'

না।'
'হীরা জহরত তাঁর শোবার ঘরে থাকত?'
'হাঁ।'
'কোথায় থাকত?'
'জানি না।'
'আন্দাজ করতেও পারেন না?'
'না।'
'তাঁর সঙ্গে কোনো লোকের শত্রুতা ছিল?'
'জানি না।'
'আপনার বাবা আপনার সঙ্গে ব্যবসার কথা কখনো কইতেন না?'
'না।'
'রাত্রে আপনার শোবার ব্যবস্থা ছিল নীচের তলায়। কোন্ ঘরে শুতেন?'
'বাবার ঘরের নীচের ঘরে।'
'তাঁর মৃত্যুর রাত্রে আপনার নিদ্রার কোনো ব্যাঘাত হয়নি?'
'না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, আপনি এখন যেতে পারেন।'

অতঃপর তারাশঙ্করবাবুর বাড়িতে আমাদের প্রয়োজন শেষ হইয়া গেল। আমরা উঠিলাম। বিদায়কালে তারাশঙ্করবাবু সদয়কণ্ঠে ব্যোমকেশকে বলিলেন, 'আমার কথা যে আপনি যাচাই করে নিয়েছেন এতে আমি খুশীই হয়েছি। আপনি হুঁসিয়ার লোক; হয়তো বৈকুণ্ঠের খুনের কিনারা করতে পারবেন। যদি কখনো সাহায্য দরকার হয় আমার কাছে আসবেন। আর মনে রাখবেন, গচ্ছিত টাকার কথা যেন চাউর না হয়। চাউর করলে বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে।'

রাস্তায় বাহির হইয়া কেল্লার দিকে ফিরিয়া চলিলাম। দিবালোক তখন মুদিত হইয়া আসিতেছে; পশ্চিম আকাশ সিন্দুর চিহ্নিত আরশির মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। তাহার মাঝখানে বাঁকা চাঁদের রেখা—যেন প্রসাধন-রতা রূপসীর হাসির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে!

ব্যোমকেশের কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই, সে বুকে ঘাড় গুঁজিয়া চলিয়াছে। পাঁচ মিনিট নীরবে চলিবার পর আমি তাহাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যোমকেশ, তারাশঙ্কর-বাবুকে কি রকম বুঝলে?'

ব্যোমকেশ আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া উঠিল; বলিল, 'ভারি বিচক্ষণ লোক।'

## ৪

কেল্লায় প্রবেশ করিয়া বাঁহাতি যে রাস্তাটা গঙ্গার দিকে গিয়াছে, তাহারি শেষ প্রান্তে কৈলাসবাবুর বাড়ি। স্থানটি বেশ নির্জন। অনুচ্চ প্রাচীর-ঘেরা বাগানের চারিদিকে কয়েকটি ঝাউ ও দেবদারু গাছ, মাঝখানে ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ি। বৈকুণ্ঠবাবুকে যে ব্যক্তি খুন করিয়াছিল, বাড়িটির অবস্থিতি দেখিয়া মনে হয় ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাকে বিশেষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

বরদাবাবু আমাদের লইয়া একেবারে উপরতলায় কৈলাসবাবুর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন। ঘরটি সম্পূর্ণ নিরাভরণ; মধ্যস্থলে একটি লোহার খাট বিরাজ করিতেছে এবং সেই খাটের উপর পিঠে বালিশ দিয়া কৈলাসবাবু বসিয়া আছেন।

একজন ভৃত্য কয়েকটা চেয়ার আনিয়া ঘরের আলো জ্বালিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। ছাদ হইতে ঝুলানো কেরোসিন ল্যাম্পের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরের ধূসর অবসন্নতা কিরৎ

পরিমাণে দূর হইল। মুঙ্গেরে তখনো বিদ্যুৎ-বিভার আবির্ভাব হয় নাই।

কৈলাসবাবুর চেহারা দেখিয়া তিনি রুগ্ন এ বিষয়ে সংশয় থাকে না। তাঁহার রং বেশ ফর্সা, কিন্তু রোগের প্রভাবে মোমের মত একটা অর্ধ-স্বচ্ছ পাণ্ডুরতা মুখের বর্ণকে যেন নিষ্প্রাণ করিয়া দিয়াছে। মুখে সামান্য ছাঁটা দাড়ি আছে, তাহাতে মুখের শীর্ণতা যেন আরো পরিস্ফুট। চোখের দৃষ্টিতে অশান্ত অনুযোগ উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কণ্ঠস্বরও দীর্ঘ রোগভোগের ফলে একটা অপ্রসন্ন তীক্ষ্ণতা লাভ করিয়াছে।

পরিচয় আদন-প্রদান শেষ হইলে আমরা উপবেশন করিলাম; ব্যোমকেশ জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। ঘরের ঐ একটিমাত্র জানালা—পশ্চিমমুখী; নীচে বাগান। দেবদারু গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে গঙ্গার স্রোত-রেখা দেখা যায়। এদিকে আর লোকালয় নাই. বাগানের পাঁচিল পার হইয়াই গঙ্গার চড়া আরম্ভ হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া বলিল, 'জানালাটা মাটি থেকে প্রায় পনের হাত উঁচু। আশ্চর্য বটে!' তারপর ঘরের চারিপাশে কৌতূহলী দৃষ্টি হানিতে হানিতে চেয়ারে আসিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ কৈলাসবাবুর সঙ্গে ভৌতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা হইল; নূতন কিছুই প্রকাশ পাইল না। কিন্তু দেখিলাম কৈলাসবাবু লোকটি অসাধারণ একগুঁয়ে। ভৌতিক কাণ্ড তিনি অবিশ্বাস করেন না; বিলক্ষণ ভয় পাইয়াছেন তাহাও তাঁহার কথার ভাবে প্রকাশ পাইল। কিন্তু তবু কোনোক্রমেই এই হানাবাড়ি পরিত্যাগ করিবেন না। ডাক্তার তাঁহার হৃদযন্ত্রের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এবাড়ি ত্যাগ করিবার উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার সহচরেরাও ভীত হইয়া মিনতি করিতেছে, কিন্তু তিনি রুগ্ন শিশুর মত অহেতুক জিদ ধরিয়া এই বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া আছেন। কিছুতেই এখান হইতে নড়িবেন না।

হঠাৎ কৈলাসবাবু একটা আশ্চর্য কথা বলিয়া আমাদের চমকিত করিয়া দিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ খিট্‌খিটে স্বরে বলিলেন, 'সবাই আমাকে এবাড়ি ছেড়ে দিতে বলছে। আরে বাপু, বাড়ি ছাড়লে কি হবে—আমি যেখানে যাব সেখানেই যে এই ব্যাপার হবে। এসব অলৌকিক কাণ্ড কেন ঘটছে তা তো আর কেউ জানে না; সে কেবল আমি জানি। আপনারা ভাবছেন, কোথাকার কোন্ বৈকুণ্ঠবাবুর প্রেতাত্মা এখানে আনাগোনা করছে। মোটেই তা নয়—এর ভেতর অন্য কথা আছে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি রকম?'

'বৈকুণ্ঠ-ফৈকুণ্ঠ সব বাজে কথা—এ হচ্ছে পিশাচ। আমার গুণধর পুত্রের কীর্তি।'

'সে কি!'

কৈলাসবাবুর মোমের মত গণ্ডে ঈষৎ রক্ত সঞ্চার হইল, তিনি সোজা হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 'হ্যাঁ, লক্ষ্মীছাড়া একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। ভদ্রলোকের ছেলে, জমিদারের একমাত্র বংশধর—পিশাচসিদ্ধ হতে চায়! শুনেছেন কখনো? হতভাগাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করেছি, তাই আমার ওপর রিষ। তার একটা মহাপাষণ্ড গুরু জুটেছে, শুনেছি শ্মশানে বসে বসে মড়ার খুলিতে করে মদ খায়। একদিন আমার ভদ্রাসনে চড়াও হয়েছিল; আমি দরোয়ান দিয়ে চাবকে বার করে দিয়েছিলুম। তাই দুজনে মিলে ষড় করে আমার পিছনে পিশাচ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু—'

'কুলাঙ্গার সন্তান—তার মতলবটা বুঝতে পারছেন না? আমার বুকের ব্যামো আছে, পিশাচ দেখে আমি যদি হার্টফেল করে মরি—ব্যাস্! মাণিক আমার নিষ্কণ্টকে প্রেতসিদ্ধ গুরুকে নিয়ে বিষয় ভোগ করবেন।' কৈলাসবাবু তিক্তকণ্ঠে হাসিলেন; তারপর সহসা জানালার দিকে তাকাইয়া বিস্ফারিত চক্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ—ঐ—'

আমরা জানালার দিকে পিছন ফিরিয়া কৈলাসবাবুর কথা শুনিতেছিলাম, বিদ্যুদ্বেগে জানালার দিকে ফিরিলাম। যাহা দেখিলাম—তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। বাহিরে তখন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; ঘরের অনুজ্জ্বল কেরাসিন ল্যাম্পের আলোকে

দেখিলাম, জানালার কালো ফ্রেমে আঁটা একটা বীভৎস মুখ। অস্থিসার মুখের বর্ণ পাণ্ডু-পীত, অধরোষ্ঠের ফাঁকে কয়েকটা পীতবর্ণ দাঁত বাহির হইয়া আছে; কালিমা-বেষ্টিত চক্ষু-কোটর হইতে দুইটা ক্ষুধিত হিংস্র চোখের পৈশাচিক দৃষ্টি যেন ঘরের অভ্যন্তরটাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

মুহূর্তের জন্য নিশ্চল পক্ষাহত হইয়া গেলাম। তারপর ব্যোমকেশ দুই লাফে জানালার সম্মুখীন হইল। কিন্তু সেই ভয়ংকর মুখ তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

আমিও ছুটিয়া ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরের অন্ধকারে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া মনে হইল যেন দেবদারু গাছের ঘন ছায়ার ভিতর দিয়া একটা শীর্ণ অতি দীর্ঘ মূর্তি শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ দেশলাই জ্বালিয়া জানালার বাহিরে ধরিল। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম নীচে মই বা তজ্জাতীয় আরোহণী কিছুই নাই। এমন কি, মানুষ দাঁড়াইতে পারে এমন কার্নিশ পর্যন্ত দেয়ালে নাই।

ব্যোমকেশের কাঠি নিঃশেষ হইয়া নিবিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিল।

বরদাবাবু বসিয়াছিলেন, উঠেন নাই। এখন ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'দেখলেন?'

'দেখলুম।'

বরদাবাবু গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন, তাঁহার চোখে গোপন বিজয়গর্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি রকম মনে হল?'

কৈলাসবাবু জবাব দিলেন। তিনি বালিসে ঠেস দিয়া প্রায় শুইয়া পড়িয়াছিলেন, হতাশা-মিশ্রিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'কি আর মনে হবে!—এ পিশাচ। আমাকে না নিয়ে ছাড়বে না। ব্যোমকেশবাবু, আমার যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। পিশাচের হাত থেকে কেউ কখনো উদ্ধার পেয়েছে শুনেছেন কি?' তাঁহার ভয়বিশীর্ণ মুখের পানে চাহিয়া আমার মনে হইল, সত্যিই ইঁহার সময় আসন্ন হইয়াছে, দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্রের উপর এরূপ স্নায়বিক ধাক্কা সহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে বলিল, 'দেখুন, ভয়টাই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু—প্রেত-পিশাচ নয়। আমি বলি, বাড়িটা না হয় ছেড়েই দিন না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আমিও তাই বলি। আমার বিশ্বাস, এ বাড়িতে দোষ লেগেছে—পিশাচ-টিশাচ নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর অপঘাত মৃত্যুর পর থেকে—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পিশাচই হোক আর বৈকুণ্ঠবাবুই হোন্—মোট কথা, কৈলাসবাবুর শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে হঠাৎ ভয় পাওয়া ওঁর পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়। অতএব এ বাড়ি ছাড়াই কর্তব্য।'

'আমি বাড়ি ছাড়ব না।' কৈলাসবাবুর মুখে একটা অন্ধ একগুঁয়েমি দেখা দিল—'কেন বাড়ি ছাড়ব? কি করেছি আমি যে অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াব? আমার নিজের ছেলে যদি আমার মৃত্যু চায়—বেশ, আমি মরব। পিতৃহত্যার পাপকে যে কুসন্তানের ভয় নেই, তার বাপ হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না।'

অভিমান ও জিদের বিরুদ্ধে তর্ক করা বৃথা। রাত্রিও হইয়াছিল। আমরা উঠিলাম। পরদিন প্রাতে আবার আসিবার আশ্বাস দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম।

পথে কোনো কথা হইল না। বরদাবাবু দু-একবার কথা বলিবার উদ্যোগ করিলেন কিন্তু ব্যোমকেশ তাহা শুনিতে পাইল না। বরদাবাবু আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পোঁছাইয়া দিয়া গেলেন।

শশাঙ্কবাবু ইতিমধ্যে বাড়ি ফিরিয়াছিলেন, আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতেই বলিলেন, 'কি হে, কি হল?'

ব্যোমকেশ একটা আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বমুখে বলিল, 'প্রেতের আবির্ভাব

হলে।' তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই বলিল, 'কিন্তু বরদাবাবুর প্রেত এবং কৈলাসবাবুর পিশাচ মিলে ব্যাপারটা ক্রমেই বড় জটিল করে তুলেছে।'

পরদিন রবিবার ছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যোমকেশ শশাঙ্কবাবুকে বলিল, 'চল, কৈলাসবাবুর বাড়িটা ঘুরে আসা যাক।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'আবার ভূত দেখতে চাও নাকি? কিন্তু দিনের বেলা গিয়ে লাভ কি? রাত্রি ছাড়া তো অশরীরীর দর্শন পাওয়া যায় না।'

'কিন্তু যা অশরীরী নয়—অর্থাৎ স্থূল বস্তু—তার তো দর্শন পাওয়া যেতে পারে।'

'বেশ, চল।'

সাতটা বাজিতে না বাজিতে উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। কৈলাসবাবুর বাড়ি তখনো সম্পূর্ণ জাগে নাই। একটা চাকর নিদ্রালুভাবে নীচের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে; উপরে গৃহস্বামীর কক্ষে দরজা জানালা বন্ধ। ব্যোমকেশ বলিল, 'ক্ষতি নেই। বাগানটা ততক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি এস।'

শিশির ভেজা ঘাসে সমস্ত বাগানটি আস্তীর্ণ। সোনালী রৌদ্রে দেওদারের চুনট-করা পাতা জরির মত ঝলমল করিতেছে। চারিদিকে শারদ প্রাতের অপূর্ব পরিচ্ছন্নতা। আমরা ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

বাগানটি পরিসরে বিঘা চারেকের কম হইবে না কিন্তু ফুলবাগান বলিয়া কিছু নাই। এখানে সেখানে গোটা-কয়েক দোপাটি ও করবীর ঝাড় নিতান্ত অনাদৃতভাবে ফুল ফুটাইয়া রহিয়াছে। মালী নাই, বোধকরি বৈকুণ্ঠবাবুর আমলেও ছিল না। আগাছার জঙ্গল বৃদ্ধি পাইলে সম্ভবতঃ বাড়ির চাকরেরাই কাটিয়া ফেলিয়া দেয়।

তাহার পরিচয় বাগানের পশ্চিমদিকে এক প্রান্তে পাইলাম। দেয়ালের কোণ ঘেঁষিয়া আবর্জনা জমা হইয়া আছে। উনানের ছাই, কাঠ-কুটা, ছেঁড়া, কাগজ, বাড়ির জঞ্জাল—সমস্তই এইখানে ফেলা হয়। বহুকালের সঞ্চিত জঞ্জাল রৌদ্রে বৃষ্টিতে জমাট বাঁধিয়া স্থানটাকে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে।

এই আবর্জনার গাদার উপর উঠিয়া ব্যোমকেশ অনুসন্ধিৎসুভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল। জুতা দিয়া ছাই-মাটি সরাইয়া দেখিতে লাগিল। একবার একটা পুরানো টিনের কৌটা তুলিয়া লইয়া ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া আবার ফেলিয়া দিল। শশাঙ্কবাবু তাহার রকম দেখিয়া বলিলেন, 'কি হে, ছাইগাদার মধ্যে কি খুঁজছ?'

ব্যোমকেশ ছাইগাদা হইতে চোখ না তুলিয়াই বলিল, 'আমাদের প্রাচীন কবি বলেছেন—যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলে পাইতে পার—এটা কি?'

একটা চিড়্ধরা পরিত্যক্ত লণ্ঠনের চিম্নি পড়িয়াছিল; সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ তাহার খোলের ভিতর দেখিতে লাগিল। তারপর সন্তর্পণে তাহার ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া একখণ্ড জীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া আনিল। সম্ভবতঃ বায়ুতাড়িত হইয়া কাগজের টুকরাটা চিমনির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল; তারপর দীর্ঘকাল সেইখানে রহিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ চিম্নি ফেলিয়া দিয়া কাগজখানা নিবিষ্টচিত্তে দেখিতে লাগিল। আমিও উৎসুক হইয়া তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম।

কাগজখানা একটা ছাপা ইস্তাহারের অর্ধাংশ; তাহাতে কয়েকটা অস্পষ্ট জন্তু জানোয়ারের ছবি রহিয়াছে মনে হইল। জল-বৃষ্টিতে কাগজের রং বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, ছাপার কালিও এমন অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে পাঠোদ্ধার দুঃসাধ্য।

শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি দেখছ হে? ওতে কি আছে?'

'কিছু না।' ব্যোমকেশ কাগজখানা উল্টাইয়া তারপর চোখের কাছে আনিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, 'হাতের লেখা রয়েছে।—দ্যাখ তো পড়তে পার কিনা।' বলিয়া কাগজ আমার হাতে দিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিলাম। হাতের লেখা যে আছে তাহা প্রথমটা ধরাই যায় না। কালির চিহ্ন বিন্দুমাত্র নাই, কেবল মাঝে মাঝে কলমের আঁচড়ের দাগ দেখিয়া দু'একটা শব্দ অনুমান করা যায়—

বিপদে......হাতে টাক...
বাবা.........নচেৎ......মরীয়া
...তোমার স্বাথী......

ব্যোমকেশকে আমার পাঠ জানাইলাম। সে বলিল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কাগজটা থাক।' বলিয়া ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিল।

আমি বলিলাম, 'লেখক বোধ হয় খুব শিক্ষিত নয়—বানান ভুল করেছে। 'স্বাথী' লিখেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'শব্দটা 'স্বাথী' নাও হতে পারে।'

শশাঙ্কবাবু ঈষৎ অধীরকণ্ঠে বলিলেন, 'চল চল, আঁস্তাকুড় ঘেঁটে লাভ নেই। এতক্ষণে বোধহয় কৈলাসবাবু উঠেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, ঐ যে তাঁর ভৌতিক জানালা খোলা দেখছি। চল।'

৫

বাড়ির নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, জানালা দিয়া কৈলাসবাবু মুখ বাড়াইয়া আছেন। শীর্ণ ফ্যাকাশে মুখ—প্রাতঃকাল না হইয়া রাত্রি হইলে তাঁহাকে সহসা ঐ জানালার সম্মুখে দেখিয়া প্রেত বলিয়া বিশ্বাস করিতে কাহারো সংশয় হইত না।

তিনি আমাদের উপরে আহ্বান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার জানালার নীচের মাটির উপর ক্ষিপ্রদৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সবুজ ঘাসের পুরু গালিচা বাড়ির দেয়াল পর্যন্ত গিয়া ঠেকিয়াছে; তাহার উপর কোনো প্রকার চিহ্ন নাই।

উপরে কৈলাসবাবুর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ঘরে চায়ের সরঞ্জাম প্রস্তুত। চা যদিও আমাদের একদফা হইয়া গিয়াছিল, তবু দ্বিতীয়বার সেবন করিতে আপত্তি হইল না।

চায়ের সহিত নানাবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল। স্থানীয় জল-হাওয়ার ক্রমিক অধঃপতন, ডাক্তারদের চিকিৎসা-প্রণালীর ক্রমিক ঊর্ধ্বগতি, টোটকা ঔষধের গুণ, মারণ-উচাটন, ভূতের রোজা ইত্যাদি কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়িল না। ব্যোমকেশ তাহার মাঝখানে একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'রাত্রে আপনি জানালা বন্ধ করে শুচ্ছেন তো?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ—তিনি দেখা দিতে আরম্ভ করা অবধি জানালা দরজা বন্ধ করেই শুতে হচ্ছে—যদিও সেটা ডাক্তারের বারণ। ডাক্তার চান আমি অপর্যাপ্ত বায়ু সেবন করি—কিন্তু আমার যে হয়েছে উভয় সঙ্কট। কি করি বলুন?'

'জানালা বন্ধ করে কোন ফল পেয়েছেন কি?'

'বড় বেশী নয়। তবে দর্শনটা পাওয়া যায় না, এই পর্যন্ত। নিশুতি রাত্রে যখন তিনি আসেন, জানালায় সজোরে ঝাঁকানি দিয়ে যান—একলা শুতে পারি না; রাত্রে একজন চাকর ঘরের মেঝেয় বিছানা পেতে শোয়।'

চা সমাপনান্তে ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'এইবার আমি ঘরটা ভাল করে দেখব! শশাঙ্ক, কিছু মনে কোরো না; তোমাদের—অর্থাৎ পুলিসের—কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে আমি কটাক্ষ করছি না; কিন্তু মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। যদি তোমাদের কিছু বাদ পড়ে থাকে তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।'

শশাঙ্কবাবু একটু বাঁকা-সুরে বলিলেন, 'তা বেশ—নাও। কিন্তু এতদিন পরে যদি বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর কোনো চিহ্ন বার করতে পার, তাহলে বুঝব তুমি যাদুকর।'

ব্যোমকেশ হাসিল, 'তাই বুঝো। কিন্তু সে যাক। বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর দিন এ ঘরে কোন

আসবাবই ছিল না?'

'বলেছি তো, মাটিতে-পাতা বিছানা, জলের ঘড়া আর পানের বাটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।—হ্যাঁ, একটা তামার কানখুস্কিও পাওয়া গিয়েছিল।'

'বেশ। আপনারা তাহলে গল্প করুন কৈলাসবাবু, আমি আপনাদের কোন বিঘ্ন করব না। কেবল ঘরময় ঘুরে বেড়াব মাত্র।'

অতঃপর ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। কখনো ঊর্ধ্ব-মুখে ছাদের দিকে তাকাইয়া, কখনো হেঁটমুখে মেঝের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চিন্তাক্রান্ত মুখে নিঃশব্দে ঘুরিতে লাগিল। একবার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া জানালার কাঠ শার্সি প্রভৃতি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল; দরজার হুড়্কো ও ছিটকিনি লাগাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর আবার পরিক্রমণ শুরু করিল।

কৈলাস ও শশাঙ্কবাবু স-কৌতূহলে তাহার গতিবিধি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন জোর করিয়া কথাবার্তা আরম্ভ করিলাম। কারণ ব্যোমকেশের মন যতই বহির্নিরপেক্ষ হোক, তিন জোড়া কুতূহলী চক্ষু অনুক্ষণ তাহার অনুসরণ করিতে থাকিলে সে যে বিক্ষিপ্তচিত্ত ও আত্মসচেতন হইয়া পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই, যাহোক একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইহাদের দুইজনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। তবু, নানা অসংলগ্ন চর্চার মধ্যেও আমাদের মন ও চক্ষু তাহার দিকেই পড়িয়া রহিল।

পনেরো মিনিট এইভাবে কাটিল। তারপর শশাঙ্কবাবুর একটা পুলিস-ঘটিত কাহিনী শুনিতে শুনিতে অলক্ষিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশের দিকে নজর ছিল না; হঠাৎ ছোট্ট একটি হাসির শব্দে সচকিতে ঘাড় ফিরাইলাম। দেখিলাম, ব্যোমকেশ দক্ষিণ দিকের দেয়ালের খুব কাছে দাঁড়াইয়া দেয়ালের দিকে তাকাইয়া আছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কি হল আবার! হাসছ যে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাদু। দেখে যাও। এটা নিশ্চয় তোমরা আগে দ্যাখনি।' বলিয়া দেয়ালের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

আমরা সাগ্রহে উঠিয়া গেলাম। প্রথমটা চূণকাম করা দেয়ালের গায়ে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তারপর ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, মেঝে হইতে আন্দাজ পাঁচ ফুট উচ্চে সাদা চূণের উপর পরিষ্কার অঙ্গুষ্ঠের ছাপ অঙ্কিত রহিয়াছে। যেন কাঁচা চূণের উপর আঙুল টিপিয়া কেহ চিহ্নটি রাখিয়া গিয়াছে।

শশাঙ্কবাবু ভ্রূকুটি সহকারে চিহ্নটি দেখিয়া বলিলেন, 'একটা বুড়ো-আঙুলের ছাপ দেখছি। এর অর্থ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'অর্থ—মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। হত্যাকারীর এই পরিচয় চিহ্নটি তোমরা দেখতে পাওনি।'

বিস্ময়ে ভ্রূ তুলিয়া শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'হত্যাকারীর! এ আঙুলের দাগ যে হত্যাকারীর তা তুমি কি করে বুঝলে? আমরা আগে ওটা লক্ষ্য করিনি বটে কিন্তু তাই বলে ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ যে কেন হবে—তাও তো বুঝতে পারছি না। যে রাজমিস্ত্রি ঘর চূণকাম করেছিল তার হতে পারে; অন্য যে-কোনো লোকের হতে পারে।'

'একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কথা হচ্ছে, রাজমিস্ত্রি দেয়ালে নিজের আঙুলের টিপ রেখে যাবে কেন?'

'তা যদি বল, হত্যাকারীই বা রেখে যাবে কেন?'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার শশাঙ্কবাবুর দিকে তাকাইল; তারপর বলিল, 'তাও তো বটে। তাহলে তোমার মতে ওটা কিছুই নয়?'

'আমি বলতে চাই, ওটা যে খুব জরুরী তার কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।'

ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তোমার যুক্তি অকাট্য। প্রমাণের অভাবে কোন জিনিসকেই জরুরী বলে স্বীকার করা যেতে পারে না।—পকেটে ছুরি আছে? কিম্বা কানখুস্কি?'

'ছুরি আছে। কেন?'

অপ্রসন্ন মুখে শশাঙ্কবাবু ছুরি বাহির করিয়া দিলেন। ব্যোমকেশের আবিষ্কারে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই, তাই বোধ হয় সেটাকে তুচ্ছ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু তবু তাঁহার মনোভাব নেহাৎ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হইল না। দেয়ালের গায়ে একটা আঙুলের চিহ্ন—কবে কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে কিছুই জানা নাই—হত্যাকাণ্ডের রহস্য-সমাধানে ইহার মূল্য কি? এবং যদি উহা হত্যাকারীরই হয় তাহা হইলেই বা লাভ কি হইবে? কে হত্যাকারী তাহাই যখন জানা নাই তখন এই আঙুলের টিপ কোন কাজে লাগিবে তাহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না।

ব্যোমকেশ কিন্তু ছুরি দিয়া চিহ্নটির চারিধারে দাগ কাটিতে আরম্ভ করিল। অতি সন্তর্পণে চূণ-বালি আল্‌গা করিয়া ছুরির নখ দিয়া একটু চাড় দিতেই টিপ-চিহ্ন সমেত খানিকটা প্ল্যাস্টার বাহির হইয়া আসিল। ব্যোমকেশ সেটি সযত্নে রুমালে জড়াইয়া পকেটে রাখিয়া কৈলাসবাবুকে বলিল—'আপনার ঘরের দেয়াল কুশ্রী করে দিলুম। দয়া করে একটু চূণ দিয়ে গর্তটা ভরাট করিয়ে নেবেন।' তারপর শশাঙ্কবাবুকে বলিল. 'চল শশাঙ্ক, এখানকার কাজ আপাতত আমাদের শেষ হয়েছে। এদিকে দেখছি ন'টা বাজে; কৈলাসবাবুকে আর কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।—ভাল কথা, কৈলাসবাবু, আপনি বাড়ি থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পান তো?'

কৈলাসবাবু বলিলেন, 'আমাকে চিঠি দেবে কে? একমাত্র ছেলে—তার গুণের কথা তো শুনেছেন; চিঠি দেবার মত আত্মীয় আমার কেউ নেই।'

প্রফুল্লস্বরে ব্যোমকেশ বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা, আজ তাহলে চললুম; মাঝে মাঝে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব। আর দেখুন, এটার কথা কাউকে বলে দরকার নেই।' বলিয়া দেয়ালের ছিদ্রের দিকে নির্দেশ করিল।

কৈলাসবাবু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। রৌদ্র তখন কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিলাম।

হঠাৎ শশাঙ্কবাবু জিজ্ঞেস করিলেন, 'ব্যোমকেশ, ওই আঙুলের দাগটা সম্বন্ধে তোমার সত্যিকার ধারণা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমার ধারণা তো বলেছি, ওটা হত্যাকারীর আঙুলের দাগ।'

অধীরভাবে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'কিন্তু এ যে তোমার জবরদস্তি। হত্যাকারী কে তার নামগন্ধও জানা নেই—অথচ তুমি বলে বসলে ওটা হত্যাকারীর। একটা সঙ্গত কারণ দেখান চাই তো।'

'কি রকম সঙ্গত কারণ তুমি দেখতে চাও?'

শশাঙ্কবাবুর কণ্ঠের বিরক্তি আর চাপা রহিল না, তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমি কিছুই দেখতে চাই না। আমার মনে হয় তুমি নিছক ছেলেমানুষী করছ। অবশ্য তোমার দোষ নেই; তুমি ভাবছ বাঙ্গলা দেশে যে প্রথায় অনুসন্ধান চলে এদেশেও বুঝি তাই চলবে। সেটা তোমার ভুল। ও ধরনের ডিটেক্‌টিভগিরিতে এখানে কোন কাজ হবে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাই, আমার ডিটেক্‌টিভ বিদ্যে কাজে লাগাবার জন্য তো আমি তোমার কাছে আসিনি, বরং ওটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জনাই এসেছি। তুমি যদি মনে কর এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ করবার দরকার নেই তাহলে তো আমি নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে যাই।'

শশাঙ্কবাবু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'না, আমি তা বলছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য, ওপথে চললে কস্মিন কালেও কিছু করতে পারবে না—এ ব্যাপার অত সহজ নয়।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'ছ'মাস ধরে আমরা যে-ব্যাপারের একটা হদিস বার করতে পারলুম না, তুমি একটা আঙুলের টিপ দেখেই যদি মনে কর তার সমাধান করে ফেলেছ, তাহলে বুঝতে হবে এ

কেসের গুরুত্ব তুমি এখনো ঠিক ধরতে পারনি। আঙুলের দাগ কিম্বা আঁস্তাকুড়ে কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া কাগজে দুটো হাতের অক্ষর—এসব দিয়ে লোমহর্ষণ উপন্যাস লেখা চলে, পুলিসের কাজ চলে না। তাই বলছি, ওসব আঙুলের টিপ-ফিপ ছেড়ে—'

'থামো।'

পাশ দিয়া একখানা ফিটন গাড়ি যাইতেছিল, তাহার আরোহী আমাদের দেখিয়া গাড়ি থামাইলেন; গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ব্যোমকেশবাবু, কদ্দুর?'

তারাশঙ্করবাবু গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছেন; কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, গায়ে নামাবলী, মুখে একটু ব্যঙ্গ-হাস্য।

ব্যোমকেশ তাঁহার প্রশ্নে ভালমানুষের মত প্রতিপ্রশ্ন করিল—'কিসের?'

'কিসের আবার—বৈকুণ্ঠের খুনের। কিছু পেলেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন? আমার তো কিছু জানবার কথা নয়। বরং শশাঙ্ককে জিজ্ঞাসা করুন।'

তারাশঙ্করবাবু বাম ভ্রূ ঈষৎ তুলিয়া বলিলেন. 'কিন্তু শুনেছিলুম যেন, আপনিই নূতন করে এ কেসের তদন্ত করবার ভার পেয়েছেন! তা সে যা হোক, শশাঙ্কবাবু, খবর কি? নূতন কিছু আবিষ্কার হল?'

শশাঙ্কবাবু নীরসকণ্ঠে বলিলেন, 'আবিষ্কার হলেও পুলিসের গোপন কথা সাধারণে প্রকাশ করবার আমার অধিকার নেই। আর, ওটা আপনি ভুল শুনেছেন—ব্যোমকেশ আমার বন্ধু, মুঙ্গেরে বেড়াতে এসেছে, তদন্তের সঙ্গে তার কোন সংস্রব নেই।'

পুলিসের সহিত উকিলের প্রণয় এ জগতে বড়ই দুর্লভ। দেখিলাম, তারাশঙ্করবাবু ও শশাঙ্কবাবুর মধ্যে ভালবাসা নাই। তারাশঙ্করবাবু কণ্ঠস্বরে অনেকখানি মধু ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'বেশ বেশ। তাহলে কিছুই পারেননি। আপনাদের দ্বারা যে এর বেশী হবে না তা আগেই আন্দাজ করেছিলুম।—হাঁকো।'

তারাশঙ্করবাবুর ফিটন বাহির হইয়া গেল।

শশাঙ্কবাবু কটমট চক্ষে সেইদিকে তাকাইয়া অস্ফুটস্বরে যাহা বলিলেন তাহা প্রিয়-সম্ভাষণ নয়। ভিতরে ভিতরে সকলেরই মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। পথে আর কোন কথা হইল না. নীরবে তিনজনে বাসায় গিয়া পৌঁছিলাম।

## ৬

দুপুরবেলাটা ব্যোমকেশ অলসভাবে কাটাইয়া দিল। একবার ছেঁড়া কাগজখানা ও আঙুলের টিপ বাহির করিয়া অবহেলাভরে দেখিল; আবার সরাইয়া রাখিয়া দিল। তাহার মনের ক্রিয়া ঠিক বুঝিলাম না; কিন্তু বোধ হইল এই হত্যার ব্যাপারে এতাবৎকাল সে যেটুকু আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল তাহাও যেন নিবিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে বরদাবাবু আসিলেন। বলিলেন, 'এখানে আমাদের বাঙালীদের একটা ক্লাব আছে, চলুন আজ আপনাদের সেখানে নিয়ে যাই।'

'চলুন।'

দুইদিন এখানে আসিয়াছি কিন্তু এখনো স্থানীয় দ্রষ্টব্য বস্তু কিছুই দেখি নাই; তাই বরদাবাবু আমাদের কষ্টহারিণীর ঘাট, পীর-শানফার কবর ইত্যাদি কয়েকটা স্থান ঘুরাইয়া দেখাইলেন। তারপর সূর্যাস্ত হইলে তাঁহাদের ক্লাবে লইয়া চলিলেন।

কেল্লার বাহিরে ক্লাব। পথে যাইতে দেখিলাম—একটা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড তাঁবু পড়িয়াছে; তাহার চারিদিকে মানুষের ভিড়—তাঁবুর ভিতর হইতে উজ্জ্বল আলো এবং ইংরাজী বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ আসিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওটা কি?'

'একটা সার্কাস পার্টি এসেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে সার্কাস পার্টিও আসে নাকি?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আসে বৈকি। বিলক্ষণ দু'পয়সা রোজগার করে নিয়ে যায়। এই তো গত বছর একদল এসেছিল—না, গত বছর নয়, তার আগের বছর।'

'এরা কতদিন হল এসেছে?'

'কাল শনিবার ছিল, কাল থেকে এরা খেলা দেখাতে শুরু করেছে।'

প্রসঙ্গতঃ শহরের আমোদ-প্রমোদের অভাব সম্বন্ধে বরদাবাবু অভিযোগ করিলেন। মুষ্টিমেয় বাঙালীর মধ্যে চিরন্তন দলাদলি, তাই থিয়েটারের একটা সখের দল থাকা সত্ত্বেও অভিনয় বড় একটা ঘটিয়া ওঠে না; বাহির হইতে এক-আধটা কার্ণিভালের দল যাহা আসে তাহাই ভরসা। শুনিয়া খুব বেশী বিস্মিত হইলাম না। বাঙালীর বাস্তব জীবনে যে জাঁকজমক ও বৈচিত্র্যের অসদ্ভাব, তাহা সে থিয়েটারেব রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া মিটাইয়া লইতে চায়। তাই যেখানে দুইজন বাঙালী আছে সেইখানেই থিয়েটার ক্লাব থাকিতে বাধ্য এবং যেখানে থিয়েটার ক্লাব আছে সেখানে দলাদলি অবশ্যম্ভাবী। আমোদ-প্রমোদের জন্য চালানি মালের উপর নির্ভর করিতে হইবে ইহা আর বিচিত্র কি?

শুনিতে শুনিতে ক্লাবে আসিয়া পেঁৗছিলাম।

ক্লাবের প্রবেশপথটি সঙ্কীর্ণ হইলেও ভিতরে বেশ সুপ্রসর। খানিকটা খোলা জায়গার উপর কয়েকখানি ঘর। আমরা প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি ঘরে ফরাস পাতা, তাহার উপর বসিয়া কয়েকজন সভ্য ব্রিজ খেলিতেছেন; প্রতি হাত খেলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছেন, আবার খেলা আরম্ভ হইবামাত্র সকলে গম্ভীর ও স্বল্পবাক্ হইয়া পড়িতেছেন। ক্রীড়াচক্রের বাহিরে তাঁহাদের চিত্ত কোন অবস্থাতেই সঞ্চারিত হইতেছে না; আমরা দুইজন আগন্তুক আসিলাম তাহা কেহ লক্ষ্যই করিলেন না। ঘরের এক কোণে দুইটি সভ্য দাবার ছক লইয়া তুরীয় সমাধির অবস্থায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং বাজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের কঠোর তপস্যা অপ্সরার ঝাঁক আসিয়াও ভাঙিতে পারিবে না।

পাশের ঘর হইতে কয়েকজন উত্তেজিত সভ্যের গলার আওয়াজ আসিতেছিল, বরদাবাবু আমাদের সেই ঘরে লইয়া গেলেন। দেখিলাম, একটি টেবিল বেষ্টন করিয়া কয়েকজন যুবক বসিয়া আছেন—তন্মধ্যে আমাদের পূর্বপরিচিত শৈলেনবাবুও বর্তমান। তাঁহাকে বাকি সকলে সপ্তরথীর মত ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং ভূতযোনি সম্বন্ধে নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ ও সন্দেহমূলক বাক্যজালে বিদ্ধ করিয়া প্রায় ধরাশায়ী করিবার উপক্রম করিয়াছেন।

বরদাবাবুকে দেখিয়া শৈলেনবাবুর চোখে পরিত্রাণের আশা ফুটিয়া উঠিল, তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন, 'আসুন বরদাবাবু, এ'রা আমাকে একেবারে—; এই যে, ব্যোমকেশ-বাবু, আপনারাও এসেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

নবাগত দুইজনকে দেখিয়া তর্ক বন্ধ হইল। বরদাবাবু আমাদের পরিচয় দিয়া, আমরা উপবিষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে কেন? কি হয়েছে?'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'ওঁরা আমার ভূত দেখার কথা বিশ্বাস করছেন না, বলছেন ওটা আমারই মস্তিষ্কপ্রসূত একটা বায়বীয় মূর্তি।'

পৃথ্বীশবাবু নামক একটি ভদ্রলোক বলিলেন, 'আমরা বলতে চাই, বরদার আষাঢ়ে গল্প শুনে শুনে ওঁর মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে উনি ঝোপে ঝোপে বাঘ দেখছেন। বস্তুতঃ যেটাকে উনি ভূত মনে করছেন সেটা হয়তো একটা বাদুড় কিম্বা ঐ জাতীয় কিছু।'

শৈলেনবাবু বলিলেন, 'আমি স্বীকার করছি যে আমি স্পষ্টভাবে কিছু দেখিনি। তবু বাদুড় যে নয় একথা আমি হলফ্ নিয়ে বলতে পারি। আর বরদাবাবুর গল্প শুনে আমি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছি এ অপবাদ যদি দেন—'

বরদাবাবু আমাদের দিকে নির্দেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'এ'রা দু'জন কাল সকালে এখানে এসেছেন। এ'দেরও আমি গল্প শুনিয়ে বশীভূত করে ফেলেছি বলে সন্দেহ

হয় কি?'

একজন প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেন, 'না, তা হয় না। তবে সময় পেলে—'

বরদাবাবু বলিলেন, 'ওঁরা কাল রাত্রে দেখেছেন।'

সকলে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। তারপর পৃথ্বীশবাবু ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সত্যি দেখেছেন?'

ব্যোমকেশ স্বীকার করিল, 'হ্যাঁ।'

'কি দেখেছেন?'

'একটা মুখ।'

প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিতে লাগিলেন। তখন ব্যোমকেশ যে অবস্থায় ঐ মুখ দেখিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল। শুনিয়া সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। বরদাবাবু ও শৈলেনবাবুর মুখে বিজয়ীর গর্বোল্লাস ফুটিয়া উঠিল।

অমূল্যবাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, তর্কে যোগ দেন নাই। তাঁহার মুখমণ্ডলে অনিচ্ছাপীড়িত প্রত্যয় এবং অবরুদ্ধ অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। যাহা বিশ্বাস করিতে চাহি না তাহাই অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাস করিতে হইলে মানুষের মনের অবস্থা যেরূপ হয় তাঁহার মনের অবস্থাও সেইরূপ—কোন প্রকারে এই অনীপ্সিত বিশ্বাসের মূলে ছেদন করিতে পারিলে তিনি বাঁচেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন, বিরুদ্ধতার শ্লেষ কণ্ঠ হইতে যথাসম্ভব অপসারিত করিয়া বলিলেন, 'তা যেন হল, অনেকেই যখন দেখেছেন বলছেন—তখন না হয় ঘটনাটা সত্যি বলেই মেনে নেয়া গেল। কিন্তু কেন? বৈকুণ্ঠ জহুরী যদি ভূতই হয়ে থাকে তাহলে কৈলাসবাবুকে বিরক্ত করে তার কি লাভ হচ্ছে? এই কথাটা আমায় কেউ বুঝিয়ে দিতে পার?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'প্রেতযোনির উদ্দেশ্য সব সময় বোঝা যায় না। তবে আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠবাবু কিছু বলতে চান।'

অমূল্যবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, 'বলতে চান তো বলছেন না কেন?'

'সুযোগ পাচ্ছেন না। তাঁকে দেখেই আমরা এত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি যে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া, প্রেতাত্মার মূর্তি পরিগ্রহ করবার ক্ষমতা থাকলেও কথা কইবার ক্ষমতা সর্বত্র থাকে না। এক্টোপ্লাজ্ম্ নামক যে-বস্তুটা মূর্তি-গ্রহণের উপাদান—'

'পাণ্ডিত্য ফলিও না বরদা। Spiritualism- এর বইগুলো যে ঝাড়া মুখস্থ করে রেখেছ তা আমরা জানি। কিন্তু তোমার বৈকুণ্ঠবাবু যদি কথাই না বলতে পারবেন তবে নিরীহ একটি ভদ্রলোককে নাহক জ্বালাতন করছেন কেন?'

'মুখে কথা বলতে না পারলেও তাঁকে কথা বলাবার উপায় আছে।'

'কি উপায়?'

'টেবিল চালা।'

'ও—সেই তেপায়া টেবিল? সে তো জুচ্চুরি।'

'কি করে জানলে? কখনো পরীক্ষা করে দেখেছ?'

অমূল্যবাবুকে নীরব হইতে হইল। তখন বরদাবাবু আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'দেখুন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৈকুণ্ঠবাবুর কিছু বক্তব্য আছে; হয়তো তিনি হত্যাকারীর নাম বলতে চান। আমাদের উচিত তাঁকে সাহায্য করা। টেবিল চেলে তাঁকে ডাকলে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন। টেবিল চালিয়ে দেখবেন?'

ভূত নামানো কখনও দেখি নাই; ভারি আগ্রহ হইল। বলিলাম, 'বেশ তো, করুন না। এখনি করবেন?'

বরদাবাবু বলিলেন, 'দোষ কি? এইখানেই করা যাক—কি বল তোমরা? ভূত যদি নামে, তোমাদের সকলেরই সন্দেহ ভঞ্জন হবে।'

সকলেই সোৎসাহে রাজী হইলেন।

একটি ছোট টিপাই তৎক্ষণাৎ আনানো হইল। বরদাবাবু বলিলেন যে, বেশী লোক

থাকিলে চক্র ভাল হইবে না, তাই পাঁচজনকে বাছিয়া লওয়া হইল। বরদাবাবু, ব্যোমকেশ, শৈলেনবাবু, অমূল্যবাবু ও আমি রহিলাম। বাকি সকলে পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন।

আলো কমাইয়া দিয়া আমরা পাঁচজন টিপাইয়ের চারিদিকে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কি করিতে হইবে বরদাবাবু সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন টিপাইয়ের উপর আলগোছে হাত রাখিয়া পরস্পর আঙুলে আঙুল ঠেকাইয়া মুদিত চক্ষে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যান শুরু করিয়া দিলাম। ঘরের মধ্যে আবছায়া অন্ধকার ও অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট এইভাবে কাটিল। ভূতের দেখা নাই। মনে আবোল-তাবোল চিন্তা আসিতে লাগিল; জোর করিয়া মনকে বৈকুণ্ঠবাবুর ধ্যানে জুড়িয়া দিতে লাগিলাম। এইরূপ টানা-টানিতে বেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল টিপাইটা যেন একটু নড়িল। হঠাৎ দেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম, আঙুলের স্নায়ুগুলো নিরতিশয় সচেতন হইয়া রহিল।

আবার টিপাই একটু নড়িল, যেন ধীরে ধীরে আমার হাতের নীচে ঘুরিয়া যাইতেছে।

বরদাবাবুর গম্ভীর স্বর শুনিলাম—'বৈকুণ্ঠবাবু এসেছেন কি? যদি এসে থাকেন একবার টোকা দিন।'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া নাই। তারপর টিপাইয়ের একটা পায়া ধীরে ধীরে শূন্যে উঠিয়া ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িল।

বরদাবাবু গম্ভীর অথচ অনুচ্চ স্বরে কহিলেন, 'আবির্ভাব হয়েছে!'

স্নায়ুর উত্তেজনা আরো বাড়িয়া গেল: কান ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। চক্ষু মেলিয়া কিন্তু একটা বিস্ময়ের ধাক্কা অনুভব করিলাম। কি দেখিব আশা করিয়াছিলাম জানি না, কিন্তু দেখিলাম যেমন পাঁচজনে আধা অন্ধকারে বসিয়াছিলাম তেমনি বসিয়া আছি, কোথাও কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইতিমধ্যে যে একটা গুরুতর রকম অবস্থান্তর ঘটিয়াছে—এই ঘরে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও অশরীরী আত্মা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বরদাবাবু নিম্নস্বরে আমাদের বলিলেন, 'আমিই প্রশ্ন করি—কি বলেন?'

আমরা শিরঃসঞ্চালনে সম্মতি জানাইলাম। তখন তিনি ধীর গম্ভীরকণ্ঠে প্রেতযোনিকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন—

'আপনি কি চান?'

কোনো উত্তর নাই। টিপাই অচল হইয়া রহিল।

'আপনি বারবার দেখা দিচ্ছেন কেন?'

মনে হইল টিপাই একটু নড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা গেল না।

'আপনার কিছু বক্তব্য আছে?'

এবার টিপাইয়ের পায়া স্পষ্টতঃ উঠিতে লাগিল। কয়েকবার ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল—অর্থ কিছু বোধগম্য হইল না।

বরদাবাবু কহিলেন, 'যদি হ্যাঁ বলতে চান একবার টোকা দিন, যদি না বলতে চান দু'বার টোকা দিন।'

একবার টোকা পড়িল।

দেখিলাম, পরলোকের সহিত ভাব বিনিময়ের প্রণালী খুব সরল নয়। 'হাঁ' বা 'না' কোনোক্রমে বোঝানো যায়; কিন্তু বিস্তারিতভাবে মনের কথা প্রকাশ করা অশরীরীর পক্ষে বড় কঠিন। কিন্তু তবু মানুষের বুদ্ধি দ্বারা সে বাধাও কিয়ৎপরিমাণে উল্লঙ্ঘিত হইয়াছে—সংখ্যার দ্বারা অক্ষর বুঝাইবার রীতি আছে। বরদাবাবু সেই রীতি অবলম্বন করিলেন: প্রেতযোনিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আপনি যা বলতে চান, অক্ষর গুণে গুণে টোকা দিন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব।'

তখন টেলিগ্রাফে কথা আরম্ভ হইল। টিপাইয়ের পায়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কয়েকবার নড়ে,

আবার স্তব্ধ হয়; আবার নড়ে—আবার স্তব্ধ হয়। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে কথাগুলি অতি কষ্টে বাহির হইয়া আসিল তাহা এই—

বাড়ি—ছেড়ে—যাও—নচেৎ—অমঙ্গল—

টিপাইয়ের শেষ শব্দ থামিয়া যাইবার পর আমরা কিছুক্ষণ ভয়স্তম্ভিতবৎ বসিয়া রহিলাম। তারপর বরদাবাবু গলাটা একবার ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'আপনার বাড়ি যাতে ছেড়ে দেওয়া হয় আমরা তার চেষ্টা করব। আর কিছু বলতে চান কি?'

টিপাই স্থির।

আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, বরদাবাবুকে চুপি চুপি বলিলাম, 'হত্যাকারী কে জিজ্ঞাসা করুন।'

বরদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন। খানিকক্ষণ কোন উত্তর আসিল না; তারপর পায়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

তা—রা—তা—রা—তা—রা—

হঠাৎ টিপাই কয়েকবার সজোরে নড়িয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। বরদাবাবু কম্পিতস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'কি বললেন, বুঝতে পারলুম না। 'তারা'—কি? কারুর নাম?'

টিপাইয়ে সাড়া নাই।

আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আপনি কি আছেন?'

কোনো উত্তর আসিল না, টিপাই জড় বস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

তখন বরদাবাবু দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'চলে গেছেন।'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল; তারপর সকলের হাতের দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকাইয়া নেহাৎ অরসিকের মত বলিল, 'মাফ করবেন, এখন কেউ টিপাই থেকে হাত তুলবেন না। আপনাদের হাত আমি পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

বরদাবাবু ঈষৎ হাসিলেন—'আমরা কেউ হাতে আঠা লাগিয়ে রেখেছি কিনা দেখতে চান? বেশ—দেখুন।'

ব্যোমকেশের ব্যবহারে আমি বড় লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। এমন খোলাখুলিভাবে এতগুলি ভদ্রলোককে প্রবঞ্চক মনে করা নিতান্তই শিষ্টতা-বিগর্হিত। তাহার মনে একটা প্রবল সংশয় জাগিয়াছে সত্য—কিন্তু তাই বলিয়া এমন কঠোরভাবে সত্য পরীক্ষা করিবার তাহার কোন অধিকার নাই। সকলেই হয়তো মনে মনে ক্ষুন্ন হইলেন; কিন্তু ব্যোমকেশ নির্লজ্জভাবে প্রত্যেকের হাত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন কি আমাকেও বাদ দিল না।

কিন্তু কাহারো হাতেই কিছু পাওয়া গেল না। ব্যোমকেশ তখন দুই করতলে গণ্ড রাখিয়া টিপাইয়ের উপর কনুই স্থাপনপূর্বক শূন্যদৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকাইয়া রহিল।

বরদাবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন, 'কিছু পেলেন না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আশ্চর্য! এ যেন কল্পনা করাও যায় না।'

বরদাবাবু প্রসন্নস্বরে বলিলেন 'There are more things—'

অমূল্যবাবুর বিরুদ্ধতা একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অসংযতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'কিন্তু—'তারা' 'তারা' কথার মানে কেউ বুঝতে পারলে?'

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। আমার মাথায় হঠাৎ বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল —তারাশঙ্কর। আমি ঐ নামটাই উচ্চারণ করিতে যাইতেছিলাম, ব্যোমকেশ আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'ও আলোচনা না হওয়াই ভাল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা যা জানতে পেরেছি তা আমাদের মনেই থাক।' সকলে তাঁহার কথায় গম্ভীর উদ্বিগ্নমুখে সায় দিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজকের অভিজ্ঞতা বড় অদ্ভুত—এখনো যেন বিশ্বাস করতে

পারছি না। কিন্তু না করেও উপায় নেই। বরদাবাবু, এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ।' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ি ফিরিবার পথে বরদাবাবুর সহিত শৈলেনবাবু এবং অমূল্যবাবু আমাদের সাথী হইলেন। তাঁহাদেরও বাসা কেল্লার মধ্যে।

আমাদের বাসা নিকটবর্তী হইলে শৈলেনবাবু বলিলেন, 'একলা বাসায় থাকি, আজ রাত্রে দেখছি ভাল ঘুম হবে না।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'আপনার আর ভয় কি? ভয় কৈলাসবাবুর।—আচ্ছা, ওঁকে বাড়ি ছাড়াবার কি করা যায় বলুন তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওঁকে ও-বাড়ি ছাড়াতেই হবে। আপনারা তো চেষ্টা করছেনই, আমিও করব। কৈলাসবাবু অবুঝ লোক, তবু ওঁর ভালর জন্যই আমাদের চেষ্টা করতে হবে।—কিন্তু বাড়ি পৌঁছে যাওয়া গেছে, আর আপনারা কষ্ট করবেন না। নমস্কার।'

তিনজনে শুভনিশি জ্ঞাপন করিয়া ফিরিয়া চলিলেন। অমূল্যবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—'শৈলেনবাবু, আপনি বরং আজকের রাতটা আমার বাসাতেই থাকবেন চলুন। আপনিও একলা থাকেন, আমার বাসাতেও উপস্থিত আমি ছাড়া আর কেউ নেই—'

বুঝিলাম টেবিল চালার ব্যাপার সকলের মনের উপরেই আতঙ্কের ছায়া ফেলিয়াছে।

## ৭

শশাঙ্কবাবু বোধহয় মনে মনে ব্যোমকেশ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাই সেদিন কৈলাসবাবুর বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসার পর হইতে হত্যার প্রসঙ্গ আর ব্যোমকেশের সম্মুখে উত্থাপিত করেন নাই। তাছাড়া হঠাৎ তাঁহার অফিসে কাজের চাপ পড়িয়াছিল, পূজার ছুটির প্রাক্কালে অবকাশেরও অভাব ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দুই তিনদিন আমরা শহরে ও শহরের বাহিরে যত্র তত্র পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়া দিলাম। স্থানটি অতি প্রাচীন, জরাসন্ধের আমল হইতে ক্লাইভের সময় পর্যন্ত বহু কিম্বদন্তী ও ইতিবৃত্ত তাহাকে কেন্দ্র করিয়া জমা হইয়াছে। পুরাবৃত্তের দিকে যাঁহাদের ঝোঁক আছে তাঁহাদের কাছে স্থানটি পরম লোভনীয়।

এই সব দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ যেন হত্যাকাণ্ডের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিল। শুধু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সে কৈলাসবাবুর বাসায় গিয়া জুটিত এবং নানাভাবে তাঁহাকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য প্ররোচিত করিত। তাহার সুকৌশল বাক্য-বিন্যাসের ফলও ফলিয়াছিল, কৈলাসবাবু নিমরাজী হইয়া আসিয়াছিলেন।

শেষে সপ্তাহখানেক পরে তিনি সম্মত হইয়া গেলেন। কেল্লার বাহিরে একখানা ভাল বাড়ি পাওয়া গিয়াছিল, আগামী রবিবারে তিনি সেখানে উঠিয়া যাইবেন স্থির হইল।

রবিবার প্রভাতে চা খাইতে খাইতে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, এবার আমাদের তল্পি তুলতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেল।'

শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'এরি মধ্যে! আর দু'দিন থেকে যাও না। কলকাতায় তোমার কোনো জরুরী কাজ নেই তো।' তাঁহার কথাগুলি শিষ্টতাসম্মত হইলেও কণ্ঠস্বর নিরুৎসুক হইয়া রহিল।

ব্যোমকেশ উত্তরে বলিল, 'তা হয়তো নেই। কিন্তু তবু কাজের প্রত্যাশায় দোকান সাজিয়ে বসে থাকতে হবে তো।'

'তা বটে। কবে যাবে মনে করছ?'

'আজই। তোমার এখানে ক'দিন ভারি আনন্দে কাটল—অনেকদিন মনে থাকবে।'

'আজই? তা—তোমাদের যাতে সুবিধা হয়—' শশাঙ্কবাবু কিয়ৎকাল বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর একটু বিরসস্বরে কহিলেন, 'সে ব্যাপারটার কিছুই হল

না। জটিল ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই; তবু ভেবেছিলুম, তোমার যে রকম নাম-ডাক হয়তো কিছু করতে পারবে।'

'কোন ব্যাপারের কথা বলছ?'

'বৈকুণ্ঠবাবুর খুনের ব্যাপার। কথাটা ভুলেই গেলে নাকি?'

'ও—না ভুলিনি। কিন্তু তাতে জানবার কিছু নেই।'

'কিছু নেই! তার মানে? তুমি সব জেনে ফেলেছ নাকি?'

'তা—একরকম জেনেছি বৈ কি।'

'সে কি! তোমার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।' শশাঙ্কবাবু ঘুরিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিল, 'কেন—বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে যা কিছু জানবার ছিল তা তো অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছি—তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?'

শশাঙ্কবাবু স্তম্ভিতভাবে তাকাইয়া রহিলেন—'কিন্তু—অনেকদিন আগেই জানতে পেরেছ—কি বলছ তুমি? বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী কে তা জানতে পেরেছ?'

'সে তো গত রবিবারই জানা গেছে।'

'তবে—তবে—এতদিন আমায় বলনি কেন?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল—'ভাই, তোমার ভাবগতিক দেখে আমার মনে হয়েছিল যে পুলিস আমার সাহায্য নিতে চায় না; বাংলাদেশে আমরা যে-প্রথায় কাজ করি সে-প্রথা তোমাদের কাছে একেবারে হাস্যকর, আঙুলের টিপ এবং ছেঁড়া কাগজের প্রতি তোমাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তাই আর আমি উপযাচক হয়ে কিছু বলতে চাইনি। লোমহর্ষণ উপন্যাস মনে করে তোমরা সমস্ত পুলিস-সম্প্রদায় যদি একসঙ্গে অট্টহাস্য শুরু করে দাও—তাহলে আমার পক্ষে সেটা কি রকম সাংঘাতিক হয়ে উঠবে একবার ভেবে দ্যাখো।'

শশাঙ্কবাবু ঢোক গিলিলেন—'কিন্তু—আমাকে তো ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারতে। আমি তো তোমার বন্ধু! সে যাক, এখন কি জানতে পেরেছ শুনি।' বলিয়া তিনি ব্যোমকেশের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিলেন।

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল।

'কে খুন করেছে? তাকে আমরা চিনি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

তাহার উরুর উপর হাত রাখিয়া প্রায় অনুনয়ের কণ্ঠে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'সত্যি বল ব্যোমকেশ, কে করেছে?'

'ভূত।'

শশাঙ্কবাবু বিমূঢ় হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ঠাট্টা করছ নাকি! ভূতে খুন করেছে?'

'অর্থাৎ—হ্যাঁ, তাই বটে।'

অধীর স্বরে শশাঙ্কবাবু বলিলেন, 'যা বলতে চাও পরিষ্কার করে বল ব্যোমকেশ। যদি তোমার সত্যিসত্যি বিশ্বাস হয়ে থাকে যে ভূতে খুন করেছে—তাহলে—' তিনি হতাশভাবে হাত উল্টাইলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল। তারপর উঠিয়া বারান্দায় একবার পায়চারি করিয়া বলিল, 'সব কথা তোমাকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হলে আজ আমার যাওয়া হয় না—রাত্রিটা থাকতে হয়। আসামীকে তোমার হাতে সমর্পণ না করে দিলে তুমি বুঝবে না। আজ কৈলাসবাবু বাড়ি বদল করবেন; সুতরাং আশা করা যায় আজ রাত্রেই আসামী ধরা পড়বে।' একটু থামিয়া বলিল, 'আর কিছু নয়, বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ের জন্যই দুঃখ হয়।—যাক, এখন কি করতে হবে বলি শোনো।'

আশ্বিন মাস, দিন ছোট হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ছ'টার মধ্যে সন্ধ্যা হয় এবং নয়টা বাজিতে না বাজিতে কেল্লার অধিবাসিবৃন্দ নিদ্রালু হইয়া শয্যা আশ্রয় করে। গত কয়েকদিনেই তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

সে-রাত্রে ন'টা বাজিবার কিছু পূর্বে আমরা তিনজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশ একটা টর্চ সঙ্গে লইল, শশাঙ্কবাবু একজোড়া হাতকড়া পকেটে পুরিয়া লইলেন।

পথ নির্জন; আকাশে মেঘের সঞ্চার হইয়া অর্ধচন্দ্রকে ঢাকিয়া দিয়াছে। রাস্তার ধারে বহুদূর ব্যবধানে যে নিষ্প্রভ কেরাসিন-বাতি ল্যাম্পপোস্টের মাথায় জ্বলিতেছিল তাহা রাত্রির ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে মাত্র। পথে জনমানবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না।

কৈলাসবাবুর পরিত্যক্ত বাসার সম্মুখে গিয়া যখন পৌঁছিলাম তখন সরকারী খাজনা-খানা হইতে নয়টার ঘণ্টা বাজিতেছে। শশাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাইয়া মৃদু শিস দিলেন; অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা লোক বাহির হইয়া আসিল—তাহাকে দেখিতে পাইলাম না, অস্পষ্ট পদশব্দে বুঝিলাম। ব্যোমকেশ তাহাকে চুপি চুপি কি বলিল, সে আবার অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আমরা সন্তর্পণে বাড়িতে প্রবেশ করিলাম। শূন্য বাড়ি, দরজা জানালা সব খোলা—কোথাও একটা আলো জ্বলিতেছে না। প্রাণহীন শবের মত বাড়িখানা যেন নিস্পন্দ হইয়া আছে।

পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। কৈলাসবাবুর ঘরের সম্মুখে ব্যোমকেশ একবার দাঁড়াইল, তারপর ঘরে প্রবেশ করিয়া টর্চ জ্বালিয়া ঘরের চারিদিকে ফিরাইল। ঘর শূন্য—খাট বিছানা যাহা ছিল কৈলাসবাবুর সঙ্গে সমস্তই স্থানান্তরিত হইয়াছে। খোলা জানালা-পথে গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাস নিরাভরণ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

দরজা ভেজাইয়া ব্যোমকেশ টর্চ নিবাইয়া দিল। তারপর মেঝেয় উপবেশন করিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'বোসো তোমরা। কতক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে কিছু ঠিক নেই, হয়তো রাত্রি তিনটে পর্যন্ত এইভাবে বসে থাকতে হবে।—অজিত, আমি টর্চ জ্বাললেই তুমি গিয়ে জানালা আগ্‌লে দাঁড়াবে; আর শশাঙ্ক, তুমি পুলিসের কর্তব্য করবে—অর্থাৎ প্রেতকে প্রাণপণে চেপে ধরবে।'

অতঃপর অন্ধকারে বসিয়া আমাদের পাহারা আরম্ভ হইল। চুপচাপ তিনজনে বসিয়া আছি, নড়ন-চড়ন নাই; নড়িলে বা একটু শব্দ করিলে ব্যোমকেশ বিরক্তি প্রকাশ করিতেছে। সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া যে সময়ের অন্ত্যেষ্টি করিব তাহারও উপায় নাই, গন্ধ পাইলে শিকার ভড়কাইয়া যাইবে। বসিয়া বসিয়া আর এক রাত্রির দীর্ঘ প্রতীক্ষা মনে পড়িল, চোরাবালির ভাঙা কুঁড়ে ঘরে অজানার উদ্দেশ্যে সেই সংশয়পূর্ণ জাগরণ। আজিকার রাত্রিও কি তেমনি অভাবনীয় পরিসমাপ্তির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে?

খাজনাখানার ঘড়ি দুইবার প্রহর জানাইল—এগারোটা বাজিয়া গেল। তিনি কখন আসিবেন তাহার স্থিরতা নাই; এদিকে চোখের পাতা ভারি হইয়া আসিতেছে।

এই তো কলির সন্ধ্যা—ভাবিতে ভাবিতে একটা অদম্য হাই তুলিবার জন্য হাঁ করিয়াছি, হঠাৎ ব্যোমকেশ সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়া আমার উরু চাপিয়া ধরিল। হাই অর্ধপথে হেঁচকা লাগিয়া থামিয়া গেল।

জানালার কাছে শব্দ। চোখে কিছুই দেখিলাম না, কেবল একটা অস্পষ্ট অতি লঘু শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া গেল। তারপর আর কোনো সাড়া নাই। নিশ্বাস রোধ করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলাম, বাহিরে কিছুই শুনিতে পাইলাম না—শুধু নিজের বুকের মধ্যে দুন্দুভির মত একটা আওয়াজ ক্রমে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

সহসা আমাদের খুব কাছে, ঘরের মেঝের উপর পা ঘষিয়া চলার মত খসখস শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একজন ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, আমাদের দুই হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—অথচ তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না। সে কি আমাদের অস্তিত্ব জানিতে

পারিয়াছে? কে সে? এবার কি করবে? আমার মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়া একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বহিয়া গেল।

প্রভাতের সূর্যরশ্মি যেমন ছিদ্রপথে বদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তেমনি সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘরের মধ্যস্থলে জন্মলাভ করিয়া আমাদের সম্মুখের দেয়াল স্পর্শ করিল। অতি ক্ষীণ আলো কিন্তু তাহাতেই মনে হইল যেন ঘর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিলাম একটা দীর্ঘাকৃতি কালো মূর্তি আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই হস্তস্থিত ক্ষুদ্র টর্চের আলো যেন দেয়ালের গায়ে কি অন্বেষণ করিতেছে।

কৃষ্ণ মূর্তিটা ক্রমে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল; অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে দেয়ালের সাদা চূণকাম পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার গলা দিয়া একটা অব্যক্ত আওয়াজ বাহির হইল, যেন যাহা খুঁজিতেছিল তাহা সে পাইয়াছে।

এই সময় ব্যোমকেশের হাতের টর্চ জ্বলিয়া উঠিল। তীব্র আলোকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষু ধাঁধিয়া গেল। তারপর আমি ছুটিয়া গিয়া জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলাম।

আগন্তুকও তড়িৎবেগে ফিরিয়া চোখের সম্মুখে হাত তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার মুখখানা প্রথমে দেখিতে পাইলাম না। তারপর মুহূর্ত মধ্যে অনেকগুলা ঘটনা প্রায় একসঙ্গে ঘটিয়া গেল। আগন্তুক বাঘের মত আমার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল, শশাঙ্কবাবু তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনজনে জাপটা-জাপটি করিয়া ভূমিসাৎ হইলাম।

ঝুটোপুটি ধস্তাধস্তি কিন্তু থামিল না। শশাঙ্কবাবু আগন্তুককে কুস্তিগিরের মত মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন; আগন্তুক তাঁহার স্কন্ধে সজোরে কামড়াইয়া দিয়া এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল। শশাঙ্কবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল না; তদবস্থায় টানিতে টানিতে জানালার দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় টর্চের আলোয় তাহার বিকৃত বীভৎস রং-করা মুখখানা দেখিতে পাইলাম। প্রেতাত্মাই বটে।

ব্যোমকেশ শান্ত সহজ সুরে বলিল, 'শৈলেনবাবু, জানালা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে কেবল দুঃখই পাবেন। আপনার রণ-পা ওখানে নেই, তার বদলে জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সদলবলে জানালার নীচে অপেক্ষা করছেন।' তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল, 'জমাদারসাহেব, উপর আইয়ে।'

সেই বিকট মুখ আবার ঘরের দিকে ফিরিল। শৈলেনবাবু! আমাদের নিরীহ শৈলেন-বাবু—এই! বিস্ময়ে মনটা যেন অসাড় হইয়া গেল।

শৈলেনবাবুর বিকৃত মুখের পৈশাচিক ক্ষুধিত চক্ষু দু'টা ব্যোমকেশের দিকে ক্ষণেক বিস্ফারিত হইয়া রহিল, দাঁতগুলা একবার হিংস্র শ্বাপদের মত বাহির করিলেন, যেন কি বলিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মুখ দিয়া একটা গোঙানির মত শব্দ বাহির হইল মাত্র। তারপর সহসা শিথিল দেহে তিনি সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন।

শশাঙ্কবাবু তাঁহার পা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'শশাঙ্ক, শৈলেন-বাবুকে তুমি চেনো বটে কিন্তু ওঁর সব পরিচয় বোধহয় জান না। কাঁধ দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছি; ও কিছু নয়, টিনচার আয়োডিন লাগালেই সেরে যাবে। তাছাড়া, পুলিসের অধিকার যখন গ্রহণ করেছ তখন তার আনুষঙ্গিক ফলভোগ করতে হবে বই কি। সে যাক, শৈলেন-বাবুর আসল পরিচয়টা দিই। উনি হচ্ছেন সার্কাসের একজন নামজাদা জিম্নাস্টিক খেলোয়াড় এবং বৈকুণ্ঠবাবুর নিরুদ্দিষ্ট জামাতা। সুতরাং উনি যদি তোমার ঘাড়ে কামড়ে দিয়েই থাকেন তাহলে তুমি সেটাকে জামাইবাবুর রসিকতা বলে ধরে নিতে পার।'

শশাঙ্কবাবু কিন্তু রসিকতা বলিয়া মনে করিলেন না; গলার মধ্যে একটা নাতি-উচ্চ গর্জন করিয়া জামাইবাবুর প্রকোষ্ঠে হাতকড়া পরাইলেন এবং জমাদার ভানুপ্রতাপ সিং সেই সময়ে তাহার বিরাট গালপাট্টা ও চোগোঁফা লইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল।

৮

ব্যোমকেশ হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট রয়েছে মাত্র। অতএব চটপট আমার কৈফিয়ৎ দাখিল করে স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করব।'

বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারীর অ্যারেস্টের ফলে শহরে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, বলাই বাহুল্য। ব্যোমকেশই যে এই অঘটন সম্ভব করিয়াছে তাহাও কি জানি কেমন করিয়া চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। শশাঙ্কবাবু প্রীতি ও সন্তোষের ভাব চেষ্টা করিয়াও আর রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাই আমরা আর অযথা বিলম্ব না করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই মনস্থ করিয়াছিলাম।

কৈলাসবাবু তাঁহার পূর্বতন বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার শয়নকক্ষে বিদায়ের পূর্বে আমরা সমবেত হইয়াছিলাম। শশাঙ্কবাবু, বরদাবাবু, অমূল্যবাবু উপস্থিত ছিলেন; কৈলাসবাবু শয্যায় অর্ধশয়ান থাকিয়া মুখে অনভ্যস্ত প্রসন্নতা আনিবার চেষ্টা করিতে-ছিলেন। পুত্রের উপর মিথ্যা সন্দেহ করিয়া তিনি যে অনুতপ্ত হইয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।

তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'এখন বুঝতে পারছি ভূত নয় পিশাচ নয়—শৈলেনবাবু। উঃ—লোকটা কি ধড়িবাজ! মনে আছে—একবার এই ঘরে বসে 'ঐ—ঐ' করে চেঁচিয়ে উঠেছিল? আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। কিছুই দেখেনি—শুধু আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। সে নিজেই যে ভূত এটা যাতে আমরা কোন মতেই না বুঝতে পারি। যাহোক, ব্যোমকেশবাবু, এবার কৈফিয়ৎ পেশ করুন—আপনি বুঝলেন কি করে?'

সকলে উৎসুক নেত্রে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া আরম্ভ করিল, 'বরদাবাবু, আপনি কিছু মনে করবেন না, প্রেতযোনি সম্বন্ধে আমার মনটা গোড়া থেকেই নাস্তিক হয়ে ছিল। ভূত পিশাচ আছে কিনা এ প্রশ্ন আমি তুলছি না; কিন্তু যিনি কৈলাসবাবুকে দেখা দিচ্ছেন তিনি যে ভূত-প্রেত নন—জলজ্যান্ত মানুষ—এ সন্দেহ আমার শুরুতেই হয়েছিল। আমি নেহাৎ বস্তুতান্ত্রিক মানুষ, নিরেট বস্তু নিয়েই আমায় কারবার করতে হয়; তাই অতীন্দ্রিয় জিনিসকে আমি সচরাচর হিসেবের বাইরে রাখি।

'এখন মনে করুন, যদি ঐ ভূতটা সত্যিই মানুষ হয়, তবে সে কে এবং কেন এমন কাজ করছে—এ প্রশ্নটা স্বতঃই মনে আসে। একটা লোক খামকা ভূত সেজে বাড়ির লোককে ভয় দেখাচ্ছে কেন? এর একমাত্র উত্তর, সে বাড়ির লোককে বাড়িছাড়া করতে চায়। ভেবে দেখুন, এ ছাড়া আর অন্য কোন সদুত্তর থাকতে পারে না।

'বেশ। এখন প্রশ্ন উঠছে—কেন বাড়িছাড়া করতে চায়? নিশ্চয় তার কোন স্বার্থ আছে। কি সে স্বার্থ?

'আপনারা সকলেই জানেন, বৈকুণ্ঠবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর মূল্যবান হীরা জহরত কিছুই পাওয়া যায়নি। পুলিস সন্দেহ করে যে তিনি একটা কাঠের হাতবাক্সে তাঁর অমূল্য সম্পত্তি রাখতেন এবং তাঁর হত্যাকারী সেগুলো নিয়ে গিয়েছে। আমি কিন্তু এটা এত সহজে বিশ্বাস করতে পারিনি। 'ব্যয়কুণ্ঠ' বৈকুণ্ঠবাবুর চরিত্র যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় তিনি মূল্যবান হীরে-মুক্তো কাঠের বাক্সে ফেলে রাখবার লোক ছিলেন না। কোথায় যে তিনি সেগুলোকে রাখতেন তাই কেউ জানে না। অথচ এই ঘরেই সেগুলো থাকত।—প্রশ্ন—কোথায় থাকত?

'কিন্তু এ প্রশ্নটা এখন চাপা থাক। এই ভৌতিক উৎপাতের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ এই হতে পারে যে, বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী তাঁর জহরতগুলো নিয়ে যাবার সুযোগ পায়নি, অথচ কোথায় সেগুলো আছে তা সে জানে। তাই সে এ বাড়ির নূতন বাসিন্দাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে; যাতে সে নিরুপদ্রবে জিনিসগুলো সরাতে পারে।

'সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে ভূতই বৈকুণ্ঠবাবুর হত্যাকারী।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়েকে প্রশ্ন করে আমার দুটো বিষয়ে খট্কা লেগেছিল। প্রথম, তিনি সে-রাত্রে কোন শব্দ শুনতে পাননি। এটা আমার অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তিনি এই ঘরের নীচের ঘরেই শুতেন, অথচ তাঁর বাপকে গলা টিপে মারবার সময় যে ভীষণ ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার শব্দ কিছুই শুনতে পাননি। আততায়ী বৈকুণ্ঠবাবুর গলা টিপে কোথায় তিনি হীরে জহরত রাখেন সে-খবর বার করে নিয়েছিল—অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে বাক্য-বিনিময় হয়েছিল। হয়তো বৈকুণ্ঠবাবু চীৎকারও করেছিলেন—অথচ তাঁর মেয়ে কিছুই শুনতে পাননি। এ কি সম্ভব?

'দ্বিতীয় কথা, বাপের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি গয়ায় পিণ্ড দিতে অনিচ্ছুক। আসল কথা তিনি জানেন তাঁর বাপ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়নি, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রেতযোনি যে কে তাও সম্ভবতঃ তিনি জানেন। নচেৎ একজন অল্পশিক্ষিত স্ত্রীলোক জেনেশুনে বাপের পারলৌকিক ক্রিয়া করবে না—এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে সম্বন্ধে অনেকগুলো সম্ভাবনার অবকাশ রয়েছে—সবগুলো তলিয়ে দেখার দরকার নেই। তার মধ্যে প্রধান এই যে, তিনি জানেন কে হত্যা করেছে এবং তাকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন। স্ত্রীলোকের এমন কে আত্মীয় থাকতে পারে যে বাপের চেয়েও প্রিয়? উত্তর নিষ্প্রয়োজন। বৈকুণ্ঠবাবুর মেয়ে যে সুচরিত্রা সে খবর আমি প্রথম দিনই পেয়েছিলুম। সুতরাং স্বামী ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

'বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই যে হত্যাকারী তার আর একটা ইঙ্গিত গোড়াগুড়ি পেয়েছিলুম। প্রেতাত্মাটা পনেরো হাত লম্বা, দোতলার জানালা দিয়ে অবলীলাক্রমে উঁকি মারে। সহজ মানুষের পক্ষে এটা কি করে সম্ভব হয়? মইও ব্যবহার করে না—মই ঘাড়ে করে অত শীঘ্র অন্তর্ধান সম্ভব নয়। তবে? এর উত্তর—রণ-পা। নাম শুনেছেন নিশ্চয়। দুটো লম্বা লাঠি, তার ওপর চড়ে সেকালে ডাকাতেরা বিশ-ত্রিশ ক্রোশ দূরে ডাকাতি করে আবার রাতারাতি ফিরে আসত। বর্তমান কালে সার্কাসে রণ-পা চড়ে অনেক খেলোয়াড় খেলা দেখায়। রীতিমত অভ্যাস না থাকলে কেউ রণ-পা চড়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না। কাজেই হত্যাকারী যে সার্কাস-সম্পর্কিত লোক হতে পারে এ অনুমান নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় নয়। বৈকুণ্ঠবাবুর বয়াটে জামাই সার্কাসদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, নিশ্চয় ভাল খেলোয়াড়—সুতরাং অনুমানটা আপনা থেকেই দৃঢ় হয়ে ওঠে।

'কিন্তু সবাই জানে জামাই দেশে নেই—আট বছর নিরুদ্দেশ। সে হঠাৎ এসে জুটল কোথা থেকে?

'সেদিন এই বাড়ির আঁস্তাকুড়ে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একটা কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। অনেকদিনের জীর্ণ একটা সার্কাসের ইস্তাহার, তাতে আবার সিংহের ছবি তখনো সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। তার উল্টো পিঠে হাতের অক্ষরে কয়েকটা বাংলা শব্দ লেখা ছিল। মনে হয় যেন কেউ চিঠির কাগজের অভাবে এই ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছে। চিঠির কথাগুলো অসংলগ্ন, তবু তা থেকে একটা অর্থ উদ্ধার করা যায় যে স্বামী অর্থাভাবে পড়ে স্ত্রীর কাছে টাকা চাইছে। অজিত, তুমি যে শব্দটা 'স্বাথী' পড়েছিলে সেটা প্রকৃতপক্ষে 'স্বামী'।

'বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সুদূর প্রবাস থেকে অর্থাভাবে মরীয়া হয়ে স্ত্রীকে চিঠি লিখেছিল। বলা বাহুল্য, অর্থ সাহায্য সে পায়নি। বৈকুণ্ঠবাবু একটা লক্ষ্মীছাড়া পত্নীত্যাগী জামাইকে টাকা দেবেন একথা বিশ্বাস্য নয়।

'এই গেল বছরখানেক আগেকার ঘটনা। দু'বছরের মধ্যে এ শহরে কোনো সার্কাস পার্টি আসেনি; অতএব বুঝতে হবে যে প্রবাস থেকেই স্বামী এই চিঠি লিখেছিলেন এবং তখনো তিনি সার্কাসের দলে ছিলেন—সাদা কাগজের অভাবে ইস্তাহারের পিঠে চিঠি লিখেছিলেন।

'কয়েকমাস পরে স্বামী একদা মুঙ্গেরে এসে হাজির হলেন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে টাকা যোগাড় করেছিলেন জানি না; তিনি এসে স্বাস্থ্যান্বেষী ভদ্রলোকের মত বাস করতে

লাগলেন। মুঙ্গেরে কেউ তাঁকে চেনে না—তাঁর বাড়ি যশোরে আর বিয়ে হয়েছিল নবদ্বীপে; —তাই বৈকুণ্ঠবাবুর জামাই বলে ধরা পড়বার ভয় তাঁর ছিল না।

'বৈকুণ্ঠবাবু বোধ হয় জামাইয়ের আগমনবার্তা শেষ পর্যন্ত জানতেই পারেননি, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। জামাইটি কিন্তু আড়ালে থেকে শ্বশুর সম্বন্ধে সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে তৈরী হলেন; শ্বশুর যখন স্বেচ্ছায় কিছু দেবেন না তখন জোর করেই তাঁর উত্তরাধিকারী হবার সংকল্প করলেন।

'তারপর সেই রাত্রে তিনি রণ-পায়ে চড়ে শ্বশুরবাড়ি গেলেন, জানালা দিয়ে একেবারে শ্বশুরমশায়ের শোবার ঘরে অবতীর্ণ হলেন। এই আকস্মিক আবির্ভাবে শ্বশুর বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন, জামাই কিন্তু নাছোড়বান্দা। কথায় বলে জামাতা দশম গ্রহ। বাবাজী প্রথমে শ্বশুরের গলা টিপে তাঁর হীরা জহরতের গুপ্তস্থান জেনে নিলেন, তারপর তাঁকে নিপাত করে ফেললেন। তিনি বেঁচে থাকলে অনেক ঝঞ্ঝাট, তাই তাঁকে শেষ করে ফেলবার জন্যেই জামাই তৈরী হয়ে এসেছিলেন।

'কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে হীরা জহরতগুলো আত্মসাৎ করবার ফুরসৎ হল না। ইতিমধ্যে নীচে স্ত্রীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, তিনি এসে দোর ঠেলাঠেলি করছিলেন।

'তাড়াতাড়ি জামাইবাবু একটিমাত্র জহরত বার করে নিয়ে সে-রাত্রির মত প্রস্থান করলেন। বাকিগুলো যথাস্থানেই রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু জহরতগুলি রাখতেন বড় অদ্ভুত জায়গায় অর্থাৎ ঘরের দেয়ালে। দেয়ালের চূণ-সুরকি খুঁড়ে সামান্য গর্ত করে, তাতেই মণিটা রেখে, আবার চূণ দিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতেন। তাঁর পানের বাটায় যথেষ্ট চূণ থাকত, কোন হাঙ্গামা ছিল না। বার করবার প্রয়োজন হলে কানখুস্কির সাহায্যে চূণ খুঁড়ে বার করে নিতেন।

'জামাইবাবু একটি জহরত দেয়াল থেকে বার করে নিয়ে যাবার আগে গর্তটা তাড়াতাড়ি চূণ দিয়ে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না, তাঁর বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ চূণের ওপর আঁকা রয়ে গেল।

'বৈকুণ্ঠবাবু তাঁর মণি-মুক্তা কোথায় রাখেন, এ প্রশ্নটা প্রথমে আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর সেদিন এঘরে পায়চারি করতে করতে যখন ঐ আঙুলের টিপ চোখে পড়ল, তখন এক মুহূর্তে সমস্ত বুঝতে পারলুম। এই ঘরের দেয়ালে যত্রতত্র চূণের প্রলেপের আড়ালে আড়াই লক্ষ টাকার জহরত লুকানো আছে। এমনভাবে লুকোনো আছে যে খুব ভাল করে দেয়ালে পরীক্ষা না করলে কেউ ধরতে পারবে না। শশাঙ্ক, তোমাকে মেহনৎ করে এই পঞ্চাশটি জহরত বার করতে হবে। আমার আর সময় নেই, নইলে আমিই বার করে দিতুম। তবু পেন্সিল দিয়ে দেয়ালে ঢ্যারা দিয়ে রেখেছি, তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

'যাক। তাহলে আমরা জানতে পারলুম যে, জামাই বৈকুণ্ঠবাবুকে খুন করে একটা জহরত নিয়ে গেছে। এবং অন্যগুলো হস্তগত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু জামাই লোকটা কে? নিশ্চয় সে এই শহরেই থাকে এবং সম্ভবতঃ আমাদের পরিচিত। তার আঙুলের ছাপ আমরা পেয়েছি বটে কিন্তু কেবলমাত্র আঙুলের ছাপ দেখে শহরসুদ্ধ লোকের ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে বার করা যায় না। তবে উপায়?'

'সেদিন প্ল্যানচেট টেবিলে সুযোগ পেলুম। টেবিলে ভূতের আবির্ভাব হল। আমি বুঝলুম আমাদেরই মধ্যে একজন টেবিল নাড়ছেন এবং তিনিই হত্যাকারী; ভূতের কথাগুলোই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। একটা ছুতো করে আমি আপনাদের সকলের হাত পরীক্ষা করে দেখলুম। শৈলেনবাবুর সঙ্গে আঙুলের দাগ মিলে গেল।

'সুতরাং শৈলেনবাবুই যে হত্যাকারী তাতে আর সন্দেহ রইল না। আপনাদেরও বোধহয় আর সন্দেহ নেই। বরদাবাবুর শিষ্য হবে শৈলেনবাবুর কাজ হাসিল করবার খুব সুবিধা হয়েছিল। লোকটি বাইরে বেশ নিরীহ আর মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বাঘের মত ক্রূর আর নিষ্ঠুর। দয়ামায়ার স্থান ওর হৃদয়ে নেই।'

ব্যোমকেশ চুপ করিল। সকলে কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তারপর অমূল্যবাবু প্রকাণ্ড একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আঃ—বাঁচলুম। ব্যোমকেশবাবু, আর কিছু না হোক বরদার ভূতের হাত থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন। যে রকম করে তুলোছিল—আর একটু হলে আমিও ভূতে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলাম আর কি; আপনি বরদার ভূতের রোজা, আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।'

সকলে হাসিলেন। বরদাবাবু বিড়বিড় করিয়া গলার মধ্যে কি বলিলেন; শুনিয়া অমূল্যবাবু বলিলেন, 'ওটা কি বললে? সংস্কৃত বুলি আওড়াচ্ছ মনে হল।'

বরদাবাবু বলিলেন, 'মৌক্তিকং ন গজে গজে। একটা হাতীর মাথায় গজমুক্তা পাওয়া গেল না বলে গজমুক্তা নেই একথা সিদ্ধ হয় না।'

অমূল্যবাবু বলিলেন, 'গজের মাথায় কি আছে কখনো তল্লাস করিনি, কিন্তু তোমার মাথায় যা আছে তা আমরা সবাই জানি।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সতেরো মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এবার তাহলে উঠলুম—নমস্কার। তারাশঙ্করবাবুর কাছে আগেই বিদায় নিয়ে এসেছি—মহাপ্রাণ লোক। তাঁকে আবার আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাবেন। এস অজিত।'

# চিত্রচোর

## ১

কাচের পেয়ালায় ডালিমের রস লইয়া সত্যবতী ব্যোমকেশের চেয়ারের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'নাও, এটুকু খেয়ে ফেল।'

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বেলা ঠিক চারিটা। সত্যবতীর সময়ের নড়চড় হয় না।

ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতেছিল, কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে পেয়ালার পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল, 'রোজ রোজ ডালিমের রস খাব কেন?'

সত্যবতী বলিল, 'ডাক্তারের হুকুম।'

ব্যোমকেশ ভ্রূকুটিকুটিল মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, 'ডাক্তারের নিকুচি করেছে। ও খেতে আমার ভাল লাগে না। কি হবে খেয়ে?'

সত্যবতী বলিল, 'গায়ে রক্ত হবে। লক্ষ্মীটি, খেয়ে ফেল।'

ব্যোমকেশ চকিতে একবার সত্যবতীর মুখের পানে দৃষ্টিপাত করিল, প্রশ্ন করিল, 'আজ রাত্তিরে কি খেতে দেবে?'

সত্যবতী বলিল, 'মুর্গীর সুরুয়া আর টোস্ট।'

ব্যোমকেশের ভ্রূকুটি গভীর হইল, 'হুঁ, সুরুয়া।—আর মুর্গীটা খাবে কে?'

সত্যবতী মুখ টিপিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো।'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'শুধু ঠাকুরপো নয়, তোমার অর্ধাঙ্গিনীও ভাগ পাবেন।'

ব্যোমকেশ আমার পানে একবার চোখ পাকাইয়া তাকাইল, তারপর বিকৃত মুখে ডালিমের রসটুকু খাইয়া ফেলিল।

কয়েকদিন হইল ব্যোমকেশকে লইয়া সাঁওতাল পরগণার একটি শহরে হাওয়া বদলাইতে আসিয়াছি। কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল; দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানির পর তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি। রোগীর সেবা করিয়া সত্যবতী কাঠির মত রোগা হইয়া গিয়াছিল, আমার অবস্থাও কাহিল হইয়াছিল। তাই ডাক্তারের পরামর্শে পৌষের গোড়ার দিকে সাঁওতাল পরগণার প্রাণপ্রদ জলহাওয়ার সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখানে আসিয়া ফলও মন্ত্রের মত হইয়াছে। আমার ও সত্যবতীর শরীর তো চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছেই, ব্যোমকেশের শরীরেও দ্রুত রক্তসঞ্চার হইতেছে এবং অসম্ভব রকম ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়াছে। দীর্ঘ রোগভোগের পর তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ন্যায় হইয়া গিয়াছে; সে দিবারাত্র খাই-খাই করিতেছে। আমরা দু'জনে অতি কষ্টে তাহাকে সামলাইয়া রাখিয়াছি।

এখানে আসিয়া অবধি মাত্র দুই জন ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। এক, অধ্যাপক আদিনাথ সোম; তাঁহার বাড়ির নীচের তলাটা আমরা ভাড়া লইয়াছি। দ্বিতীয়, এখানকার স্থানীয় ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক। রোগী সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, তাই সর্বাগ্রে ডাক্তারের সহিত পরিচয় করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে হইয়াছে।

শহরে আরও অনেকগুলি বাঙালী আছেন কিন্তু কাহারও সহিত এখনও আলাপের সুযোগ হয় নাই। এ কয়দিন বাড়ির বাহির হইতে পারি নাই, নূতন স্থানে আসিয়া গোছগাছ করিয়া বসিতেই দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ প্রথম সুযোগ হইয়াছে; শহরের একটি গণ্যমান্য বাঙালীর বাড়িতে চা-পানের নিমন্ত্রণ আছে। আমরা যদিও এখানে আসিয়া নিজেদের জাহির করিতে চাহি নাই, তবু কাঁঠালী চাঁপার সুগন্ধের মত ব্যোমকেশের আগমন-বার্তা শহরে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে চায়ের নিমন্ত্রণ আসিয়াছে।

ব্যোমকেশকে এত শীঘ্র চায়ের পার্টিতে লইয়া যাইবার ইচ্ছা আমাদের ছিল না; কিন্তু

দীর্ঘকাল ঘরে বন্ধ থাকিয়া সে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে; ডাক্তারও ছাড়পত্র দিয়াছেন। সুতরাং যাওয়াই স্থির হইয়াছে।

আরাম-কেদারায় বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশ উসখুস করিতেছিল এবং বারবার ঘড়ির পানে তাকাইতেছিল। আমি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া অলসভাবে সিগারেট টানিতেছিলাম; সাঁওতাল পরগণার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখানে শুষ্কতার সহিত শ্যামলতার, প্রাচুর্যের সহিত রিক্ততার নিবিড় মিলন ঘটিয়াছে; মানুষের সংস্পর্শ এখানকার কঙ্করময় মাটিকে গলিত পঙ্কিল করিয়া তুলিতে পারে নাই।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'রিক্‌শা কখন আসতে বলেছ?'

বলিলাম, 'সাড়ে চারটে।'

ব্যোমকেশ আর একবার ঘড়ির পানে তাকাইয়া পুস্তকের দিকে চোখ নামাইল। বুঝিলাম ঘড়ির কাঁটার মন্থর আবর্তন তাহাকে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। হাসিয়া বলিলাম, 'রাই ধৈর্যং রহু ধৈর্যং—।'

ব্যোমকেশ খিঁচাইয়া উঠিল, 'লজ্জা করে না! আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেট খাচ্ছ।'

অর্ধদগ্ধ সিগারেট জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। ব্যোমকেশ এখনও সিগারেট খাইবার অনুমতি পায় নাই; সত্যবতী কঠিন দিব্য দিয়াছে—তাহার অনুমতি না পাইয়া সিগারেট খাইলে মাথা খাইবে, মরা মুখ দেখিবে। আমিও ব্যোমকেশের সম্মুখে সিগারেট খাইতাম না; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নেশাখোরকে লোভ দেখানোর মত পাপ আর নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হইয়া যাইত।

## ২

ঠিক সাড়ে চারিটার সময় বাড়ির সদরে দুইটি সাইকেল-রিক্‌শা আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম; সত্যবতীও ইতিমধ্যে সাজপোশাক করিয়া লইয়াছিল। আমরা বাহির হইলাম।

আমাদের বাড়ির একতলার সহিত দোতলার কোনও যোগ ছিল না, সদরের খোলা বারান্দার ওপাশ হইতে উপরের সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছিল। বাড়ির সম্মুখে খানিকটা মুক্ত স্থান, তারপর ফটক। বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক সোম বিরক্তগম্ভীর মুখে ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

অধ্যাপক সোমের বয়স বোধ করি চল্লিশের কাছাকাছি, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া ত্রিশের বেশী বয়স মনে হয় না; তাঁহার আচার-ব্যবহারেও প্রৌঢ়ত্বের ছাপ নাই। সব কাজেই চটপটে উৎসাহশীল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি কাঁটা ছিল. সেটি তাঁর স্ত্রী! দাম্পত্য জীবনে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

প্রোফেসর সোম বাহিরে যাইবার উপযোগী সাজগোজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, আমাদের দেখিয়া করুণ হাসিলেন। তিনিও চায়ের নিমন্ত্রণে যাইবেন জানিতাম, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাঁড়িয়ে যে! যাবেন না?'

প্রোফেসর সোম একবার নিজের বাড়ির দ্বিতলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'যাব। কিন্তু গিন্নীর এখনও প্রসাধন শেষ হয়নি। আপনারা এগোন।'

আমরা রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী একটাতে বসিল, অন্যটাতে আমি একা। ঘণ্টি বাজাইয়া মনুষ্য-চালিত ত্রিচক্র-যান ছাড়িয়া দিল। ব্যোমকেশের মুখে হাসি ফুটিল। সত্যবতী সযত্নে তাহার গায়ে শাল জড়াইয়া দিল। অতর্কিতে ঠাণ্ডা লাগিয়া না যায়।

কাঁকর-ঢাকা উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়া দুই দিক দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। রাস্তার

দু'ধারে ঘরবাড়ির ভিড় নাই, এখানে একটা ওখানে একটা। শহরটি যেন হাত-পা ছড়াইয়া অসমতল পাহাড়তলির উপর অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছে, গাদাগাদি ঠেসাঠেসি নাই। আয়তনে বিস্তৃত হইলেও নগরের জনসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু সমৃদ্ধি আছে। আশেপাশে কয়েকটি অভ্রের খনি এখানকার সমৃদ্ধির প্রধান সূত্র। আদালত আছে, ব্যাঙ্ক আছে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যাঁরা গণ্যমান্য তাঁরা প্রায় সকলেই বাঙালী।

যিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার নাম মহীধর চৌধুরী। অধ্যাপক সোমের কাছে শুনিয়াছি ভদ্রলোক প্রচুর বিত্তশালী; বয়সে প্রবীণ হইলেও সর্বদাই নানাপ্রকার হুজুগ লইয়া আছেন; অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত। তাঁহার প্রযোজনায় চড়ুইভাতি, শিকার, খেলাধুলা লাগিয়াই আছে।

মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রায় দশ বিঘা জমি পাথরের পাঁচিল দিয়া ঘেরা, হঠাৎ দুর্গ বলিয়া ভ্রম হয়। ভিতরে রকমারি গাছপালা, মরসুমী ফুলের কেয়ারি, উঁচু-নীচু পাথুরে জমির উপর কোথাও লাল-মাছেব বাঁধানো সরোবর, কোথাও নিভৃত বেতসকুঞ্জ, কোথাও বা কৃত্রিম ক্রীড়াশৈল। সাজানো বাগান দেখিয়া সহসা বনানীর বিভ্রম উপস্থিত হয়। মহীধরবাবু যে ধনবান তাহা তাঁহার বাগান দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বাড়ির সম্মুখে ছাঁটা ঘাসের সমতল টেনিস কোর্ট, তাহার উপর টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার স্থান হইয়াছে, শীতের বৈকালী রৌদ্র স্থানটিকে আতপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর দোতলা বাড়িটি যেন এই দৃশ্যের পশ্চাৎপট রচনা করিয়াছে। আমরা উপস্থিত হইলে মহীধরবাবু সাদরে আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। ভদ্রলোকের দেহায়তন বিপুল, গৌরবর্ণ দেহ, মাথায় সাদা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, দাড়িগোঁফ কামানো গাল দু'টি চালতার মত, মুখে ফুটিফাটা হাসি। দেখিলেই মনে হয় অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক।

তিনি তাঁহার মেয়ে রজনীর সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটির বয়স কুড়ি-একুশ, সুশ্রী গৌরাঙ্গী হাস্যমুখী; ভাসা-ভাসা চোখ দু'টিতে বুদ্ধি ও কৌতুকের খেলা। মহীধরবাবু বিপত্নীক, এই মেয়েটি তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল এবং উত্তরাধিকারিণী।

রজনী মুহূর্তমধ্যে সত্যবতীর সহিত ভাব করিয়া ফেলিল এবং তাহাকে লইয়া দূরের একটা সোফাতে বসাইয়া গল্প জুড়িয়া দিল। আমরাও বসিলাম। অতিথিরা এখনও সকলে আসিয়া উপস্থিত হন নাই, কেবল ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক ও আর একটি ভদ্রলোক আসিয়াছেন। ডাক্তার ঘটক আমাদের পরিচিত, পূর্বেই বলিয়াছি; অন্য ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। এঁর নাম নকুলেশ সরকার; শহরের একজন মধ্যম শ্রেণীর ব্যবসাদার তা ছাড়া ফটোগ্রাফির দোকান আছে। ফটোগ্রাফি করেন শখের জন্য, উপরন্তু এই সূত্রে কিছু-কিঞ্চিৎ উপার্জন হয়। শহরে অন্য ফটোগ্রাফার নাই।

সাধারণভাবে কথাবার্তা হইতে লাগিল। মহীধরবাবু এক সময় ডাক্তার ঘটককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'ওহে ঘোটক, তুমি অ্যাদ্দিনেও ব্যোমকেশবাবুকে চাঙ্গা করে তুলতে পারলে না! তুমি দেখছি নামেও ঘোটক কাজেও ঘোটক—একেবারে ঘোড়ার ডাক্তার!' বলিয়া নিজের রসিকতায় হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

নকুলেশবাবু ফোড়ন দিয়া বলিলেন, 'ঘোড়ার ডাক্তার না হয়ে উপায় আছে? একে অশ্বিনী তায় ঘোটক।'

ডাক্তার ইঁহাদের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, সে একটু হাসিয়া রসিকতা হজম করিল। ডাক্তারকে লইয়া অনেকেই রঙ্গ-রসিকতা করে দেখিলাম, কিন্তু তাহার চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধে সকলেই শ্রদ্ধাশীল। শহরে আরও কয়েকজন প্রবীণ চিকিৎসক আছেন, কিন্তু এই তরুণ সংস্বভাব ডাক্তারটি মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে বেশ পসার জমাইয়া তুলিয়াছে।

ক্রমে অন্যান্য অতিথিরা আসিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে আসিলেন সস্ত্রীক সপুত্র

উষানাথ ঘোষ। ইনি একজন ডেপুটি, এখানকার সরকারী মালখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। লম্বা-চওড়া চেহারা, খসখসে কালো রঙ, চোখে কালো কাচের চশমা। বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, গম্ভীরভাবে থামিয়া থামিয়া কথা বলেন, গম্ভীরভাবে হাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চেহারা রুগ্ন, মুখে উৎকণ্ঠার ভাব, থাকিয়া থাকিয়া স্বামীর মুখের পানে উদ্বিগ্ন চক্ষে দৃষ্টিপাত করেন। ছেলেটি বছর পাঁচেকের; তাহাকে দেখিয়াও মনে হয় যেন সর্বদা শঙ্কিত সঙ্কুচিত হইয়া আছে। উষানাথবাবু সম্ভবতঃ নিজের পরিবারবর্গকে কঠিন শাসনে রাখেন, তাঁহার সম্মুখে কেহ মাথা তুলিয়া কথা বলিতে পারে না।

মহীধরবাবু আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলে তিনি গম্ভীর মুখে গলার মধ্যে দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন; বোধ হয় তাহা লৌকিক সম্ভাষণ, কিন্তু আমরা কিছু শুনিতে পাইলাম না। তাঁহার চক্ষু দুইটি কালো কাচের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া রহিল। একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। যাহার চোখ দেখিতে পাইতেছি না এমন লোকের সঙ্গে কথা কহিয়া সুখ নাই।

তারপর আসিলেন পুলিসের ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডে। ইনি বাঙালী নন, কিন্তু পরিষ্কার বাংলা বলেন; বাঙালীর সহিত মেলামেশা করিতেও ভালবাসেন। লোকটি সুপুরুষ, পুলিসের সাজ-পোশাকে দিব্য মানাইয়াছে। ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, 'আপনি এসেছেন, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য একটি জটিল রহস্য দিয়ে যে আপনাকে সংবর্ধনা করব তার উপায় নেই। আমাদের এলাকায় রহস্য জিনিসটার একান্ত অভাব। সব খোলাখুলি। চুরি বাটপাড়ি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তাতে বুদ্ধি খেলাবার অবকাশ নেই।'

ব্যোমকেশও হাসিয়া বলিল, 'সেটা আমার পক্ষে ভালই। জটিল রহস্য এবং আরও অনেক লোভনীয় বস্তু থেকে আমি উপস্থিত বঞ্চিত। ডাক্তারের বারণ।'

এই সময় আর একজন অতিথি দেখা দিলেন। ইনি স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। কৃশ ব্যক্তিত্বহীন চেহারা, তাই বোধ করি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রাখিয়া চেহারায় একটু বৈশিষ্ট্য দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বয়স যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি একটা অনির্দিষ্ট স্থানে।

মহীধরবাবু বলিলেন, 'অমরেশবাবু, আপনি ব্যোমকেশবাবুকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলেন—এই নিন।'

অমরেশবাবু নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'কীর্তিমান পুরুষকে দেখবার ইচ্ছা কার না হয়? আপনারাও কম ব্যস্ত হননি, শুধু আমাকে দোষ দিলে চলবে কেন?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কিন্তু আজ আসতে বড় দেরী করেছেন। সকলেই এসে গেছেন, কেবল প্রোফেসর সোম বাকি। তা তাঁর না হয় একটা ওজুহাত আছে। মেয়েদের সাজসজ্জা করতে একটু দেরী হয়। আপনার সে ওজুহাতও নেই। ব্যাঙ্ক তো সাড়ে তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে।'

অমরেশ রাহা বলিলেন, 'তাড়াতাড়ি আসব ভেবেছিলাম। কিন্তু বড়দিন এসে পড়ল, এখন কাজের চাপ একটু বেশী। বছর ফুরিয়ে আসছে। নূতন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তো আপনারা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনতে আরম্ভ করবেন। তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে তো।'

ইতিমধ্যে কয়েকজন ভৃত্য বাড়ির ভিতর হইতে বড় বড় ট্রেতে করিয়া নানাবিধ খাদ্য-পানীয় আনিয়া টেবিলগুলির উপর রাখিতেছিল; চা, কেক্, সন্দেশ, পাঁপরভাজা, ডালমুট ইত্যাদি। রজনী উঠিয়া গিয়া খাবারের প্লেটগুলি পরিবেশন করিতে লাগিল। কেহ কেহ নিজেই গিয়া প্লেট তুলিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসি গল্প আলাপ-আলোচনা চলিল।

রজনী মিষ্টান্নের একটি প্লেট লইয়া ব্যোমকেশের সম্মুখে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, একটু জলযোগ।'

ব্যোমকেশ আড়চোখে একবার সত্যবতীর দিকে তাকাইল, দেখিল সত্যবতী দূর হইতে

একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘাড় চুলকাইয়া বলিল, 'আমাকে মাপ করতে হবে। এসব আমার চলবে না।'

মহীধরবাবু ঘুরিয়া ফিরিয়া খাওয়া তদারক করিতেছিলেন, বলিলেন, 'সে কি কথা! একেবারেই চলবে না? একটু কিছু—? ওহে ডাক্তার, তোমার রোগীর কি কিছুই খাবার হুকুম নেই?'

ডাক্তার টেবিলের নিকট দাঁড়াইয়া এক মুঠি ডালমুট মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিল, বলিল, 'না খেলেই ভাল।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, 'শুনলেন তো! আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দিন। ভাববেন না, আবার আমরা আসব; আজকের আসাটা মুখবন্ধ মাত্র।'

মহীধরবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'আমার বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা কেউ না কেউ পায়ের ধুলো দেন। আপনারাও যদি মাঝে মাঝে আসেন সান্ধ্য-বৈঠক জমবে ভাল।'

এতক্ষণে অধ্যাপক সোম সস্ত্রীক আসিয়া পৌঁছিলেন। সোমের একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব। বস্তুত লজ্জা না হওয়াই আশ্চর্য। সোম-পত্নী মালতী দেবীর বর্ণনা আমরা এখনও দিই নাই, কিন্তু আর না দিলে নয়। বয়সে তিনি স্বামীর প্রায় সমকক্ষ; কালো মোটা শরীর, থলথলে গড়ন, ভাঁটার মত চক্ষু সর্বদাই গর্বিতভাবে ঘুরিতেছে; মুখশ্রী দেখিয়া কেহ মুগ্ধ হইবে সে সম্ভাবনা নাই। উপরন্তু তিনি সাজ-পোশাক করিয়া থাকিতে ভালবাসেন। আজ যেরূপ সর্বালংকার ভূষিতা হইয়া চায়ের জলসায় আসিয়াছেন তাহাতে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরা-দেরও চমক লাগিবার কথা। পরিধানে ডগ্‌ডগে লাল মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী, তার উপর সর্বাঙ্গে হীরা-জহরতের গহনা। তাঁহার পাশে সোমের কুণ্ঠিত ম্রিয়মাণ মূর্তি দেখিয়া আমাদেরই লজ্জা করিতে লাগিল।

রজনী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিল, কিন্তু মালতী দেবীর মুখে হাসি ফুটিল না। তিনি বক্রচক্ষে রজনীর মুখ হইতে স্বামীর মুখ পর্যন্ত দৃষ্টির একটি কশাঘাত করিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল। ব্যোমকেশ মুখে শহীদের ন্যায় ভাবব্যঞ্জনা ফুটাইয়া চুমুক দিয়া দিয়া চা খাইতেছে; আমি নকুলেশবাবুর সহিত আলাপ করিতে করিতে পানাহার করিতেছি; ঊষানাথবাবু গম্ভীরমুখে পুরন্দর পাণ্ডের কথা শুনিতে শুনিতে ঘাড় নাড়িতে-ছেন; তাঁহার ছেলেটি লুব্ধভাবে খাবারের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইয়া শঙ্কিত-মুখে আবার ফিরিয়া আসিতেছে; তাহার মা খাবারের একটি প্লেট হাতে ধরিয়া পর্যায়ক্রমে ছেলে ও স্বামীর দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

এই সময় বাক্যালাপের মিলিত কলস্বরের মধ্যে মহীধরবাবুর ঈষদুচ্চ কণ্ঠ শোনা গেল 'মিস্টার পাণ্ডে খানিক আগে বলছিলেন যে আমাদের এলাকায় জটিল রহস্যের একান্ত অভাব। এ কথা কতদূর সত্য আপনারাই বিচার করুন। কাল রাত্রে আমার বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।'

স্বরগুঞ্জন নীরব হইল; সকলের দৃষ্টি গিয়া পড়িল মহীধরবাবুর উপর। তিনি হাস্যবিকশিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, যেন সংবাদটা ভারি কৌতুকপ্রদ।

অমরেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিছু চুরি গেছে নাকি?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'সেইটেই জটিল রহস্য। ড্রয়িংরুমের দেয়াল থেকে একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ চুরি গেছে। রাত্রে কিছু জানতে পারিনি, সকালবেলা দেখলাম ছবি নেই; আর একটা জানালা খোলা রয়েছে।'

পুরন্দর পাণ্ডে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, 'ছবি! কোন্ ছবি?'

'একটা গ্রুপ-ফটোগ্রাফ। মাসখানেক আগে আমরা পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম, সেই সময় নকুলেশবাবু তুলেছিলেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ। আর কিছু চুরি করেনি? ঘরে দামী জিনিস কিছু ছিল?'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'কয়েকটা রূপোর ফুলদানী ছিল; তা ছাড়া পাশের ঘরে অনেক

রুপোর বাসন ছিল। চোর এসব কিছু না নিয়ে স্রেফ একটি ফটো নিয়ে পালাল। বলুন দেখি জটিল রহস্য কি না?'

পাণ্ডে তাচ্ছিল্যভরে হাসিয়া বলিলেন, 'জটিল রহস্য মনে করতে চান মনে করতে পারেন। আমার তো মনে হয় কোনও জংলী সাঁওতাল জানালা খোলা পেয়ে ঢুকেছিল, তারপর ছবির সোনালী ফ্রেমের লোভে ছবিটা নিয়ে গেছে।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ইহাদের সওয়াল জবাব শুনিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার চক্ষু অলস-ভাবে চারিদিকে ঘুরিতেছিল, সে এখন একটু সচেতন হইয়া বলিল, 'মিস্টার পাণ্ডে ঠিকই ধরেছেন মনে হয়। নকুলেশবাবু, আপনি ছবি তুলেছিলেন?'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ। ছবিখানা ভাল হয়েছিল। তিন কপি ছেপেছিলাম। তার মধ্যে এক কপি মহীধরবাবু নিয়েছিলেন—'

ঊষানাথবাবু গলা ঝাড়া দিয়া বলিলেন, 'আমিও একখানা কিনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার ছবিখানা আছে তো?'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'কি জানি। এল্‌বামে রেখেছিলাম, তারপর আর দেখিনি। আছে নিশ্চয়।'

'আর তৃতীয় ছবিটি কে নিয়েছিলেন নকুলেশবাবু?'

'প্রোফেসর সোম।'

আমরা সকলে সোমের পানে তাকাইলাম। তিনি এতক্ষণ নির্জীব ভাবে স্ত্রীর পাশে বসিয়াছিলেন, নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাঁহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল। সোম-গৃহিণীর কিন্তু কোন প্রকার ভাবান্তর দেখা গেল না; তিনি কষ্টিপাথরের যক্ষিণীমূর্তির ন্যায় অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার ছবিটা নিশ্চয় আছে!'

সোম উত্তপ্তমুখে বলিলেন, 'অ্যাঁ—তা—বোধ হয়—ঠিক বলতে পারি না—'

তাঁহার ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলাম। এমন কিছু গুরুতর বিষয় নয়, তিনি এমন অসম্বৃত হইয়া পড়িলেন কেন?

তাঁহাকে সঙ্কটাবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন অমরেশবাবু, হাসিয়া বলিলেন, 'তা গিয়ে থাকে যাক গে, আর একখানা নেবেন। নকুলেশবাবু, আমারও কিন্তু একখানা চাই। আমিও গ্রুপে ছিলাম।'

নকুলেশবাবু মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, 'ও ছবিটা আর পাওয়া যাবে না। নেগেটিভও খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সে কি! কোথায় গেল নেগেটিভ?'

দেখিলাম, ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নকুলেশবাবুর পানে চাহিয়া আছে। তিনি বলিলেন, 'আমার স্টুডিওতে অন্যান্য নেগেটিভের সঙ্গে ছিল। আমি দিন দুয়েকের জন্যে কলকাতা গিয়েছিলাম, স্টুডিও বন্ধ ছিল; ফিরে এসে আর সেটা খুঁজে পাচ্ছি না।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ভাল করে খুঁজে দেখবেন। নিশ্চয়ই কোথাও আছে, যাবে কোথায়!

এ প্রসঙ্গ লইয়া আর কোনও কথা হইল না। এদিকে সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা গাত্রোত্থানের উদ্যোগ করিলাম, কারণ সূর্যাস্তের পর ব্যোমকেশকে বাহিরে রাখা নিরাপদ নয়।

এই সময় দেখিলাম একটি প্রেতাকৃতি লোক কখন আসিয়া মহীধরবাবুর পাশে দাঁড়াইয়াছে এবং নিম্নস্বরে তাঁহার সহিত কথা কহিতেছে। লোকটি যে নিমন্ত্রিত অতিথি নয় তাহা তাহার বেশবাস দেখিয়াই অনুমান করা যায়। দীর্ঘ কঙ্কালসার দেহে আধ-ময়লা ধুতি ও সুতির কামিজ, চক্ষু এবং গণ্ডস্থল কোটরপ্রবিষ্ট, যেন মূর্তিমান দুর্ভিক্ষ। তবু লোকটি যে ভদ্রশ্রেণীর তাহা বোঝা যায়।

মহীধরবাবু আমার অনতিদূরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাই তাঁহাদের কথাবার্তা কানে আসিল। মহীধরবাবু একটু অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'আবার কি চাই বাপু? এই তো পরশু তোমাকে টাকা দিয়েছি।'

লোকটি ব্যগ্র-বিহ্বল স্বরে বলিল, 'আজ্ঞে, আমি টাকা চাই না। আপনার একটা ছবি এঁকেছি, তাই দেখাতে এনেছিলাম।'

'আমার ছবি!'

লোকটির হাতে এক তা পাকানো কাগজ ছিল, সে তাহা খুলিয়া মহীধরবাবুর চোখের সামনে ধরিল।

মহীধরবাবু সবিস্ময়ে ছবির পানে চাহিয়া রহিলেন। আমারও কৌতূহল হইয়াছিল, উঠিয়া গিয়া মহীধরবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

ছবি দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। সাদা কাগজের উপর ক্রেয়নের আঁকা ছবি, মহীধর-বাবুর বুক পর্যন্ত প্রতিকৃতি; পাকা হাতের নিঃসংশয় কয়েকটি রেখায় মহীধরবাবুর অবিকল চেহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমার দেখাদেখি রজনীও আসিয়া পিতার পিছনে দাঁড়াইল এবং ছবি দেখিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিল, 'বাঃ! কি সুন্দর ছবি!'

তখন আরও কয়েকজন আসিয়া জুটিলেন। ছবিখানা হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলের মুখেই প্রশংসা গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল। দুর্ভিক্ষপীড়িত চিত্রকর অদূরে দাঁড়াইয়া গদ্‌গদ মুখে দুই হাত ঘষিতে লাগিল।

মহীধরবাবু তাহাকে বলিলেন, 'তুমি তো খাসা ছবি আঁকতে পার। তোমার নাম কি?'

চিত্রকর বলিল, 'আজ্ঞে, আমার নাম ফাল্গুনী পাল।'

মহীধরবাবু পকেট হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রসন্ন স্বরে বলিলেন, 'বেশ বেশ। ছবিখানি আমি নিলাম। এই নাও তোমার পুরস্কার।'

ফাল্গুনী পাল কাঁকড়ার মত হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ নোট পকেটস্থ করিল।

পুরন্দর পাণ্ডে ললাট কুঞ্চিত করিয়া ছবিখানা দেখিতেছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলিয়া ফাল্গুনীকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি ওঁর ছবি আঁকলে কি করে? ফটো থেকে?'

ফাল্গুনী বলিল, 'আজ্ঞে, না। ওঁকে পরশুদিন একবার দেখেছিলাম—তাই—'

'একবার দেখেছিলে তাতেই ছবি এঁকে ফেললে?'

ফাল্গুনী আমতা আমতা করিয়া বলিল, 'আজ্ঞে, আমি পারি। আপনি যদি হুকুম দেন আপনার ছবি এঁকে দেব।'

পাণ্ডে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, বেশ। তুমি যদি আমার ছবি এঁকে আনতে পার, আমিও তোমাকে দশ টাকা বক্‌শিস দেব।'

ফাল্গুনী পাল সবিনয়ে সকলকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে ব্যোমকেশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'দেখা যাক। আমি ওঁদের পিক্‌নিক গ্রুপে ছিলাম না।'

ব্যোমকেশ অনুমোদনসূচক ঘাড় নাড়িল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল। মহীধরবাবুর মোটর আমাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিল। সোম-দম্পতিও আমাদের সঙ্গে ফিরিলেন।

৩

রাত্রি আন্দাজ আটটার সময় আমরা তিনজন বসিবার ঘরে দোরতাড়া বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম। নৈশ আহারের এখনও বিলম্ব আছে, ব্যোমকেশ আরাম-কেদারায় বসিয়া বলবর্ধক ডাক্তারি মদ্য চুমুক দিয়া পান করিতেছে; সত্যবতী তাহার পাশে একটা চেয়ারে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া বসিয়াছে। আমি সম্মুখে বসিয়া মাঝে মাঝে পকেট হইতে সিগারেটের

ডিবা বাহির করিতেছি, আবার রাখিয়া দিতেছি। ব্যোমকেশের গঞ্জনা খাইবার আর ইচ্ছা নাই। চায়ের জলসার আলোচনাই হইতেছে।

আমি বলিলাম, 'আমরা শিল্প-সাহিত্যের কত আদর করি ফাল্গুনী পাল তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। লোকটা সত্যিকার গুণী, অথচ পেটের দায়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে।'

ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক ছিল, বলিল, 'পেটেব দায়ে ভিক্ষে করছে তুমি জানলে কি করে?'

বলিলাম, 'ওর চেহারা আর কাপড়-চোপড় দেখে পেটের অবস্থা আন্দাজ করা শক্ত নয়।'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, 'শক্ত নয় বলেই তুমি ভুল আন্দাজ করেছ। তুমি সাহিত্যিক, শিল্পীর প্রতি তোমার সহানুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু ফাল্গুনী পালের শারীরিক দুর্গতির কারণ অন্নাভাব নয়। আসলে খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের প্রতি তার টান বেশী।'

'অর্থাৎ মাতাল? তুমি কি করে বুঝলে?'

'প্রথমত, তার ঠোঁট দেখে। মাতালের ঠোঁট যদি লক্ষ্য কর, দেখবে বৈশিষ্ট্য আছে: একটু ভিজে ভিজে, একটু শিথিল—ঠিক বোঝাতে পারব না, কিন্তু দেখলে বুঝতে পারি। দ্বিতীয়ত, ফাল্গুনী যদি ক্ষুধার্ত হত তাহলে খাদ্যদ্রব্যগুলোর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করত, টেবিলের উপর তখনও প্রচুর খাবার ছিল। কিন্তু ফাল্গুনী সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না। তৃতীয়ত, আমার পাশ দিয়ে যখন চলে গেল তখন তার গায়ে মদের গন্ধ পেলাম। খুব স্পষ্ট নয়, তবু মদের গন্ধ।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিজের বলবর্ধক ঔষধটি তুলিয়া লইয়া এক চুমুক পান করিল।

সত্যবতী বলিল, 'যাক গে, মাতালের কথা শুনতে ভাল লাগে না। কিন্তু ছবি চুরির এ কি ব্যাপার গা? আমি তো কিছু বুঝতেই পারলাম না। মিছিমিছি ছবি চুরি করবে কেন?'

ব্যোমকেশ কতকটা আপন মনেই বলিল, 'হয়তো পাণ্ডেসাহেব ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু—। যদি তা না হয় তাহলে ভাববার কথা।...পিক্‌নিকে গ্রুপ ছবি তোলা হয়েছিল। আজ চায়ের পার্টিতে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সকলেই পিক্‌নিকে ছিলেন—পাণ্ডে ছাড়া।...ছবির তিনটে কপি ছাপা হয়েছিল: তার মধ্যে একটা চুরি গেছে, বাকি দুটো আছে কিনা জানা যায়নি —নেগেটিভটাও পাওয়া যাচ্ছে না।—' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ ছাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ইনি ছবির কথায় এমন ঘাবড়ে গেলেন কেন বোঝা গেল না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর আমি বলিলাম, 'কেউ যদি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ছবিটা সরিয়ে থাকে তবে সে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উদ্দেশ্য কি একটা অজিত? কে কোন্ মতলবে ফিরছে তা কি এত সহজে ধরা যায়? গহনা কর্মণো গতিঃ। সেদিন একটা মার্কিন পত্রিকায় দেখেছিলাম, ওদের চিড়িয়াখানাতে এক বানর-দম্পতি আছে। পুরুষ বাঁদরটা এমনি হিংসুটে, কোনও পুরুষ-দর্শক খাঁচার কাছে এলেই বৌকে টেনে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখে।'

সত্যবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'তোমার যত সব আষাঢ়ে গল্প। বাঁদরের কখনও এত বুদ্ধি হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা বুদ্ধি নয়, হৃদয়াবেগ: সরল ভাষায় যৌন ঈর্ষা। মানুষের মধ্যেও যে ও-বস্তুটি আছে আশা করি তা অস্বীকার করবে না। পুরুষের মধ্যে তো আছেই, মেয়েদের মধ্যে আরও বেশী আছে। আমি যদি মহীধরবাবুর মেয়ে রজনীর সঙ্গে বেশী মাখামাখি করি তোমার ভাল লাগবে না।'

সত্যবতী র‍্যাপারের একটা প্রান্ত ঠোঁটের উপর ধরিয়া নত চক্ষে চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, 'কিন্তু এই ঈর্ষার সঙ্গে ছবি চুরির সম্বন্ধটা কি?'

'যেখানে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা আছে সেখানেই এ ধরনের ঈর্ষা থাকতে পারে।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বমুখে ছাদের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম, 'মোটিভ খুব জোরালো মনে হচ্ছে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য

থাকতে পারে না কি?'

'পারে। চিত্রকর ফাল্গুনী পাল চুরি করে থাকতে পারে। একটা মানুষকে একবার মাত্র দেখে সে ছবি আঁকতে পারে, তার এই দাবি সম্ভবতঃ মিথ্যে। ফটো দেখে ছবি সহজেই আঁকা যায়। ফাল্গুনী সকলের চোখে চমক লাগিয়ে দিয়ে বেশী টাকা রোজগার করবার চেষ্টা করছে কিনা কে জানে!'

'হুঁ। আর কিছু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশবাবু স্বয়ং ছবি চুরি করে থাকতে পারেন।'

'নকুলেশবাবুর স্বার্থ কি?'

'তাঁর ছবি আরও বিক্রি হবে এই স্বার্থ।' বলিয়া ব্যোমকেশ মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

'এটা সম্ভব বলে তোমার মনে হয়?'

'ব্যবসাদারের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। আমেরিকায় ফসলের দাম বাড়াবার জন্য ফসল পুড়িয়ে দেয়।'

'আচ্ছা। আর কেউ?'

'ঐ দলের মধ্যে হয়তো এমন কেউ আছে যে নিশ্চিহ্নভাবে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে চায়—'

'মানে—দাগী আসামী?'

'এই সময় ঘরের বন্ধ দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল। আমি গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলাম। অধ্যাপক সোম গরম ড্রেসিং-গাউন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে স্বাগত করিলাম। আমরা আসা অবধি তিনি প্রায় প্রত্যহ এই সময় একবার নামিয়া আসেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব হয়; তারপর আহারের সময় হইলে তিনি চলিয়া যান। তাঁহার গৃহিণী দিনের বেলা দু' একবার আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সত্যবতীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ তাঁহার দেখা যায় নাই। সত্যবতীও মহিলাটির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করে নাই।

সোম আসিয়া বসিলেন। তাঁহাকে একটি সিগারেট দিয়া নিজে একটি ধরাইলাম। ব্যোমকেশের সাক্ষাতে ধূমপান করিবার এই একটা সুযোগ; সে খিঁচাইতে পারিবে না।

সোম জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ পার্টি কেমন লাগল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ লাগল। সকলেই বেশ কর্ষিতচিত্ত ভদ্রলোক বলে মনে হল।'

সোম সিগারেটে একটা টান দিয়া বলিলেন, 'বাইরে থেকে সাধারণতঃ তাই মনে হয়। কিন্তু সেকথা আপনার চেয়ে বেশী কে জানে? মিসেস বক্সী, আজ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কাকে ভাল লাগল বলুন।'

সত্যবতী নিঃসংশয়ে বলিল, 'রজনীকে। ভারি সুন্দর স্বভাব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে।'

সোমের মুখে একটু অরুণাভা ফুটিয়া উঠিল। সত্যবতী সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া চলিল, 'যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি মিষ্টি কথা; আর ভারি বুদ্ধিমতী।— আচ্ছা, মহীধরবাবু এখনও মেয়ের বিয়ে কেন দিচ্ছেন না? ওঁর তো টাকার অভাব নেই।'

দ্বারের নিকট হইতে একটি তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমরা চমকিয়া উঠিলাম—

'বিধবা! বিধবা! বিধবাকে কোন্ হিঁদুর ছেলে বিয়ে করবে?' মালতী দেবী কখন দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন জানিতে পারি নাই। সংবাদটি যেমন অপ্রত্যাশিত, সংবাদ-দাত্রীর আবির্ভাবও তেমনি বিস্ময়কর। হতভম্ব হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। মালতী দেবী ঈর্ষাতিক্ত নয়নে আমাদের একে একে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বলিলেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? উনি জানেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন। এখানে সবাই জানে। অতি বড় বেহায়া না হলে বিধবা মেয়ে আইবুড়ো সেজে বেড়ায় না। কিন্তু দু'কান কাটার কি লজ্জা আছে? অত যে ছলা-কলা ওসব পুরুষ ধরবার ফাঁদ।'

মালতী দেবী যেমন আচম্বিতে আসিয়াছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন। সিঁড়িতে

তাঁর দুম্ দুম্ পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভিভূত হইয়াছিলেন অধ্যাপক সোম। তিনি লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিতেছিলেন না। কিছুক্ষণ নীরবে কাটিয়া গেল। শেষে তিনি বিড়ম্বিত মুখ তুলিয়া দীনকণ্ঠে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা মাপ করুন। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় কোথাও পালিয়ে যাই—' তাঁর স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, 'রজনী সত্যিই বিধবা?'

সোম ধীরে ধীরে বলিলেন, 'হ্যাঁ। চৌদ্দ বছর বয়সে বিধবা হয়। মহীধরবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃতি ছাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের দু'দিন পরে প্লেনে চড়ে সে বিলেত যাত্রা করে; মহীধরবাবুই জামাইকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে বিলেত পর্যন্ত পেঁছিল না; পথেই বিমান দুর্ঘটনা হয়ে মারা গেল। রজনীকে কুমারী বলা চলে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি সোমকে আর একটি সিগারেট দিলাম এবং দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিলাম। সিগারেট ধরাইয়া সোম বলিলেন, 'আপনারা আমার পারিবারিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছেন। আমার জীবনের ইতিহাসও অনেকটা মহীধরবাবুর জামাইয়ের মত। গরীবের ছেলে ছিলাম এবং ভাল ছাত্র ছিলাম। বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাই। কিন্তু উপসংহারটা সম্পূর্ণ অন্য রকমের হল। আমি বিদ্যালাভ করে ফিরে এলাম এবং কলেজের অধ্যাপক হলাম। কিন্তু বেশীদিন টিকতে পারলাম না। কাজ ছেড়ে দিয়ে আজ সাত বছর এখানে বাস করছি। অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই; আমার স্ত্রীর অনেক টাকা।'

কথাগুলিতে অন্তরের তিক্ততা ফুটিয়া উঠিল। আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাজ ছেড়ে দিলেন কেন?'

সোম উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'লজ্জায়। স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগে স্ত্রীকে ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না—অথচ—। মাঝে মাঝে ভাবি, বিমান দুর্ঘটনাটা যদি রজনীর স্বামীর না হয়ে আমার হত সব দিক দিয়েই সুরাহা হত।'

সোম দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। ব্যোমকেশ পিছন হইতে বলিল, 'প্রোফেসর সোম যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করি। যে গ্রুপ ছবিটা কিনেছিলেন সেটা কোথায়?'

সোম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'সেটা আমার স্ত্রী কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। তাতে আমি আর রজনী পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম।'

সোম ধীরপদে প্রস্থান করিলেন।

রাত্রে আহারে বসিয়া বেশী কথাবার্তা হইল না। হঠাৎ এক সময় সত্যবতী বলিয়া উঠিল 'যে যাই বলুক, রজনী ভারি ভাল মেয়ে। কম বয়সে বিধবা হয়েছে, বাপ যদি সাজিয়ে গুজিয়ে রাখতে চান তাতে দোষ কি?'

ব্যোমকেশ একবার সত্যবতীর পানে তাকাইল, তারপর নির্লিপ্ত স্বরে বলিল, 'আজ পার্টিতে একটা সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করলাম, তোমাদের বোধ হয় চোখে পড়েনি। মহীধর-বাবু তখন ছবি চুরির গল্প আরম্ভ করেছেন, সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে। দেখলাম ডাক্তার ঘটক একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, রজনী চুপি চুপি তার কাছে গিয়ে তার পকেটে একটা চিঠির মতন ভাঁজ করা কাগজ ফেলে দিলে। দু'জনের মধ্যে একটা চকিত চাউনি খেলে গেল। তারপর রজনী সেখান থেকে সরে এল। আমার বোধ হয় আমি ছাড়া এ দৃশ্য আর কেউ লক্ষ্য করেনি। মালতী দেবীও না।'

৪

দিন পাঁচ ছয় কাটিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশের শরীর এই কয়দিনে আরও সারিয়াছে। তাহার আহার্যের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাইয়াছে; সত্যবতী তাহাকে দিনে দুইটা সিগারেট খাইবার অনুমতি দিয়াছে। আমি নিত্য গুরুভোজনের ফলে দিন দিন খোদার খাসী হইয়া উঠিতেছি, সত্যবতীর গায়েও গত্তি লাগিয়াছে। এখন আমরা প্রত্যহ বৈকালে ব্যোমকেশকে লইয়া রাস্তায় রাস্তায় পাদচারণ করি, কারণ হাওয়া বদলের ইহা একটা অপরিহার্য অঙ্গ। সকলেই খুশী।

একদিন আমরা পথ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছি, অধ্যাপক সোম আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন, বলিলেন, 'চলুন, আজ আমিও আপনাদের সহযাত্রী।'

সত্যবতী একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'মিসেস সোম কি—?'

সোম প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, 'তাঁর সর্দি হয়েছে। শুয়ে আছেন।'

সোম মিশুক লোক, কেবল স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে একটু নির্জীব হইয়া পড়েন। আমরা নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

ছবি চুরির প্রসঙ্গ আপনা হইতেই উঠিয়া পড়িল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা বলুন দেখি, ঐ ছবিখানা কাগজে বা পত্রিকায় ছাপানোর কোনও প্রস্তাব হয়েছিল কি?'

সোম চকিতে একবার ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, 'কৈ, আমি তো কিছু জানি না। তবে নকুলেশবাবু মাঝে কলকাতা গিয়েছিলেন বটে। কিন্তু আমাদের না জানিয়ে তিনি ছবি ছাপতে দেবেন কি? মনে হয় না। বিশেষতঃ ডেপুটি ঊষানাথবাবু জানতে পারলে ভারি অসন্তুষ্ট হবেন।'

'ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্ট হবেন কেন?'

'উনি একটু অদ্ভুত গোছের লোক। বাইরে বেশ গাম্ভারি, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ভীরু প্রকৃতি। বিশেষতঃ ইংরেজ মনিবকে* যমের মত ভয় করেন। সাহেবরা বোধ হয় চান না যে একজন হাকিম সাধারণ লোকের সঙ্গে ফটো তোলাবে, তাই ঊষানাথবাবুর ফটো তোলাতে ঘোর আপত্তি। মনে আছে, পিক্‌নিকের সময় তিনি প্রথমটা ফটোর দলে থাকতে চাননি, অনেক বলে-কয়ে রাজী করাতে হয়েছিল। এ ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় নকুলেশবাবুর কপালে দুঃখ আছে।'

ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সে মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'ঊষানাথবাবু কি সব সময়েই কালো চশমা পরে থাকেন?'

সোম বলিলেন, 'হ্যাঁ। উনি বছর দেড়েক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, তার মধ্যে আমি ওঁকে কখনও বিনা চশমায় দেখিনি। হয়তো চোখের কোনও দুর্বলতা আছে; আলো সহ্য করতে পারেন না।'

ব্যোমকেশ ঊষানাথবাবু সম্বন্ধে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। হঠাৎ বলিল, 'ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার লোকটি কেমন?'

সোম বলিলেন, 'চতুর ব্যবসাদার, ঘটে বুদ্ধি আছে। মহীধরবাবুকে খোসামোদ করে চলেন, শুনেছি তাঁর কাছে টাকা ধার নিয়েছেন।'

'তাই নাকি! কত টাকা?'

'তা ঠিক জানি না। তবে মোটা টাকা।'

এই সময় সামনে ফট্‌ফট্‌ শব্দ শুনিয়া দেখিলাম একটি মোটর-বাইক আসিতেছে। আরও কাছে আসিলে চেনা গেল, আরোহী ডি.এস্‌.পি পুরন্দর পাণ্ডে। তিনিও আমাদের চিনিয়াছিলেন, মোটর-বাইক থামাইয়া সহাস্যমুখে অভিবাদন করিলেন।

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ফাল্গুনী পাল আপনার

*যে সময়ের গল্প তখনও ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয় নাই।

ছবি এঁকেছে?'

পাণ্ডে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার মশাই, পর দিনই ছবি নিয়ে হাজির। একেবারে হুবহু ছবি এঁকেছে। অথচ আমার ফটো তার হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সত্যি গুণী লোক। দশ টাকা খসাতে হল।'

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, 'কোথায় থাকে সে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর বলবেন না। অতবড় গুণী কিন্তু একেবারে হতভাগা। পাঁড় নেশাখোর—মদ গাঁজা গুলি কোকেন কিছুই বাদ যায় না। মাসখানেক এখানে এসেছে। এখানে এসে যেখানে সেখানে পড়ে থাকত, কোনও দিন কারুর বারান্দায়, কোনও দিন কারুর খড়ের গাদায় রাত কাটাত। মহীধরবাবু দয়া করে নিজের বাগানে থাকতে দিয়েছেন। ওঁর বাগানের কোণে একটা মেটে ঘর আছে, দু'দিন থেকে সেখানেই আছে।'

হতভাগ্য এবং চরিত্রহীন শিল্পীর যে-দশা হয় ফাল্গুনীরও তাহাই হইয়াছে। তবু কিছুদিনের জন্যও সে একটা আশ্রয় পাইয়াছে জানিয়া মনটা আশ্বস্ত হইল।

পাণ্ডে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিবার উপক্রম করিলে সোম বলিলেন, 'আপনি এদিকে চলেছেন কোথায়?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'মহীধরবাবুর বাড়ির দিকেই যাচ্ছি। নকুলেশবাবুর মুখে শুনলাম তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই বাড়ি যাবার পথে তাঁর খবর নিয়ে যাব।'

'কি অসুখ?'

'সামান্য সর্দিকাশি। কিন্তু ওঁর হাঁপানির ধাত।'

সোম বলিলেন, 'তাই তো, আমারও দেখতে যাওয়া উচিত। মহীধরবাবু আমাকে বড়ই স্নেহ করেন—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ তো, আমার গাড়ির পিছনের সীটে উঠে বসুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক। ফেরবার সময় আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

'তাহলে তো ভালই হয়।' বলিয়া সোম মোটর-বাইকের পিছনে গদি-আঁটা আসনটিতে বসিয়া পাণ্ডের কোমর জড়াইয়া লইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, মহীধরবাবুকে বলে দেবেন আমরা কাল বিকেলে যাব।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

মোটর-বাইক দুইজন আরোহী লইয়া চলিয়া গেল। আমরাও বাড়ির দিকে ফিরিলাম। লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশ আপন মনে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

বাড়ি ফিরিয়া চা পান করিতে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিল। দরজা খোলা ছিল; সিঁড়ির উপর ভারি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। ব্যোমকেশ চকিত হইয়া খাটো গলায় বলিল, 'অধ্যাপক সোম কোথায় গেছেন এ প্রশ্নের যদি জবাব দেবার দরকার হয়, বলো তিনি মিস্টার পাণ্ডের বাড়িতে গেছেন।'

কথাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পূর্বেই প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। মালতী দেবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সর্দিতে তাঁহার মুখখানা আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু রক্তাভ; তিনি ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। সত্যবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আসুন মিসেস সোম।'

মালতী দেবী ধরা ধরা গলায় বলিলেন, 'না, আমার শরীর ভাল নয়। উনি আপনাদের সঙ্গে বেরিয়েছিলেন, কোথায় গেলেন?'

ব্যোমকেশ দ্বারের কাছে আসিয়া সহজ সুরে বলিল, 'রাস্তায় পাণ্ডে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোফেসর সোমকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।'

মালতী দেবী বিস্ময়ভরে বলিলেন, 'পুলিসের পাণ্ডে? ওঁর সঙ্গে তাঁর কি দরকার?'

ব্যোমকেশ সরলভাবে বলিল, 'তা তো কিছু শুনলাম না। পাণ্ডে বললেন, চলুন আমার বাড়িতে চা খাবেন। হয়তো কোনও কাজের কথা আছে।'

মালতী দেবী আমাদের তিনজনের মুখ ভাল করিয়া দেখিলেন, একটা গুরুভার নিশ্বাস

ফেলিলেন, তারপর আর কোনও কথা না বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

ব্যোমকেশ আমাদের পানে চাহিয়া একটু লজ্জিত ভাবে হাসিল, বলিল, 'ডাহা মিথ্যে কথা বলতে হল। কিন্তু উপায় কি? বাড়িতে দাম্পত্য-দাঙ্গা হওয়াটা কি ভাল?'

সত্যবতী বাঁকা সুরে বলিল, 'তোমাদের সহানুভূতি কেবল পুরুষের দিকে। মিসেস সোম যে সন্দেহ করেন সে নেহাত মিছে নয়।'

ব্যোমকেশেরও স্বর গরম হইয়া উঠিল, 'আর তোমাদের সহানুভূতি কেবল মেয়েদের দিকে। স্বামীর ভালবাসা না পেলে তোমরা হিংসেয় চৌচির হয়ে যাও, কিন্তু স্বামীর ভালবাসা কি করে রাখতে হয় তা জান না।—যাক, অজিত, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই; বাইরের বারান্দায় পাহারা দিতে হবে। সোম ফিরলেই তাঁকে চেতিয়ে দেওয়া দরকার, নৈলে মিথ্যে কথা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে সোম তো যাবেই, সেই সঙ্গে আমাদেরও অশেষ দুর্গতি হবে।'

আমার কোনই আপত্তি ছিল না। বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ার পড়িয়া থাকিত, তাহাতে বসিয়া মনের সুখে সিগারেট টানিতে লাগিলাম। বাহিরে একটু ঠাণ্ডা বেশী, কিন্তু আলোয়ান গায়ে থাকিলে কষ্ট হয় না।

সোম ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। পাণ্ডের মোটর ফট্ ফট্ শব্দে ফটকের বাহিরে দাঁড়াইল, সোমকে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বারান্দায় উঠিলে আমি বলিলাম, 'শুনে যান। কথা আছে।'

বসিবার ঘরে ব্যোমকেশ একলা ছিল। সোমের মুখ দেখিলাম, গম্ভীর ও কঠিন। ব্যোমকেশ বলিল, 'মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

সোম সংক্ষেপে বলিলেন, 'ভালই।'

'ওখানে আর কেউ ছিল নাকি?'

'শুধু ডাক্তার ঘটক।'

ব্যোমকেশ তখন মালতী-সংবাদ সোমকে শুনাইল। সোমের গম্ভীর মুখে একটু হাসি ফুটিল। তিনি বলিলেন, 'ধন্যবাদ।'

## ৫

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের সময় লক্ষ্য করিলাম দাম্পত্য কলহ কেবল বাড়ির উপরতলায় আবদ্ধ নাই, নীচের তলায় নামিয়া আসিয়াছে। সত্যবতীর মুখ ভারী, ব্যোমকেশের অধরে বঙ্কিম কঠিনতা। দাম্পত্য কলহ বোধ করি সর্দিকাশির মতই ছোঁয়াচে রোগ।

কি করিয়া দাম্পত্য কলহের উৎপত্তি হয়, কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি হয়, এসব গূঢ় রহস্য কিছু জানি না। কিন্তু জিনিসটা নূতন নয়, ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। ঋষি-শ্রাদ্ধের ন্যায় মহা ধুমধামের সহিত আরম্ভ হইয়া অচিরাৎ প্রভাতের মেঘ-ডম্বরবৎ শূন্যে মিলাইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, চল আজ সকালবেলা একটু বেরুনো যাক।'

বলিলাম, 'বেশ, চল। সত্যবতী তৈরি হয়ে নিক।'

সত্যবতী বিরসমুখে বলিল, 'আমার বাড়িতে কাজ আছে। সকাল বিকাল টো টো করে বেড়ালে চলে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া শালটা গায়ে জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আমরা দু'জনে যাব এই প্রস্তাবই আমি করেছিলাম। চল, মিছে বাড়িতে বসে থেকে লাভ নেই।'

সত্যবতী ব্যোমকেশের পায়ের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিল,

'যার রোগা শরীর তার মোজা পায়ে দিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত।' বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি হাসি চাপিতে না পারিয়া বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। তাহার ললাটে গভীর ভ্রূকুটি, কিন্তু পায়ে মোজা।

রাস্তায় বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের যে কোনও বিশেষ গন্তব্য স্থান আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই! ভাবিয়াছিলাম হাওয়া বদলকারীর স্বাভাবিক পরিব্রজনস্পৃহা তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু কিছু দূর যাইবার পর একটা খালি রিক্শা দেখিয়া সে তাহাতে উঠিয়া বসিল। আমিও উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেপুটি উষানাথবাবুকা মোকাম চলো।'

রিক্শা চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, 'হঠাৎ উষানাথবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তিনি বাড়ি থাকবেন। তাঁকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার আছে।'

আধ মাইল পথ চলিবার পর আমি বলিলাম, 'ব্যোমকেশ, তুমি ছবি চুরির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ মনে হচ্ছে। সত্যিই কি ওতে গুরুতর কিছু আছে?'

সে বলিল, 'সেইটেই আবিষ্কারের চেষ্টা করছি।'

আরও আধ মাইল পথ উত্তীর্ণ হইয়া উষানাথবাবুর বাড়িতে পৌঁছান গেল। হাকিম পাড়ায় বাড়ি, পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ফটকের কাছে রিক্শাওয়ালাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই চমক লাগিল, বাড়ির সদরে কয়েকজন পুলিসের লোক দাঁড়াইয়া আছে। তারপর দেখিলাম ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডের মোটর-বাইক রহিয়াছে।

উষানাথ ও পাণ্ডে সদর বারান্দায় ছিলেন। আমাদের দেখিয়া পাণ্ডে সবিস্ময়ে বলিলেন, 'একি, আপনারা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ রবিবার, তাই বেড়াতে এসেছিলাম।'

উষানাথ হিমশীতল হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন। কাল রাত্রে বাড়িতে চুরি হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি? কি চুরি গেছে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা এখনও জানা যায়নি। রাত্রে এঁরা দোতলায় শোন্, নীচে কেউ থাকে না। ঘর বন্ধ থাকে। কাল রাত্রে আপিস-ঘরে চোর ঢুকে আলমারি খোলবার চেষ্টা করেছিল। একটা পর-চাবি তালায় ঢুকিয়েছিল, কিন্তু সেটা বের করতে পারেনি।'

'বটে! আলমারিতে কি ছিল?'

উষানাথবাবু বলিলেন, 'সরকারী দলিলপত্র ছিল, আর আমার স্ত্রীর গয়নার বাক্স ছিল। স্টিলের আলমারি। লোহার সিন্দুক বলতে পারেন।'

উষানাথবাবুর চোখে কালো চশমা, চোখ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভয় পাইয়াছেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে চোর কিছু নিয়ে যেতে পারেনি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সেটা আলমারি না খোলা পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। একটা চাবিওয়ালা ডাকতে পাঠিয়েছি।'

'হুঁ। চোর ঘরে ঢুকল কি করে?'

'কাচের জানালার একটা কাচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকিনি খুলেছে। আসুন না দেখবেন।'

উষানাথবাবুর আপিস-ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাঝারি আয়তনের ঘর, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, স্টিলের আলমারি, দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি—এছাড়া আর কিছু নাই। ব্যোমকেশ কাচ-ভাঙা জানালা পরীক্ষা করিল: আলমারির চাবি ঘুরাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু চাবি ঘুরিল না। এই চাবিটা ছাড়া চোর নিজের আগমনের আর কোনও নিদর্শন রাখিয়া যায় নাই। আপিস-ঘরের পাশেই ড্রয়িং-রুম, মাঝে দরজা। আমরা সেখানে গিয়া বসিলাম। আলমারিটা খোলা না হওয়া পর্যন্ত কিছু চুরি গিয়াছে কিনা জানা যাইবে

না। ঊষানাথবাবু চায়ের প্রস্তাব করিলেন, আমরা মাথা নাড়িয়া প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ড্রয়িং-রুমটি মামুলী ভাবে সাজানো গোছানো। এখানেও দেওয়ালে ভারত-সম্রাটের ছবি। এক কোণে একটি রেডিও যন্ত্র। চেয়ারগুলির পাশে ছোট ছোট নীচু টেবিল; তাহাদের কোনটার উপর পিতলের ফুলদানী, কোনটার উপর ছবির এল্‌বাম; দামী জিনিস কিছু নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর বোধ হয় এ ঘরে ঢোকেনি।'

ঊষানাথবাবু বলিলেন, 'এ ঘরে চুরি করবার মত কিছু নেই।' বলিয়াই তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। চোখের কালো চশমা ক্ষণেকের জন্য তুলিয়া কোণের রেডিও-যন্ত্রটার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার পরী! পরী কোথায় গেল!'

আমরা সমস্বরে বলিলাম, 'পরী!'

ঊষানাথবাবু রেডিওর কাছে গিয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'একটা রুপোলী গিল্‌টি-করা ছোট্ট পরী—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রী আমাকে উপহার দিয়েছিলেন—সেটা রেডিওর ওপর রাখা থাকত। নিশ্চয় চোরে নিয়ে গেছে।' আমরাও উঠিয়া গিয়া দেখিলাম। রেডিও যন্ত্রের উপর আধুলির মত একটা স্থান সম্পূর্ণ শূন্য। পরী ঐ স্থানে অবস্থান করিতেন সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'চোর হয়তো নেয়নি। আপনার ছেলে খেলা করবার জন্যে নিয়ে থাকতে পারে। একবার খোঁজ করে দেখুন না।'

ঊষানাথবাবু ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়া বলিলেন, 'খোকা সভ্য ছেলে, সে কখনও কোনও জিনিসে হাত দেয় না। যাহোক, আমি খোঁজ নিচ্ছি।'

তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ পাণ্ডেকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কাউকে সন্দেহ করেন নাকি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহ—না, সে রকম কিছু নয়। তবে একটা আরদালি বলছে, কাল রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটার সময় একটা পাগলাটে গোছের লোক ডেপুটিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ডেপুটিবাবু দেখা করেননি, আরদালি বাইরে থেকেই তাকে হাঁকিয়ে দিয়েছে। আরদালি লোকটার যে-রকম বর্ণনা দিলে তাতে তো মনে হয়—'

'ফাল্গুনী পাল?'

'হ্যাঁ। একজন সাব-ইন্‌সপেক্টরকে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছি।'

ঊষানাথবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিয়া জানাইলেন তাঁহার স্ত্রী-পুত্র পরীর কোনও খবরই রাখেন না। নিশ্চয় চোর আর কিছু না পাইয়া রৌপ্যভ্রমে পরীকে লইয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঁচকাইয়া বসিয়া ছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'ভাল কথা, সেই ছবিটা আছে কিনা দেখেছিলেন কি?'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে একটা গ্রুপ-ফটোর কথা মহীধরবাবুর বাড়িতে হয়েছিল?'

'ও—না, দেখা হয়নি। ঐ যে আপনার পাশে এল্‌বাম রয়েছে, দেখুন না ওতেই আছে।'

ব্যোমকেশ এল্‌বাম লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। তাহাতে ঊষানাথবাবুর পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র সকলের ছবি আছে, এমন কি মহীধরবাবু ও রজনীর ছবিও আছে, কেবল উদ্দিষ্ট গ্রুপ-ফটোখানি নাই!

ব্যোমকেশ বলিল, 'কৈ, দেখছি না তো?'

'নেই।' ঊষানাথবাবু উঠিয়া আসিয়া নিজে এল্‌বাম দেখিলেন, কিন্তু ফটো পাওয়া গেল না। তিনি তখন বলিলেন, 'কি জানি কোথায় গেল। কিন্তু এটা এমন কিছু দামী জিনিস নয়। আলমারি থেকে যদি দলিলপত্র কিংবা গয়নার বাক্স চুরি গিয়ে থাকে—'

ব্যোমকেশ গাত্রোত্থান করিয়া বলিল, 'আপনি চিন্তা করবেন না, চোর কিছুই চুরি করতে পারেনি। গয়নার বাক্স নিরাপদে আছে, এমন কি, আপনার পরীও একটু খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজ তাহলে আমরা উঠি। মিস্টার পাণ্ডে, চোরের যদি সন্ধান পান আমাকে

বঞ্চিত করবেন না।'

পাণ্ডে হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। আমরা বাহিরে আসিলাম; ঊষানাথবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ব্যোমকেশ ঊষানাথবাবুকে ইশারা করিয়া বারান্দার এক কোণে লইয়া গিয়া চুপিচুপি কিছুক্ষণ কথা বলিল। তারপর ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'চল।'

রিক্শাওয়ালা অপেক্ষা করিতেছিল, আমরা ফিরিয়া চলিলাম। ব্যোমকেশ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর এক সময় বলিল, 'অজিত, ঊষানাথবাবু এক সময় চোখের চশমা তুলেছিলেন, তখন কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

'কৈ না। কি লক্ষ্য করব?'

'ঊষানাথবাবুর বাঁ চোখটা পাথরের।'

'তাই নাকি? কালো চশমার এই অর্থ?'

'হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে ওঁর চোখের ভেতরে ফোড়া হয়, অস্ত্র করে চোখটা বাদ দিতে হয়েছিল। ওঁর সর্বদা ভয় সাহেবরা জানতে পারলেই ওঁর চাকরি যাবে।'

'আচ্ছা ভীতু লোক তো! এই কথাই বুঝি আড়ালে গিয়ে হচ্ছিল?'

'হ্যাঁ।'

এই তথ্যের গুরুত্ব কতখানি তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। ঊষানাথবাবু যদি কানা-ই হন তাহাতে পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি?

রিক্শা ক্রমে বাড়ির নিকটবর্তী হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'অজিত, যাবার সময় তুমি প্রশ্ন করেছিলে, ছবি চুরির ব্যাপার গুরুতর কিনা। সে প্রশ্নের উত্তর এখন দেওয়া যেতে পারে। ব্যাপার গুরুতর।'

'সত্যি? কি করে বুঝলে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না, একটু মুচকি হাসিল।

অপরাহ্নে আমরা মহীধরবাবুর বাড়িতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সত্যবতী বলিল, 'ঠাকুরপো, টর্চ নিয়ে যেও। ফিরতে রাত করবে নিশ্চয়।'

আমি টর্চ পকেটে লইয়া বলিলাম, 'তুমি এবেলাও তাহলে বেরুচ্ছ না?'

সত্যবতী বলিল, 'না। ওপরতলায় একটা মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কথা কইবার লোক নেই। তার কাছে দুদণ্ড বসে দুটো কথা কইলেও তার মনটা ভাল থাকবে।'

বলিলাম, 'মালতী দেবীর প্রতি তোমার সহানুভূতি যে ক্রমে বেড়েই যাচ্ছে।'

'কেন বাড়বে না? নিশ্চয় বাড়বে।'

'আর রজনীর প্রতি সহানুভূতি বোধ করি সেই অনুপাতে কমে যাচ্ছে?'

'মোটেই না, একটুও কমেনি। রজনীর দোষ কি? যত নষ্টের গোড়া এই পুরুষ জাতটা।'

তর্জন করিয়া বলিলাম, 'দেখ, জাত তুলে কথা বললে ভাল হবে না বলছি।'

সত্যবতী নাক সিটকাইয়া রান্নাঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

মহীধরবাবুর বাড়িতে যখন পৌঁছিলাম তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু বাগানের মধ্যে ঘোর-ঘোর হইয়া আসিয়াছে। খোলা ফটকে লোক নাই। রাত্রেও বোধ হয় ফটক খোলা থাকে, কিংবা গরু ছাগলের গতিরোধ করিবার জন্য আগড় লাগানো থাকে। মানুষের যাতায়াতে বাধা নাই।

বাড়ির সদর দরজা খোলা; কিন্তু বাড়িতে কেহ আছে বলিয়া মনে হইল না। দুই-তিন বার হ্রেষা-ধ্বনিবৎ গলা খাঁকারি দিবার পর একটি বৃদ্ধগোছের চাকর বাহির হইয়া আসিল। বলিল, 'কর্তাবাবু ওপরে শুয়ে আছেন। দিদিমণি বাগানে বেড়াচ্ছেন। আপনারা বসুন, আমি ডেকে আনছি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দরকার নেই। আমরাই দেখছি।' বাগানে নামিয়া ব্যোমকেশ বাগানের একটা কোণ লক্ষ্য করিয়া চলিল। গাছপালা ঝোপঝাড়ে বেশীদূর পর্যন্ত দেখা যায় না, কিন্তু ঘাসে ঢাকা সংকীর্ণ পথগুলি মাকড়সার জালের মত চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে। বুঝিলাম ব্যোমকেশ ফাল্গুনী পালের আস্তানার সন্ধানে চলিয়াছে।

বাগানের কোণে আসিয়া পৌঁছিলাম। একটা মাটির ঘর, মাথায় টালির ছাউনি; সম্ভবতঃ মালীদের যন্ত্রপাতি রাখিবার স্থান। পাশেই একটা প্রকাণ্ড ইঁদারা।

ঘরের দ্বার খোলা রহিয়াছে, কিন্তু ভিতরে অন্ধকার। আমি টর্চের আলো ভিতরে ফেলিলাম। অন্ধকারে খড়ের বিছানার উপর কেহ শুইয়াছিল, আলো পড়িতেই উঠিয়া বাহিরে আসিল। দেখিলাম ফাল্গুনী পাল।

আজ ফাল্গুনীর মন ভাল নয়, কণ্ঠস্বরে ঔদাসীন্য-ভরা অভিমান। আমাদের দেখিয়া বলিল, 'আপনারাও কি পুলিসের লোক, আমার ঘর খানাতল্লাস করতে এসেছেন? আসুন—দেখুন, প্রাণ ভরে খানাতল্লাস করুন। কিছু পাবেন না। আমি গরীব বটে, কিন্তু চোর নই।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা খানাতল্লাস করতে আসিনি।' আপনাকে শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কাল রাত্রে আপনি উষানাথবাবুর বাড়িতে কেন গিয়েছিলেন?'

ফাল্গুনী তিক্তস্বরে বলিল, 'তাঁর একটা ছবি এঁকেছিলাম, তাই দেখাতে গিয়েছিলাম। দারোয়ান দেখা করতে দিলে না, তাড়িয়ে দিলে। বেশ কথা, ভাল কথা। কিন্তু সেজন্য পুলিস লেলিয়ে দেবার কি দরকার?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভারি অন্যায়। আমি পুলিসকে বলে দেব, তারা আপনাকে আর বিরক্ত করবে না।'

'ধন্যবাদ' বলিয়া ফাল্গুনী আবার কোটরে প্রবেশ করিল। আমরা ফিরিয়া আসিলাম।

দিনের আলো প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। আমরা বাগানে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু রজনীকে দেখিতে পাইলাম না।

বাগানের অন্য প্রান্তে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় দিয়া একটা উচ্চ ক্রীড়াশৈল রচিত হইয়াছিল। তাহাকে ঘিরিয়া সবুজ শ্যাওলার বন্ধনী। ক্রীড়াশৈলটি আকারে চারকোণা, দেখিতে অনেকটা পিরামিডের মত। আমরা তাহার পাশ দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। পিরামিডের অপর পার হইতে আবেগোদ্ধত কণ্ঠস্বর কানে আসিল, 'ছবি ছবি ছবি। কি হবে ছবি! চাই না ছবি!'

'আস্তে! কেউ শুনতে পাবে।'

কণ্ঠস্বর দুইটি পরিচিত; প্রথমটি ডাক্তার ঘটকের, দ্বিতীয়টি রজনীর। ডাক্তার ঘটককে আমরা শান্ত সংযতবাক্ মানুষ বলিয়াই জানি; তাহার কণ্ঠ হইতে যে এমন আর্ত উগ্রতা বাহির হইতে পারে তাহা কল্পনা করাও দুষ্কর। রজনীর কণ্ঠস্বরেও একটা শীৎকার আছে, কিন্তু তাহা অস্বাভাবিক নয়।

ডাক্তার ঘটক আবার যখন কথা কহিল তখন তাহার স্বর অপেক্ষকৃত হ্রস্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু আবেগের উন্মাদনা কিছুমাত্র কমে নাই। সে বলিল, 'আমি তোমাকে চাই—তোমাকে। দুধের বদলে জল খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না।'

রজনী বলিল, 'আর আমি! আমি কি চাই না? কিন্তু উপায় যে নেই।'

ডাক্তার বলিল, 'উপায় আছে, তোমাকে বলছি।'

রজনী বলিল, 'কিন্তু বাবা—'

ডাক্তার বলিল, 'তুমি নাবালিকা নও। তোমার বাবা তোমাকে আটকাতে পারেন না।'

রজনী বলিল, 'তা জানি। কিন্তু।—শোন লক্ষ্মীটি শোন, বাবার শরীর খারাপ যাচ্ছে, তিনি সেরে উঠুন—তারপর—'

ডাক্তার বলিল, 'না। আজই আমি জানতে চাই তুমি রাজী আছ কিনা।'

একটু নীরবতা। তারপর রজনী বলিল, 'আচ্ছা, আজই বলব, কিন্তু এখন নয়।

আমাকে একটু সময় দাও। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তুমি এস, আমি এখানে থাকবো; তখন কথা হবে। এখন হয়তো বাড়িতে কেউ এসেছে, আমাকে না দেখলে—'

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইল।

দুজনে পা টিপিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ চোখে পড়িল পিরামিডের অন্য পাশ হইতে আর একটা লোক আমাদেরই মত সন্তর্পণে দূরে চলিয়া যাইতেছে। একবার মনে হইল বুঝি ডাক্তার ঘটক; কিন্তু ভাল করিয়া চিনিবার আগেই লোকটি অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পিরামিড হইতে অনেকখানি ঘুরিয়া দূরে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, বাড়ি ফেরা যাক। আজ আর দেখা করে কাজ নেই।'

রাস্তায় বাহির হইলাম। অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, আকাশে চন্দ্র নাই, পথের পাশে কেরোসিনের আলোগুলি দূরে দূরে মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। আমি মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালিয়া পথ নির্ণয় করিতে করিতে চলিলাম।

ব্যোমকেশ চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছে। বিদ্রোহোন্মুখ যুবক-যুবতীর নিয়তি কোন্ কুটিল পথে চলিয়াছে—বোধ করি তাহাই নির্ধারণের চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহার ধ্যানভঙ্গ করিলাম না।

বাড়ির কাছাকাছি পেণীছিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করিল, 'অন্য লোকটিকে চিনতে পারলে?'

বলিলাম, 'না। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনি হচ্ছেন আমাদের গৃহস্বামী অধ্যাপক আদিনাথ সোম।'

'তাই নাকি! ব্যোমকেশ, ব্যাপারটা আমার পক্ষে কিছু জটিল হয়ে উঠেছে। ছবি চুরি, পরী চুরি, নেশাখোর চিত্রকর, কানা হাকিম, অবৈধ প্রণয়, অধ্যাপকের আড়িপাতা—কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না পারবারই কথা। রবীন্দ্রনাথের গান মনে আছে—'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে, জীবন-বীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে?'—আমিও সরু-মোটা তারের জট ছাড়াতে পারছি না।'

'আচ্ছা, এই যে ডাক্তার আর রজনীর ব্যাপার, এতে আমাদের কিছু করা উচিত নয় কি?'

ব্যোমকেশ দৃঢ়স্বরে বলিল, 'কিছু না। আমরা ক্রিকেট খেলার দর্শক, হাততালি দিতে পারি, দুয়ো দিতে পারি, কিন্তু খেলার মাঠে নেমে খেলায় বাগড়া দেওয়া আমাদের পক্ষে ঘোর বেয়াদপি।'

বাড়ি ফিরিয়া দেখিলাম সত্যবতী একাকিনী পশমের গেঞ্জি বুনিতেছে। বলিলাম, 'তোমার রুগীর খবর কি?'

সত্যবতী উত্তর দিল না, সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি, মুখে কথা নেই যে! মালতী দেবীকে দেখতে গিয়েছিলে তো?'

'গিয়েছিলাম'—সত্যবতী মুখ তুলিল না, কিন্তু তাহার মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ অদূরে দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিতেছিল, হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। সত্যবতী সূচীবিদ্ধবৎ চমকিয়া উঠিল, শয়নকক্ষের দ্বারের দিকে একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষপাত করিল, তারপর আবার সম্মুখে ঝুঁকিয়া দ্রুত কাঁটা চালাইতে লাগিল।

আমি তাহার পাশে বসিয়া বলিলাম, 'কি ব্যাপার খুলে বল দেখি।'

'কিছু না। চা খাবে তো? জল চড়াতে বলে এসেছি। দেখি—' বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'আহা, কি হয়েছে আগে বল না! চা পরে হবে।'

সত্যবতী তখন আবেগভরে বলিয়া উঠিল, 'কি আবার হবে, ঐ লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটার

কাছে আমার যাওয়াই ভুল হয়েছিল। এমন পচা নোংরা মন—আমাকে বলে কিনা—কিন্তু সে আমি বলতে পারব না। যার অমন মন তার মুখে নুড়ো জেবলে দিতে হয়।'

শয়নকক্ষ হইতে আর এক ধমক হাসির আওয়াজ আসিল। সত্যবতী চলিয়া গেল। ব্যাপার বুঝিতে বাকি রহিল না। রাগে আমার মুখও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধমনা স্ত্রীলোকের সন্দেহ পাত্রপাত্রী বিচার করে না জানি, কিন্তু সত্যবতীকে যে স্ত্রীলোক এরূপ পঙ্কিল দোষারোপ করিতে পারে, তাকে গুলি করিয়া মারা উচিত। ব্যোমকেশ হাসুক, আমার গা রি রি করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

রাত্রে শয়ন করিতে গিয়া ঘুম আসিল না; সারাদিনের নানা ঘটনায় মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। ঘড়িতে দেখিলাম দশটা; ডিসেম্বর মাসে রাত্রি দশটা এখানে গভীর রাত্রি। ব্যোমকেশ ও সত্যবতী অনেকক্ষণ শুইয়া পড়িয়াছে।

বিছানায় শুইয়া ঘুম না আসিলে আমার সিগারেটের পিপাসা জাগিয়া ওঠে, সুতরাং শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে হইল। গায়ে আলোয়ান দিয়া সিগারেট ধরাইলাম। কিন্তু বন্ধ ঘরে ধূমপান করিলে ঘরের বাতাস ধোঁয়ায় দূষিত হইয়া উঠিবে; আমি একটা জানালা ঈষৎ খুলিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলাম।

জানালাটা সদরের দিকে। সামনে ফটক, তাহার পরপারে রাস্তা, রাস্তার ধারে মিউনিসিপ্যালিটির আলোকস্তম্ভ; আলোকস্তম্ভ না বলিয়া ধূমস্তম্ভ বলিলেই ভাল হয়। প্রদীপের তৈল শেষ হইয়া আসিতেছে।

মিনিট দুই তিন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছি, বাহিরে একটা অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দে চকিত হইয়া উঠিলাম। কে যেন বারান্দা হইতে নামিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম একটি ছায়ামূর্তি ফটক পার হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আলোকস্তম্ভের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে চিনিতে পারিলাম—কালো কোট-প্যাণ্ট-পরা অধ্যাপক সোম।

বিদ্যুৎ চমকের মত বুঝিতে পারিলাম এত রাত্রে তিনি কোথায় যাইতেছেন। আজ রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মহীধরবাবুর বাগানে ডাক্তার ঘটক এবং রজনীর মিলিত হইবার কথা; সংকেত-স্থলে সোম অনাহূত উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু কেন? কি তাঁহার অভিপ্রায়?

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এই কথা ভাবিতেছি, সহসা অধিক বিস্ময়ের কারণ ঘটিল। আবার খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। এবার বাহির হইয়া আসিল মালতী দেবী। তাঁহাকে চিনিতে কষ্ট হইল না। একটা চাপা কাশির শব্দ; তারপর সোম যে পথে গিয়াছিলেন তিনিও সেই পথে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

পরিস্থিতি স্পষ্টই বোঝা গেল। স্বামী অভিসারে যাইতেছেন, আর স্ত্রী অসুস্থ শরীর লইয়া এই শীতজর্জর রাত্রে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। বোধ হয় স্বামীকে হাতে হাতে ধরিতে চান। উঃ, কি দুর্বহ ইহাদের জীবন! প্রেমহীন স্বামী এবং বিশ্বাসহীন পত্নীর দাম্পত্য জীবন কি ভয়ঙ্কর! এর চেয়ে ডাইভোর্স ভাল।

বর্তমান ক্ষেত্রে আমার কিছু করা উচিত কিনা ভাবিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশকে জাগাইয়া সংবাদটা দিব? না, কাজ নাই, সে ঘুমাইতেছে ঘুমাক। বরং আমার ঘুম যেরূপ চটিয়া গিয়াছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে আসিবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং আমি জানালার কাছে বসিয়া পাহারা দিব। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

আবার সিগারেট ধরাইলাম।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। দীপস্তম্ভের আলো ধোঁয়ায় দম বন্ধ হইয়া মরিয়া গেল।

একটি মূর্তি ফটক দিয়া প্রবেশ করিল। নক্ষত্রের আলোয় মালতী দেবীর ভারী মোটা চেহারা চিনিতে পারিলাম। তিনি পদশব্দ গোপনের চেষ্টা করিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটা অবরুদ্ধ আওয়াজ বাহির হইল, তাহা চাপা কাশি কিংবা চাপা কান্না বুঝিতে পারিলাম না। তিনি উপরে চলিয়া গেলেন।

এত শীঘ্র শ্রীমতী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু শ্রীমানের দেখা নাই। অনুমান করিলাম শ্রীমতী বেশী দূর স্বামীকে অনুসরণ করিতে পারেন নাই, অন্ধকারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

তারপর এদিক ওদিক নিষ্ফল অন্বেষণ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

সোম ফিরিলেন সাড়ে এগারটার সময়। বাদুড়ের মত নিঃশব্দ সঞ্চারে বাড়ির মধ্যে মিলাইয়া গেলেন।

## ৭

সকালে ব্যোমকেশকে রাত্রির ঘটনা বলিলাম। সে চুপ করিয়া শুনিল, কোনও মন্তব্য করিল না।

একজন কনেস্টবল একটা চিঠি দিয়া গেল। ডি.এস.পি পাণ্ডের চিঠি, আগের দিন সন্ধ্যা ছ'টার তারিখ। চিঠিতে মাত্র কয়েক ছত্র লেখা ছিল—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

ডেপুটি সাহেবের আলমারি খুলিয়া দেখা গেল কিছু চুরি যায় নাই। আপনি বলিয়াছিলেন পরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, কিন্তু পরী এখনও নিরুদ্দেশ। চোরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আপনি জানিতে চাহিয়াছিলেন তাই লিখিলাম। ইতি—

পুরন্দর পাণ্ডে

ব্যোমকেশ চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া বলিল, 'পাণ্ডে লোকটি সত্যিকার সজ্জন।'

এই সময় যিনি সবেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তিনি ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার। মহীধরবাবুর পার্টির পর রাস্তায় নকুলেশবাবুর সহিত দু'একবার দেখা হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খবরটা দিয়ে যাই। শোনেননি নিশ্চয়ই? ফাল্গুনী পাল—সেই যে ছবি আঁকত—সে মহীধরবাবুর বাগানে কুয়োয় ডুবে মরেছে।'

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'কখন এ ব্যাপার হল?'

নকুলেশ বলিলেন, 'বোধ হয় কাল রাত্তিরে, ঠিক জানি না। মাতাল দাঁতাল লোক, অন্ধকারে তাল সামলাতে পারেনি, পড়েছে কুয়োয়। আজ সকালে আমি মহীধরবাবুর খবর নিতে গিয়েছিলাম, দেখি মালীরা কুয়ো থেকে লাস তুলছে।'

আমরা নীরবে পরস্পর পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম। কাল রাত্রে মহীধরবাবুর বাগানে বহু বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে।

'আচ্ছা, আজ তাহলে উঠি; আমাকে আবার ক্যামেরা নিয়ে ফিরে যেতে হবে—।' বলিয়া নকুলেশবাবু উঠিবার উপক্রম করিলেন।

'বসুন বসুন, চা খেয়ে যান।'

নকুলেশ চায়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, বসিলেন। অচিরাৎ চা আসিয়া পড়িল। দু'চার কথার পর ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সেই গ্রুপ-ফটোর নেগেটিভখানা খুঁজেছিলেন কি?'

'কোন্ নেগেটিভ? ও—হ্যাঁ, অনেক খুঁজেছি মশাই, পাওয়া গেল না।—আমার লোকসানের বরাত; থাকলে আরও পাঁচখানা বিক্রি হত।'

'আচ্ছা, সেই ফটোতে কে কে ছিল বলুন দেখি?'

'কে কে ছিল? পিক্‌নিকে গিয়েছিলাম ধরুন—আমি, মহীধরবাবু, তাঁর মেয়ে রজনী, ডাক্তার ঘটক, সস্ত্রীক প্রোফেসর সোম, সপরিবারে ডেপুটি ঊষানাথবাবু আর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা। সকলেই ফটোতে ছিলেন। ফটোখানা ভারি উৎরে গিয়েছিল—গ্রুপ-ফটো অত ভাল খুব একটা হয় না। আচ্ছা, চলি তাহলে। আর একদিন আসব।'

নকুলেশবাবু প্রস্থান করিলেন। দু'জনে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। ফাল্গুনীর কথা ভাবিয়া মনটা ভারী হইয়া উঠিল। সে নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া ছিল, কিন্তু ভগবান তাহাকে প্রতিভা দিয়াছিলেন। এমনভাবে অপঘাত মৃত্যুই যদি তাহার নিয়তি, তবে তাহাকে প্রতিভা

দিবার কি প্রয়োজন ছিল?

ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'এ সম্ভাবনা আমার মনেই আসেনি। চল, বেরুনো যাক।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্যাঙ্কে যাব। কিছু টাকা বের করতে হবে।'

এখানে আসিয়া স্থানীয় ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখা হইয়াছিল, সংসার-খরচের প্রয়োজন অনুসারে বাহির করা হইত।

আমরা সদর বারান্দায় বাহির হইয়াছি, দেখিলাম অধ্যাপক সোম ড্রেসিং-গাউন পরিহিত অবস্থায় নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মুখে উদ্বিগ্ন গাম্ভীর্য। ব্যোমকেশ সম্ভাষণ করিল, 'কি খবর?'

সোম বলিলেন, 'খবর ভাল নয়। স্ত্রীর অসুখ খুব বেড়েছে। বোধ হয় নিউমোনিয়া। জ্বর বেড়েছে; মাঝে মাঝে ভুল বকছেন মনে হল।'

আশ্চর্য নয়। কাল রাত্রে সর্দির উপর ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। কিন্তু সোম বোধ হয় তাহা জানেন না। ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে খবর দিয়েছেন?'

ডাক্তার ঘটকের নামে সোমের মুখ অন্ধকার হইল। তিনি বলিলেন, 'ঘটককে ডাকব না। আমি অন্য ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ম চক্ষে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'কেন? ডাক্তার ঘটকের ওপর কি আপনার বিশ্বাস নেই? আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন কিন্তু আপনি ঘটককেই সুপারিশ করেছিলেন।'

সোম ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন। ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'সে যাক! এই মাত্র খবর পেলাম ফাল্গুনী পাল কাল রাত্রে মহীধরবাবুর কুয়োয় ডুবে মারা গেছে।'

সোম বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, 'তাই নাকি। হয়তো আত্মহত্যা করেছে। আর্টিস্টরা একটু অব্যবস্থিতচিত্ত হয়—'

ব্যোমকেশ বন্দুকের গুলির মত প্রশ্ন করিল, 'প্রোফেসর সোম, কাল রাত্রি এগারোটার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোম চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ পাংশু হইয়া গেল। তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন, 'আমি—আমি! কে বললে আমি কোথাও গিয়েছিলাম? আমি তো—'

হাত তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মিছে কথা বলে লাভ নেই। প্রোফেসর সোম, আপনার স্ত্রীর যে আজ বাড়াবাড়ি হয়েছে তার জন্যে আপনি দায়ী। তিনি কাল আপনার পেছন পেছনে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন। এই রোগে যদি তাঁর মৃত্যু হয়—'

ভয়-বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সোম বলিলেন, 'আমার স্ত্রী—ব্যোমকেশবাবু, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না—'

ব্যোমকেশ তর্জনী তুলিয়া ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বলিল, 'কিন্তু আমরা জানি। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনি সাবধানে থাকবেন। এস অজিত।'

সোম স্তম্ভের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তায় কিছু দূর গিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সোমকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি।' তারপর ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'ব্যাঙ্ক খুলতে এখনও দেরি আছে। চল, ঘটকের ডিস্‌পেনসারিতে একবার ঢুঁ মেরে যাই।'

বাজারের দিকে ডাক্তারের ঔষধালয়। সবে খুলিয়াছে। আমরা ডাক্তারের ঘরে প্রবেশ করিতে যাইব, শুনিলাম সে একজনকে বলিতেছে, 'দেখুন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে; লম্বা কেস, সারাতে সময় লাগবে। আমি এখন লম্বা কেস হাতে নিতে পারব না। আপনি বরং শ্রীধরবাবুর কাছে যান—তিনি প্রবীণ ডাক্তার—'

আমরা প্রবেশ করিলাম, অন্য লোকটি চলিয়া গেল। ডাক্তার সানন্দে আমাদের অভ্যর্থনা করিল। বলিল, 'আসুন আসুন। রোগী যখন সশরীরে ডাক্তারের বাড়িতে আসে তখন

বুঝতে হবে রোগ সেরেছে। মহীধরবাবু সেদিন আমাকে ঘোড়ার ডাক্তার বলেছিলেন। এখন আপনিই বলুন, আমি মানুষের ডাক্তার কিংবা আপনি ঘোড়া!'—বলিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিল। ডাক্তারের মন আজ ভারি প্রফুল্ল; চোখে আনন্দের জ্যোতি।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'আপনি মানুষের ডাক্তার এই কথা স্বীকার করে নেওয়াই আমার পক্ষে সম্মানজনক। মহীধরবাবু কেমন আছেন?'

ডাক্তার বলিল, 'অনেকটা ভাল। প্রায় সেরে উঠেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন কি?'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'সেই চিত্রকর! কি হয়েছিল তার?'

'কিছু হয়নি। কাল রাত্রে জলে ডুবে মারা গেছে'—ব্যোমকেশ যতটুকু জানিত সংক্ষেপে বলিল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর বলিল, 'আমার যাওয়া উচিত। মহীধর-বাবুর দুর্বল শরীর—। যাই, একবার চট্ করে ঘুরে আসি।' ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ সহসা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কলকাতা যাচ্ছেন কবে?'

ডাক্তারের মুখের ভাব সহসা পরিবর্তিত হইল; সে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ব্যোমকেশের চোখের মধ্যে চাহিয়া বলিল, 'আমি কলকাতা যাচ্ছি কে বললে আপনাকে?'

ব্যোমকেশ কেবল মৃদু হাসিল। ডাক্তার তখন বলিল, 'হ্যাঁ, শীগ্গিরই একবার যাবার ইচ্ছে আছে। আচ্ছা, চললাম। যদি সময় পাই ওবেলা আপনাদের বাড়িতে যাব।'

ডাক্তার ক্ষুদ্র মোটরে চড়িয়া চলিয়া গেল। আমরা ব্যাঙ্কের দিকে চলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ডাক্তার কলকাতা যাচ্ছে জানলে কি করে? তুমি কি আজকাল অন্তর্যামী হয়েছ নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না। কিন্তু একজন ডাক্তার যখন বলে লম্বা কেস হাতে নেব না, অন্য ডাক্তারের কাছে যাও, তখন আন্দাজ করা যেতে পারে যে সে বাইরে যাবে।'

'কিন্তু কলকাতায়ই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?'

'ওটা ডাক্তারের প্রফুল্লতা থেকে অনুমান করলাম।'

## ৮

ডাক্তারের ঔষধালয় হইতে অনতিদূরে ব্যাঙ্ক। আমরা গিয়া দেখিলাম ব্যাঙ্কের দ্বার খুলিয়াছে। দ্বারের দুই পাশে বন্দুক-কিরিচধারী দুইজন সান্ত্রী পাহারা দিতেছে।

বড় একটি ঘর দুই ভাগে বিভক্ত, মাঝে কাঠ ও কাচের অনুচ্চ বেড়া। বেড়ার গায়ে সারি সারি জানালা। এই জানালা দিয়া জনসাধারণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের লেন-দেন হইয়া থাকে।

ব্যোমকেশ একটি জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া চেক লিখিতেছে, দেখিলাম বেড়ার ভিতর দিকে ম্যানেজার অমরেশ রাহা দাঁড়াইয়া একজন কেরানীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। অমরেশ-বাবুও আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি স্মিতমুখে বাহিরে আসিলেন। বলিলেন, 'নমস্কার। ভাগ্যে আপনাদের দেখে ফেললাম নইলে তো টাকা নিয়েই চলে যেতেন।'

অমরেশবাবুকে চায়ের পার্টির পর আর দেখি নাই। তিনি সেজন্য লজ্জিত; ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'রোজই মনে করি আপনাদের বাড়িতে যাব, কিন্তু একটা না একটা কাজ পড়ে যায়। ব্যাঙ্কের চাকরি মানে অষ্টপ্রহরের গোলামি!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন গোলামিতে সুখ আছে। হরদম টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন।'

অমরেশবাবু করুণ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'সুখ আর কৈ ব্যোমকেশবাবু। চিনির বলদ চিনির বোঝা বয়ে মরে, কিন্তু দিনের শেষে খায় সেই ঘাস জল।'

ব্যোমকেশ চেকের বদলে টাকা পকেটস্থ করিলে অমরেশবাবু বলিলেন, 'চলুন, আজ

যখন পেয়েছি আপনাকে সহজে ছাড়ব না। আমার আপিস-ঘরে বসে খানিক গল্প-সল্প করা যাক। আপনার প্রতিভার যে পরিচয় অজিতবাবুর লেখা থেকে পাওয়া যায়, তাতে আপনাকে পেলে আর ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আমাদের দেশে প্রতিভাবান মানুষের বড়ই অভাব।'

ভদ্রলোক শুধু যে ব্যোমকেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাহাই নয়, সাহিত্য-রসিকও বটে। সেদিন তাঁহার সহিত অধিক আলাপ করি নাই বলিয়া অনুতপ্ত হইলাম।

তিনি আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁহার একটি নিজস্ব আপিস-ঘর আছে, তাহার দ্বার পর্যন্ত গিয়া তিনি বলিলেন, 'না, এখানে নয়। চলুন, ওপরে যাই। এখানে গণ্ডগোল, কাজের হুড়োহুড়ি। ওপরে বেশ নিরিবিলি হবে।'

আপিস-ঘরের দরজা খোলা ছিল; ভিতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, মামুলী টেবিল চেয়ার খাতাপত্র, কয়েকটা বড় বড় লোহার সিন্দুক ছাড়া আর কিছু নাই।

কাছেই সিঁড়ি। উপরে উঠিতে উঠিতে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপরতলাটা বুঝি আপনার কোয়ার্টার?'

'হ্যাঁ। ব্যাঙ্কেরও সুবিধে।'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার সব এখানেই থাকেন?'

'স্ত্রী-পুত্র পরিবার আমার নেই ব্যোমকেশবাবু। ভগবান সুমতি দিয়েছিলেন, বিয়ে করিনি। একলা-মানুষ, তাই ভদ্রভাবে চলে যায়। বিয়ে করলে হাঁড়ির হাল হত।'

উপরতলাটি একজন লোকের পক্ষে বেশ সুপরিসর। তিন চারটি ঘর, সামনে উন্মুক্ত ছাদ। অমরেশবাবু আমাদের বসিবার ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। অনাড়ম্বর পরিচ্ছন্ন ঘর; দেওয়ালে ছবি নাই, মেঝেয় গালিচা নাই। এক পাশে একটি জাজিম-ঢাকা চৌকি, দুই-তিনটি আরাম-কেদারা, একটি বইয়ের আলমারি। নিতান্তই মামুলী ব্যাপার, কিন্তু বেশ তৃপ্তিদায়ক। গৃহস্বামী যে গোছালো স্বভাবের লোক তাহা বোঝা যায়।

'বসুন, চা তৈরী করতে বলি।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

বইয়ের আলমারিটা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, উঠিয়া গিয়া বইগুলি দেখিলাম। অধিকাংশ বই গল্প উপন্যাস, চলন্তিকা আছে, সঞ্চয়িতা আছে। আমার রচিত ব্যোমকেশের উপন্যাসগুলিও আছে দেখিয়া পুলকিত হইলাম।

ব্যোমকেশও আসিয়া জুটিল। সে একখানা বই টানিয়া লইয়া পাতা খুলিল; দেখিলাম বইখানা বাংলা ভাষায় নয়, ভারতবর্ষেরই অন্য কোনও প্রদেশের লিপি। অনেকটা হিন্দীর মতন, কিন্তু ঠিক হিন্দী নয়।

এই সময় অমরেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি গুজরাটী ভাষাও জানেন?'

অমরেশবাবু মুখে চট্‌কার শব্দ করিয়া বলিলেন, 'জানি আর কৈ? একসময় শেখবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ও আমার দ্বারা হল না। বাঙালীর ছেলে মাতৃভাষা শিখতেই গলদ্‌ঘর্ম হয়, তার ওপর ইংরিজি আছে। উপরন্তু যদি একটা তৃতীয় ভাষা শিখতে হয় তাহলে আর বাঙালীর শক্তিতে কুলোয় না। অথচ শিখতে পারলে আমার উপকার হত। ব্যাঙ্কের কাজে গুজরাটী ভাষা জানা থাকলে অনেক সুবিধা হয়।'

আমরা আবার আসিয়া বসিলাম। দুই-চারিটি একথা সেকথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ফাল্গুনী পাল মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়?'

অমরেশবাবু চেয়ার হইতে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন, 'অ্যাঁ। ফাল্গুনী পাল মারা গেছে! কবে—কোথায়—কি করে মারা গেল?'

ব্যোমকেশ ফাল্গুনীর মৃত্যু-বিবরণ বলিল। শুনিয়া অমরেশবাবু দুঃখিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'আহা বেচারা! বড় দুঃখে পড়েছিল। কাল আমার কাছে এসেছিল।'

এবার আমাদের বিস্মিত হইবার পালা। ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'কাল এসেছিল? কখন?'

অমরেশবাবু বলিলেন, 'সকালবেলা। কাল রবিবার ছিল, ব্যাংক বন্ধ; সবে চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে বসেছি, ফাল্গুনী এসে হাজির, আমার ছবি এ'কেছে তাই দেখাতে এসেছিল—'

'ও—'

চাকর তিন পেয়ালা চা দিয়া গেল। তক্‌মা-আঁটা চাকর, বুঝিলাম ব্যাঙ্কের পিওন; অবসরকালে বাড়ির কাজও করে। ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল অমরেশবাবু টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিলক্ষণ হিসাবী।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চামচ ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, 'ছবিখানা কিনলেন নাকি?'

অমরেশবাবু বিমর্ষ মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, 'কিনতে হল। পাঁচ টাকা দিতে গেলাম কিছুতেই নিলে না, দশ টাকা আদায় করে ছাড়ল। এমন জানলে—'

ব্যোমকেশ চায়ে একটা চুমুক দিয়া বলিল, 'মৃত চিত্রকরের শেষ ছবি দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।'

'দেখুন না। ভালই এ'কেছে বোধ হয়। আমি অবশ্য ছবির কিছু বুঝি না—'

বইয়ের আলমারির নীচের দেরাজ হইতে একখণ্ড পুরু চতুষ্কোণ কাগজ আনিয়া তিনি আমাদের সম্মুখে ধরিলেন।

ফাল্গুনী ভাল ছবি আঁকিয়াছে: অমরেশবাবুর বিশেষত্বহীন চেহারাও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্যোমকেশ চিত্রবিদ্যার একজন জহুরী, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ছবিটি দেখিতে লাগিল।

অমরেশবাবু আগে বেশ প্রফুল্লমুখে কথাবার্তা বলিতেছিলেন, কিন্তু ফাল্গুনীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিবার পর কেমন যেন মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। প্রায় নীরবেই চা-পান শেষ হইল। পেয়ালা রাখিয়া অমরেশবাবু স্তিমিত স্বরে বলিলেন, 'ফাল্গুনীর কথায় মনে পড়ল, সেদিন চায়ের পার্টিতে শুনেছিলাম পিক্‌নিকের ফটোখানা চুরি গেছে। মনে আছে? তার কোনও হদিস পাওয়া গেল কিনা কে জানে।'

ব্যোমকেশ মগ্ন হইয়া ছবি দেখিতেছিল, উত্তর দিল না। আমিও কিছু বলা উচিত কিনা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমরেশবাবুর পানে চাহিয়া রহিলাম। অমরেশবাবু তখন নিজেই বলিলেন, 'সামান্য ব্যাপার, তাই ও নিয়ে বোধ হয় কেউ মাথা ঘামায়নি।'

ব্যোমকেশ ছবি নামাইয়া রাখিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, 'চমৎকার ছবি। লোকটা যদি বে'চে থাকত, আমিও ওকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিতাম। অমরেশবাবু, ছবিখানা যত্ন করে রাখবেন। আজ ফাল্গুনী পালের নাম কেউ জানে না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন ওর আঁকা ছবি সোনার দরে বিক্রি হবে।'

অমরেশবাবু একটু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, 'তাই নাকি! তাহলে দশটা টাকা জলে পড়েনি? ছবিটা বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো চলবে?'

'নিশ্চয়।'

অতঃপর আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। অমরেশবাবু বলিলেন, 'আবার দেখা হবে। বছর শেষ হতে চলল, আমাকে আবার নববর্ষের ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে হেড আপিসের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে। এবার নববর্ষে দু'দিন ছুটি।'

'দু'দিন ছুটি কেন?'

'এবার একত্রিশে ডিসেম্বর রবিবার পড়েছে। শনিবার যদি অর্ধেক দিন ধরেন, তাহলে আড়াই দিন ছুটি পাওয়া যাবে। আপনারা এখনও কিছুদিন আছেন তো?'

'২রা জানুয়ারী পর্যন্ত আছি বোধ হয়।'

'আচ্ছা, নমস্কার।'

আমরা বাহির হইলাম। ব্যাঙ্কের ভিতর দিয়া নামিতে হইল না, বাড়ির পিছনদিকে একটা খিড়কি-সি'ড়ি ছিল, সেই পথে নামিয়া রাস্তায় আসিলাম। বাজারের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিগারেট ফুরাইয়াছে। বলিলাম, 'এস, এক টিন সিগারেট কিনতে হবে।'

— ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ছিল, চমকিয়া উঠিল। বলিল, 'আরে তাই তো! আমাকেও একটা জিনিস কিনতে হবে।'

একটা বড় মনিহারীর দোকানে ঢুকিলাম। আমি একদিকে সিগারেট কিনিতে গেলাম, ব্যোমকেশ অন্যদিকে গেল। আমি সিগারেট কিনিতে কিনিতে আড়চোখে দেখিলাম ব্যোমকেশ একটা দামী এসেন্সের শিশি কিনিয়া পকেটে পুরিল।

মনে মনে হাসিলাম। ইহারা কেন যে ঝগড়া করে, কেনই বা ভাব করে কিছু বুঝি না। দাম্পত্য-জীবন আমার কাছে একটা হাস্যকর প্রহেলিকা।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিবার জন্য বিছানায় লম্বা হইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙিয়া দেখি বেলা সাড়ে তিনটা।

ব্যোমকেশের ঘর হইতে মৃদু জল্পনার শব্দ আসিতেছিল; উঁকি মারিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়াছে এবং সত্যবতী তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কি সব বলিতেছে। দু'জনের মুখেই হাসি।

সরিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলাম, 'ওহে কপোত-কপোতী, তোমাদের কূজন-গুঞ্জন শেষ হতে যদি দেরি থাকে তাহলে না হয় আমিই চায়ের ব্যবস্থা করি।'

সত্যবতী সলজ্জভাবে মুখের খানিকটা আঁচলের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। খানিক পরে ব্যোমকেশ জ্বলন্ত সিগারেট হইতে ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বাহির হইল। অবাক হইয়া বলিলাম, 'ব্যাপার কি! ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া ছাড়ছ যে।'

ব্যোমকেশ একগাল হাসিয়া বলিল, 'পারমিশান পেয়ে গেছি। আজ থেকে যত ইচ্ছে।'

বুঝিলাম দাম্পত্য-জীবনে কেবল প্রেম থাকিলেই চলে না, কূটবুদ্ধিরও প্রয়োজন।

৯

চা পান করিয়া উপরতলায় রোগিণীর সংবাদ লইতে গেলাম। সামাজিক কর্তব্য পালন না করিলে নয়।

অধ্যাপক সোমের মুখ চিন্তাক্রান্ত। মালতী দেবীর অবস্থা খুবই খারাপ, তবে একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার মত নয়। দুটা ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়াছে, অক্সিজেন দেওয়া হইতেছে। জ্বর খুব বেশী রোগিণী মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছেন। একজন নার্সকে সেবার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে।

স্বখাত সলিল। সহানুভূতি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

নীচে নামিয়া আসিবার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার ঘটক আসিল।

এবেলা ডাক্তারের ভাবভঙ্গী অন্য প্রকার। একটু সতর্ক, একটু সন্দিগ্ধ, একটু অন্তঃপ্রবিষ্ট। ব্যোমকেশের পানে মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকাইতেছে যেন ব্যোমকেশ সম্বন্ধে তাহার মনে কোনও সংশয় উপস্থিত হইয়াছে।

কথাবার্তা সাধারণ ভাবেই হইল। ডাক্তার সকালে মহীধরবাবুর বাড়িতে গিয়া ফাল্গুনীর লাস দেখিয়াছিল, সেই কথা বলিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'কি দেখলেন? মৃত্যুর কারণ জানা গেল?'

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'অটপ্সি না হওয়া পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা যায় না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তবু আপনি ডাক্তার, আপনি কি কিছুই বুঝতে পারলেন না?'

ইতস্তত করিয়া ডাক্তার বলিল, 'না।'

ব্যোমকেশ তখন বলিল, 'ও কথা যাক। মহীধরবাবু কেমন আছেন? কাল বিকেলে আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম; কিন্তু ডাকাডাকি করেও কারুর সাড়া পাওয়া গেল

না, তাই ফিরে এলাম।'

ডাক্তার সতর্ক ভাবে প্রশ্ন করিল, 'ক'টার সময় গিয়েছিলেন?'

'আন্দাজ পাঁচটার সময়।'

ডাক্তার একটু ভাবিয়া বলিল, 'কি জানি। আমিও বিকেলবেলা গিয়েছিলাম, কিন্তু পাঁচটার আগে ফিরে এসেছিলাম। মহীধরবাবু ভালই আছেন। তবে আজকে বাড়িতে এই ব্যাপার হল—একটা শক্ পেয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আর রজনী দেবী! তিনি কেমন আছেন?'

ডাক্তারের মুখের উপর দিয়া একটা রক্তাভা খেলিয়া গেল। কিন্তু সে ধীরে ধীরে বলিল, 'রজনী দেবী ভালই আছেন। তাঁর অসুখ করেছে এমন কথা তো শুনিনি। আচ্ছা, আজ উঠি।

ডাক্তার উঠিল। আমরাও উঠিলাম। দ্বার পর্যন্ত আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার কলকাতা যাওয়া তাহলে স্থির?'

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ দুটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনি এখানে শরীর সারাতে এসেছেন, গোয়েন্দাগিরি করতে নয়। যা আপনার এলাকার বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' বলিয়া গট্ গট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল, 'ডাক্তার ঘটক এমনিতে খুব ভালমানুষ, কিন্তু ল্যাজে পা পড়লে একেবারে কেউটে সাপ।'

বাইরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ আসিয়া থামিল। ব্যোমকেশ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আরে পাণ্ডে সাহেব এসেছেন। ভালই হল।'

পাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্ত হাসিয়া বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাবু, আপনার কথা ফলে গেল। পরী উদ্ধার করেছি।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ার দিয়া বলিল, 'বসুন। কোথা থেকে পরী উদ্ধার করলেন?'

'মহীধরবাবুর কুয়ো থেকে। ফাল্গুনীর লাস বেরুবার পর কুয়োয় ডুবুরি নামিয়েছিলাম। ঊষানাথবাবুর পরী বেরিয়েছে।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া থাকিয়া বলিল, 'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। ফাল্গুনী জলে ডুবে মরেনি, মৃত্যুর পর তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।'

'হুঁ। অর্থাৎ কাল রাত্রে তাকে কেউ খুন করেছে। তারপর মৃতদেহটা কুয়োয় ফেলে দিয়েছে। আত্মহত্যা নয়।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু ফাল্গুনীর মতন একটা অপদার্থ লোককে খুন করে কার কি লাভ?'

'লাভ নিশ্চয় আছে, নইলে খুন করবে কেন? অপদার্থ লোক যদি কোনও সাংঘাতিক গুপ্তকথা জানতে পারে তাহলে তার বেঁচে থাকা কারুর কারুর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। ফাল্গুনী অপদার্থ ছিল বটে, কিন্তু নির্বোধ ছিল না।'

পাণ্ডে বিরস মুখে বলিলেন, 'তা বটে। কিন্তু আমি ভাবছি, পরীটা কুয়োর মধ্যে এল কি করে? তবে কি ফাল্গুনীই পরী চুরি করেছিল? খুনীর সঙ্গে ফাল্গুনীর কি পরী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ি হয়েছিল? তারপর খুনী ফাল্গুনীকে ঠেলে কুয়োয় ফেলে দিয়েছে?—কিন্তু পরীটা তো এমন কিছু দামী জিনিস নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ভাল কথা, ফাল্গুনীর গায়ে কি কোনও আঘাত-চিহ্ন পাওয়া গেছে?'

'না। কিন্তু তার পেটে অনেকখানি আফিম পাওয়া গেছে। মদের সঙ্গে আফিম মেশান ছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বুঝেছি। দেখুন, কি করে ফাল্গুনীর মৃত্যু হল সেটা বড় কথা নয়, কেন মৃত্যু হল সেইটেই আসল কথা।'

পাণ্ডে উৎসুক চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, 'এ বিষয়ে আপনি কি কিছু বুঝেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল, 'বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার শোনবার সময় হবে কি?'

পাণ্ডে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া দ্বারের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বলিলেন, 'সময় হবে কিনা দেখাচ্ছি। চলুন আমার বাড়িতে, একেবারে রাত্রির খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরবেন।'

পাণ্ডে ব্যোমকেশকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

আমি আর সত্যবতী রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্যন্ত তাস লইয়া গোলামচোর খেলিলাম।

ব্যোমকেশ ফিরিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল এতক্ষণ ধরে?'

ব্যোমকেশ স্বর্গীয় হাস্য করিয়া বলিল, 'আঃ, মুর্গিটা যা রেঁধেছিল!'

ধমক দিয়া বলিলাম, 'কথা চাপা দিও না। পাঁচ ঘণ্টা ধরে কি কথা হল?'

ব্যোমকেশ জিভ কাটিল, 'পুলিসের গুপ্তকথা কি বলতে আছে? তবে এমন কোনও কথা হয়নি যা তুমি জান না।'

'হত্যাকারী কে?'

'পাঁচকড়ি দে।' বলিয়া ব্যোমকেশ সুট করিয়া শয়নকক্ষে ঢুকিয়া পড়িল।

## ১০

বড়দিন আসিয়া চলিয়া গিয়াছে; নববর্ষ সমাগতপ্রায়। এখানে বড়দিন ও নববর্ষের উৎসবে বিশেষ হৈ চৈ হয় না, সাহেব-মেমেরা হুইস্কি খাইয়া একটু নাচানাচি করে এই পর্যন্ত।

এ কয়দিনে নূতন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। মালতী দেবীর রোগ ভালর দিকেই আসিতেছিল; কিন্তু তিনি একটু সংবিৎ পাইয়া দেখিলেন ঘরে যুবতী নার্স রহিয়াছে। অমনি তাঁহার ষষ্ঠ রিপু প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি গালাগালি দিয়া নার্সকে তাড়াইয়া দিলেন। ফলে অবস্থা আবার যায়-যায় হইয়া উঠিয়াছে, অধ্যাপক সোম একা হিমসিম খাইতেছেন।

শনিবার ৩০শে ডিসেম্বর সকালবেলা ব্যোমকেশ বলিল, 'চল, আজ একটু রোঁদে বেরুনো যাক।'

রিক্‌শা চড়িয়া বাহির হইলাম।

প্রথমে উপস্থিত হইলাম নকুলেশবাবুর ফটোগ্রাফির দোকানে। নীচে দোকান, উপর-তলায় নকুলেশবাবুর বাসস্থান। তিনি উপরে ছিলেন আমাদের দেখিয়া যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল তিনি বাঁধাছাঁদা করিতেছিলেন; কাষ্ঠ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—ছবি তোলাবেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম আপনার দোকানটা দেখে যাই।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'বেশ বেশ। আমি কিন্তু ভাল ছবি তুলি। এখানকার কেষ্ট-বিষ্টু সকলেই আমাকে দিয়ে ছবি তুলিয়েছেন। এই দেখুন না।'

ঘরের দেয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙানো রহিয়াছে; তন্মধ্যে চেনা লোক মহীধরবাবু এবং অধ্যাপক সোম। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'বাঃ, বেশ ছবি। আপনি দেখছি একজন সত্যিকারের শিল্পী।'

নকুলেশবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, 'হেঁ হেঁ। ওরে লালু, পাশের দোকান থেকে দু' পেয়ালা চা নিয়ে আয়।'

'চায়ের দরকার নেই, আমরা খেয়ে-দেয়ে বেরিয়েছি। আপনি কোথাও যাবেন মনে

হচ্ছে।'

নকুলেশবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ, দু' দিনের জন্য একবার কলকাতা যাব। বৌ-ছেলে কলকাতায় আছে, তাদের আনতে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা, আপনি গোছগাছ করুন।'

রিক্‌শাতে চড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'স্টেশনে চল।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপার কি? সবাই জোট বেঁধে কলকাতা যাচ্ছে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সময় কলকাতার একটা নিদারুণ আকর্ষণ আছে।'

রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ব্রাঞ্চ লাইনের প্রান্তীয় স্টেশন, বেশী বড় নয়। এখান হইতে বড় জংশন প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে, সেখানে নামিয়া মেন লাইনের গাড়ি ধরিতে হয়। রেল ছাড়া জংশনে যাইবার মোটর-রাস্তাও আছে; সাহেব সুবা এবং যাহাদের মোটর আছে তাহারা সেই পথে যায়।

ব্যোমকেশ কিন্তু স্টেশনে নামিল না, রিক্‌শাওয়ালাকে ইশারা করিতেই সে গাড়ি ঘুরাইয়া বাহিরে লইয়া চলিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হল, নামলে না?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করনি, টিকিট-ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার ঘটক টিকিট কিনছিল।'

'তাই নাকি?' আমি ব্যোমকেশকে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে যেন শুনিতে পায় নাই এমনি ভান করিয়া উত্তর দিল না।

বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে বড় মনিহারীর দোকানটার সামনে একটা মোটর দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। ব্যোমকেশ রিক্‌শা থামাইয়া নামিল, আমিও নামিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার কি মতলব? আরও এসেন্স চাই নাকি?'

সে হাসিয়া বলিল, 'আরে না না—'

'তবে কি কেশতৈল? তরল আলতা?'

'এসই না।'

দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ডেপুটি ঊষানাথবাবু রহিয়াছেন। তিনি একটা চামড়ার সুটকেস কিনিতেছেন। আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, 'আপনিও কি কলকাতা যাচ্ছেন নাকি?'

ঊষানাথবাবু চমকিত হইয়া বলিলেন, 'আমি! নাঃ, আমি ট্রেজারি অফিসার, আমার কি স্টেশন ছাড়বার জো আছে? কে বললে আমি কলকাতা যাচ্ছি?' তাঁহার স্বর রূঢ় হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনার সুরে বলিল, 'কেউ বলেনি। আপনি সুটকেস কিনছেন দেখে অজিত ভেবেছিল—। যাক, আপনার পরী পেয়েছেন তো?'

'হ্যাঁ, পেয়েছি।' ঊষানাথবাবু অসন্তুষ্ট ভাবে মুখ ফিরাইয়া লইয়া দোকানদারের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা ফিরিয়া গিয়া রিক্‌শাতে চড়িলাম। বলিলাম, 'কি হল? হুজুর হঠাৎ চটলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কি জানি। ওঁর হয়তো মনে মনে কলকাতা যাবার ইচ্ছে, কিন্তু কর্তব্যের দায়ে স্টেশন ছাড়তে পারছেন না, তাই মেজাজ গরম। কিংবা—'

রিক্‌শাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, 'আভি কিধর্ যানা হ্যায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডি.এস.পি পাণ্ডে সাহেব।'

পাণ্ডে সাহেবের বাড়িতেই আপিস। তিনি আমাদের স্বাগত করিলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'সব ঠিক?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সব ঠিক।'

'ট্রেন কখন?'

'রাত্রি সাড়ে দশটায়। সওয়া এগারটায় জংশন পেঁছবে।'

'কলকাতার ট্রেন কখন?'

'পৌনে বারটায়।'

'আর পশ্চিমের মেল?'

'এগারটা পঁয়ত্রিশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ। তাহলে ওবেলা আন্দাজ পাঁচটার সময় আমি মহীধরবাবুর বাড়িতে যাব। আপনি সাড়ে পাঁচটার সময় যাবেন। মহীধরবাবু যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, পুলিসের অনুরোধ নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারবেন না।'

গম্ভীর হাসিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'আমারও তাই বিশ্বাস।'

ইহাদের টেলিগ্রাফে কথাবার্তা হৃদয়ঙ্গম হইল না। কিন্তু প্রশ্ন করিয়া লাভ নাই; জানি প্রশ্ন করিলেই ব্যোমকেশ জিভ কাটিয়া বলিবে—পুলিসের গুপ্তকথা।

পাণ্ডের আপিস হইতে ব্যাঙ্কে গেলাম। কিছু টাকা বাহির করিবার ছিল।

ব্যাঙ্কে খুব ভিড়; আগামী দুই দিন বন্ধ থাকিবে। তবু ক্ষণেকের জন্য অমরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি বলিলেন, 'এই বেলা যা দরকার টাকা বার করে নিন। কাল পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি ফিরছেন কবে?'

'পরশু রাত্রেই ফিরব।'

কাজের সময়, একজন কেরানী তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। আমরা টাকা বাহির করিয়া ফিরিতেছি, দেখিলাম ডাক্তার ঘটক ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিল। সে আমাদের দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু যেন দেখিতে পায় নাই এমনি ভাবে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ আমার দিকে চাহিয়া সহাস্য চক্ষুর্দ্বয় ঈষৎ কুঞ্চিত করিল। তারপর রিক্‌শাতে চড়িয়া বসিয়া বলিল, 'ঘর চলো।'

## ১১

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় আমি আর ব্যোমকেশ মহীধরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তিনি বসিবার ঘরে ছিলেন। দেখিলাম তাঁহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে। মুখের ফুটি-ফাটা হাসিটি ম্রিয়মাণ, চালতার মতন গাল দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

বলিলেন, 'আসুন আসুন। অনেক দিন বাঁচবেন, ব্যোমকেশবাবু, এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। শরীর বেশ সেরে উঠেছে দেখছি। বাঃ, বেশ বেশ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কিন্তু আপনার শরীর তো ভাল দেখছি না।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'হয়েছিল একটু শরীর খারাপ—এখন ভালই। কিন্তু একটা বড় ভাবনার কারণ হয়েছে ব্যোমকেশবাবু।'

'কি হয়েছে?'

'রজনী কাল রাত্রে কলকাতা চলে গেছে।'

'সে কি! একলা গেছেন? আপনাকে না বলে?'

'না না, সে সব কিছু নয়। বাড়ির পুরোনো চাকর রামদীনকে তার সঙ্গে দিয়েছি।'

'তবে ভাবনাটা কিসের?'

মহীধরবাবুর মনে ছল চাতুরী নাই। সোজাসুজি বলিতে আরম্ভ করিলেন, 'শুনুন, বলি তাহলে। কলকাতায় রজনীর এক মাসী থাকেন, তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। কাল বিকেলে ওর মেসোর এক 'তার' এল। তিনি রজনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন—মাসীর ভারি অসুখ। রজনীকে রাত্তিরের গাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। ও এমন প্রায়ই যাতায়াত করে, পাঁচ ছ' ঘণ্টার রাস্তা বৈ তো নয়। রজনী আজ সকালে কলকাতায় পৌঁছে গেছে, 'তার' পেয়েছি।

'এ পর্যন্ত কোনও গোলমাল নেই। তারপর শুনুন। আজ সকালে দু'খানা চিঠি পেলুম; তার মধ্যে একখানা রজনীর মাসীর হাতের লেখা—কালকের তারিখ। তিনি নিতান্ত মামুলী চিঠি লিখেছেন, অসুখ-বিসুখের কোনও কথাই নেই।'

মহীধরবাবু শঙ্কিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'এমনও তো হতে পারে চিঠি লেখবার পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'

মহীধরবাবু বলিলেন, 'তা একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্য চিঠিখানার কথা এখনও বলিনি। বেনামী চিঠি। এই পড়ে দেখুন।'

তিনি একটি খাম ব্যোমকেশকে দিলেন। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ দেখিয়া বোঝা যায় এই শহরেই ডাকে দেওয়া হইয়াছে। ব্যোমকেশ চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। সাদা এক তক্তা কাগজের উপর মাত্র কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

আপনার চোখের আড়ালে একজন ভদ্রবেশী দুষ্ট লোক আপনার কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা যদি ইলোপ করে, কেলেঙ্কারীর একশেষ হইবে। সাবধান! ডাক্তার ঘটককে বিশ্বাস করিবেন না।

ব্যোমকেশ চিঠি পড়িয়া ফেরত দিল। মহীধরবাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন, 'কে লিখেছে জানি না। কিন্তু এ যদি সত্যি হয়—'

ব্যোমকেশ শান্তভাবে বলিল, 'ডাক্তার ঘটককে আপনি জানেন। সে এমন কাজ করবে বলে আপনার মনে হয়?'

মহীধরবাবু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, 'ডাক্তারকে তো ভাল ছেলে বলেই জানি; যখন তখন আসে আমার বাড়িতে। তবে পরচিত্ত অন্ধকার। আচ্ছা, সে কি আছে এখানে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আছে। আজ সকালেই তাকে দেখেছি।'

মহীধরবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আছে? যাক, তাহলে বোধ হয় কেউ মিথ্যে বেনামী চিঠি দিয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার কিন্তু আজ রাত্রে কলকাতা যাচ্ছে।'

মহীধরবাবু আবার ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ—যাচ্ছে! তবে—?'

ব্যোমকেশ দৃঢ় স্বরে বলিল, 'মহীধরবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও কেলেঙ্কারী হবে না। আপনি মিথ্যে ভয় করছেন।'

মহীধরবাবু ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যি বলছেন? কিন্তু আপনি কি করে জানলেন—আপনি তো—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি এমন অনেক কথা জানি যা আপনি জানেন না। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি না। রজনী দেবী দু'দিন পরেই ফিরে আসবেন। তিনি এমন কোনও কাজ করবেন না যাতে আপনার মাথা হেঁট হয়।'

মহীধরবাবু গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'ব্যস, তা হলেই হল। ধন্যবাদ ব্যোমকেশবাবু। আপনার কথায় যে কত দূর নিশ্চিন্ত হলাম তা বলতে পারি না। বুড়ো হয়েছি—ভগবান একবার দাগা দিয়েছেন—তাই একটুতেই ভয় হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকথা ভুলে যান। আমি এসেছি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে।'

মহীধরবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বলুন বলুন।'

'আপনার মোটরখানা আজ রাত্রে একবার দিতে হবে। জংশনে যাব। একটু জরুরী কাজ আছে।'

'এ আর বেশী কথা কি? কখন চাই বলুন?'

'রাত্রি ন'টার সময়।'

'বেশ, ঠিক ন'টার সময় আমার গাড়ি আপনার বাড়ির সামনে হাজির থাকবে। আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

এই সময় পাণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে মিলিয়া চা ও প্রচুর জলখাবার ধ্বংস করিয়া বাড়ি ফিরিলাম।

ঠিক ন'টার সময় মহীধরবাবুর আট সিলিণ্ডার গাড়ি আমাদের বাড়ির সামনে আসিয়া থামিল। আমি, ব্যোমকেশ ও পাণ্ডে সাহেব তাহাতে চাপিয়া বসিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। একটি কালো রঙের পুলিস ভ্যান আগে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, সেটি আমাদের পিছু লইল।

শহরের সীমানা অতিক্রম করিয়া আমাদের মোটর জংশনের দীর্ঘ গৃহহীন পথ ধরিল। দুই পাশে কেবল বড় বড় গাছ; আমাদের গাড়ি তাহার ভিতর আলোর সুড়ঙ্গ রচনা করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পথে বেশী কথা হইল না। তিনজনে পাশাপাশি বসিয়া একটার পর একটা সিগারেট টানিয়া চলিয়াছি। একবার ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার আসামী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনবে।'

'হ্যাঁ। আমারও তাই মনে হয়। যে ক্লাসেই উঠুক, ইনস্পেক্টর দুবে পাশের কামরায় থাকবে।'

'পুলিস মহলে আসল কথা কে কে জানে?'

'আমি আর দুবে। পাছে আগে থাকতে বেশী হৈ চৈ হয় তাই চুপিসাড়ে মহীধর-বাবুর গাড়ি নিতে হল। পিছনের ভ্যানে যারা আছে তারাও জানে না কি জন্যে কোথায় যাচ্ছি। পুলিসের থানা থেকে যত কথা বেরোয় এত আর কোথাও থেকে নয়। ঘুষখোর পুলিস তো আছেই। তা ছাড়া পুলিসের পেটে কথা থাকে না।'

পুরন্দর পাণ্ডে নির্মলচরিত্র পুরুষ, তাই স্বজাতি সম্বন্ধেও তিনি সত্যবাদী।

দশটার সময় জংশনে পৌঁছিলাম। লাল সবুজ অসংখ্য আকাশ-প্রদীপে স্টেশন ঝলমল করিতেছে।

পুলিসের ভ্যানে দুইজন সাব-ইন্‌স্পেক্টর ও কয়েকটি কনস্টেবল ছিল। পাণ্ডে তাহাদের স্টেশনের ভিতরে বাহিরে নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন; তারপর স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'আমার একটা 'লগ' আসবার কথা আছে। এলেই খবর দেবেন। আমরা ওয়েটিং রুমে আছি।'

আমরা তিন জনে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। পাণ্ডে ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখিতে লাগিলেন।

ঠিক সাড়ে দশটার সময় স্টেশনমাস্টার খবর দিলেন, ''লগ' এসেছে। সব ভাল। ফার্স্ট ক্লাস।'

এখনও প'য়তাল্লিশ মিনিট।

কিন্তু প'য়তাল্লিশ মিনিট সময় যত দীর্ঘই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মে শেষ হইতে বাধ্য। গাড়ি আসার ঘণ্টা বাজিল। আমরা প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলের গায়ে ওভারকোট এবং মাথায় পশমের টুপি, সুতরাং সহসা দেখিয়া কেহ যে চিনিয়া ফেলিবে সে সম্ভাবনা নাই।

তারপর বহু প্রতীক্ষিত গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

পাণ্ডে সাহেব নাটকের রঙ্গমঞ্চ ভালই নির্বাচন করিয়াছিলেন। আয়োজনেরও কিছু ত্রুটি রাখেন নাই; কিন্তু তবু নাটক জমিতে পাইল না, পটোত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িয়া গেল।

গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরা যেখানে থামে আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলাম। ঠিক আমাদের সামনে প্রথম শ্রেণীর কামরা দেখা গেল। জানালাগুলির কাঠের কবাট বন্ধ, তাই অভ্যন্তরভাগ দেখা গেল না। অল্পকাল-মধ্যে দরজা খুলিয়া গেল। একজন কুলি ছুটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দুইটি বড় বড় চামড়ার সুটকেস নামাইয়া রাখিল।

কামরায় একটি মাত্র যাত্রী ছিলেন, তিনি এবার বাহির হইয়া আসিলেন। কোটপ্যাণ্ট-পরা অপরিচিত ভদ্রলোক, গোঁফ দাড়ি কামানো, চোখে ফিকা নীল চশমা। তিনি সুটকেস

দুটি কুলির মাথায় তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, পাণ্ডে এবং ব্যোমকেশ তাঁহার দুই পাশে গিয়া দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ একটু দুঃখিত স্বরে বলিল, 'অমরেশবাবু, আপনার যাওয়া হল না। ফিরে যেতে হবে।'

অমরেশবাবু! ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অমরেশ রাহা! গোঁফদাড়ি কামানো মুখ দেখিয়া একেবারে চিনিতে পারি নাই।

অমরেশ রাহা একবার দক্ষিণে একবার বামে ঘাড় ফিরাইলেন, তারপর ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া নিজের কপালে ঠেকাইয়া ঘোড়া টানিলেন। চড়াৎ করিয়া শব্দ হইল।

মুহূর্ত-মধ্যে অমরেশ রাহার ভূপতিত দেহ ঘিরিয়া লোক জমিয়া গেল। পাণ্ডে হুইসল বাজাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের বহু লোক আসিয়া স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। পাণ্ডে কড়া সুরে বলিলেন, 'ইন্‌স্পেক্টর দুবে, সুটকেস দুটো আপনার জিম্মায়।'

একজন লোক ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করিল। চিনিলাম, ডাক্তার ঘটক। সে বলিল, 'কি হয়েছে? এ কে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'অমরেশ রাহা। দেখুন তো বেঁচে আছে কি না।'

ডাক্তার ঘটক নত হইয়া দেহ পরীক্ষা করিল, তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'মারা গেছে।'

ভিড়ের ভিতর হইতে দন্তবাদ্যসহযোগে একটা বিস্ময়-কুতূহলী স্বর শোনা গেল, 'অমরেশ রাহা মারা গেছে—অ্যাঁ! কি হয়েছিল? তার দাড়ি কোথায়—অ্যাঁ—!'

ফটোগ্রাফার নকুলেশ সরকার।

ডাক্তার ঘটক ও নকুলেশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনাদের গাড়িও এসে পড়েছে। এখন বলবার সময় নেই, ফিরে এসে শুনবেন।'

## ১২

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা সাংঘাতিক ভুল করেছিলাম। অমরেশ রাহা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, তার যে পিস্তলের লাইসেন্স থাকতে পারে একথা মনেই আসেনি।'

সত্যবতী বলিল, 'না, গোড়া থেকে বল।'

২রা জানুয়ারী। কলিকাতায় ফিরিয়া চলিয়াছি। ডি.এস.পি পাণ্ডে, মহীধরবাবু ও রজনী স্টেশনে আসিয়া আমাদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত মনে একত্র হইতে পারিয়াছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুটো জিনিস জট পাকিয়ে গিয়েছিল—এক, ছবি চুরি; দ্বিতীয়, ডাক্তার আর রজনীর গুপ্ত প্রণয়। ওদের প্রণয় গুপ্ত হলেও তাতে নিন্দের কিছু ছিল না। ওরা কলকাতায় গিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে। সম্ভবতঃ রজনীর মাসী আর মেসো জানেন, আর কেউ জানে না; মহীধরবাবুও না। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন কেউ জানবে না। মহীধরবাবু সেকেলে লোক নয়, তবু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে সাবেক সংস্কার ত্যাগ করতে পারেননি। তাই ওরা লুকিয়ে বিয়ে করে সব দিক রক্ষে করেছে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'খবরটা কি ডাক্তারের কাছে পেলে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'উঁহু। ডাক্তারকে ঘাঁটাইনি, ও যে রকম রুখে ছিল, কিছু বলতে গেলেই কামড়ে দিত। আমি রজনীকে আড়ালে বলেছিলাম, সব জানি। সে জিজ্ঞেস করেছিল, ব্যোমকেশবাবু, আমরা কি অন্যায় করেছি? আমি বলেছিলাম—না। তোমরা যে বিদ্রোহের ঝোঁকে মহীধরবাবুকে দুঃখ দাওনি, এতেই তোমাদের গৌরব। উগ্র বিদ্রোহে বেশী কাজ হয় না, কেবল বিরুদ্ধ শক্তিকে জাগিয়ে তোলা হয়। বিদ্রোহের সঙ্গে সহিষ্ণুতা চাই। তোমরা সুখী হবে।'

সত্যবতী বলিল, 'তারপর বল।'

ব্যোমকেশ বলিতে আরম্ভ করিল, 'ছবি চুরির ব্যাপারটাকে যদি হাল্কা ভাবে নাও তাহলে তার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু যদি গুরুতর ব্যাপার মনে কর, তাহলে তার একটিমাত্র ব্যাখ্যা হয়—ঐ গ্রুপের মধ্যে এমন একজন আছে যে নিজের চেহারা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চায়।

'কিন্তু কি উদ্দেশ্যে?—একটা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে ঐ দলে একজন দাগী আসামী আছে যে নিজের ছবির প্রচার চায় না। প্রস্তাবটা কিন্তু টেকসই নয়। ঐ গ্রুপে যারা আছে তারা কেউ লুকিয়ে বেড়ায় না, তাদের সকলেই চেনে। সুতরাং ছবি চুরি করার কোনও মানে হয় না।

'দাগী আসামীর সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি ঐ দলে এমন কেউ থাকে যে ভবিষ্যতে দাগী আসামী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, অর্থাৎ একটা গুরুতর অপরাধ করে কেটে পড়বার চেষ্টায় আছে, তাহলে সে নিজের ছবি লোপাট করবার চেষ্টা করবে। অজিত, তুমি তো লেখক, শুধু ভাষায় দ্বারা একটা লোকের এমন হুবহু বর্ণনা দিতে পার যাতে তাকে দেখলেই চেনা যায়?—পারবে না; বিশেষতঃ তার চেহারা যদি মামুলী হয় তাহলে একেবারেই পারবে না। কিন্তু একটা ফটোগ্রাফ মুহূর্তমধ্যে তার চেহারাখানা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পারে। তাই দাগী আসামীদের ফটো পুলিসের ফাইলে রাখা থাকে।

'তাহলে পাওয়া গেল, ঐ দলের একটা লোক গুরুতর অপরাধ করে ডুব মারবার ফন্দি আঁটছে। এখন প্রশ্ন এই—সংকল্পিত অপরাধটা কি এবং লোকটা কে?

'গ্রুপের লোকগুলিকে একে একে ধরা যাক।—মহীধরবাবু ডুব মারবেন না; তাঁর বিপুল সম্পত্তি আছে, চেহারাখানাও ডুব মারবার অনুকূল নয়। ডাক্তার ঘটক রজনীকে নিয়ে উধাও হতে পারে কিন্তু রজনী সাবালিকা, তাকে নিয়ে পালানো আইন-ঘটিত অপরাধ নয়। তবে ছবি চুরি করতে যাবে কেন? অধ্যাপক সোমকেও বাদ দিতে পার। সোম যদি শিকল কেটে ওড়বার সংকল্প করতেন তা হলেও স্রেফ ঐ ছবিটা চুরি করার কোনও মানে হত না। সোমের আরও ছবি আছে; নকুলেশবাবুর ঘরে তাঁর ফটো টাঙানো আছে আমরা দেখেছি। তারপর ধর নকুলেশবাবু; তিনি পিকনিকের দলে ছিলেন। তিনি মহীধরবাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করেছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে গা-ঢাকা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তিনি ফটো তুলেছিলেন, ফটোতে তাঁর চেহারা ছিল না। অতএব তাঁর পক্ষে ফটো চুরি করতে যাওয়া বোকামি।

'বাকি রয়ে গেলেন ডেপুটি ঊষানাথবাবু এবং ব্যাংক-ম্যানেজার অমরেশ রাহা। একজন সরকারী মালখানার মালিক, অন্যজন ব্যাঙ্কের কর্তা। দেখা যাচ্ছে, ফেরার হয়ে যদি কারুর লাভ থাকে তো এ'দের দু'জনের। দু'জনের হাতেই বিস্তর পরের টাকা; দু'জনেই চিনির বলদ।

'প্রথমে ঊষানাথবাবুকে ধর। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছে; চেহারাখানাও এমন যে ফটো না থাকলেও তাঁকে সনাক্ত করা চলে। তিনি চোখে কালো চশমা পরেন, চশমা খুললে দেখা যায় তাঁর একটা চোখ কানা। বেশীদিন পুলিসের সন্ধানী চক্ষু এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, তাঁর চরিত্রও এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করার প্রতিকূল।

'বাকি রইলেন অমরেশ রাহা। এটা অবশ্য নেতি প্রমাণ। কিন্তু তারপর তাঁকে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না। তাঁর চেহারা নিতান্ত সাধারণ, তাঁর মত লক্ষ লক্ষ বৈশিষ্ট্যহীন লোক পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি রেখেছেন। এ রকম দাড়ি রাখার সুবিধে, দাড়ি কামিয়ে ফেললেই চেহারা বদলে যায়, তখন চেনা লোক আর চিনতে পারে না। নকল দাড়ি পরার চেয়ে তাই আসল দাড়ি কামিয়ে ফেলা ছদ্মবেশ হিসেবে ঢের বেশী নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য।

'অমরেশবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি মাইনে ভালই পেতেন, তবু তাঁর মনে দারিদ্র্যের

ক্ষোভ ছিল; টাকার প্রতি দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল। আমার মনে হয় তিনি অনেকদিন ধরে এই কু-মতলব আঁটছিলেন। তাঁর আলমারিতে গুজরাটী বই দেখেছিলে মনে আছে? তিনি চেষ্টা করে গুজরাটী ভাষা শিখেছিলেন; হয়তো সংকল্প ছিল টাকা নিয়ে বোম্বাই অঞ্চলে গিয়ে বসবেন। বাঙালীদের সঙ্গে গুজরাটীদের চেহারার একটা ধাতুগত ঐক্য আছে, ভাষাটাও রপ্ত থাকলে কেউ তাঁকে সন্দেহ করতে পারবে না।

'সর্বাদক ভেবে আঁটঘাট বেঁধে তিনি তৈরী হয়েছিলেন। তারপর যখন সঙ্কল্পকে কাজে পরিণত করবার সময় হল তখন হঠাৎ কতকগুলো অপ্রত্যাশিত বাধা উপস্থিত হল। পিক্‌নিকের দলে গিয়ে তাঁকে ছবি তোলাতে হল। তিনি অনিচ্ছাভাবে ছবি তুলিয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু না তোলাতে লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। ভাবলেন, ছবি চুরি করে সামলে নেবেন।

'যাহোক, তিনি মহীধরবাবুর বাড়ি থেকে ছবি চুরি করলেন। পরদিন চায়ের পার্টিতে আমরা উপস্থিত ছিলাম; সেখানে যে সব আলোচনা হল তাতে অমরেশবাবু বুঝলেন তিনি একটা ভুল করেছেন। স্রেফ ছবিখানা চুরি করা ঠিক হয়নি। তাই পরের বার যখন তিনি ঊষানাথবাবুর বাড়িতে চুরি করতে গেলেন তখন আর কিছু না পেয়ে পরী চুরি করে আনলেন। আলমারিতে চাবি ঢুকিয়ে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন যাতে মনে হয় ছবি চুরি করাটা চোরের মূল উদ্দেশ্য নয়। অধ্যাপক সোমের ছবিটা চুরি করার দরকার হয়নি। আমার বিশ্বাস তিনি কোনও উপায়ে জানতে পেরেছিলেন যে, মালতী দেবী ছবিটা আগেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তিনি ছবি চুরি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ছবি তার আগেই নষ্ট করা হয়েছিল। হয়তো তিনি ছেঁড়া ছবির টুকরোগুলো পেয়েছিলেন।

'আমার আবির্ভাবে অমরেশবাবু শঙ্কিত হননি। তাঁর মূল অপরাধ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে; তিনি টাকা নিয়ে উধাও হবার পর সবাই জানতে পারবে, তখন আমি জানলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু ফাল্গুনী পালের প্রেতমূর্তি যখন এসে দাঁড়াল, তখন অমরেশবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাঁর সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে যাবার উপক্রম হল। ফাল্গুনী থাকতে ফটো চুরি করে কি লাভ? সে স্মৃতি থেকে ছবি এঁকে ফটোর অভাব পূরণ করে দেবে।

'কিন্তু পরকীয়া-প্রীতির মত বেআইনী কাজ করার একটা তীব্র উত্তেজনা আছে। অমরেশবাবু তার স্বাদ পেয়েছিলেন। তিনি এতদূর এগিয়ে আর পেছুতে পারছিলেন না। তাই ফাল্গুনী যেদিন তাঁর ছবি এঁকে দেখাতে এল সেদিন তিনি ঠিক করলেন ফাল্গুনীর বেঁচে থাকা চলবে না। সেই রাত্রে তিনি মদের বোতলে বেশ খানিকটা আফিম মিশিয়ে নিয়ে ফাল্গুনীর কুঁড়ে ঘরে গেলেন। ফাল্গুনীকে নেশার জিনিস খাওয়ানো শক্ত হল না। তারপর সে যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ল তখন তাকে তুলে কুয়োয় ফেলে দিলেন। আগের রাত্রে চুরি-করা পরীটা তিনি সঙ্গে এনেছিলেন, সেটাও কুয়োর মধ্যে গেল; যাতে পুলিস ফাল্গুনীকেই চোর বলে মনে করে। এই ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ রাত্রি এগারোটার পর, যখন বাগানের অন্য কোণে আর একটি মন্ত্রণা সভা শেষ হয়ে গেছে।

'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট থেকে মনে হয় ফাল্গুনী জলে পড়বার আগেই মরে গিয়েছিল। কিন্তু অমরেশবাবুর বোধ হয় ইচ্ছে ছিল সে বেঁচে থাকতে থাকতেই তাকে জলে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ হয় সে নেশার ঝোঁকে অপঘাতে জলে ডুবে মরেছে।

'যাহোক, অমরেশবাবু নিষ্কণ্টক হলেন। যে ছবিটা তিনি আমাদের দেখিয়েছিলেন, রওনা দেবার আগে সেটা পুড়িয়ে ফেললেই নিশ্চিন্ত, আর তাঁকে সনাক্ত করবার কোনও চিহ্ন থাকবে না।

'আমি যখন নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলাম এ অমরেশবাবুর কাজ, তখন পাণ্ডে সাহেবকে সব কথা বললাম। ভারি বুদ্ধিমান লোক, চট করে ব্যাপার বুঝে নিলেন। সেই থেকে এক মিনিটের জন্যেও অমরেশবাবু পুলিসের চোখের আড়াল হতে পারেননি।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, অমরেশ রাহা যে ঠিক ঐ দিনই পালাবে, এটা বুঝলে কি করে? অন্য যে কোনও দিন পালাতে পারত।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা কোনও ছুটির আগে পালানোর সুবিধে আছে, দু'দিন সময় পাওয়া যায়। দু'দিন পরে ব্যাঙ্ক খুললে যখন চুরি ধরা পড়বে, চোর তখন অনেক দূরে। অবশ্য বড়দিনের ছুটিতেও পালাতে পারত; কিন্তু তার দিক থেকে নববর্ষের ছুটিতেই পালানোর দরকার ছিল। অমরেশ রাহা যে-ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল সেটা কলকাতার একটা বড় ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিস। প্রত্যেক মাসের শেষে এখানে হেড আপিস থেকে মোটা টাকা আসত; কারণ পরের মাসের আরম্ভেই ব্যাঙ্কের টাকায় টান পড়বে। সাধারণ লোক ছাড়াও এখানে কয়েকটা খনি আছে, তাতে অনেক কর্মী কাজ করে, মাসের পয়লা তাদের মাইনে দিতে হয়। এবার সেই মোটা টাকাটা ব্যাঙ্কে এসেছিল বড়দিনের ছুটির পর। বড়দিনের ছুটির আগে পালালে অমরেশ রাহা বেশী টাকা নিয়ে যেতে পারত না। তার দুটি সুটকেশ থেকে এক লাখ আশী হাজার টাকার নোট পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ লম্বা হইয়া শুইল, বলিল, 'আর কোনও প্রশ্ন আছে?'

'দাড়ি কামালো কখন? ট্রেনে?'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কিনেছিল। ফার্স্ট ক্লাসে সহযাত্রীর সম্ভাবনা কম।'

সত্যবতী বলিল, 'মহীধরবাবুকে বেনামী চিঠি কে দিয়েছিল?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'প্রোফেসর সোম। কিন্তু বেচারার প্রতি অবিচার কোরো না। লোকটি শিক্ষিত এবং সজ্জন, এক ভয়ংকরী স্ত্রীলোকের হাতে পড়ে তাঁর জীবনটা নষ্ট হতে বসেছে। সোম সংসারের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সেদিকেও কিছু হল না, ডাক্তার ঘটকের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে গেলেন। তাই ঈর্ষার জ্বালায়—। ঈর্ষার মতন এমন নীচ প্রবৃত্তি আর নেই। কাম ক্রোধ লোভ—ষড়রিপুর মধ্যে সবচেয়ে অধম হচ্ছে মাৎসর্য।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'মালতী দেবীর অসুখের খুবই বাড়াবাড়ি যাচ্ছে। কারুর মৃত্যু-কামনা করতে নেই, কিন্তু মালতী দেবী যদি সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে এই বেলা স্বর্গারোহণ করেন তাহলে অন্তত আমি অসুখী হব না।'

আমিও মনে মনে সায় দিলাম।

# দুর্গরহস্য

## পূর্বখণ্ড

### ১

ব্যোমকেশের শরীর সারাইবার জন্য সাঁওতাল পরগণার যে শহরে হাওয়া বদলাইতে গিয়াছিলাম, বছর না ঘুরিতেই যে আবার সেখানে যাইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই। এবার কিন্তু স্বাস্থ্যের অন্বেষণে নয়, পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় যে নূতন শিকারের সন্ধান দিয়াছিলেন তাহারই অন্বেষণে ব্যোমকেশ ও আমি বাহির হইয়াছিলাম।

প্রথমবার যখন এ শহরে যাই, তখন এখানকার অনেকগুলি বাঙালীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু শহরের বাহিরেও যে একটি ধনী বাঙালী পরিবার বাস করেন, তাহা কেহ বলে নাই। এই পরিবারটিকে লইয়া এই বিচিত্র কাহিনী। সুতরাং তাহার কথাই সর্বাগ্রে বলিব। সব কথা অবশ্য একসঙ্গে জানিতে পারি নাই, ছাড়াছাড়া ভাবে কয়েকজনের মুখে শুনিলাম। পাঠকের সুবিধার জন্য আরম্ভেই সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া দিলাম।

শহরের দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ জংশন হইতে বিপরীত মুখে প্রায় ছয় মাইল পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটি বহু পুরাতন; বাদশাহী আমলের। বড় বড় চৌকশ পাথর দিয়া আচ্ছাদিত; পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ঘাস ও আগাছা জন্মিয়াছে, কিন্তু তবু রাস্তার উপর দিয়া মোটর চালানো যায়। দুই পাশের শিলাকর্কশ বন্ধুরতাকে দ্বিধা ভিন্ন করিয়া পথ এখনও নিজের কঠিন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

এই পথের সর্পিল গতি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে পাশাপাশি দুটি ক্ষুদ্র গিরিচূড়া। কালিদাসের বর্ণনা মনে পড়ে, 'মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ।' বেশী উঁচু নয়, কিন্তু দুটি চূড়ার মাঝখানে খাঁজ পড়িয়াছে। উপমা কালিদাসস্য বাদ দিলেও দৃশ্যটি লোভনীয়।

চূড়া দুটি নিরাভরণ নয়। একটির মাথায় প্রাচীন কালের এক দুর্গের ভগ্নাবশেষ; অন্যটির শীর্ষে আধুনিক কালের চুনকাম করা বাড়ি। বাড়ি এবং দুর্গের মালিক শ্রীরামকিশোর সিংহ সপরিবারে এই স্থানে বাস করেন।

এইখানে প্রাচীন দুর্গ ও তাহার আধুনিক মালিকের কিছু পরিচয় আবশ্যক। নবাব আলিবর্দীর আমলে জানকীরাম নামক জনৈক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি রাজা জানকীরাম খেতাব পাইয়া কিছুকাল সুবা বিহার শাসন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে তখন ক্রান্তিকাল আরম্ভ হইয়াছে; ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহী ভাঙিয়া পড়িতেছে; দুর্দম মারাঠা বর্গী বারম্বার বাঙলা বিহারে হানা দিয়া চারিদিক ছারখার করিয়া দিতেছে; ইংরেজ বণিক বাণিজ্যের খোলস ছাড়িয়া রাজদণ্ডের দিকে হাত বাড়াইতেছে। দেশজোড়া অশান্তি; রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র কাহারও চিত্তে সুখ নাই। রাজা জানকীরাম কুশাগ্রবুদ্ধি লোক ছিলেন; তিনি এই দুর্গম গিরি-সংকটের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈয়ার করাইয়া তাঁহার বিপুল ধনসম্পত্তি এবং পরিবারবর্গকে এইখানে রাখিলেন।

তারপর রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রবল প্লাবনে অনেক কিছুই ভাসিয়া গেল। কিন্তু জানকী-রামের এই নিভৃত দুর্গ নিরাপদে রহিল। তাঁহার বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতে লাগিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর আরও একশত বছর কাটিয়া গেল।

কোম্পানীর শাসনে দেশ অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। জানকীরামের দুর্গে তাঁহার অধস্তন চতুর্থ ও পঞ্চম পুরুষ বিদ্যমান—রাজারাম ও তৎপুত্র জয়রাম। রাজারাম বয়স্থ ব্যক্তি, পুত্র জয়রাম যুবক। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত অর্থ ও পারিপার্শ্বিক জমিদারীর আয় হইতে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা চলিতেছে। সঞ্চিত অর্থ এই কয় পুরুষে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া আরও বাড়িয়াছে। জানকীরামের বংশধরদের স্বভাব ছিল টাকা হাতে আসিলেই তাহা স্বর্ণে রূপান্তরিত করিয়া রাখা; এইভাবে রাশি রাশি মোহর আসরফি তৈজস সঞ্চিত হইয়া ছিল। কাহারও কোনও প্রকার বদ্‌খেয়াল ছিল না। এই জঙ্গলের মধ্যে বিলাস-ব্যসনের অবকাশ কোথায়?

হঠাৎ দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন কেবল নগরগুলির মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না। দাবানলের মত বনে জঙ্গলেও প্রসারিত হইল।

রাজারাম সংসারের কর্তা, তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। চারিদিকে লুঠতরাজ; কোথাও ইংরেজ দলের সিপাহীরা লুঠ করিতেছে, কোথাও বিদ্রোহী সিপাহীরা লুঠ করিতেছে। রাজারাম খবর পাইলেন একদল সিপাহী এইদিকে আসিতেছে। তিনি সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু সম্পত্তি রক্ষা করিবেন কী উপায়ে? শতবর্ষের পুরাতন দুর্গটি সুশিক্ষিত আগ্নেয়াস্ত্রধারী শত্রুর আক্রমণ রোধ করিতে সমর্থ নয়। দুর্গের জীর্ণ তোরণদ্বার একটি গোলার আঘাতেই উড়িয়া যাইবে। দুর্গে একটি বড় কামান আছে বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল অব্যবহারের ফলে উহা মরিচা পড়িয়া অকর্মণ্য হইয়াছে, উহার গোড়ার দিকের লৌহকপাট এমন জাম হইয়া গিয়াছে যে খোলা যায় না। তাছাড়া যে-কয়টি গাদা বন্দুক আছে, তাহার দ্বারা জঙ্গলে হরিণ শিকার বা চোর তাড়ানো চলিতে পারে, লুণ্ঠন-লোলুপ সিপাহীর দলকে ঠেকাইয়া রাখা একেবারেই অসম্ভব।

রাজারাম উপযুক্ত পুত্রের সহিত পরামর্শ করিয়া পরিবারস্থ নারী ও শিশুদের স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দুর্গ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি সাঁওতাল পল্লী ছিল, স্ত্রী পুত্র-বধূ ও দুই তিনটি নাতি-নাতনীকে সেইখানে পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের সমস্ত ভৃত্য ও কর্মচারী সেই সঙ্গে গেল; কেবল পুত্র জয়রাম সহ রাজারাম দুর্গে রহিলেন। বিদায়কালে রাজারাম গৃহিণীর অঞ্চলে কয়েকটি মোহর বাঁধিয়া দিলেন। বেশী মোহর দিতে সাহস হইল না, কি জানি বেশী সোনার লোভে পরিচরেরাই যদি বেইমানি করে। তারপর তাহারা প্রস্থান করিলে পিতাপুত্র মিলিয়া সঞ্চিত সোনা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন দিন পরে ফিরিঙ্গী নায়কের অধীনে একদল সিপাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজারামের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল, সোনা দানা লুকাইয়া রাখিয়া নিজেও পুত্রকে লইয়া দুর্গ হইতে অন্তর্হিত হইবেন; কিন্তু তাঁহারা পলাইতে পারিলেন না। সিপাহীরা অতর্কিতে উপস্থিত হইয়া নির্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিল।

তারপর দুর্গের মধ্যে কি হইল কেহ জানে না। দুই দিন পরে সিপাহীরা চলিয়া গেল। রাজারাম ও জয়রামকে কিন্তু ইহলোকে আর কেহ দেখিল না। শূন্য দুর্গ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে দেশ শান্ত হইল। কয়েক মাস পরে রাজারামের পরিবার ও অনুচরগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিল দুর্গের পাথরগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই; তুলিয়া লইয়া যাইবার মত যাহা কিছু ছিল সিপাহীরা লইয়া গিয়াছে। দুর্গের স্থানে স্থানে, এমন কি ঘরের মেঝেয় সিপাহীরা পাথর তুলিয়া গর্ত খুঁড়িয়াছে; বোধকরি ভূ-প্রোথিত ধনরত্নের সন্ধান করিয়াছে। কিছু পাইয়াছে কিনা অনুমান করা যায় না, কারণ রাজারাম কোথায় ধনরত্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল তিনি এবং জয়রাম জানিতেন। হয়তো সিপাহীরা সব কিছুই লুটিয়া লইয়া গিয়াছে; হয়তো কিছুই পায় নাই, তাই পিতাপুত্রকে হত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

অসহায়া দুইটি নারী কয়েকটি শিশুকে লইয়া কিছুকাল দুর্গে রহিল, কিন্তু যে দুর্গ একদিন গৃহ ছিল তাহা এখন শ্মশান হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমে ভৃত্য ও কর্মচারীরা একে একে

খসিয়া পড়িতে লাগিল; কারণ সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য শুধু গৃহই যথেষ্ট নয়, অন্নবস্ত্রেরও প্রয়োজন। অবশেষে একদিন দুইটি বিধবা শিশুগুলির হাত ধরিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা কোথায় গিয়া আশ্রয় পাইল তাহার কোনও ইতিহাস নাই। সম্ভবতঃ বাংলা দেশে কোনও দূর আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় পাইল। পরিত্যক্ত দুর্গ শৃগালের বাসভূমি হইল।

অতঃপর প্রায় ষাট বছর এই বংশের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বংশের দুইটি যুবক আবার মাথা তুলিলেন। রামবিনোদ ও রামকিশোর সিংহ দুই ভাই। দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহারা মানুষ হইয়াছিলেন, কিন্তু বংশের ঐতিহ্য ভোলেন নাই। দুই ভাই ব্যবসা আরম্ভ করিলেন, এতদিন পরে কমলা আবার তাঁহাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথমে ঘৃতের, পরে লোহার কারবার করিয়া তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিলেন।

বড় ভাই রামবিনোদ কিন্তু বেশিদিন বাঁচিলেন না। যৌবন কালেই হঠাৎ রহস্যময়ভাবে তাঁহার মৃত্যু হইল। রামকিশোর একাই ব্যবসা চালাইলেন এবং আরও অর্থ অর্জন করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। রামকিশোর বিবাহ করিলেন, তাঁহার পুত্রকন্যা জন্মিল। তারপর বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষে রামকিশোর প্রাচীন কালের পৈতৃক সম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করিয়া দুর্গের পাশের দ্বিতীয় চূড়ায় নূতন গৃহ নির্মাণ করাইলেন, আশেপাশে বহু জমিদারী কিনিলেন এবং সপরিবারে শৈল-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। দুর্গটিকেও পূর্ব গৌরবের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ অল্প-বিস্তর মেরামত করানো হইল; কিন্তু তাহা আগের মতই অব্যবহৃত পড়িয়া রহিল।

## ২

পাথরের পাটি বসানো সাবেক পথটি গিরিচূড়ার পাদমূলে আসিয়া শেষ হয় নাই কিছুদূর চড়াই উঠিয়াছে। যেখানে চড়াই আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে পাথরের ধারে একটি বৃহৎ কূপ। কূপের সরসতায় পুষ্ট হইয়া কয়েকটি বড় বড় গাছ তাহার চারিপাশে ব্যূহ রচনা করিয়াছে।

এখান হইতে রাস্তা প্রায় পঞ্চাশ গজ চড়াই উঠিয়া একটি দেউড়ির সম্মুখে শেষ হইয়াছে। তারপর পাথর-বাঁধানো সিঁড়ি সর্পজিহ্বার মত দুই ভাগ হইয়া দুই দিকে গিয়াছে; একটি গিয়াছে দুর্গের তোরণদ্বার পর্যন্ত, অন্যটি রামকিশোরের বাসভবনে উপনীত হইয়াছে।

দেউড়িতে মোটর রাখিবার একটি লম্বা ঘর এবং চালকের বাসের জন্য ছোট ছোট দুটি কুঠুরি। এখানে রামকিশোরের সাবেক মোটর ও তাহার সাবেক চালক বুলাকিলাল থাকে।

এখান হইতে সিঁড়ির যে ধাপগুলি রামকিশোরের বাড়ির দিকে উঠিয়াছে, সেগুলি একেবারে খাড়া ওঠে নাই, একটু ঘুরিয়া পাহাড়ের অঙ্গ বেড়িয়া উঠিয়াছে। চওড়া সিঁড়িগুলি বাড়ির সদর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

পাহাড়ের মাথার উপর জমি চৌরস করিয়া তাহার মাঝখানে বৃহৎ বাড়ি। বাড়ি ঘিরিয়া ফল-ফুলের বাগান, বাগান ঘিরিয়া ফণি-মনসার বেড়া। এখানে দাঁড়াইলে পাশেই শত হস্ত দূরে সর্বোচ্চ শিখরে ধূম্রবর্ণ দুর্গ দেখা যায়, উত্তরদিকে ছয় মাইল দূরে শহরটি অস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়ে। দক্ষিণে চড়াইয়ের মূলদেশ হইতে জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে; যতদূর দৃষ্টি যায় নিবিড় তরুশ্রেণী। এ জঙ্গলটিও রামকিশোরের সম্পত্তি। শাল সেগুন আবলুস কাঠ হইতে বিস্তর আয় হয়।

রামকিশোর যখন প্রথম এই গৃহে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশের নীচেই; শরীরও বেশ মজবুত এবং নীরোগ। তথাপি অর্থোপার্জনের জন্য দৌড়াদৌড়ির

আর প্রয়োজন নাই বলিয়াই বোধ করি তিনি স্বেচ্ছায় এই অজ্ঞাতবাস বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন তাঁহার স্ত্রী, দুইটি পুত্র, একটি কন্যা, বহু চাকর-বাকর এবং প্রবীণ নায়েব চাঁদমোহন দত্ত।

ক্রমে রামকিশোরের আর একটি পুত্র ও কন্যা জন্মিল। তারপর তাঁহার স্ত্রী গত হইলেন। পাঁচটি পুত্র-কন্যার লালন-পালনের ভার রামকিশোরের উপর পড়িল।

পুত্র-কন্যারা বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রামকিশোর কিন্তু পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারিলেন না। বড় হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পুত্র-কন্যাগুলির স্বভাব প্রকটিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই বন্য স্থানে সকল সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার ফলে হয়তো তাহাদের চরিত্র বিকৃত হইয়াছিল। বড় ছেলে বংশীধর দুর্দান্ত ক্রোধী, রাগ হইলে তাহার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে স্থানীয় স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া বহরমপুর কলেজে পড়িতে গেল। কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেখানে কি একটা অতি গর্হিত দুষ্কর্ম করার ফলে তাহাকে কলেজ ছাড়িতে হইল। কলেজের কর্তৃপক্ষ তাহার দুষ্কৃতির স্বরূপ প্রকাশ করিলেন না; কলেজের একজন অধ্যাপক ছিলেন রামকিশোরের বাল্যবন্ধু, তিনি ব্যাপারটাকে চাপা দিলেন। এমন কি রামকিশোরও প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন না। তিনি জানিতে পারিলে হয়তো অনর্থ ঘটিত।

বংশীধর আবার বাড়িতে আসিয়া বসিল। বাপকে বলিল, সে আর লেখাপড়া করিবে না, এখন হইতে জমিদারী দেখাশুনা করিবে। রামকিশোর বিরক্ত হইয়া বকাবকি করিলেন, কিন্তু ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিলেন না। বংশীধর জমিদারী তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল। নায়েব চাঁদমোহন দত্ত হাতে ধরিয়া তাহাকে কাজ শিখাইলেন।

যথাসময়ে রামকিশোর বংশীধরের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের কয়েক মাস পরেই বধূর অপঘাত মৃত্যু হইল। বংশীধর গৃহে ছিল না, জমিদারী পরিদর্শনে গিয়াছিল। একদিন সকালে বধূকে গৃহে পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দুই চূড়ার মধ্যবর্তী খাঁজের মধ্যে তাহার মৃতদেহ পাওয়া গেল। বধূ বোধ করি রাত্রে কোনও কারণে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া খাদের কিনারায় গিয়াছিল, তারপর পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িয়াছে। মৃত্যু রহস্যজনক। বংশীধর ফিরিয়া আসিয়া বধূর মৃত্যুর সংবাদে একেবারে ফাটিয়া পড়িল; উন্মত্ত ক্রোধে ভাই বোন কাহাকেও সে দোষারোপ করিতে বিরত হইল না। ইহার পর হইতে তাহার ভীষণ প্রকৃতি যেন ভীষণতর হইয়া উঠিল।

রামকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র মুরলীধর; বংশীধরের চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। গিরগিটির মত রোগা হাড়-বাহির করা চেহারা, ধূর্তামিভরা ছুঁচালো মুখ; চোখ এমন সাংঘাতিক ট্যারা যে, কখন কোন্ দিকে তাকাইয়া আছে বুঝিতে পারা যায় না। তার উপর মেরুদণ্ডের ন্যুব্জতা শীর্ণ দেহটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিয়াছে। মুরলীধর জন্মাবধি বিকলাঙ্গ। তাহার চরিত্রও বংশীধরের বিপরীত; সে রাগী নয়, মিটমিটে শয়তান। কিশোর বয়সে দুই ভায়ে একবার ঝগড়া হইয়াছিল, বংশী মুরলীর গালে একটি চড় মারিয়াছিল। মুরলীর গায়ে জোর নাই। সে তখন চড় হজম করিয়াছিল; কিন্তু কয়েকদিন পরে বংশী হঠাৎ এমন ভেদবমি আরম্ভ করিল যে যায়-যায় অবস্থা। এ ব্যাপারে মুরলীর যে কোনও হাত আছে তাহা ধরা গেল না; কিন্তু তদবধি বংশী আর কোনও দিন তাহার গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে নাই। তর্জন গর্জন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

মুরলীধর লেখাপড়া শেখে নাই, তার উপর ওই চেহারা; বাপ তাহার বিবাহ দিলেন না। সে আপন মনে থাকে এবং দিবারাত্র পান-সুপারি চিবায়। তাহার একটি খাস চাকর আছে, নাম গণপৎ। গণপৎ মুরলীধরেরই সমবয়স্ক; বেঁটে নিরেট চেহারা, গোল মুখ, চক্ষু দুটিও গোল, ভ্রূযুগল অর্ধচন্দ্রাকৃতি। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে সর্বদাই শিশুসুলভ বিস্ময়ে আবিষ্ট হইয়া আছে। অথচ তাহার মত দুষ্ট খুব কম দেখা যায়। এমন দুষ্কর্ম নাই যাহা গণপতের অসাধ্য; নারীহরণ হইতে গৃহদাহ পর্যন্ত, প্রভুর আদেশ পাইলে সে সব কিছুই করিতে পারে। প্রভু-ভৃত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শোনা

যায়, ইহারা দুইজনে মিলিয়া অনেক দুষ্কৃতি করিয়াছে, কিন্তু কখনও ধরা পড়ে নাই।

রামকিশোরের তৃতীয় সন্তানটি কন্যা, নাম হরিপ্রিয়া। সে মুরলীধর অপেক্ষা বছর চারেকের ছোট; দেখিতে শুনিতে ভালই, কোনও শারীরিক বিকলতা নাই। কিন্তু তাহার চোখের দৃষ্টি যেন বিষমাখানো। মনও ঈর্ষার বিষে ভরা। হরিপ্রিয়া নিজের ভাই-বোনদের দু'চক্ষে দেখিতে পারিত না। সকলের ছিদ্রান্বেষণ, পান হইতে চুণ খসিলে তীব্র অসন্তোষ এবং তদুপযোগী বচন-বিন্যাস, এই ছিল হরিপ্রিয়ার স্বভাব। বংশীধরের বিবাহের পর যখন নববধূ ঘরে আসিল, তখন হরিপ্রিয়ার ঈর্ষার জ্বালা দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। বধূটি ভালমানুষ ও ভীরু স্বভাব; হরিপ্রিয়া পদে পদে তাহার খুঁৎ ধরিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া বাক্যবাণে জর্জর করিয়া তুলিল।

তারপর অকস্মাৎ বধূর মৃত্যু হইল। এই দুর্যোগ কাটিয়া যাইবার কয়েক মাস পরে রামকিশোর কন্যার বিবাহ দিলেন। শ্বশুর-ঘর করিতে পারিবে না বুঝিয়া তিনি দেখিয়া শুনিয়া একটি গরীব ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিলেন। ছেলেটির নাম মণিলাল; লেখাপড়ায় ভাল, বি. এস-সি. পাশ করিয়াছে; স্বাস্থ্যবান, শান্ত প্রকৃতি, বিবাহের পর মণিলাল শ্বশুরগৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইল।

হরিপ্রিয়া ও মণিলালের দাম্পত্য জীবন সুখের হইল কিনা বাহির হইতে বোঝা গেল না। মণিলাল একেই চাপা প্রকৃতির যুবক, তার উপর দরিদ্র ঘরজামাই; অ-সুখের কারণ ঘটিলেও সে নীরব রহিল। হরিপ্রিয়াও নিজের স্বামীকে অন্যের কাছে লঘু করিল না। বরং তাহার ভ্রাতারা মণিলালকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করিলে সে ফোঁস করিয়া উঠিত।

একটি বিষয়ে নবদম্পতির মধ্যে প্রকাশ্য ঐক্য ছিল। মণিলাল বিবাহের পর শ্বশুরের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্যালকদের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, কাহারও প্রতি অনুরাগ বিরাগ ছিল না; কিন্তু শ্বশুরের প্রতি যে তাহার অসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহা তাহার প্রতি বাক্যে ও আচরণে প্রকাশ পাইত। হরিপ্রিয়াও পিতাকে ভালবাসিত; পিতাকে ছাড়া আর কাহাকেও বোধ হয় সে অন্তরের সহিত ভালবাসিত না। ভালবাসিবার শক্তি হরিপ্রিয়ার খুব বেশী ছিল না।

হরিপ্রিয়ার পর দু'টি ভাই বোন; কিশোর বয়স্ক গদাধর এবং সর্বকনিষ্ঠা তুলসী। গদাধর একটু হাবলা গোছের, বয়সের অনুযায়ী বুদ্ধি পরিণত হয় নাই। কাছা কোঁচার ঠিক থাকে না, অকারণে হি হি করিয়া হাসে। লেখাপড়ায় তাহারও মন নাই; গুল্‌তি লইয়া বনে পাখি শিকার করিয়া বেড়ানো তাহার একমাত্র কাজ।

এই কাজে ছোট বোন তুলসী তাহার নিত্য সঙ্গিনী। তুলসীর বুদ্ধি কিন্তু গদাধরের মত নয়, বরং বয়সের অনুপাতে একটু বেশী। ছিপছিপে শরীর, সুশ্রী পাৎলা মুখ, অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতি। দুপুরবেলা জঙ্গলের মধ্যে পাখির বাসা বা খরগোশের গর্ত খুঁজিয়া বেড়ানো এবং সকল বিষয়ে গদাধরের অভিভাবকতা করা তাহার কাজ। বাড়িতে কে কোথায় কি করিতেছে কিছুই তুলসীর চক্ষু এড়ায় না। সে কখন কোথায় থাকে তাহাও নির্ণয় করা কাহারও সাধ্য নয়। তবু সব ভাইবোনের মধ্যে তুলসীকেই বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ ও প্রকৃতিস্থ বলা চলে।

রামকিশোরের সংসারে পুত্রকন্যা ছাড়া আর একটি পোষ্য ছিল যাহার পরিচয় আবশ্যক। ছেলেটির নাম রমাপতি। দুঃস্থ স্বজাতি দেখিয়া রামকিশোর তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। রমাপতি ম্যাট্রিক পাস; সে গদাধর ও তুলসীকে পড়াইবে এই উদ্দেশ্যেই রামকিশোর তাহাকে গৃহে রাখিয়াছিলেন। রমাপতির চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সহিত মাস্টারের সাক্ষাৎকার বড় একটা ঘটিয়া উঠিত না। রমাপতি মুখচোরা ও লাজুক স্বভাবের ছেলে, ছাত্র-ছাত্রী তাহাকে অগ্রাহ্য করিত; বাড়ির অন্য সকলে তাহার অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব লক্ষ্যই করিত না। এমনিভাবে দু'বেলা দু'মুঠি অন্ন ও আশ্রয়ের জন্য রমাপতি বাড়ির এক কোণে পড়িয়া থাকিত।

নায়েব চাঁদমোহন দত্তের উল্লেখ পূর্বেই হইয়াছে। তিনি রামকিশোর অপেক্ষা পাঁচ-ছয়

বছরের বড়; রামকিশোরের কর্ম-জীবনের আরম্ভ হইতে তাঁহার সঙ্গে আছেন। বংশীধর জমিদারী পরিচালনার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার পর তাঁহার একপ্রকার ছুটি হইয়াছিল। কিন্তু তবু তিনি কাজকর্মের দিকে সতর্কদৃষ্টি রাখিতেন; আয় ব্যয় হিসাব নিকাশ সমস্তই তাঁহার অনুমোদনের অপেক্ষা রাখিত। লোকটি অতিশয় হুঁসিয়ার ও বিষয়জ্ঞ; দীর্ঘকাল একত্র থাকিয়া বাড়ির একজন হইয়া গিয়াছিলেন।

রামকিশোর পারিবারিক জীবনে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু স্নেহের বশে এবং বয়োধর্মে মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পায়। যৌবনকালে তাঁহার প্রকৃতি দুর্জয় ও অসহিষ্ণু ছিল, এখন অনেকটা নরম হইয়াছে। পূর্বে পুরুষকারকেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতেন, এখন অদৃষ্টকে একেবারে অস্বীকার করেন না। ধর্মকর্মের প্রতি অধিক আসক্তি না থাকিলেও ঠাকুরদেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, হয়তো তাঁহার প্রভাব রামকিশোরের জীবনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। অন্তত পুত্র-কন্যাদের নামকরণের মধ্যে সে প্রভাবের ছাপ রহিয়া গিয়াছে।

তবু, কদাচিৎ কোনও কারণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার প্রচণ্ড অন্তঃপ্রকৃতি বাহির হইয়া আসিত, কলসীর মধ্যে আবদ্ধ দৈত্যের মত কঠিন হিংস্র ক্রোধ প্রকাশ হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার সম্মুখে কেহ দাঁড়াইতে পারিত না, এমন কি বংশীধর পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া যাইত। তাঁহার ক্রোধ কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইত না, দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার দপ করিয়া নিভিয়া যাইত।

৩

হরিপ্রিয়ার বিবাহের আট নয় মাস পরে শীতের শেষে একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কুয়ার সন্নিকটে আস্তানা গাড়িল। তাহাদের সঙ্গে একপাল গাধা কুকুর মুরগী সাপ প্রভৃতি জন্তুজানোয়ার। তাহারা রাত্রে ধুনি জ্বালিয়া মদ্যপান করিয়া মেয়ে-মদ্দ নাচগান হুল্লোড় করে, দিনের বেলা জঙ্গলে কাঠ কাটে, ফাঁদ পাতিয়া বনমোরগ খরগোশ ধরে, কূপের জল যথেচ্ছা ব্যবহার করে। বেদে জাতির নীতিজ্ঞান কোনও কালেই খুব প্রখর নয়।

রামকিশোর প্রথমটা কিছু বলেন না, কিন্তু ক্রমে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা, গদাধর ও তুলসী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বেদের তাঁবুগুলির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অনেক শাসন করিয়াও তাহাদের বিনিদ্র কৌতূহল দমন করা গেল না। বাড়ির বয়স্থ লোকেরা অবশ্য প্রকাশ্যে বেদে-পল্লীকে পরিহার করিয়া চলিল; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে বাড়ির চাকর-বাকর এবং মালিকদের মধ্যে কেহ কেহ যে সেখানে পদার্পণ করিত তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। বেদেনী যুবতীদের রূপ যত না থাক মোহিনী শক্তি আছে।

হপ্তাখানেক এইভাবে কাটিবার পর একদিন কয়েকজন বেদে-বেদেনী একেবারে রাম-কিশোরের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শিলাজিৎ, কস্তুরী মৃগের নাভি, সাপের বিষ, গন্ধকমিশ্র সাবান প্রভৃতির পসরা খুলিয়া বসিল। বংশীধর উপস্থিত ছিল, সে মার-মার করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। রামকিশোর হুকুম দিলেন, আজই যেন তাহারা এলাকা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

বেদেরা এই আদেশ পালন করিল বটে, কিন্তু পুরাপুরি নয়। সন্ধ্যার সময় তাহারা ডেরাডাণ্ডা তুলিয়া দুই তিন শত গজ দূরে জঙ্গলের কিনারায় গিয়া আবার আস্তানা গাড়িল। পরদিন সকালে বংশীধর তাহা দেখিয়া একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। বন্দুক লইয়া সে তাঁবুতে উপস্থিত হইল, সঙ্গে কয়েকজন চাকর। বংশীধরের হুকুম পাইয়া চাকরেরা বেদেদের পিটাইতে আরম্ভ করিল, বংশীধর বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিল। এবার বেদেরা সত্যই এলাকা ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

আপদ দূর হইল বটে, কিন্তু নায়েব চাঁদমোহন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'কাজটা বোধহয় ভাল হল না। ব্যাটারা ভারি শয়তান, হয়তো অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে।'

বংশীধর উদ্ধতভাবে বলিল, 'কি অনিষ্ট করতে পারে ওরা?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'তা কি বলা যায়। হয়তো কুয়োয় বিষ ফেলে দিয়ে যাবে, নয়তো জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেবে—'

কিছুদিন সকলে সতর্ক রহিলেন, কিন্তু কোনও বিপদাপদ ঘটিল না। বেদেরা কোনও প্রকার অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে নাই, কিম্বা করিলেও তাহা ফলপ্রসূ হয় নাই।

মাসখানেক পরে রামকিশোর পরিবারবর্গকে লইয়া জঙ্গলের মধ্যে বনভোজনে গেলেন। ইহা তাঁহার একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান। বনের মধ্যে চাঁদোয়া টাঙানো হয়; ভৃত্যেরা পাঁঠা কাটিয়া রন্ধন করে; ছেলেরা বন্দুক লইয়া জঙ্গলের মধ্যে পশুপক্ষীর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কর্তা চাঁদোয়ার তলে বসিয়া চাঁদমোহনের সঙ্গে দু'চার বাজি দাবা খেলেন। তারপর অপরাহ্নে সকলে গৃহে ফিরিয়া আসেন।

সকালবেলা দলবল লইয়া রামকিশোর উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। ঘন শালবনের মধ্যে একটি স্থান পরিষ্কৃত হইয়াছে; মাটির উপর শতরঞ্চি পাতা, মাথার উপর চন্দ্রাতপ। পাচক উনান জ্বালিতেছে, চাকর-বাকর রান্নার উদ্যোগ করিতেছে। মোটর চালক বুলাকিলাল একরাশ সিদ্ধির পাতা লইয়া হামান্‌দিস্তায় কুটিতে বসিয়াছে, বৈকালে ভাঙের সরবৎ হইবে। আকাশে স্বর্ণাভ রৌদ্র, শালবনের ছায়ায় স্নিগ্ধ হইয়া বাতাস মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও কোনও দুর্লক্ষণের চিহ্নমাত্র নাই।

দুই বৃদ্ধ চন্দ্রাতপতলে বসিয়া দাবার ছক পাতিলেন; আর সকলে বনের মধ্যে এদিক ওদিক অদৃশ্য হইয়া গেল। বংশীধর বন্দুক কাঁধে ফেলিয়া এক দিকে গেল, মুরলীধর নিত্যসঙ্গী গণপৎকে লইয়া অন্য দিকে শিকার সন্ধানে গেল। দু'জনেই ভাল বন্দুক চালাইতে পারে। গদাধর ও তুলসী একসঙ্গে বাহির হইল; মাস্টার রমাপতি দূরে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। কারণ ঘন জঙ্গলের মধ্যে বালকবালিকার পথ হারানো অসম্ভব নয়। রামকিশোর বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ওদের চোখে চোখে রেখো।'

জামাই মণিলাল একখানা বই লইয়া আস্তানা হইতে কিছু দূরে একটা গাছের আড়ালে গিয়া বসিল। রামকিশোর তাহাকে তন্ত্র সম্বন্ধে একটি ইংরেজি বই দিয়াছিলেন, তাহাই সে মনোযোগের সহিত দাগ দিয়া পড়িতেছিল। তাহার শিকারের শখ নাই।

বাকি রহিল কেবল হরিপ্রিয়া। সে কিছুক্ষণ রান্নার আয়োজনের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইল, একবার স্বামীর গাছতলার দিকে গেল, তারপর একাকিনী বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। আজ একদিনের জন্য সকলে স্বাধীন হইয়াছে; একই বাড়িতে এতগুলো লোক একসঙ্গে থাকিয়া যেন পরস্পরের সান্নিধ্যে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাই বনের মধ্যে ছাড়া পাইয়া একটু নিঃসঙ্গতা উপভোগ করিয়া লইতেছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। দুই বৃদ্ধ খেলায় মগ্ন হইয়া গিয়াছেন, জঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে থাকিয়া থাকিয়া বন্দুকের আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, রন্ধনের সুগন্ধ বাতাস আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে গিরিচূড়ায় চুণকাম করা বাড়ি এবং ভাঙা দুর্গ দেখা যাইতেছে। বেশী দূর নয়, বড় জোর আধ মাইল। ভাঙা দুর্গের ছায়া মাঝের খাদ লঙ্ঘন করিয়া সাদা বাড়ির উপর পড়িয়াছে।

হঠাৎ একটা তীব্র একটানা চীৎকার অলস বনমর্মরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। দাবা খেলোয়াড় দুইজন চমকিয়া চোখ তুলিলেন। গাছের তলায় মণিলাল বই ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল, তুলসী শালবনের আলোছায়ার ভিতর দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে এবং তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

তুলসী চাঁদোয়া পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই মণিলাল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কাঁধে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, 'এই তুলসী! কি হয়েছে! চেঁচাচ্ছিস কেন?'

তুলসী পাগলের মত ঘোলাটে চোখ তুলিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর আগের

মতই চীৎকার করিয়া বলিল,—'দিদি! গাছতলায় পড়ে আছে—বোধহয় মরে গেছে! শীগ্‌গির এসো—বাবা, জেঠামশাই, শীগ্‌গির এসো।'

তুলসী যেদিক হইতে আসিয়াছিল আবার সেই দিকে ছুটিয়া চলিল; মণিলালও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। দুই বৃদ্ধ আলুথালুভাবে তাহাদের অনুসরণ করিলেন।

প্রায় দুইশত গজ দূরে ঘন গাছের ঝোপ; তুলসী ঝোপের কাছে আসিয়া একটা গাছের নীচে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। হরিপ্রিয়া বাসন্তী রঙের শাড়ি পরিয়া আসিয়াছিল, দেখা গেল সে ছায়াঘন গাছের তলায় পড়িয়া আছে, আর, কে একটা লোক তাহার শরীরের উপর ঝুঁকিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে।

পদশব্দ শুনিয়া রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ ভয়ে শীর্ণ, সে স্খলিত স্বরে বলিল, 'সাপ! সাপে কামড়েছে।'

মণিলাল তাহাকে ঠেলিয়া দূরে সরাইয়া দিল, তারপর দুই বাহু দ্বারা হরিপ্রিয়াকে তুলিয়া লইল। হরিপ্রিয়ার তখন জ্ঞান নাই। বাঁ পায়ের গোড়ালির উপর সাপের দাঁতের দাগ; পাশাপাশি দুটি রক্তবর্ণ চিহ্ন।

## ৪

হরিপ্রিয়া বাঁচিল না, বাড়িতে লইয়া যাইতে যাইতে পথেই তাহার মৃত্যু হইল।

জঙ্গলে ইতিপূর্বে কেহ বিষধর সাপ দেখে নাই। এবারও সাপ চোখে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাপের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না; এবং ইহা যে বেদেদের কাজ, তাহারাই প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে সাপ কিম্বা সাপের ডিম ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে, তাহাও একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু বেদের দল তখন বহুদূরে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধান পাওয়া গেল না।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কিছুদিন রামকিশোরের বাড়ির উপর অভিশাপের মত একটা থমথমে ছায়া চাপিয়া রহিল। রামকিশোর তাঁহার সকল সন্তানদের মধ্যে হরিপ্রিয়াকেই বোধহয় সবচেয়ে বেশী ভালবাসিতেন; তিনি দারুণ আঘাত পাইলেন। মণিলাল অতিশয় সম্বৃতচরিত্র যুবক, কিন্তু সেও এই আকস্মিক বিপর্যয়ে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হইয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে তাহার নবগঠিত জীবনের ভিত্তি একেবারে ধ্বসিয়া গিয়াছিল।

আর একজন এই অনর্থপাতে গুরুতর ভাবে অভিভূত হইয়াছিল, সে তুলসী। তুলসী যে তাহার দিদিকে খুব বেশী ভালবাসিত তা নয়, বরং দুই বোনের মধ্যে খিটিমিটি লাগিয়াই থাকিত। হরিপ্রিয়া সুযোগ পাইলেই তুলসীকে শাসন করিত, ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিত। তবু, হরিপ্রিয়ার মৃত্যু চোখের সামনে দেখিয়া তুলসী কেমন যেন বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন বনের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সে অদূরে গাছতলায় হলুদবর্ণ শাড়ি দেখিয়া সেই দিকে গিয়াছিল; তারপর দিদিকে ঐভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ভীতভাবে ডাকাডাকি করিয়াছিল। হরিপ্রিয়া কেবল একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সেই হইতে তুলসীর ধন্দ লাগিয়া গিয়াছিল। ভূতগ্রস্তের মত শঙ্কিত চক্ষু মেলিয়া সে বাড়িময় ঘুরিয়া বেড়াইত; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিত। তাহার অপরিণত স্নায়ুমণ্ডলীর উপর যে কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীধর এবং মুরলীধরও ধাক্কা পাইয়াছিল কিন্তু এতটা নয়। বংশীধর গুম হইয়া গিয়াছিল; মনে মনে সে হয়তো হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য নিজেকে দোষী করিতেছিল; বেদেদের উপর অতটা জুলুম না করিলে বোধ হয় এ ব্যাপার ঘটিত না। মুরলীধরের বাহ্য

চালচলনে কোনও পরিবর্তন দেখা যায় নাই বটে কিন্তু সেও কচ্ছপের মত নিজেকে নিজের মধ্যে গুটাইয়া লইয়াছিল। দুই ভ্রাতার মধ্যে কেবল একটি বিষয়ে ঐক্য হইয়াছিল, দুইজনেই মণিলালকে বিষচক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যেন হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর জন্য মণিলালই দায়ী।

হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর একমাস পরে মণিলাল রামকিশোরের কাছে গিয়া বিদায় চাহিল। এ সংসারের সহিত তাহার সম্পর্ক ঘুচিয়া গিয়াছে, এই কথার উল্লেখ করিয়া সে সজল চক্ষে বলিল, 'আপনার স্নেহ কখনও ভুলব না। কিন্তু এ পরিবারে আর তো আমার স্থান নেই।'

রামকিশোরের চক্ষুও সজল হইল। তিনি বলিলেন, 'কেন স্থান নেই? যে গেছে সে তো গেছেই, আবার তোমাকেও হারাবো? তা হবে না। তুমি থাকো। যদি ভগবান করেন আবার হয়তো সম্পর্ক হবে।'

বংশীধর ও মুরলীধর উপস্থিত ছিল। বংশীধর মুখ কালো করিয়া উঠিয়া গেল; মুরলীধরের ঠোঁট অসন্তোষে বাঁকা হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতটা কাহারও বুঝিতে বাকি রহিল না।

মণিলাল রহিয়া গেল। পূর্বাপেক্ষাও নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্তভাবে ভূতপূর্ব শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে লাগিল।

অতঃপর বছর দুই নিরুপদ্রবে কাটিয়া গিয়াছে। রামকিশোরের সংসার আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কেবল তুলসী পূর্বের মত ঠিক প্রকৃতিস্থ হইল না। তাহার মনে এমন গুরুতর ধাক্কা লাগিয়াছিল, যাহার ফলে তাহার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দশ বছর বয়সে তাহার দেহ-মন যেরূপ অপরিণত ছিল, তের বছরে পা দিয়াও তেমনি অপরিণত আছে। মোট কথা, যৌবনোদ্গমের স্বাভাবিক বয়সে উপনীত হইয়াও সে বালিকাই রহিয়া গিয়াছে।

উপরন্তু তাহার মনে আর একটি পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যে-মাস্টারের প্রতি পূর্বে তাহার অবহেলার অন্ত ছিল না, অহেতুকভাবে সে সেই মাস্টারের অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে মাস্টার রমাপতি যতটা আনন্দিত হইয়াছে, তাহার অধিক সঙ্কোচ ও অশান্তি অনুভব করিতেছে। কারণ অবহেলায় যাহারা অভ্যস্ত, একটু সমাদর পাইলে তাহারা বিব্রত হইয়া ওঠে।

যাহোক, রামকিশোরের সংসার-যন্ত্র আবার সচল হইয়াছে এমন সময় বাড়িতে একজন অতিথি আসিলেন। ইনি রামকিশোরের যৌবনকালের বন্ধু। আসলে রামকিশোরের দাদা রামবিনোদের সহিত ইঁহার গাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। রামবিনোদের অকালমৃত্যুর পর রাম-কিশোরের সহিত তাঁহার সখ্য-বন্ধন শিথিল হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রীতির সূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নাই। ইনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন। নাম ঈশানচন্দ্র মজুমদার। কয়েক বছর আগে বংশীধর যখন কলেজে দুষ্কৃতি করার ফলে বিতাড়িত হইতেছিল, তখন ইনিই তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ঈশানচন্দ্রের চেহারা তপঃকৃশ সন্ন্যাসীর ন্যায় শুষ্কশীর্ণ প্রকৃতি ঈষৎ তিক্তরসাক্ত। অবসর গ্রহণ করিবার পর তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়াছিল, অর্থেরও বোধকরি অনটন ঘটিয়াছিল। তিনি পূর্ব ঘনিষ্ঠতা স্মরণ করিয়া রামকিশোরকে পত্র লিখিলেন; তোমাদের অনেকদিন দেখি নাই, কবে আছি কবে নাই, ওখানকার জলহাওয়া নাকি ভাল, ইত্যাদি। রামকিশোর উত্তরে অধ্যাপক মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন, এখানকার স্বাস্থ্য খুবই ভাল, তুমি এস, দু'এক মাস থাকিলেই শরীর সারিয়া যাইবে।

যথাসময়ে ঈশানচন্দ্র আসিলেন এবং বাড়িতে অধিষ্ঠিত হইলেন। বংশীধর কিছু জানিত না, সে খাস-আবাদী ধান কাটাইতে গিয়াছিল; বাড়ি ফিরিয়া ঈশানচন্দ্রের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। বংশীধর ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল; তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়া আবার ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিল। সে ঈশানচন্দ্রের কাছে

আসিয়া চাপা গলায় বলিল, 'আপনি এখানে?'

ঈশানচন্দ্র কিছুক্ষণ একদৃষ্টে প্রাক্তন শিষ্যের পানে চাহিয়া থাকিয়া শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'এসেছি। তোমার আপত্তি আছে নাকে?'

বংশীধর তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'শুনে যান। একটা কথা আছে।'

আড়ালে গিয়া গুরুশিষ্যের মধ্যে কি কথা হইল, তাহা কেহ জানিল না। কিন্তু বাক্যবিনিময় যে আনন্দদায়ক হয় নাই তাহা প্রমাণ হইল যখন ঈশানচন্দ্র রামকিশোরকে গিয়া বলিলেন যে, তিনি আজই চলিয়া যাইতে চান। রামকিশোর তাঁহার অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন; শেষ পর্যন্ত রফা হইল অধ্যাপক মহাশয় দুর্গে গিয়া থাকিবেন। দুর্গের দু'একটি ঘর বাসোপযোগী আছে; অধ্যাপক মহাশয়ের নির্জনবাসে আপত্তি নাই। তাঁহার খাদ্য দুর্গে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে।

সেদিন সন্ধ্যায় ঈশানচন্দ্রকে দুর্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রামকিশোর ফিরিয়া আসিলেন এবং বংশীধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পিতাপুত্রে সওয়াল জবাব চলিল। হঠাৎ রামকিশোর খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং উগ্রকণ্ঠে পুত্রকে ভর্ৎসনা করিলেন। বংশীধর কিন্তু চেঁচামেচি করিল না, আরক্ত চক্ষে নিষ্ফল ক্রোধ ভরিয়া তিরস্কার শুনিল।

যাহোক, ঈশানচন্দ্র দুর্গে বাস করিতে লাগিলেন। রাত্রে তিনি একাকী থাকেন কিন্তু দিনের বেলা বংশীধর ও মুরলীধর ছাড়া বাড়ির আর সকলেই দুর্গে যাতায়াত করে। মুরলী-ধর অধ্যাপক মহাশয়ের উপর মর্মান্তিক চটিয়াছিল, কারণ তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া তাহার গোপন কেলিকুঞ্জটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

অতঃপর একপক্ষ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যার সময় রামকিশোর ঈশান-চন্দ্রের সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন, দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিবেন, দেখিতে পাইলেন কুয়ার কাছে তরুগুচ্ছের ভিতর হইতে ধুঁয়া বাহির হইতেছে। কৌতূহলী হইয়া তিনি সেইদিকে গেলেন। দেখিলেন, বৃক্ষতলে এক সাধু ধুনি জ্বালিয়া বসিয়া আছেন।

সাধুর অঙ্গ বিভূতিভূষিত, মাথায় জটা, মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। রামকিশোর এবং সাধুবাবা অনেকক্ষণ স্থির নেত্রে পরস্পর নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর সাধুবাবার কণ্ঠ হইতে খল্ খল্ হাস্য নির্গত হইল।

রামকিশোরের দুর্গে যাওয়া হইল না। তিনি ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার তাড়স দিয়া জ্বর আসিল। জ্বরের ঘোরে তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন।

ডাক্তার আসিল। প্রলাপ বন্ধ হইল, জ্বরও ছাড়িল। রামকিশোর ক্রমে সুস্থ হইলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁহার হৃদয়যন্ত্র গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। পূর্বে তাঁহার হৃদযন্ত্র বেশ মজবুত ছিল।

আরও একপক্ষ কাটিল। ঈশানচন্দ্র পূর্ববৎ দুর্গে রহিলেন। সাধুবাবাকে বৃক্ষমূল হইতে কেহ তাড়াইবার চেষ্টা করিল না। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়, বেদেদের লইয়া যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে তাহার পুনরভিনয় বাঞ্ছনীয় নয়।

১

একদিন কার্তিক মাসের সকালবেলা ব্যোমকেশ ও আমি আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব সহযোগে চা-পান শেষ করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী বাড়ির ভিতর গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। পুঁটিরাম বাজারে গিয়াছিল।

ব্যোমকেশের বিবাহের পর আমি অন্য বাসা লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম; কারণ নবদম্পতীর জীবন নির্বিঘ্ন করা বন্ধুর কাজ। কিন্তু ব্যোমকেশ ও সত্যবতী আমাকে যাইতে দেয় নাই। সেই অবধি এই চার বছর আমরা একসঙ্গে বাস করিতেছি। ব্যোমকেশকে পাইয়া আমার ভ্রাতার অভাব দূর হইয়াছিল; সত্যবতীকে পাইয়াছি একাধারে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূরূপে। উপরন্তু সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পুত্র লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। আশাতীত সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলো কাটিয়া যাইতেছে।

ভাগ করিয়া খবরের কাগজ পাঠ চলিতেছিল। সামনের পাতা আমি লইয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লইয়াছিল ভিতরের পাতা। সংবাদপত্রের সদরে মোটা অক্ষরে যেসব খবর ছাপা হয়, তাহার প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি নাই, সদরের চেয়ে অলিগলিতেই তাহার মনের যাতায়াত বেশি।

হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানচন্দ্র মজুমদারের নাম জানো?'

চিন্তা করিয়া বলিলাম, 'নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কে তিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। বহরমপুরে আমি কিছুদিন তাঁর ছাত্র ছিলাম। ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

বলিলাম, 'তা তুমি যখন তাঁর ছাত্র, তখন তাঁর মরবার বয়স হয়েছিল বলতে হবে।'

'তা হয়তো হয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। সর্পাঘাতে মারা গেছেন।'

'ও!'

'গত বছর আমরা যেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়েছিলাম, তিনি এবছর সেখানে গিয়েছিলেন। সেখানেই মৃত্যু হয়েছে।'

সাঁওতাল পরগণার সেই পাহাড়-ঘেরা শহরটি! সেখানে কয় হপ্তা বড় আনন্দে ছিলাম, যাহাদের স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। মহীধরবাবু, পুরন্দর পাণ্ডে, ডাক্তার ঘটক, রজনী—

বহির্দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখিলাম, ডাকপিওন। একখানা খামের চিঠি, ব্যোমকেশের নামে। আমাদের চিঠিপত্র বড় একটা আসে না। ব্যোমকেশকে চিঠি দিয়া উৎসুকভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

চিঠি পড়িয়া সে সহাস্যে মুখ তুলিল, বলিল, 'কার চিঠি বল দেখি?'

বলিলাম, 'তা কি করে জানব। আমার তো রেডিও-চক্ষু নেই।'

'ডি.এস.পি পুরন্দর পাণ্ডের চিঠি।'

সবিস্ময়ে বলিলাম, 'বল কি! এইমাত্র যে তাঁর কথা ভাবছিলাম!'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আমিও। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক মজুমদারের প্রসঙ্গও আছে।'

'আশ্চর্য!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এরকম আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে ঘটে। অনেকদিন যার কথা ভাবিনি তাকে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তারপর সে সশরীরে এসে হাজির হল।—পণ্ডিতেরা বলেন, 'কইনসিডেন্স'—সমাপতন। কিন্তু এর রহস্য আরও গভীর। কোথাও একটা যোগসূত্র

আছে, আমরা দেখতে পাই না—'

'সে যাক। পাণ্ডে লিখেছেন কি?'

'পড়ে দ্যাখো।'

চিঠি পড়িলাম। পাণ্ডে যাহা লিখিয়াছেন তাহার সারমর্ম এই:—

সম্প্রতি এখানে একটি রহস্যময় ব্যাপার ঘটিয়াছে। শহর হইতে কিছু দূরে পাহাড়ের উপর এক সমৃদ্ধ পরিবার বাস করেন; গৃহস্বামীর এক বৃদ্ধ বন্ধু ঈশান মজুমদার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ মারা গিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ সর্পাঘাত বলিয়াই প্রকাশ, কিন্তু এ বিষয়ে শব-ব্যবচ্ছেদক ডাক্তার এবং পুলিসের মনে সন্দেহ হইয়াছে। ...ব্যোমকেশবাবু রহস্য ভালবাসেন; তার উপর এখন শীতকাল, এখানকার জলবায়ু অতি মনোরম। তিনি যদি সবান্ধবে আসিয়া কিছু দিনের জন্য দীনের গরীবখানায় আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রথ-দেখা কলা-বেচা দুই-ই হইবে।

চিঠি পড়া শেষ হইলে ব্যোমকেশ বলিল, 'কি বল?'

বলিলাম, 'মন্দ কি। এখানে তোমার কাজকর্মও তো কিছু দেখছি না। কিন্তু সত্যবতী—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওকে এ অবস্থায় কোথাও নিয়ে যাওয়া চলে না—'

'তা বটে। কিন্তু ও যদি যেতে চায়? কিম্বা যদি তোমাকে না ছাড়তে চায়? এ সময় মেয়েদের মন বড় অবুঝ হয়ে পড়ে, কখন কি চায় বোঝা যায় না—' ভিতর দিকে পায়ের শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেলাম।

সত্যবতী প্রবেশ করিল। অবস্থাবশে তাহার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে, দেহাকৃতি ডিম-ভরা কৈ মাছের মত। সে আসিয়া একটা চেয়ারে থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা নীরব রহিলাম। সত্যবতী তখন ক্লান্তিভরে বলিল, 'আমাকে দাদার কাছে পাঠিয়ে দাও। এখানে আর ভাল লাগছে না।'

ব্যোমকেশের সহিত আমার চোখে চোখে বার্তা বিনিময় হইয়া গেল। সে বলিল, 'ভাল লাগছে না! ভাল লাগছে না কেন?'

সত্যবতী উত্তাপহীন স্বরে বলিল, 'তোমাদের আর সহ্য হচ্ছে না। দেখছি আর রাগ হচ্ছে।'

ইহা নিশ্চয় এই সময়ের একটা লক্ষণ, নচেৎ আমাদের দেখিয়া রাগ হইবার কোনও কারণ নাই। ব্যোমকেশ একটা ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাও তাহলে, আটকাব না। অজিত তোমাকে সুকুমারের ওখানে পৌঁছে দিয়ে আসুক।—আর আমরাও না হয় এই ফাঁকে কোথাও ঘুরে আসি।'

টেলিগ্রাম পাইয়া পুরন্দর পাণ্ডে মহাশয় স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের নামাইয়া লইলেন। তাঁহার বাসায় পৌঁছিয়া অপর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ করিতে করিতে পরিচিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর লইলাম। সকলেই পূর্ববৎ আছেন। কেবল মালতী দেবী আর ইহলোকে নাই; প্রোফেসর সোম বাড়ি বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কাজের কথা আরম্ভ হইল। পুরন্দর পাণ্ডে অধ্যাপক ঈশানচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুর হাল বয়ান করিলেন। সেই সঙ্গে রামকিশোরের পারিবারিক সংস্থাও অনেকখানি জানা গেল।

অধ্যাপক মজুমদারের মৃত্যুর বিবরণ এইরূপ:—তিনি মাসখানেক দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, শরীর বেশ সারিয়াছিল। কয়েকদিন আগে তিনি রাত্রির আহার সম্পন্ন করিয়া অভ্যাসমত দুর্গের প্রাঙ্গণে পায়চারি করিলেন; সে সময় মাস্টার রমাপতি তাঁহার সঙ্গে ছিল। আন্দাজ সাড়ে নয়টার সময় রমাপতি বাড়িতে ফিরিয়া গেল; অধ্যাপক মহাশয় একাকী রহিলেন। তারপর রাত্রিকালে দুর্গে কি ঘটিল কেহ জানে না। পরদিন প্রাতঃকালেই রমাপতি আবার দুর্গে গেল। গিয়া দেখিল, অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার শয়নঘরের দ্বারের কাছে মরিয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার পায়ের গোড়ালিতে সর্পাঘাতের চিহ্ন, মাথার পিছন

দিকে ঘাড়ের কাছে একটা কালশিরার দাগ এবং ডান হাতের মুঠির মধ্যে একটি বাদশাহী আমলের চক্‌চকে মোহর।

সর্পাঘাতের চিহ্ন প্রথমে কাহারও চোখে পড়ে নাই। রামকিশোর সন্দেহ করিলেন, রাত্রে কোনও দুর্বৃত্ত আসিয়া ঈশানবাবুকে মারিয়া গিয়াছে; মস্তকের আঘাত-চিহ্ন এই অনুমান সমর্থন করিল। তিনি পুলিসে খবর পাঠাইলেন।

কিন্তু পুলিস আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই সর্প-দংশনের দাগ আবিষ্কৃত হইল। তখন আর উপায় নাই। পুলিস আসিয়া শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য লাস চালান দিল।

শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে মৃতের রক্তে সাপের বিষ পাওয়া গিয়াছে, গোখুরা সাপের বিষ। সুতরাং সর্পাঘাতই যে মৃত্যুর কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু পুরন্দর পাণ্ডে নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্বাস ইহার মধ্যে একটা কারচুপি আছে।

সব শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে একথা যখন অস্বীকার করা যায় না, তখন সন্দেহ কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সন্দেহের অনেকগুলো ছোট কারণ আছে। কোনোটাই স্বতন্ত্রভাবে খুব জোরালো নয় বটে, কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে একটা কিছু পাওয়া যায়। প্রথমত দেখুন, ঈশানবাবু মারা গেছেন সর্পাঘাতে। তবে তাঁর মাথায় চোট লাগল কি করে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এমন হতে পারে, সাপে কামড়াবার পর তিনি ভয় পেয়ে পড়ে যান মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তারপর অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সম্ভব নয় কি?'

'অসম্ভব নয়। কিন্তু আরও কথা আছে। সাপ এল কোত্থেকে? আমি তন্নতন্ন করে খোঁজ করিয়েছি, কোথাও বিষাক্ত সাপের চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায়নি।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন দু'বছর আগে রামকিশোরবাবুর মেয়েও সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিল।'

'তাকে সাপে কামড়েছিল জঙ্গলে। সেখানে সাপ থাকতেও পারে। কিন্তু দুর্গে সাপ উঠল কি করে? পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। সিঁড়ি বেয়ে উঠতেও পারে, কিন্তু ওঠবার কোনও কারণ নেই। দুর্গে ইঁদুর, ব্যাং কিছু নেই, তবে কিসের লোভে সাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবে?'

'তাহলে—?'

'তবে যদি কেউ সাপ নিয়ে গিয়ে দুর্গে ছেড়ে দিকে থাকে, তাহলে হতে পারে।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'হুঁ, আর কিছু?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আর, ভেবে দেখুন, অধ্যাপক মহাশয়ের মুঠির মধ্যে একটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেটি এল কোত্থেকে?'

'হয়তো তাঁর নিজের জিনিস।'

'অধ্যাপক মহাশয়ের আর্থিক অবস্থার যে পরিচয় সংগ্রহ করেছি, তাতে তিনি মোহর হাতে নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়াতেন বলে মনে হয় না।'

'তবে—কি অনুমান করেন?'

'কিছুই অনুমান করতে পারছি না; তাতেই তো সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এটা মামুলী সর্পাঘাত নয়, এর মধ্যে রহস্য আছে।'

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর আত্মীয় পরিজন কেউ নেই?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এক বিবাহিতা মেয়ে আছে। জামাই নেপালে ডাক্তারি করে। খবর পেলাম, মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে অধ্যাপক মহাশয়ের সদ্ভাব ছিল না।'

ব্যোমকেশ নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। পাঁচ মিনিট কাটিবার পর পাণ্ডে আবার কহিলেন, 'যেসব কথা শুনলেন সেগুলোকে ঠিক প্রমাণ বলা চলে না তা মানি, কিন্তু অবহেলা করাও যায় না। তা ছাড়া, আর একটা কথা আছে। রামকিশোরবাবুর বংশটা ভাল নয়।'

ব্যোমকেশ চকিত হইয়া বলিল, 'সে কি রকম?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বংশের একটা মানুষও সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। রামকিশোর-বাবুকে আপাতদৃষ্টিতে ভালমানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু সেটা পোষ-মানা বাঘের নিরীহতা; সহজাত নয়, মেকি। তাঁর অতীত জীবনে বোধ হয় কোনও গুপ্তরহস্য আছে, নৈলে যৌবন পার না হতেই তিনি এই জঙ্গলে অজ্ঞাতবাস শুরু করলেন কেন তা বোঝা যায় না। তারপর, বড় ছেলে বংশীধর একটি আস্ত কাঠগোঁয়ার; সে যেভাবে জমিদারী শাসন করে, তাতে মনে হয় সে চেঙ্গিস্ খাঁর ভায়রাভাই। শুনেছি জমিদারীতে দু'একটা খুন-জখমও করেছে, কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ নেই—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'বয়স কত বংশীধরের? বিয়ে হয়েছে?'

'বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই বৌয়ের অপঘাত মৃত্যু হয়। দেখা যাচ্ছে, এ বংশে মাঝে মাঝে অপঘাত মৃত্যু লেগেই আছে।'

'এরও কি সর্পাঘাত?'

'না। দুপুর রাত্রে ওপর থেকে খাদে লাফিয়ে পড়েছিল কিম্বা কেউ ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।'

'চমৎকার বংশটি তো! তারপর বলুন।'

'মেজ ছেলে মুরলীধর আর একটি গুণধর। ট্যারা এবং কুঁজো; বাপ বিয়ে দেননি। বাপকে লুকিয়ে লোচ্চামি করে। একটা মজা দেখেছি, দুই ছেলেই বাপকে যমের মতন ভয় করে। বাপ যদি গো-বেচারি ভালমানুষ হতেন, তাহলে ছেলেরা তাঁকে অত বেশী ভয় করত না।'

'হুঁ—তারপর?'

'মুরলীধরের পরে এক মেয়ে ছিল, হরিপ্রিয়া। সে সর্পাঘাতে মারা গেছে। তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে জামাইটি সহজ মানুষ।'

'জামাই!'

পাণ্ডে জামাই মণিলালের কথা বলিলেন। তারপর গদাধর ও তুলসীর পরিচয় দিয়া বিবরণ শেষ করিলেন, 'গদাধরটা ন্যালা-ক্যাবলা; তার যেটুকু বুদ্ধি সেটুকু দুষ্টু-বুদ্ধি। আর তুলসী—তুলসী মেয়েটা যে কী তা আমি বুঝে উঠতে পারিনি। নির্বোধ নয়, ন্যাকা-বোকা নয়, ইঁচড়ে পাকাও নয়; তবু যেন কেমন একরকম।'

ব্যোমকেশ ধীরে-সুস্থে একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল, 'আপনি যে-ভাবে চরিত্রগুলিকে সমীক্ষণ করেছেন, তাতে মনে হয় আপনার বিশ্বাস এদের মধ্যে কেউ পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে ঈশানবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী।'

পাণ্ডে একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সন্দেহ তাই, কিন্তু সন্দেহটা এখনও বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছয়নি। বৃদ্ধ অধ্যাপককে মেরে কার কি ইষ্টসিদ্ধি হল সেটা বুঝতে পারছি না। যাহোক, আপনার মন্তব্য এখন মুলতুবী থাক। আজ বিকেলবেলা দুর্গে যাওয়া যাবে; সেখানে সরেজমিন তর্জবিজ করে আপনার যা মনে হয় বলবেন।'

পাণ্ডে অফিসের কাজ দেখিতে চলিয়া গেলেন। ব্যোমকেশ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কি মনে হল?'

বলিলাম, 'সবই যেন ধোঁয়া ধোঁয়া।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ধোঁয়া যখন দেখা যাচ্ছে, তখন আগুন আছে। শাস্ত্রে বলে, পর্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ।'

## ২

বৈকালে পুলিসের মোটর চড়িয়া তিনজনে বাহির হইলাম। ছয় মাইল পাথুরে পথ অতিক্রম করিতে আধ ঘণ্টা লাগিল।

কুয়ার নিকট অবধি পৌঁছিয়া দেখা গেল সেখানে আর একটি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। আমরাও এখানে গাড়ি হইতে নামিলাম; পান্ডে বলিলেন, 'ডাক্তার ঘটকের গাড়ি। আবার কারুর অসুখ নাকি!'

প্রশ্ন করিয়া জানা গেল, আমাদের পরিচিত ডাক্তার অশ্বিনী ঘটক এ বাড়ির গৃহ-চিকিৎসক। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছি, দৃষ্টি পড়িল কুয়ার ওপারে তরুগুচ্ছ হইতে মৃদুমন্দ ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা কি? ওখানে ধোঁয়া কিসের?'

পান্ডে বলিলেন, 'একটা সাধু ওখানে আড্ডা গেড়েছে।'

'সাধু! এই জঙ্গলের মধ্যে সাধু! এখানে তো ভিক্ষা পাবার কোনও আশা নেই।'

'তা নেই। কিন্তু রামকিশোরবাবুর বাড়ি থেকে বোধ হয় বাবাজীর সিধে আসে।'

'ও। কতদিন আছেন এখানে বাবাজী?'

'ঠিক জানি না। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই আছেন।'

'তাই নাকি? চলুন, একবার সাধু দর্শন করা যাক।'

একটি গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়া কৌপীনধারী বাবাজী বসিয়া আছেন। আমরা কাছে গিয়া দাঁড়াইলে তিনি জবারক্ত চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন, কিছুক্ষণ অপলকনেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শ্মশ্রুসমাকুল মুখে একটি বিচিত্র নীরব হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আবার চক্ষু মুদিত করিলেন।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলাম। পথেঘাটে যেসব ভিক্ষাজীবী সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায় ইনি ঠিক সেই জাতীয় নন। কোথায় যেন একটা তফাৎ আছে। কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক আভিজাত্য কিনা বুঝিতে পারিলাম না।

পান্ডে বলিলেন, 'এবার কোথায় যাবেন? আগে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন, না দুর্গ দেখবেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দুর্গটাই আগে দেখা যাক।'

দেউড়ির পাশ দিয়া দুর্গের সিঁড়ি ধরিব, মোটর চালক বুলাকিলাল তাহার কোটর হইতে বাহিরে আসিয়া ডি.এস.পি সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পান্ডে বলিলেন, 'বুলাকিলাল, ডাক্তার এসেছে কেন? কারুর কি অসুখ?'

বুলাকিলাল বলিল, 'না হুজুর, ডাক্তার সাহেব এসেছে, উকিল সাহেবও এসেছেন। কি জানি কি গুফ্‌ত-গু হচ্ছে।'

'উকিল? হিমাংশুবাবু?'

'জী হুজুর। একসঙ্গে এসেছেন। এত্তালা দেব?'

'থাক, আমরা নিজেরাই যাব।'

বুলাকিলাল তখন হাত জোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর, ঠান্ডাই তৈরি করছি। যদি হুকুম হয়—'

'ঠান্ডাই—ভাঙ? বেশ তো, তুমি তৈরি কর, আমরা দুর্গ দেখে এখনই ফিরে আসছি।'

'জী সরকার।'

আমরা তখন সিঁড়ি ধরিয়া দুর্গের দিকে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। পান্ডে হাসিয়া বলিলেন, 'বুড়ো বুলাকিলাল খাসা ভাঙ তৈরি করে। ঐ নিয়েই আছে।'

পঁচাত্তরটি সিঁড়ি ভাঙিয়া দুর্গতোরণে উপনীত হইলাম। তোরণের কবাট নাই, বহু পূর্বেই অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু পাথরের খিলান এখনও অটুট আছে। গতাগতির বাধা নাই।

তোরণপথে প্রবেশ করিয়া সর্বাগ্রে যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা একটি কামান। প্রথম দেখিয়া মনে হয় তাল গাছের একটা গুঁড়ি মুখ উঁচু করিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। দুই শতাব্দীর রৌদ্রবৃষ্টি অনাবৃত কামানের দশ হাত দীর্ঘ দেহটিকে মরিচা ধরাইয়া শল্কাবৃত করিয়া তুলিয়াছে। প্রায় নিরেট লৌহস্তম্ভটি জগদ্দল ভারি, বহুকাল কেহ তাহাকে নাড়াচাড়া করে নাই। তাহার ভিতরের গোলা ছুঁড়িবার ছিদ্রটি বেশী ফাঁদালো নয়, কোনও ক্রমে একটি ছোবড়া-ছাড়ানো নারিকেল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাও বর্তমানে ধূলামাটিতে ভরাট হইয়া গিয়াছে; মুখের দিকটায় একগুচ্ছ সজীব ঘাস মাথা বাহির করিয়া আছে। অতীতের সাক্ষী ক্ষয়িষ্ণু দুর্গটির তোরণমুখে ভূপতিত কামানটিকে দেখিয়া কেমন যেন মায়া হয়; মনে হয় যৌবনে সে বলদৃপ্ত যোদ্ধা ছিল, জরার বশে ধরাশায়ী হইয়া সে ঊর্ধ্বমুখে মৃত্যুর দিন গুনিতেছে।

কামান ছাড়া অতীতকালের অস্থাবর বস্তু দুর্গমধ্যে আর কিছু নাই। প্রাকার-ঘেরা দুর্গভূমি আয়তনে দুই বিঘার বেশী নয়; সমস্তটাই পাথরের পাটি দিয়া বাঁধানো। চক্রাকার প্রাকারের গায়ে ছোট ছোট কুঠুরি; বোধ হয় পূর্বকালে এগুলিতে দুর্গরক্ষক সিপাহীরা থাকিত। এগুলির অবস্থা ভগ্নপ্রায়; কোথাও পাথর ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কোথাও দ্বারের সম্মুখে কাঁটাগাছ জন্মিয়াছে। এই চক্রের মাঝখানে নাভির ন্যায় দুর্গের প্রধান ভবন। নাভি ও নেমির মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের অবকাশ।

গৃহটি চতুষ্কোণ এবং বাহির হইতে দেখিলে মজবুত বলিয়া মনে হয়। পাঁচ ছয়টি ছোট বড় ঘর লইয়া গৃহ; মামুলিভাবে মেরামত করা সত্ত্বেও সব ঘরগুলি বাসের উপযোগী নয়। কোনও ঘরের দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, কোনও ঘরের ছাদ ফুটো হইয়া আকাশ দেখা যায়। কেবল পিছন দিকের একটি ছোট ঘর ভাল অবস্থায় আছে। যদিও চুণ সুরকি খসিয়া স্থূল পাথরের গাঁথুনি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে তবু ঘরটিকে বাসোপযোগী করিবার জন্য তাহার প্রবেশ-পথে নূতন চৌকাঠ ও কবাট লাগানো হইয়াছে।

আমরা অন্যান্য ঘরগুলি দেখিয়া এই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডে চৌকাঠের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন, 'অধ্যাপক মহাশয়ের লাস ঐখানে পড়ে ছিল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'সাপে কামড়াবার পর তিনি যদি চৌকাঠে মাথা ঠুকে পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে মাথায় চোট লাগা অসম্ভব নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'না, অসম্ভব নয়। কিন্তু সারা বাড়িটা আপনি দেখেছেন; ভাঙা বটে কিন্তু কোথাও এমন আবর্জনা নেই যেখানে সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে। অধ্যাপক মহাশয় বাস করতে আসার সময় এখানে ভাল করে কার্বলিক অ্যাসিডের জল ছড়ানো হয়েছিল, তারপরও তিনি বেঁচে থাকাকালে বার দুই ছড়ানো হয়েছে—'

'অধ্যাপক মহাশয় আসবার আগে এখানে কেউ বাস করত না?'

পাণ্ডে মুখ টিপিয়া বলিলেন, 'কেউ কবুল করে না। কিন্তু মুরলীধর—'

'হুঁ—বুঝেছি।' বলিয়া ব্যোমকেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘরটি লম্বায় চওড়ায় আন্দাজ চৌদ্দ ফুট। মেঝে শান বাঁধানো। একপাশে একটি তক্তপোশ এবং একটি আরাম-কেদারা ছাড়া ঘরে অন্য কোনও আসবাব নাই। অধ্যাপক মহাশয়ের ব্যবহারের জন্য যে-সকল তৈজস ছিল তাহা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

এই ঘরে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যাহা অন্য কোনও ঘরে নাই। তিনটি দেয়ালে মেঝে হইতে প্রায় এক হাত ঊর্ধ্বে সারি সারি লোহার গজাল ঠোকা রহিয়াছে, গজালগুলি দেয়াল হইতে দেড় হাত বাহির হইয়া আছে। সেগুলি আগে বোধ হয় শাবলের মত স্থূল ছিল, এখন মরিচা ধরিয়া যেরূপ ভঙ্গুর আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় সেগুলি জানকীরামের সমসাময়িক।

ব্যোমকেশ বলিল, 'দেয়ালে গোঁজ কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'এ ঘরটা বোধহয় সেকালে দুর্গের দপ্তর কিম্বা খাজনাখানা ছিল। গোঁজের ওপর তক্তা পেতে দিলে বেশ তাক হয়, তাকের ওপর নানান জিনিসপত্র, বই খাতা,

এমন কি টাকার সিন্দুক রাখা চলত। এখনও বিহারের অনেক সাবেক বাড়িতে এইরকম গোঁজ দেখা যায়।'

ব্যোমকেশ ঘরের মেঝে ও দেয়ালের উপর চোখ বুলাইয়া দেখিতে লাগিল। এক সময় বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয় বাক্স-বিছানা এনেছিলেন। সেগুলো কোথায়?'

'সেগুলো আমাদের অর্থাৎ পুলিসের জিম্মায় আছে।'

'বাক্সর মধ্যে কি আছে দেখেছেন?'

'গোটাকয়েক জামা কাপড় আর খান-তিন-চার বই খাতা। একটা ন্যাক্ড়ায় বাঁধা তিনটে দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো টাকা পয়সা ছিল।'

'আর তাঁর মুঠির মধ্যে যে মোহর পাওয়া গিয়েছিল সেটা?'

'সেটাও আমাদের জিম্মায় আছে। এ মামলার একটা নিষ্পত্তি হলে সব জিনিস তাঁর ওয়ারিসকে ফেরত দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আরও কিছুক্ষণ ঘর পরীক্ষা করিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। তখন সে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, 'চলুন। এখানকার দেখা শেষ হয়েছে।'

দুর্গ প্রাঙ্গণে আসিয়া আমরা তোরণের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, একটি ছোকরা তোরণ দিয়া প্রবেশ করিল। মাস্টার রমাপতিকে এই প্রথম দেখিলাম। ছিপ্ছিপে গড়ন, ময়লা রঙ, চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ; কিন্তু সংকুচিত ভাব। বয়স উনিশ-কুড়ি। তাহাকে দেখিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'কি মাস্টার, কি খবর?'

রমাপতি একটু অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল, 'বাড়িতে ডাক্তারবাবু আর উকিলবাবু এসেছেন। তাঁদের নিয়ে কর্তার ঘরে কি সব কাজের কথা হচ্ছে। বড়রা সবাই সেখানে আছেন। কিন্তু গদাই আর তুলসীকে দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম হয়তো তারা এখানে এসেছে।'

'না, তাদের তো এখানে দেখিনি।' পাণ্ডে আমাদের সহিত রমাপতির পরিচয় করাইয়া দিলেন, 'এ'রা আমার বন্ধু, এখানে বেড়াতে এসেছেন।'

রমাপতি একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া সংহত স্বরে বলিল, 'আপনি কি—সত্যান্বেষী ব্যোমকেশবাবু?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ! কিন্তু চিনলেন কি করে? আমার ছবি তো কোথাও বেরোয়নি।'

রমাপতি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, স্খলিত স্বরে বলিল, 'আমি—না, ছবি দেখিনি—কিন্তু দেখে মনে হল—আপনার বই পড়েছি—ক'দিন ধরে মনে হচ্ছিল—আপনি যদি আসতেন তাহলে নিশ্চয় এই ব্যাপারের মীমাংসা হত—' সে থতমত খাইয়া চুপ করিল।

ব্যোমকেশ সদয় হাসিয়া বলিল, 'আসুন, আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা যাক।'

নিকটেই কামান পড়িয়াছিল, ব্যোমকেশ রুমাল দিয়া ধুলো ঝাড়িয়া তাহার উপর বসিল, পাশের স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'বসুন।' রমাপতি সসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি বললেন আমি এলে এ ব্যাপারের মীমাংসা হবে। ঈশানবাবু তো সাপের কামড়ে মারা গেছেন। এর মীমাংসা কী হবে?'

রমাপতি উত্তর দিল না, শঙ্কিত নতমুখে অঙ্গুষ্ঠ দিয়া অঙ্গুষ্ঠের নখ খুঁটিতে লাগিল। ব্যোমকেশ তাহার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়া সহজ স্বরে বলিল, 'যাক ও কথা। ঈশানবাবু যে-রাত্রে মারা যান সে-রাত্রে প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কি কথা হচ্ছিল?'

রমাপতি এবার সতর্কভাবে উত্তর দিল, বলিল, 'উনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমি ওঁর কাছে এলে আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে-রাত্রে—'

'সে-রাত্রে কোন্ গল্প বলছিলেন?'

'এই দুর্গের ইতিহাস বলছিলেন।'

'দুর্গের ইতিহাস! তাই নাকি! কি ইতিহাস শুনলেন বলুন তো, আমরাও শুনি।'

আমি ও পাণ্ডে গিয়া কামানের উপর বসিলাম। রমাপতি যে গল্প শুনিয়াছিল তাহা

বলিল। রাজা জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া সিপাহী বিদ্রোহের সময় রাজারাম ও জয়রাম পর্যন্ত কাহিনী বলিয়া গেল।

শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, সত্যি ইতিহাস বলেই মনে হয়। কিন্তু এ ইতিহাস তো পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায় না। ঈশানবাবু জানলেন কি করে?'

রমাপতি বলিল, 'উনি সব জানতেন। কর্তার এক ভাই ছিলেন, কম বয়সে মারা যান, তাঁর নাম ছিল রামবিনোদ সিংহ, অধ্যাপক মশায় তাঁর প্রাণের বন্ধু ছিলেন। তাঁর মুখে উনি এসব কথা শুনেছিলেন; রামবিনোদবাবুর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বংশের সব ইতিহাস এ'র জানা ছিল। একটা খাতায় সব লিখে রেখেছিলেন।'

'খাতায় লিখে রেখেছিলেন? কোথায় খাতা?'

'এখন খাতা কোথায় তা জানি না। কিন্তু আমি দেখেছি। বোধহয় ওঁর তোরঙ্গের মধ্যে আছে।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের পানে তাকাইল। পাণ্ডে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'পেন্সিলে লেখা একটা খাতা আছে, কিন্তু তাতে কি লেখা আছে তা জানি না। বাংলায় লেখা।'

'দেখতে হবে; যা হোক—' ব্যোমকেশ রমাপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার কাছে অনেক খবর পাওয়া গেল।—আচ্ছা, পরদিন সকালে সবার আগে আপনি আবার দুর্গে এসেছিলেন কেন, বলুন তো?'

রমাপতি বলিল, 'উনি আমাকে ডেকেছিলেন। বলেছিলেন, আজ এই পর্যন্ত থাক, কাল ভোরবেলা এসো, বাকি গল্পটা বলব!'

'বাকি গল্পটা মানে—?'

'তা কিছু খুলে বলেননি। তবে আমার মনে হয়েছিল যে সিপাহী যুদ্ধের পর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ বংশের ইতিহাস আমাকে শোনাবেন।'

'কিন্তু কেন? আপনাকে এ ইতিহাস শোনাবার কোনও উদ্দেশ্য ছিল কি—?'

'তা জানি না; তাঁর যখন যা মনে আসত আমাকে বলতেন, আমারও ভাল লাগত তাই শুনতাম। মোগল-পাঠান আমলের অনেক গল্প বলতেন। একদিন বলেছিলেন, যে-বংশে একবার ভ্রাতৃহত্যার বিষ প্রবেশ করেছে সে-বংশের আর রক্ষা নেই; যতবড় বংশই হোক তার ধ্বংস অনিবার্য। এই হচ্ছে ইতিহাসের সাক্ষ্য।'

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। পাণ্ডের ললাট ভ্রূকুটি-বন্ধুর হইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চলুন, এবার ওদিকে যাওয়া যাক।'

খাদের ওপারে বাড়ির আড়ালে সূর্য তখন ঢাকা পড়িয়াছে।

## ৩

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, বুলাকিলাল দুইটি বৃহৎ পাত্রে ভাঙের সরবৎ লইয়া ঢালাঢালি করিতেছে; গদাধর এবং তুলসী পরম আগ্রহভরে দাঁড়াইয়া প্রক্রিয়া দেখিতেছে।

আমাদের আগমনে গদাধর বিরাট হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল; তুলসী সংশয়-সঙ্কুল চক্ষু আমাদের উপর স্থাপন করিয়া কোণাচে ভাবে সরিয়া গিয়া মাস্টার রমাপতির হাত চাপিয়া ধরিল। রমাপতি তিরস্কারের সুরে বলিল, 'কোথায় ছিলে তোমরা? আমি চারিদিকে তোমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

তুলসী জবাব দিল না, অপলক দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল। গদাধরের গলা হইতে একটি ঘড়্ঘড়্ হাসির শব্দ বাহির হইল। সে বলিল, 'সাধুবাবা গাঁজা খাচ্ছিল তাই দেখছিলাম।'

রমাপতি ধমক দিয়া বলিল, 'সাধুর কাছে যেতে তোমাদের মানা করা হয়নি?'

গদাধর বলিল, 'কাছে তো যাইনি, দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।'

'আচ্ছা, হয়েছে—এবার বাড়ি চল।' রমাপতি তাহাদের লইয়া বাড়ির দিকে চলিল। শুনিতে পাইলাম, কয়েক ধাপ উঠিবার পর তুলসী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিতেছে, 'মাস্টারমশাই, ওরা সব কারা?'

বুলাকিলাল গেলাস ভরিয়া আমাদের হাতে দিল। দধি গোলমরিচ শসার বীচি এবং আরও বহুবিধ বকাল সহযোগে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট ভাঙের সরবৎ; এমন সরবৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ছাড়া আর কোথাও প্রস্তুত হয় না। পাণ্ডে তারিফ করিয়া বলিলেন, 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে। কিন্তু বুলাকিলাল, তুমি এত ভাঙ তৈরি করেছ কার জন্যে? আমরা আসব তা তো জানতে না।'

বুলাকিলাল বলিল, 'হুজুর, আমি আছি, সাধুবাবাও এক ঘটি চড়ান্—'

'সাধুবাবার দেখছি কিছুতেই অরুচি নেই। আর—'

'আর—গণপৎ এক ঘটি নিয়ে যায়।'

'গণপৎ—মুরলীধরের খাস চাকর? নিজের জন্যে নিয়ে যায়, না মালিকের জন্যে?'

'তা জানি না হুজুর।'

'আচ্ছা বুলাকিলাল, তুমি তো এ বাড়ির পুরোনো চাকর, বাড়িতে কে কোন্ নেশা করে বলতে পারো?'

বুল্যাকিলাল একটু চুপ করিয়া বলিল, 'বড়কর্তা সন্ধ্যের পর আফিম খান। আর কারুর কথা জানি না ধর্মাবতার।'

বোঝা গেল, জানিলেও বুলাকিলাল বলিবে না। আমরা সরবৎ শেষ করিয়া, আর এক প্রস্থ তারিফ করিয়া বাড়ির সিঁড়ি ধরিলাম।

এদিকেও সিঁড়ির সংখ্যা সত্তর-আশী। উপরে উঠিয়া দেখা গেল, সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু এখনও বেশ আলো আছে। বাড়ির সদরে রমাপতি উপস্থিত ছিল, সে বলিল, 'কর্তার সঙ্গে দেখা করবেন? আসুন।'

রমাপতি আমাদের যে ঘরটিতে লইয়া গেল সেটি বাড়ির বৈঠকখানা।

টেবিল চেয়ার ছাড়াও একটি ফরাস-ঢাকা বড় তক্তপোশ আছে। তক্তপোশের মধ্যস্থলে রামকিশোরবাবু আসীন; তাঁহার এক পাশে নায়েব চাঁদমোহন, অপর পাশে জামাই মণিলাল। দুই ছেলে বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের দুই কোণে বসিয়াছে। ডাক্তার ঘটক এবং উকিল হিমাংশুবাবু তক্তপোশের কিনারায় চেয়ার টানিয়া উপবিষ্ট আছেন। পশ্চিম দিকের খোলা জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছে; তবু ঘরের ভিতরটা ঘোর ঘোর হইয়া আসিয়াছে।

ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে শুনিতে পাইলাম, মুরলীধর পেঁচালো সুরে বলিতেছে, 'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দৈ! মণিলালকে দুর্গ দেওয়া হবে কেন? আমি কি ভেসে এসেছি? দুর্গ আমি নেব।'

বংশীধর অমনি বলিয়া উঠিল, 'তুমি নেবে কেন? আমার দাবী আগে, দুর্গ আমি নেব। আমি ওটা মেরামত করিয়ে ওখানে বাস করব।'

রামকিশোর বারুদের মত ফাটিয়া পড়িলেন, 'খবরদার! আমার মুখের ওপর যে কথা বলবে জুতিয়ে তার মুখ ছিঁড়ে দেব। আমার সম্পত্তি আমি যাকে ইচ্ছে দিয়ে যাব। মণিলালকে আমি সর্বস্ব দিয়ে যাব, তোমাদের তাতে কি! বেয়াদব কোথাকার!'

মণিলাল শান্তস্বরে বলিল, 'আমি তো কিছুই চাইনি—।'

মুরলীধর মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'না, কিছুই চাওনি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে বাবাকে বশ করেছ। মিট্‌মিটে ডান—'

রামকিশোর আবার ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, ডাক্তার ঘটক হাত তুলিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, আপনি বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, আপনার শরীরের পক্ষে ওটা ভাল নয়। আজ বরং কথাবার্তা বন্ধ থাক্, আর একদিন হবে।'

রামকিশোরবাবু ঈষৎ সংযত হইয়া বলিলেন, 'না ডাক্তার, এ ব্যাপার টাঙিয়ে রাখা চলবে না। আজ আছি কাল নেই, আমি সব হাঙ্গামা চুকিয়ে রাখতে চাই। হিমাংশুবাবু, আমি আমার সম্পত্তির কি রকম ব্যবস্থা করতে চাই আপনি শুনেছেন; আর বেশী আলোচনার দরকার নেই। আপনি দলিলপত্র তৈরি করতে আরম্ভ করে দিন। যত শীগ্‌গির দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে যায় ততই ভাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ তাহলে ওঠা যাক্।' হিমাংশুবাবু গাত্রোত্থান করিলেন। এতক্ষণে সকলের নজর পড়িল যে আমরা তিনজন ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া আছি। রামকিশোর ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন, 'কে?'

পাণ্ডে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'আমি। আমার দু'টি কলকাতার বন্ধু বেড়াতে এসেছেন, তাঁদের দুর্গ দেখাতে এনেছিলাম।' বলিয়া ব্যোমকেশের ও আমার নামোল্লেখ করিলেন।

রামকিশোর সমাদর সহকারে বলিলেন, 'আসুন, আসুন। বসতে আজ্ঞা হোক।' কিন্তু তিনি ব্যোমকেশের নাম পূর্বে শুনিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না।

বংশীধর ও মুরলীধর উঠিয়া গেল। ডাক্তার ঘটক আমাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইল, তারপর হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। ডাক্তারের সঙ্গে দু'একটা কথা হইবার পর সে উকিল হিমাংশুবাবুকে লইয়া প্রস্থান করিল। ঘরের মধ্যে রহিয়া গেলাম আমরা তিনজন এবং ও-পক্ষে রামকিশোরবাবু, নায়েব চাঁদমোহন এবং জামাই মণিলাল।

রামকিশোর হাঁকিলেন, 'ওরে কে আছিস, আলো দিয়ে যা, চা তৈরি কর।'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আমি দেখছি—'

তিনি উঠিয়া গেলেন। চাঁদমোহনের চেহারা কালো এবং চিমুশে কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে ধূর্ততা ভরা। তিনি যাইবার সময় ব্যোমকেশের প্রতি একটি দীর্ঘ-গভীর অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গেলেন।

দুই চারিটি সৌজন্যসূচক বাক্যালাপ হইল। বাহিরের লোকের সহিত রামকিশোরের ব্যবহার বেশ মিষ্ট ও অমায়িক। তারপর ব্যোমকেশ বলিল, 'শুনলাম ঈশানবাবু এখানে এসে সর্পাঘাতে মারা গেছেন। আমি তাঁকে চিনতাম, একসময় তাঁর ছাত্র ছিলাম।'

'তাই নাকি!' রামকিশোর চকিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, 'আমার বড় ছেলেও—। কি বলে, ঈশান আমার প্রাণের বন্ধু ছিল, ছেলেবেলার বন্ধু। সে আমার বাড়িতে বেড়াতে এসে অপঘাতে মারা গেল, এ লজ্জা আমি জীবনে ভুলব না।' তাঁহার কথার ভাবে মনে হইল, সর্পাঘাতে মৃত্যু সম্বন্ধে যে সন্দেহ আছে তাহা তিনি জানেন না।

ব্যোমকেশ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিল, 'বড়ই দুঃখের বিষয়। তিনি আপনার দাদারও বন্ধু ছিলেন?'

রামকিশোর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া যেন একটু বেশী ঝোঁক দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু দাদা প্রায় ত্রিশ বছর হল মারা গেছেন।'

'ও—তাহলে বর্তমানে আপনার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল।—আচ্ছা, তিনি এবার এখানে আসার আগে এ বাড়ির কে কে তাঁকে চিনতেন? আপনি চিনতেন। আর—?'

'আর আমার নায়েব চাঁদমোহন চিনতেন।'

'আপনার ড্রাইভার তো পুরোনো লোক, সে চিনত না?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলাল চিনত।'

'আর, আপনার বড় ছেলেও বোধহয় তাঁর ছাত্র ছিলেন?'

গলাটা পরিষ্কার করিয়া রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

'এই বাক্যালাপ যখন চলিতেছিল তখন জামাই মণিলালকে লক্ষ্য করিলাম। ভোজনরত মানুষের পাতের কাছে বসিয়া পোষা বিড়াল যেমন একবার পাতের দিকে একবার মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চক্ষু সঞ্চালন করে, মণিলাল তেমনি কথা বলার পর্যায়ক্রমে ব্যোমকেশ ও রামকিশোরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছে। তাহার মুখের ভাব আধা-অন্ধকারে ভাল ধরা

গেল না, কিন্তু সে যে একাগ্রমনে বাক্যালাপ শুনিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুর মুঠিতে একটি মোহর পাওয়া গিয়েছিল। সেটি কোথা থেকে এল বলতে পারেন?'

রামকিশোর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'না। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার। ঈশানের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। অন্তত মোহর নিয়ে বেড়াবার মত ছিল না।'

'দুর্গে কোথাও কুড়িয়ে পাওয়া সম্ভব নয় কি?'

রামকিশোর বিবেচনা করিয়া বলিলেন, 'সম্ভব। কারণ আমার পূর্ব-পুরুষদের অনেক সোনা-দানা ঐ দুর্গে সঞ্চিত ছিল। সিপাহীরা যখন লুঠ করতে আসে তখন এক-আধটা মোহর এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়া বিচিত্র নয়। তা যদি হয় তাহলে ও মোহর আমার সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার সম্পত্তি হলে ঈশানবাবু মোহরটি আপনাকে ফেরত দিতেন না কি? আমি যতদূর জানি, পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার লোক তিনি ছিলেন না।'

'তা ঠিক। কিন্তু অভাবে মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়। তা ছাড়া, মোহরটা কুড়িয়ে পাবার সময়েই হয়তো তাকে সাপে কামড়েছিল। বেচারা সময় পায়নি।'

এই সময় একজন ভৃত্য কেরোসিনের ল্যাম্প আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল, অন্য একজন ভৃত্য চা এবং জলখাবারের ট্রে লইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিল। আমরা সবিনয়ে জলখাবার প্রত্যাখ্যান করিয়া চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইলাম।

চায়ে চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে বিদ্যুৎ বাতির ব্যবস্থা নেই। ঈশানবাবুও নিশ্চয় রাত্রে কেরোসিনের লণ্ঠন ব্যবহার করতেন?'

রামকিশোর বলিলেন, 'হ্যাঁ। তবে মৃত্যুর হপ্তাখানেক আগে সে একবার আমার কাছ থেকে একটা ইলেকট্রিক টর্চ চেয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর আর সব জিনিসই পাওয়া গেল, কেবল ঐ টর্চটা পাওয়া যায়নি।'

'তাই নাকি! কোথায় গেল টর্চটা?'

এতক্ষণে মণিলাল কথা কহিল, গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমার বিশ্বাস ঐ ঘটনার পরদিন সকালবেলা গোলমালে কেউ টর্চটা সরিয়েছে।'

পাণ্ডে প্রশ্ন করিলেন, 'কে সরাতে পারে? কারুর ওপর সন্দেহ হয়?'

মণিলাল উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল, রামকিশোর মাঝখানে বলিয়া উঠিলেন, 'না না, মণি, ও তোমার ভুল ধারণা। রমাপতি নেয়নি, নিলে স্বীকার করত।'

মণিলাল আর কথা কহিল না, ঠোঁট চাপিয়া বসিয়া রহিল। বুঝিলাম, টর্চ হারানোর প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে এবং মণিলালের সন্দেহ মাস্টার রমাপতির উপর। একটা ক্ষুদ্র পারিবারিক মতান্তর ও অস্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গেল।

অতঃপর চা শেষ করিয়া আমরা উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'এই সূত্রে আপনার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য হল। বড় সুন্দর জায়গায় বাড়ি করেছেন। এখানে একবার এলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।'

রামকিশোর আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'বেশ তো, দু'দিন না হয় থেকে যান না। দু'দিন পরে কিন্তু প্রাণ পালাই-পালাই করবে। আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই থাকতে পারি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনার নিমন্ত্রণ মনে রাখব। কিন্তু যদি আসি, ঐ দুর্গে থাকতে দিতে হবে। ক্ষুধিত পাষাণের মত আপনার দুর্গটা আমাকে চেপে ধরেছে।'

রামকিশোর বিরসমুখে বলিলেন, 'দুর্গে আর কাউকে থাকতে দিতে সাহস হয় না। যাহোক, যদি সত্যিই আসেন তখন দেখা যাবে।'

দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, কালো পর্দার আড়ালে জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তুলসী এতক্ষণ পর্দার কাছে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতেছিল, এখন সরীসৃপের মত সরিয়া গেল।

রাত্রে আহারাদির পর পাণ্ডেজির বাসার খোলা ছাদে তিনটি আরাম-কেদারায় আমরা তিনজনে অঙ্গ এলাইয়া দিয়াছিলাম। অন্ধকারে ধূমপান চলিতেছিল। এখানে কার্তিক মাসের এই সময়টি বড় মধুর; দিনে একটু মোলায়েম গরম, রাত্রে মোলায়েম ঠাণ্ডা।

পাণ্ডে বলিলেন, 'এবার বলুন কি মনে হল।'

ব্যোমকেশ সিগারেটে দু' তিনটা টান দিয়া বলিল, 'আপনি ঠিক ধরেছেন, গলদ আছে। কিন্তু ওখানে গিয়ে যতক্ষণ না চেপে বসা যাচ্ছে ততক্ষণ গলদ ধরা যাবে না।'

'আপনি তো আজ তার গৌরচন্দ্রিকা করে এসেছেন। কিন্তু নিতান্তই কি দরকার—?'

'দরকার। এতদূর থেকে সুবিধা হবে না। ওদের সঙ্গে ভাল করে মিশতে হবে তবে ওদের পেটের কথা জানা যাবে। আজ লক্ষ্য করলাম, কেউ মন খুলে কথা কইছে না, সকলেই কিছু-না-কিছু চেপে যাচ্ছে।'

'হুঁ। তাহলে আপনার বিশ্বাস হয়েছে যে ঈশানবাবুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক সর্পাঘাতে মৃত্যু নয়?'

'অতটা বলবার এখনও সময় হয়নি। এইটুকু বলতে পারি, আপাতদৃষ্টিতে যা দেখা যাচ্ছে তা সত্যি নয়, ভেতরে একটা গূঢ় এবং চমকপ্রদ রহস্য রয়েছে। মোহর কোথা থেকে এল? টর্চটা কোথায় গেল? রমাপতি যে-গল্প শোনালে তা কি সত্যি? সবাই দুর্গটা চায় কেন? মণিলালকে কর্তা ছাড়া কেউ দেখতে পারে না কেন?'

আমি বলিলাম, 'মণিলালও রমাপতিকে দেখতে পারে না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ওটা স্বাভাবিক। ওরা দু'জনেই রামকিশোরবাবুর আশ্রিত। রমাপতিও বোধহয় মণিলালকে দেখতে পারে না। বাড়ির কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সেটা আমাদের পক্ষে সুবিধে।' দগ্ধাবশিষ্ট সিগারেট ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, 'আচ্ছা পাণ্ডেজি, বংশীধর কতদূর লেখাপড়া করেছে জানেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছে জানি। তারপর বহরমপুরে পড়তে গিয়েছিল, কিন্তু মাস কয়েক পরেই পড়াশুনা বন্ধ করে ঘরে ফিরে আসে।'

'গোলমাল ঠেকছে। বহরমপুরে ঈশানবাবুর সঙ্গে বংশীধরের জানা-শোনা হয়েছিল—তারপর বংশীধর হঠাৎ লেখাপড়া ছেড়ে দিলে কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'খোঁজ নিতে পারি। বেশী দিনের কথা নয়, যদি গোলমাল থাকে কলেজের সেরেস্তায় হদিস পাওয়া যাবে।'

'খবর নেবেন তো।—আর মুরলীধরের বিদ্যে কতদূর?'

'ওটা আকাট মুখ্খু।'

'হুঁ, বংশটাই চাষাড়ে হয়ে গেছে। তবে রামকিশোরবাবুর ব্যবহারে একটা সাবেক ভদ্রতা আছে।'

'কিন্তু বাল্যবন্ধুর মৃত্যুতে খুব বেশী শোক পেয়েছেন বলে মনে হল না; বরং মোহরটি বাগাবার মতলব।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল, 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভূরি ভূরি।—কাল সকালে ঈশানবাবুর জিনিসপত্রগুলো পরীক্ষা করতে হবে, খাতাটা পড়তে হবে। তাতে হয়তো কিছু পাওয়া যেতে পারে।'

'তারপর?'

'তারপর দুর্গে গিয়ে গ্যাঁট্ হয়ে বসব। আপনি ব্যবস্থা করুন।'

'ভাল। কিন্তু একটা কথা ওদের দেওয়া খাবার খাওয়া চলবে না। কি জানি কার মনে কি আছে—'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। আপনার ইক্‌মিক্ কুকার আছে?'

'আছে।'

'ব্যস্, তাহলেই চলবে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ আর একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'অজিত,

রামকিশোরবাবুকে দেখে কিছু মনে হল?'

'কি মনে হবে?'

'আজ তাঁকে দেখেই মনে হল, আগে কোথায় দেখেছি। তোমার মনে হল না?'

'কৈ না!'

'আমার কিন্তু এক নজর দেখেই মনে হল চেনা লোক। কিন্তু কবে কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছি না।'

পাণ্ডে একটা হাই চাপিয়া বলিলেন, 'রামকিশোরবাবুকে আপনার দেখার সম্ভাবনা কম; গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি লোকালয়ে পা বাড়িয়েছেন কিনা সন্দেহ। আপনি হয়তো ওই ধরনের চেহারা অন্য কোথাও দেখে থাকবেন।'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাই হবে বোধ হয়।'

## ৪

পরদিন প্রাতরাশের সময় পাণ্ডে বলিলেন, 'দুর্গে গিয়ে থাকার সংকল্প ঠিক আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আপনি ব্যবস্থা করুন। বড় জোর দু-তিন দিন থাকব, বেশী নয়।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার কিন্তু মন চাইছে না, কি জানি যদি সত্যিই সাপ থাকে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'থাকলেও আমাদের কিছু করতে পারবে না। আমরা সাপের রোজা।'

'বেশ, আমি তাহলে রামকিশোরবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঠিকঠাক করে আসি।—আচ্ছা, দুর্গের বদলে যদি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে থাকেন তাতে ক্ষতি কি?'

'অত ঘেঁষাঘেঁষি সুবিধা হবে না, পরিপ্রেক্ষিত পাব না। দুর্গই ভাল।'

'ভাল। আমি অফিসে বলে যাচ্ছি, আমার মুন্শী আতাউল্লাকে খবর দিলে সে ঈশানবাবুর জিনিসপত্র আপনাদের দেখাবে। গুদাম ঘরের চাবি তার কাছে।'

পাণ্ডেজি মোটর-বাইকে চড়িয়া প্রস্থান করিলেন। ঘড়িতে মাত্র ন'টা বাজিয়াছে, পাণ্ডেজির অফিস তাঁহার বাড়িতেই; সুতরাং ঈশানবাবুর মালপত্র পরীক্ষার তাড়া নাই। আমরা সিগারেট ধরাইয়া সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইয়া গড়িমসি করিতেছি, এমন সময় একটি ছোট মোটর আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। ব্যোমকেশ জানালা দিয়া দেখিয়া বলিল, 'ডাক্তার ঘটক। ভালই হল।'

ডাক্তার ঘটকের একটু অনুতপ্ত ভাব। আমরা যে তাহার গুপ্তকথা ফাঁস করিয়া দিই নাই এবং ভবিষ্যতে দিব না তাহা সে বুঝিয়াছে। বলিল, 'কাল আপনাদের সঙ্গে ভাল করে কথা বলবার সুযোগ পেলাম না, তাই—'

ব্যোমকেশ পরম সমাদরের সহিত তাহাকে বসাইয়া বলিল, 'আপনি না এলে আমরাই যেতাম। কেমন আছেন বলুন। পুরোনো বন্ধুরা সব কেমন? মহীধরবাবু?'

ডাক্তার বলিল, 'সবাই ভাল আছেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু মিটিমিটি করিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'আর রজনী দেবী?'

ডাক্তারের কান দু'টি রক্তাভ হইল, তারপর সে হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'ভাল আছে রজনী। আপনারা এসেছেন শুনে জানতে চাইল মিসেস বক্সী এসেছেন কি না।'

'সত্যবতী এবার আসেনি। সে—' ব্যোমকেশ আমার পানে তাকাইল।

আমি সত্যবতীর অবস্থা জানাইয়া বলিলাম, 'সত্যবতী আমাদের কলকাতা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরাও প্রতিজ্ঞা করেছি, একটা সুখবর না পাওয়া পর্যন্ত ওমুখো হব না।'

ডাক্তার হাসিয়া ব্যোমকেশকে অভিনন্দন জানাইল, কিন্তু তাহার মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। ক্ষুধিত ব্যক্তি অন্যকে আহার করিতে দেখিলে হাসিতে পারে, কিন্তু সে হাসি আনন্দের

নয়।

ব্যোমকেশ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিল, পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, 'বন্ধু, মনে ক্ষোভ রাখবেন না। আপনি যা পেয়েছেন তা কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। একসঙ্গে দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্য আর পরকীয়াপ্রীতির তীক্ষ্ণ স্বাদ উপভোগ করে নিচ্ছেন।'

আমি যোগ করিয়া দিলাম, 'ভেবে দেখুন, শেলী বলেছেন, হে পবন, শীত যদি আসে বসন্ত রহে কি কভু দূরে! ফুলের মরসুম শেষ হোক, ফল আপনি আসবে।'

এবার ডাক্তারের মুখে সত্যকার হাসি ফুটিল। আরও কিছুক্ষণ হাসি-তামাসার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, কাল রামকিশোরবাবুর বাড়িতে বিষয়-ঘটিত আলোচনা খানিকটা শুনেছিলাম, বাকিটা শোনবার কৌতূহল আছে। যদি বাধা না থাকে আপনি বলুন।'

ডাক্তার বলিল, 'বাধা কি? রামকিশোরবাবু তো লুকিয়ে কিছু করছেন না। মাসখানেক আগে ওঁর স্বাস্থ্য হঠাৎ ভেঙে পড়ে; হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন অনেকটা সামলেছেন; কিন্তু ওঁর ভয় হয়েছে হঠাৎ যদি মারা যান তাহলে বড় ছেলেরা মামলা-মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট করবে। হয়তো নাবালক ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করবে। তাই বেঁচে থাকতে থাকতেই উনি সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিতে চান। সম্পত্তি সমান চার ভাগ হবে; দু'ভাগ বড় দুই ছেলে পাবে, বাকি দু'ভাগ রামকিশোরের অধিকারে থাকবে। তারপর ওঁর মৃত্যু হলে গদাই আর তুলসী ওয়ারিসান্‌-সূত্রে ওঁর সম্পত্তি পাবে, বড় দুই ছেলে আর কিছু পাবে না।'

ব্যোমকেশ চিন্তা করিতে করিতে বলিল, 'বুঝেছি। দুর্গ নিয়ে কি ঝগড়া হচ্ছিল?'

'দুর্গটা রামকিশোরবাবু নিজের দখলে রেখেছেন। অথচ দুই ছেলেরই লোভ দুর্গের ওপর।'

'মণিলালকে দুর্গ দেবার কথা উঠল কেন?'

'ব্যাপার হচ্ছে এই—রামকিশোরবাবু স্থির করেছেন তুলসীর সঙ্গে মণিলালের বিয়ে দেবেন। মণিলাল ওঁর বড় মেয়েকে বিয়ে করেছিল, সে-মেয়ে মারা গেছে, জানেন বোধ হয়। কাল কথায় কথায় রামকিশোরবাবু বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর বসতবাড়িটা পাবে গদাই, আর মণিলাল পাবে দুর্গ। মণিলাল মানেই তুলসী, মণিলালকে আলাদা কিছু দেওয়া হচ্ছে না। তাইতেই বংশী আর মুরলী ঝগড়া শুরু করে দিলে।'

'হুঁ। কিন্তু তুলসীর বিয়ের তো এখনও দেরি আছে। ওর কতই বা বয়স হবে।'

'আধুনিক মতে বিয়ের বয়স না হলেও নেহাৎ ছোট নয়, বছর তের-চোদ্দ হবে। রামকিশোরবাবু বোধহয় শীগ্‌গিরই ওদের বিয়ে দেবেন। যদি হঠাৎ মারা যান, নাবালক ছেলেমেয়েদের একজন নির্ভরযোগ্য অভিভাবক চাই তো! বড় দুই ছেলের ওপর ওঁর কিছুমাত্র আস্থা নেই।'

'যেটুকু দেখেছি তাতে আস্থা থাকার কথা নয়। মণিলাল মানুষটি কেমন?'

'মাথা-ঠাণ্ডা লোক। রামকিশোরবাবু তাই ওর ওপরেই ভরসা রাখেন বেশি। তবে যেভাবে শ্বশুরবাড়ি কামড়ে পড়ে আছে তাতে মনে হয় চক্ষুলজ্জা কম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ শূন্যে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল, 'ডাক্তার ঘটক, আপনি রুগী সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকবেন।'

ডাক্তার চকিত হইয়া বলিল, 'রুগী! কোন্‌ রুগী?'

'রামকিশোরবাবু। তাঁর হৃদ্‌যন্ত্র যদি দলিল রেজিস্ট্রি হবার আগেই হঠাৎ থেমে যায় তাহলে কারুর সুবিধা হতে পারে।'

ডাক্তার চোখ বড় বড় করিয়া চাহিয়া রহিল।

বেলা দশটা নাগাদ ডাক্তার বিদায় লইলে আমরা মুন্‌শী আতাউল্লাকে খবর পাঠাইলাম।

আতাউল্লা লোকটি অতিশয় কেতাদুরস্ত প্রৌঢ় মুসলমান, বোধহয় খানদানী ব্যক্তি। কৃশ দেহে ছিটের আচকান, দাড়িতে মেহেদীর রঙ, চোখে সুর্মা, মুখে পান; তাহার চোস্ত জবানের সঙ্গে মুখ হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পানের কুচি ছিট্‌কাইয়া পড়িত। লোকটি

সজ্জন।

আমাদের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুন্শী আতাউল্লা দুইজন আরদালির সাহায্যে ঈশানবাবুর বিছানা ও তোরঙ্গ আনিয়া আমাদের খিদ্মতে পেশ করিলেন। বিছানাটা নাম মাত্র। রঙ-ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো জীর্ণ বাঁদিপোতার তোষক ও তেলচিটে বালিশ। তবু ব্যোমকেশ উহা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিল। তোষকটি ঝাড়িয়া এবং বালিশটি টিপিয়া টুপিয়া দেখিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুপ্ত ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব ধরা পড়িল না।

বিছানা স্থানান্তরিত করিবার হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'মুন্শীজী, একটা মোহর ছিল সেটা দেখতে পাওয়া যাবে কি?'

'বেশক্, জনাব। আপনার যদি মরজি হয় তাই আমি মোহর সঙ্গে এনেছি।' আতাউল্লা আচ্কানের পকেট হইতে একটি কাঠের কৌটা বাহির করিলেন। কৌটার গায়ে নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক অক্ষর ও চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। ভিতরে তুলার মোড়কের মধ্যে মোহর।

পাকা সোনার মোহর; আকারে আয়তনে বর্তমান কালের চাঁদির টাকার মত। ব্যোমকেশ উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিল, 'এতে উর্দুতে কি লেখা রয়েছে পড়তে পারেন?'

আতাউল্লা ঈষৎ আহত-কণ্ঠে বলিলেন, 'উর্দু নয় জনাব, ফারসী। আসরফিতে উর্দু লেখার রেওয়াজ ছিল না। যদি ফরমাস করেন পড়ে দিতে পারি, ফারসী আমার খাস জবান।'

ব্যোমকেশ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, 'তাই নাকি! তাহলে পড়ে বলুন দেখি কবেকার মোহর।'

আতাউল্লা চশমা আঁটিয়া মোহরের লেখা পড়িলেন, বলিলেন, 'তারিখ নেই। লেখা আছে এই মোহর নবাব আলিবর্দি খাঁ'র আমলে ছাপা হয়েছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে জানকীরামের কালের মোহর, পরের নয়।—আচ্ছা মুন্শীজী, আপনাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ, আপনি অফিসে যান, যদি আবার দরকার হয় আপনাকে খবর পাঠাব।'

'মেহেরবানি' বলিয়া আতাউল্লা প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ তখন অধ্যাপক মহাশয়ের তোরঙ্গটি টানিয়া লইয়া বসিল। চটা-ওঠা টিনের তোরঙ্গটির মধ্যে কিন্তু এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহা তাঁহার মৃত্যুর কারণ-নির্দেশে সাহায্য করিতে পারে। বস্ত্রাদি নিত্যব্যবহার্য জিনিসগুলি দেখিলে মনে হয় অধ্যাপক মহাশয় অল্পবিত্ত ছিলেন কিম্বা অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন। দুইখানি পুরাতন মলাট-ছেঁড়া বই; একটি শ্যামশাস্ত্রী-সম্পাদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, অন্যটি শয়র্-ই-মুতাক্ষরিনের ইংরেজী অনুবাদ। ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে অধ্যাপক মহাশয়ের জ্ঞানের পরিধি কতখানি বিস্তৃত ছিল, এই বই দু'খানি হইতে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বই দু'খানির সঙ্গে একখানি চামড়া-বাঁধানো প্রাচীন খাতা। খাতাখানি বোধ হয় ত্রিশ বছরের পুরাতন; মলাট ঢলঢলে হইয়া গিয়াছে, বিবর্ণ পাতাগুলিও খসিয়া আসিতেছে। এই খাতায় অত্যন্ত অগোছালোভাবে, কোথাও পেন্সিল দিয়া দু'চার পাতা, কোথাও কালি দিয়া দু'চার ছত্র লেখা রহিয়াছে। হস্তাক্ষর সুছাঁদ নয়, কিন্তু একই হাতের লেখা। যাহাদের লেখাপড়া লইয়া কাজ করিতে হয় তাহারা এইরূপ একখানি সর্বংবহা খাতা হাতের কাছে রাখে; যখন যাহা ইচ্ছা ইহাতে টুকিয়া রাখা যায়।

খাতাখানি সযত্নে লইয়া আমরা টেবিলে বসিলাম। ব্যোমকেশ একটি একটি করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।

প্রথম দুই-তিনটি পাতা খালি। তারপর একটি পাতায় লেখা আছে—

ইতিহাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
যদি মানুষের ভাষায় কথা বলিতে
পারিতেন তবে তিনি মহরমের
বাজনার ছন্দে বলিতেন—
ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল, 'মহরমের বাজনার মত শোনাচ্ছে বটে, কিন্তু মানে কি?'
বলিলাম, 'মানে হচ্ছে, ধন উপার্জন করহ, ধন উপার্জন করহ। তোমার ঈশানবাবু দেখছি সিনিক্ ছিলেন।'

ব্যোমকেশ লেখাটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখিয়া পাতা উল্টাইল। পরপৃষ্ঠায় কেবল কয়েকটি তারিখ নোট করা রহিয়াছে। ঐতিহাসিক তারিখ; কবে হিজ্‌রির অব্দ আরম্ভ হইয়াছিল, শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর তারিখ কি, এইসব। বোধ হয় ছাত্রদের ইতিহাস পড়াইবার জন্য নোট করিয়াছিলেন। এমনি আরও কয়েক পৃষ্ঠায় তারিখ লেখা আছে, সেগুলির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

ইহার পর আরও কয়েক পাতা শূন্য। তারপর সহসা এক দীর্ঘ রচনা শুরু হইয়াছে। তাহার আরম্ভটা এইরূপ—

'রামবিনোদের কাছে তাহার বংশের ইতিহাস শুনিলাম। সিপাহী-যুদ্ধের সময় লুঠেরাগণ বোধ হয় সঞ্চিত ধনরত্ন লইয়া যাইতে পারে নাই; অন্তত রামবিনোদের তাহাই বিশ্বাস। সে দুর্গ দেখিয়া আসিয়াছে। তাহার উচ্চাশা, যদি কোনও দিন ধনী হয় তখন ঐ দুর্গ কিনিয়া তথায় গিয়া বাস করিবে।'

অতঃপর জানকীরাম হইতে আরম্ভ করিয়া রাজারাম জয়রাম পর্যন্ত রমাপতির মুখে যেমন শুনিয়াছিলাম ঠিক তেমনি লেখা আছে, একচুল এদিক ওদিক নাই। পাঠ শেষ হইলে আমি বলিলাম, 'যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, রমাপতি মিথ্যে গল্প বলেনি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গল্পটা রমাপতি ঠিকই বলেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটা ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে শুনেছিল তার প্রমাণ কি? দুদিন আগেও শুনে থাকতে পারে।'

'তা—বটে। তাহলে—?'

'তাহলে কিছু না। আমি বলতে চাই যে, ও সম্ভাবনাটাকেও বাদ দেওয়া যায় না। অর্থাৎ রমাপতি সে-রাত্রে এই গল্পই শুনেছিল এবং পরদিন ভোরবেলা গল্পের বাকিটা শোনবার জন্যে ঈশানবাবুর কাছে গিয়েছিল তার কোনও প্রমাণ নেই।'

আবার কিছুক্ষণ পাতা উল্টাইবার পর এমন একটি পৃষ্ঠায় আসিয়া পৌঁছিলাম, যেখানে তীব্র কাতরোক্তির মত কয়েকটি শব্দ লেখা রহিয়াছে—

—রামবিনোদ বাঁচিয়া নাই। আমার
একমাত্র অকৃত্রিম বন্ধু চলিয়া গিয়াছে।
সে কি ভয়ংকর মৃত্যু! দুঃস্বপ্নের মত
সে-দৃশ্য আমার চোখে লাগিয়া আছে।

ব্যোমকেশ লেখাটার উপর কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থাপিত রাখিয়া বলিল, 'ভয়ংকর মৃত্যু! স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মনে হয় না। খোঁজ করা দরকার।' আমার মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে আবৃত্তি করিল, 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পার লুকানো রতন।'

খাতার সামনের দিকের লেখা এইখানেই শেষ। মনে হয় রামবিনোদের মৃত্যুর পর খাতাটি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত পড়িয়া ছিল, হয়তো হারাইয়া গিয়াছিল। তারপর আবার যখন লেখা আরম্ভ হইয়াছে, তখন খাতার উল্টা পিঠ হইতে।

প্রথম লেখাটি কালি-কলমের লেখা; পীতবর্ণ কাগজে কালি চুপ্‌সিয়া গিয়াছে। পাতার মাথার দিকে লেখা হইয়াছে—

রামকিশোরের বড় ছেলে বংশীধর কলেজে পড়িতে আসিয়াছে।
অনেকদিন পরে উহাদের সংগে আবার সংযোগ ঘটিল। সেই
রামবিনোদের মৃত্যুর পর আর খোঁজ লই নাই।
পাতার নীচের দিকে লেখা আছে—বংশীধর এক মারাত্মক

কেলেঙ্কারী করিয়াছে। তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছি।
হাজার হোক রামবিনোদের ভ্রাতুষ্পুত্র।

ব্যোমকেশ বলিল, 'বংশীধরের কেলেঙ্কারীর হদিস বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এ কি!'

দেখা গেল বাকি পাতাগুলিতে যে লেখা আছে তাহার সবগুলিই লাল-নীল পেন্সিলে লেখা। ব্যোমকেশ পাতাগুলি কয়েকবার ওলট-পালট করিয়া বলিল, 'অজিত, তোরঙ্গর তলায় দেখ তো লাল-নীল পেন্সিল আছে কি না।'

বেশী খুঁজিতে হইল না, একটি দুমুখো লাল-নীল পেন্সিল পাওয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, বোঝা গেল। এর পর যা কিছু লেখা আছে ঈশানবাবু দুর্গে আসার পর লিখেছেন। এগুলি তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়।'

প্রথম লেখাটি এইরূপ—

দুর্গে গুপ্তকক্ষ দেখিতে পাইলাম না।
ভারি আশ্চর্য! দুর্গের সোনাদানা কোথায় রক্ষিত হইত?
প্রকাশ্য কক্ষে রক্ষিত হইত বিশ্বাস হয় না। নিশ্চয়
কোথাও গুপ্তকক্ষ আছে। কিন্তু কোথায়? সিপাহীরা
গুপ্তকক্ষের সন্ধান পাইয়া থাকিলে গুপ্তকক্ষ আর গুপ্ত
থাকিত না, তাহার দ্বার ভাঙিয়া রাখিয়া যাইত, তখন
উহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইত। তবে গুপ্তকক্ষের
সন্ধান সিপাহীরা পায় নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অধ্যাপক মহাশয়ের যুক্তিটা খুব বিচারসহ নয়। সিপাহীরা চলে যাবার পর রাজারামের পরিবারবর্গ ফিরে এসেছিল। তারা হয়তো ভাঙা তোষাখানা মেরামত করিয়েছিল, তাই এখন ধরা যাচ্ছে না।'

পাতা উল্টাইয়া ব্যোমকেশ পড়িল—

কেহ আমাকে ভয় দেখাইয়া দুর্গ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা
করিতেছে। বংশীধর? আমি কিন্তু সহজে দুর্গ ছাড়িব
না! ধনানর্জয়ধ্বম্! ধনানর্জয়ধ্বম্!

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আবার মহরমের বাজনা কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহরের গন্ধ পেয়ে বোধ হয় তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হয়েছিল।'

অতঃপর কয়েক পৃষ্ঠা পরে খাতার শেষ লেখা। আমরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। বাংলা ভাষায় লেখা নয়, উর্দু কিংবা ফারসীতে লেখা তিনটি পংক্তি। তাহার নীচে বাংলা অক্ষরে কেবল দুইটি শব্দ—মোহনলাল কে?

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'সত্যিই তো, মোহনলাল কে? এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের কর্ম নয়। ডাকো মুন্শী আতাউল্লাকে।'

আতাউল্লা আসিয়া লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। বলিলেন, 'জনাব, মৃত ব্যক্তি ভাল ফারসী জানতেন মনে হচ্ছে। তবে একটু সেকেলে ধরনের। তিনি লিখেছেন, 'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।'

'মোহনলালের জিম্মায়—!'

'জী জনাব, তাই লেখা আছে।'

'হুঁ। আচ্ছা, মুন্শীজী, আপনি এবার জিনিসপত্র সব নিয়ে যান। কেবল এই খাতাটা আমার কাছে রইল।'

দু'জনে সিগারেট ধরাইয়া আরাম-কেদারার কোলে অঙ্গ ছড়াইয়া দিলাম। নীরবে

একটা সিগারেট শেষ করিয়া তাহারই চিতাগ্নি হইতে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাইয়া বলিলাম, 'খাতা পড়ে কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ কেদারার দুই হাতলে তবলা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'মনে হচ্ছে, ধনানর্জয়ধ্বম্। ধনানর্জয়ধ্বম্।'

'ঠাট্টা নয়, কি বুঝলে বল না।'

'পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝিনি এখনও। তবে ঈশানবাবুকে যদি সত্যিই কেউ হত্যা করে থাকে তাহলে হত্যার একটা মোটিভ্ দেখতে পাচ্ছি।'

'কি মোটিভ্?'

'সেই চিরন্তন মোটিভ্—টাকা।'

'আচ্ছা, ফারসী ভাষায় ঐ কথাগুলো লিখে রাখার তাৎপর্য কি?'

'ওটা উনি নিজে লেখেননি। অর্থাৎ হস্তাক্ষর ওঁর, কিন্তু রচনা ওঁর নয়, রাজারামের। উনি লেখাটি দুর্গে কোথাও পেয়েছিলেন, তারপর খাতায় টুকে রেখেছিলেন।'

'তারপর?'

'তারপর মারা গেলেন।'

৫

পাণ্ডেজি ফিরিলেন বেলা বারোটার পর। হেল্‌মেট খুলিয়া ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'কাজ হল বটে কিন্তু বুড়ো গোড়ায় গোলমাল করেছিল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'গোলমাল কিসের?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেলা হয়ে গেছে, খেতে বসে সব বলব। আপনি কিছু পেলেন?'

'খেতে বসে বলব।

আহারে বসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি আগে বলুন। কাল তো রামকিশোরবাবু নিমরাজী ছিলেন, আজ হঠাৎ বেঁকে বসলেন কেন?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'কাল আমরা চলে আসবার পর কেউ ওঁকে বলেছে যে আপনি একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ। তাতেই উনি ঘাবড়ে গেছেন।'

'এতে ঘাবড়াবার কি আছে? ওঁর মনে যদি পাপ না থাকে—'

'সেই কথাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বলতে হল। বললাম, 'হলই বা ব্যোমকেশবাবু ডিটেক্‌টিভ, আপনার ভয়টা কিসের? আপনি কি কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন?' তখন বুড়ো তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে গেল।'

আমি বলিলাম, 'রামকিশোরবাবু তাহলে সত্যিই কিছু লুকোবার চেষ্টা করেছেন।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার তাই সন্দেহ হল। কিন্তু ঈশানবাবুর মৃত্যু-ঘটিত কোনো কথা নয়। অন্য কিছু। যাহোক, আমি ঠিক করে এসেছি, আজই ওরা দুর্গটাকে আপনাদের বাসের উপযোগী করে রাখবে। আপনার ইচ্ছে করলে আজ বিকেলে যেতে পারেন কিম্বা কাল সকালে যেতে পারেন।'

'আজ বিকেলেই যাব।'

'তাই হবে। কিন্তু আমি আর একটা ব্যবস্থা করেছি। আমার খাস আরদালি সীতারাম আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

'না না, কি দরকার?'

'দরকার আছে। সীতারাম লাল পাগড়ি পরে যাবে না, সাধারণ চাকর সেজে যাবে। লোকটা খুব হুঁশিয়ার; তাছাড়া, ওর একটা মস্ত বিদ্যে আছে, ও সাপের রোজা। ও সঙ্গে থাকলে অনেক সুবিধে হবে। ভেবে দেখুন, আপনাদের জল তোলা কাপড় কাচা বাসন মাজার জন্যেও একজন লোক দরকার। ওদের লোক না নেওয়াই ভাল।'

ব্যোমকেশ সম্মত হইল। পাণ্ডে তখন বলিলেন, 'এবার আপনার হাল বয়ান করুন।'

ব্যোমকেশ সবিস্তারে ঈশানবাবুর খাতার রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিল। শুনিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'হুঁ, মোহনলাল লোকটা কে ছিল আমারও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু একশো বছর পরে আর তার ঠিকানা বার করা সম্ভব হবে না। এদিকে হালের খবর ঈশানবাবু লিখছেন, তাঁকে কেউ ভয় দেখিয়ে দুর্গ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছে। তাঁর সন্দেহ বংশীধরের ওপর। কিন্তু সত্যি কথাটা কি? ভয়ই বা দেখালো কী ভাবে?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, 'এ সব প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া যাবে না। দেখা যাক, দুর্গে গিয়ে যদি দুর্গের রহস্য ভেদ করা যায়।'

অপরাহ্নে পুলিস ভ্যানে চড়িয়া শৈল-দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা তিনজন এবং সীতারাম। পাণ্ডেজি আমাদের ঘর-বসত করিয়া দিয়া ফিরিয়া যাইবেন, সীতারাম থাকিবে। সীতারামের বয়স পঁয়ত্রিশ, লিকলিকে লম্বা গড়ন, তামাটে ফর্সা রঙ, শিকারী বিড়ালের মত গোঁফ। তাহার চেহারার মাহাত্ম্য এই যে, সে ভাল কাপড়চোপড় পরিলে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়, আবার নেংটি পরিয়া থাকিলে বাসন-মাজা ভৃত্য মনে করিতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না। উপস্থিত তাহার পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় কাঁধে গামছা। অর্থাৎ, মোটা কাজের চাকর।

আমাদের সঙ্গে লটবহরহ কম ছিল না, বিছানা বাক্স, চাল ডাল আনাজ প্রভৃতি রসদ, ইক্‌মিক্‌ কুকার এবং আরও কত কি। সীতারাম এবং বুলাকিলাল মালপত্র দুর্গে ঢোলাই করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডে বলিলেন, 'চলুন, গৃহস্বামীর সঙ্গে দেখা করে আসবেন।'

গৃহস্বামী বাড়ির সদর বারান্দায় উপবিষ্ট ছিলেন, সঙ্গে জামাই মণিলাল, আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন; আমরা খাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়াছি বলিয়া অনুযোগ করিলেন; শহুরে মানুষ পাহাড়ে জঙ্গলে মন বসাইতে পারিব না বলিয়া রসিকতা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু সতর্ক ও সাবধান হইয়া রহিল।

মিষ্টালাপের সময় লক্ষ্য করিলাম, বাড়ির অন্যান্য অধিবাসীরা আমাদের শুভাগমনে বেশ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বংশীধর এবং মুরলীধর চিলের মত চক্রাকারে আমাদের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু কাছে আসিতেছে না। রমাপতি একবার বাড়ির ভিতর হইতে গলা বাড়াইয়া আমাদের দেখিয়া নিঃশব্দে সরিয়া গেল। নায়েব চাঁদমোহন বারান্দার অন্য প্রান্তে থেলো হুঁকোয় তামাক টানিতে টানিতে বক্র দৃষ্টিশলাকায় আমাদের বিদ্ধ করিতেছেন। তুলসী একটা জুঁই ঝাড়ের আড়াল হইতে কৌতূহলী কাঠবিড়ালীর মত আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম একটা থামের আড়াল হইতে সে উঁকি মারিতেছে।

ব্যোমকেশ যে একজন খ্যাতনামা গোয়েন্দা এবং কোনও গভীর অভিসন্ধি লইয়া দুর্গে বাস করিতে আসিয়াছে তাহা ইহারা জানিতে পারিয়াছে এবং তদনুযায়ী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। কেবল গদাধরের জড়বুদ্ধি বোধ হয় এতবড় ধাক্কাতেও সক্রিয় হইয়া ওঠে নাই: তাহাকে দেখিলাম না।

আমরা গাত্রোত্থান করিলে রামকিশোরবাবু বলিলেন, 'শুধু থাকার জন্যেই এসেছেন মনে করবেন না যেন। আপনারা আমার অতিথি, যখন যা দরকার হবে খবর পাঠাবেন।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' আমরা গমনোদ্যত হইলাম। গৃহস্বামী ইশারা করিলেন, মণিলাল আমাদের সঙ্গে চলিল: উদ্দেশ্য দুর্গ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া নামা ওঠার সময় মণিলালের সঙ্গে দুইচারিটা কথা হইল। ব্যোমকেশ বলিল 'আমি যে ডিটেকটিভ একথা রামকিশোরবাবু জানলেন কি করে?'

মণিলাল বলিল, 'আমি বলেছিলাম। আপনার নাম আমার জানা ছিল; এঁর লেখা বই পড়েছি। শুনে কর্তা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তারপর আপনারা দুর্গে এসে থাকতে চান শুনে ঘাবড়ে গেলেন।'

'কেন?'

'এই সেদিন একটা দুর্ঘটনা হয়ে গেল—'

'তাই আপনাদের ভয় আমাদেরও সাপে খাবে। ভালো কথা, আপনার স্ত্রীও না সর্পাঘাতে মারা গিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এ অঞ্চলে দেখছি খুব সাপ আছে।'

'আছে নিশ্চয়। কিন্তু আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

দেউড়ি পর্যন্ত নামিয়া আমরা দুর্গের সিঁড়ি ধরিলাম। হঠাৎ মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনারা পুলিসের লোক, তাই জানতে কৌতূহল হচ্ছে—ঈশানবাবু ঠিক সাপের কামড়েই মারা গিয়েছিলেন তো?'

ব্যোমকেশ ও পাণ্ডের মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় হইল। ব্যোমকেশ বলিল, 'কেন বলুন দেখি? এ বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি?'

মণিলাল ইতস্তত করিয়া বলিল, 'না—তবে—কিছুই তো বলা যায় না—'

পাণ্ডে বলিলেন, 'সাপ ছাড়া আর কি হতে পারে?'

মণিলাল বলিল, 'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। ঈশানবাবুর পায়ে সাপের দাঁতের দাগ আমি নিজের চোখে দেখেছি। ঠিক যেমন আমার স্ত্রীর পায়ে ছিল।' মণিলাল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দুর্গের তোরণে আসিয়া পৌঁছিলাম। মণিলাল বলিল, 'এবার আমি ফিরে যাব। কর্তার শরীর ভাল নয়, তাঁকে বেশীক্ষণ একলা রাখতে সাহস হয় না। কাল সকালেই আবার আসব।'

মণিলাল নমস্কার করিয়া নামিয়া গেল। সূর্য অস্ত গিয়াছিল। রামকিশোরবাবুর বাড়ির মাথার উপর শুক্লা দ্বিতীয়ার কৃশাঙ্গী চন্দ্রকলা মুচকি হাসিয়া বাড়ির আড়ালে লুকাইয়া পড়িল। আমরাও তোরণ দিয়া দুর্গের অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সকালে ডাক্তার ঘটককে তার রুগী সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছিলাম; এখন দেখছি তার কোনও দরকার ছিল না। সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত জামাই মণিলাল যক্ষের মত শ্বশুরকে আগলে থাকবে।'

পাণ্ডে একটু হাসিলেন, 'হ্যাঁ—ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে এদের খটকা লেগেছে দেখছি। কিন্তু এখন কিছু বলা হবে না।'

'না।'

আমরা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া বাড়ির দিকে চলিলাম। পাণ্ডেজির হাতে একটি মুষলাকৃতি লম্বা টর্চ ছিল; সেটির বৈদ্যুতিক আলো যেমন দূরপ্রসারী, প্রয়োজন হইলে সেটিকে মারাত্মক প্রহরণরূপেও ব্যবহার করা চলে। পাণ্ডে টর্চ জ্বালিয়া তাহার আলো সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন, বলিলেন, 'এটা আপনাদের কাছে রেখে যাব, দরকার হতে পারে। চলুন, দেখি আপনাদের থাকার কি ব্যবস্থা হয়েছে।'

দেখা গেল সেই গজাল-কণ্টকিত ঘরটিতেই থাকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। দুইটি লোহার খাট, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব দেওয়ালের নিরাভরণ দৈন্য অনেকটা চাপা দিয়াছে। সীতারাম ইতিমধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়াছে, বিছানা পাতিয়াছে, ইক্‌মিক্ কুকারে রান্না চড়াইয়াছে এবং স্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল গরম করিতেছে। তাহার কর্মতৎপরতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম।

অচিরাৎ ধূমায়মান চা আসিয়া উপস্থিত হইল। চায়ে চুমুক দিয়া পাণ্ডে বলিলেন, 'সীতারাম, কেমন দেখলে?'

সীতারাম বলিল, 'কিল্লা ঘুরে ফিরে দেখে নিয়েছি হুজুর। এখানে সাপ নেই।'

নিঃসংশয় উক্তি। পাণ্ডে নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, 'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

'আর কিছু?'

'আর, সিঁড়ি ছাড়া কিল্লায় ঢোকবার অন্য রাস্তা নেই। দেয়ালের বাইরে খাড়া

পাহাড়।'

ব্যোমকেশ পাণ্ডের দিকে ফিরিয়া বলিল, 'এর মানে বুঝতে পারছেন?'

'কি?'

'যদি কোনও আততায়ী দুর্গে ঢুকতে চায় তাকে সিঁড়ি দিয়ে আসতে হবে। অর্থাৎ, দেউড়ির পাশ দিয়ে আসতে হবে। বুলাকিলাল তাকে দেখে ফেলতে পারে।'

'হুঁ, ঠিক বলেছেন। বুলাকিলালকে জেরা করতে হবে। কিন্তু আজ দেরি হয়ে গেছে, আজ আর নয়।—সীতারাম, তোমাকে বেশী বলবার দরকার নেই। এ'দের দেখাশুনা করবে, আর চোখ কান খুলে রাখবে।'

'জী হুজুর।'

পাণ্ডেজি উঠিলেন।

'কাল কোনও সময়ে আসব। আপনারা সাবধানে থাকবেন।'

পাণ্ডেজিকে দুর্গতোরণ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলাম। ব্যোমকেশ টর্চ জ্বালিয়া সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল, পাণ্ডেজি নামিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে নীচে হইতে শব্দ পাইলাম পুলিস ভ্যান চলিয়া গেল। ওদিকে রামকিশোরবাবুর বাড়িতে তখন মিটিমিটি আলো জ্বলিয়াছে।

আমরা আবার প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আকাশে তারা ফুটিয়াছে, জঙ্গলের দিক হইতে মিষ্ট বাতাস দিতেছে। সীতারাম যেন আমাদের মনের অকথিত অভিলাষ জানিতে পারিয়া দু'টি চেয়ার আনিয়া অঙ্গনে রাখিয়াছে। আমরা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উপবেশন করিলাম।

এই নক্ষত্রবিদ্ধ অন্ধকারে বসিয়া আমার মন নানা বিচিত্র কল্পনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল আমরা যেন রূপকথার রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি। সেই যে রাজপুত্র কোটালপুত্র কি জানি কিসের সন্ধানে বাহির হইয়া ঘুমন্ত রাজকুমারীর মায়াপুরীতে উপনীত হইয়াছিল, আমাদের অবস্থা যেন সেইরূপ। অবশ্য ঘুমন্ত রাজকুমারী নাই, কিন্তু সাপের মাথায় মণি আছে কিনা কে বলিতে পারে? কোন্ অদৃশ্য রাক্ষস-রাক্ষসীরা তাহাকে পাহারা দিতেছে তাহাই বা কে জানে? শুক্তির অভ্যন্তরে মুক্তার ন্যায় কোন অপরূপ রহস্য এই প্রাচীন দুর্গের অস্থিপঞ্জরতলে লুক্কায়িত আছে?

ব্যোমকেশ ফস্ করিয়া দেশলাই জ্বালিয়া আমার রোমাণ্টিক স্বপ্নজাল ভাঙিয়া দিল। সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'ঈশানবাবু ঠিক ধরেছিলেন, দুর্গে নিশ্চয় কোথাও গুপ্ত তোষাখানা আছে।'

বলিলাম, 'কিন্তু কোথায়? এতবড় দুর্গের মাটি খুঁড়ে তার সন্ধান বার করা কি সহজ?'

'সহজ নয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ঈশানবাবু সন্ধান পেয়েছিলেন; তাঁর মুঠির মধ্যে মোহরের আর কোনও মানে হয় না।'

কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করিয়া শেষে বলিলাম, 'তা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে আরও অনেক মোহর আছে।

'সম্ভব। এবং তার চেয়েও বড় কথা, ঈশানবাবু যখন খুঁজে বার করতে পেরেছেন তখন আমরাও পারব।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া অন্ধকারে পায়চারি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার পর সে হঠাৎ 'উ' বলিয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে কোনক্রমে সামলাইয়া লইল। আমি লাফাইয়া উঠিলাম—'কি হল!'

'কিছু নয়, সামান্য হোঁচট খেয়েছি।' টর্চটা তাহার হাতেই ছিল, সে তাহা জ্বালিয়া মাটিতে আলো ফেলিল।

দিনের আলোতে যাহা চোখে পড়ে নাই, এখন তাহা সহজে চোখে পড়িল। একটা চৌকশ পাথর সম্প্রতি কেহ খুঁড়িয়া তুলিয়াছিল, আবার অপটু হস্তে যথাস্থানে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। পাথরটা সমানভাবে বসে নাই, একদিকের কানা একটু উঁচু

হইয়া আছে। ব্যোমকেশ অন্ধকারে ওই উঁচু কানায় পা লাগিয়া হোঁচট খাইয়াছিল।

আল্‌গা পাথরটা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম,—'ব্যোমকেশ! পাথরের তলায় তোষাখানার গর্ত নেই তো?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল, 'উঁহু, পাথরটা বড় জোর চৌদ্দ ইঞ্চি চৌকশ। ওর তলায় যদি গর্ত থাকেও, তা দিয়ে মানুষ ঢুকতে পারবে না।'

'তবু—'

'না হে, যা ভাবছ তা নয়। খোলা উঠোনে তোষাখানার গুপ্তদ্বার হতে পারে না। যা হোক, কাল সকালে পাথর তুলিয়ে দেখতে হবে।'

ব্যোমকেশ টর্চ ঘুরাইয়া চারিদিকে আলো ফেলিল, কিন্তু অন্য কোথাও পাথরের পাটি নাড়াচাড়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। অদূরে কামানটা পড়িয়া আছে, তাহার নীচে অনেক ধুলামাটি জমিয়া কামানকে মেঝের সঙ্গে জাম করিয়া দিয়াছে; সেখানেও আল্‌গা মাটি বা পাথর চোখে পড়িল না।

এই সময় সীতারাম আসিয়া জানাইল, আহার প্রস্তুত। হাতের ঘড়িতে দেখিলাম পোনে দশটা। কখন যে নিঃসাড়ে সময় কাটিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই।

ঘরে গিয়া আহারে বসিলাম। ইক্‌মিক্ কুকারে রাঁধা খিচুড়ি এবং মাংস যে এমন অমৃততুল্য হইতে পারে তাহা জানা ছিল না। তার উপর সীতারাম অমলেট ভাজিয়াছে। গুরুভোজন হইয়া গেল।

আমাদের ভোজন শেষ হইলে সীতারাম বারান্দায় নিজের আহার সারিয়া লইল। দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, 'হুজুর, যদি হুকুম হয়, একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ তো। তুমি শোবে কোথায়?'

সীতারাম বলিল, 'সেজন্যে ভাববেন না হুজুর। আমি দোরের বাইরে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব।'

সীতারাম চলিয়া গেল। আমরা আলো কমাইয়া দিয়া বিছানায় লম্বা হইলাম। দ্বার খোলাই রহিল; কারণ ঘরে জানালা নাই, দ্বার বন্ধ করিলে দম বন্ধ হইবার সম্ভাবনা।

শুইয়া শুইয়া বোধহয় তন্দ্রা আসিয়া গিয়াছিল, ব্যোমকেশের গলার আওয়াজে সচেতন হইয়া উঠিলাম, 'দ্যাখো, ঐ গজালগুলো আমার ভাল ঠেকছে না।'

'গজাল! কোন্ গজাল?'

'দেয়ালে এত গজাল কেন? পাণ্ডেজি একটা কৈফিয়ৎ দিলেন বটে, কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে।'

এত রাত্রে গজালকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ঘড়িতে দেখিলাম এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। সীতারাম এখনও এদিক ওদিক দেখিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

'আজ ঘুমোও, কাল গজালের কথা ভেবে।' বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

গভীর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ মাথার শিয়রে বোমা ফাটার মত শব্দে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মুহূর্তের জন্য কোথায় আছি ঠাহর করিতে পারিলাম না।

স্থানকালের জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম ব্যোমকেশ দ্বারের বাহিরে টর্চের আলো ফেলিয়াছে, সেখানে কতকগুলো ভাঙা হাঁড়ি কলসীর মত খোলামকুচি পড়িয়া আছে। তারপর ব্যোমকেশ, জ্বলন্ত টর্চ হাতে লইয়া তীরবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। 'অজিত এসো—'

আমিও আলুথালুভাবে উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম; সে কাহারও পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে কিম্বা বিপদের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার হাতের আলোটা যেদিকে যাইতেছে, আমিও সেইদিকে ছুটিলাম।

তোরণের মুখে পৌঁছিয়া ব্যোমকেশ সিঁড়ির উপর আলো ফেলিল। আমি তাহার কাছে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সিঁড়ি দিয়া একটা লোক ছুটিতে ছুটিতে উপরে আসিতেছে। কাছে আসিলে চিনিলাম—সীতারাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'সীতারাম, সিঁড়ি দিয়ে কাউকে নামতে দেখেছ?'

সীতারাম বলিল, 'জী হুজুর, আমি ওপরে আসছিলাম, হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে টক্কর লেগে গেল। আমি তাকে ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু লোকটা হাত ছাড়িয়ে পালাল।'

'তাকে চিনতে পারলে?'

'জী না, অন্ধকারে তার মুখ দেখতে পাইনি। কিন্তু টক্কর লাগবার সময় তার মুখ দিয়ে একটা বুরা জবান বেরিয়ে গিয়েছিল, তা শুনে মনে হল লোকটা ছোট জাতের হিন্দুস্থানী।—কিন্তু কী হয়েছে হুজুর?'

'তা এখনও ঠিক জানি না। দেখবে এস।'

ফিরিয়া গেলাম। ঘরের সম্মুখে ভাঙা হাঁড়ির টুকরাগুলো পড়িয়া ছিল, ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ দ্যাখো। আমি জেগেছিলাম, বাইরে খুব হাল্‌কা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, তুমি বুঝি ফিরে এলে। তারপরই দুম্‌ করে শব্দ—'

সীতারাম ভাঙা সরার মত একটা টুকরা তুলিয়া আঘ্রাণ গ্রহণ করিল। বলিল, 'হুজুর, চট্‌ করে খাটের ওপর উঠে বসুন।'

'কেন? কি ব্যাপার?'

'সাপ। কেউ সরা-ঢাকা হাঁড়িতে সাপ এনে এইখানে হাঁড়ি আছড়ে ভেঙেছে। আমাকে টর্চ দিন, আমি খুঁজে দেখছি। সাপ কাছেই কোথাও আছে।'

আমরা বিলম্ব না করিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিলাম, কারণ অন্ধকার রাত্রে সাপের সঙ্গে বীরত্ব চলে না। সীতারাম টর্চ লইয়া বাহিরে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল।

লণ্ঠনটা উস্কাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবুকে কিসের ভয় দেখিয়ে তাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এখন বুঝতে পারছি।'

'কিন্তু লোকটা কে?'

'তা এখন বলা শক্ত। বুলাকিলাল হতে পারে, গণপৎ হতে পারে, এমন কি সান্নিদ ঠাকুরও হতে পারেন।'

এই সময় সীতারামের আকস্মিক অট্টহাস্য শুনিতে পাইলাম। সীতারাম গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'হুজুর, এদিকে দেখবেন আসুন। কোনও ভয় নেই।'

সন্তর্পণে নামিয়া সীতারামের কাছে গেলাম। বাড়ির একটা কোণ আশ্রয় করিয়া বাদামী রঙের একটা সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া কিল্‌বিল করিতেছে। সাপটা আহত, তাই পলাইতে পারিতেছে না, তীব্র আলোর তলায় তাল পাকাইতেছে।

সীতারাম হাসিয়া বলিল, 'ঢাম্‌না সাপ, হুজুর, বিষ নেই। মনে হচ্ছে কেউ আমাদের সঙ্গে দিল্‌লাগি করেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'দিল্‌লাগিই বটে। কিন্তু এখন সাপটাকে নিয়ে কি করা যাবে?'

'আমি ব্যবস্থা করছি।' সীতারাম খাবার ঢাকা দিবার ছিদ্রযুক্ত পিতলের ঢাক্‌নি আনিয়া সাপটাকে চাপা দিল, বলিল, 'আজ এমনি থাক, কাল দেখা যাবে।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। সীতারাম দ্বারের সম্মুখে নিজের বিছানা পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহর।

ব্যোমকেশ বলিল, 'সীতারাম, তুমি এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে, কি করছিলে, এবার বল দেখি।'

সীতারাম বলিল, 'হুজুর, এখান থেকে নেমে দেউড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি, বুলাকিলাল ভাঙ্‌ খেয়ে নিজের কুঠুরীর মধ্যে ঘুমুচ্ছে। তার কাছে থেকে কিছু খবর বার করবার ইচ্ছে ছিল, সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে দোস্তী করে রেখেছিলাম। ঠেলাঠুলি দিলাম কিন্তু বুলাকিলাল জাগল না। কি করি, ভাবলাম, যাই সাধুবাবার দর্শন করে আসি।

'সাধুবাবা জেগে ছিলেন, আমাকে দেখে খুশী হলেন। আমাকে অনেক সওয়াল করলেন; আপনারা কে, কি জন্যে এসেছেন, এইসব জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আপনারা হাওয়া বদল করতে এসেছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশ বেশ। আর কি কথা হল?'

সীতারাম বলিল, 'অনেক আজে-বাজে কথা হল হুজুর। আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একেবারে প্রোফেসার সাহেবের মৃত্যুর কথা তুললাম, তাতে সাধুবাবা ভীষণ চটে উঠলেন। দেখলাম বাড়ির মালিক আর নায়েববাবুর ওপর ভারি রাগ। বার বার বলতে লাগলেন, ওদের সর্বনাশ হবে, ওদের সর্বনাশ হবে।'

'তাই নাকি! ভারি অকৃতজ্ঞ সাধু দেখছি। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা এক ছিলিম গাঁজা চড়ালেন। আমাকে প্রসাদ দিলেন।'

'তুমি গাঁজা খেলে?'

'জী হুজুর। সাধুবাবার প্রসাদ তো ফেলে দেওয়া যায় না।'

'তা বটে। তারপর?'

'তারপর সাধুবাবা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও চলে এলাম। ফেরবার সময় সিঁড়িতে ঐ লোকটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, একটা কথা বল তো সীতারাম। তুমি যখন ফিরে আসছিলে তখন বুলাকিলালকে দেখেছিলে?'

সীতারাম বলিল, 'না হুজুর, চোখে দেখিনি। কিন্তু দেউড়ির পাশ দিয়ে আসবার সময় কুঠুরী থেকে তার নাকডাকার ঘড় ঘড় আওয়াজ শুনেছিলাম।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাপের হাঁড়ি নিয়ে যিনি এসেছিলেন তিনি আর যেই হোন, বুলাকিলাল কিম্বা সাধুবাবা নন। আশা করি, তিনি আজ আর দ্বিতীয়বার এদিকে আসবেন না—এবার ঘুমিয়ে পড়।'

সকালে উঠিয়া দেখা গেল ঢাকনি-চাপা সাপটা রাত্রে মরিয়া গিয়াছে; বোধহয় হাঁড়ি ভাঙার সময় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। সীতারাম সেটাকে লাঠির ডগায় তুলিয়া দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফেলিয়া দিল। আমরাও প্রাকারে উঠিয়া একটা চক্র দিলাম। দেখা গেল, প্রাকার একেবারে অটুট নয় বটে কিন্তু তোরণদ্বার ছাড়া দুর্গে প্রবেশ করিবার অন্য কোনও চোরাপথ নাই। প্রাকারের নীচেই অগাধ গভীরতা।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সীতারামকে দুর্গে রাখিয়া ব্যোমকেশ ও আমি রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। রমাপতি সদর বারান্দায় আমাদের অভ্যর্থনা করিল।—'আসুন। কর্তা এখনি বেরুচ্ছেন, শহরে যাবেন।'

'তাই নাকি!' আমরা ইতস্তত করিতেছি এমন সময় রামকিশোরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পরনে গরদের পাঞ্জাবি, গলায় কোঁচানো চাদর; আমাদের দেখিয়া বলিলেন, 'এই যে!—নতুন জায়গা কেমন লাগছে? রাত্রে বেশ আরামে ছিলেন? কোনও রকম অসুবিধে হয়নি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কোন অসুবিধে হয়নি, ভারি আরামে রাত কেটেছে। আপনি বেরুচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, একবার উকিলের বাড়ি যাব, কিছু দলিলপত্তর রেজিস্ট্রি করাতে হবে। তা—আপনারা এসেছেন, আমি না হয় একটু দেরি করেই যাব—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'না না, আপনি কাজে বেরুচ্ছেন বেরিয়ে পড়ুন। আমরা এমনি বেড়াতে এসেছি, কোনও দরকার নেই।'

'তা—আচ্ছা। রমাপতি, এঁদের চা-টা দাও। আমাদের ফিরতে বিকেল হবে।'

রামকিশোর বাহির হইয়া পড়িলেন; জামাই মণিলাল এক বস্তা কাগজপত্র লইয়া সঙ্গে

গেল। আমাদের পাশ দিয়া যাইবার সময় মণিলাল সহাস্যমুখে নমস্কার করিল।

ব্যোমকেশ রমাপতিকে বলিল, 'চায়ের দরকার নেই, আমরা চা খেয়ে বেরিয়েছি। আজই বুঝি সম্পত্তি বাঁটোয়ারার দলিল রেজিস্ট্রি হবে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'যাক, একটা দুর্ভাবনা মিট্‌ল।—আচ্ছা, বলুন দেখি—'

রমাপতি হাতজোড় করিয়া বলিল, 'আমাকে 'আপনি' বলবেন না, 'তুমি' বলুন।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বেশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, কিন্তু সে পরে হবে। এখন বল দেখি গণপৎ কোথায়?'

রমাপতি একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, 'গণপৎ—মুরলীদার চাকর? বাড়িতেই আছে নিশ্চয়। আজ সকালে তাকে দেখিনি। ডেকে আনব?'

এই সময় মুরলীধর বারান্দায় আসিয়া আমাদের দেখিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। তাহার ট্যারা চোখ আরও ট্যারা হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনিই মুরলীধরবাবু? নমস্কার। আপনার চাকর গণপৎকে একবার ডেকে দেবেন? তার সঙ্গে একটু দরকার আছে।'

মুরলীধরের মুখ ভয় ও বিদ্রোহের মিশ্রণে অপরূপ ভাব ধারণ করিল। সে চেরা গলায় বলিল, 'গণপতের সঙ্গে কি দরকার?'

'তাকে দু' একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'সে—তাকে ছুটি দিয়েছি। সে বাড়ি গেছে।'

'তাই নাকি! কবে ছুটি দিয়েছেন?'

'কাল—কাল দুপুরে।' মুরলীধর আর প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

আমরা পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। রমাপতির মুখে একটা ত্রস্ত উত্তেজনার ভাব দেখা গেল। সে ব্যোমকেশের কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল, 'কাল দুপুরে—! কিন্তু কাল সন্ধ্যের পরও আমি গণপৎকে বাড়িতে দেখেছি—'

ঘাড় নাড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'খুব সম্ভব। কারণ, রাত বারোটা পর্যন্ত গণপৎ বাড়ি যায়নি। কিন্তু সে যাক। নায়েব চাঁদমোহনবাবু বাড়িতে আছেন নিশ্চয়। আমরা তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

রমাপতি বলিল, 'তিনি নিজের ঘরে আছেন—'

'বেশ, সেখানেই আমাদের নিয়ে চল।'

বাড়ির এক কোণে চাঁদমোহনের ঘর। আমরা দ্বারের কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সারি সারি কলিকায় তামাক সাজিয়া রাখিতেছেন বোধ করি সারাদিনের কাজ সকালেই সারিয়া লইতেছেন। ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া রমাপতিকে বিদায় করিল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম, ব্যোমকেশ দরজা ভেজাইয়া দিল।

আমাদের অতর্কিত আবির্ভাবে চাঁদমোহন ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার চতুর চোখে চকিতে ভয়ের ছায়া পড়িল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'কে? আঁ—ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ তক্তপোশের কোণে বসিয়া বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।' তাহার কণ্ঠস্বর খুব মোলায়েম শুনাইল না।

ত্রাসের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া চাঁদমোহন গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'কি কথা?'

'অনেক দিনের পুরোনো কথা। রামবিনোদের মৃত্যু হয় কি করে?'

চাঁদমোহনের মুখ শীর্ণ হইয়া গেল, তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অর্ধস্ফুট স্বরে

বলিলেন, 'আমি কিছু বলতে পারি না—আমি এ বাড়ির নায়েব—'

ব্যোমকেশ গম্ভীর স্বরে বলিল, 'চাঁদমোহনবাবু, আপনি আমার নাম জানেন; আমার কাছে কোনও কথা লুকোবার চেষ্টা করলে তার ফল ভাল হয় না। রামবিনোদের মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। কি করে তাঁর মৃত্যু হল সব কথা খুলে বলুন।'

চাঁদমোহন ব্যোমকেশের দিকে একটা তীক্ষ্ণ চোরা চাহনি হানিয়া ধীরে ধীরে তক্ত-পোশের একপাশে আসিয়া বসিলেন, শুষ্কস্বরে বলিলেন, 'আপনি যখন জোর করছেন তখন না বলে আমার উপায় নেই। আমি যতটুকু জানি বলছি।'

ভিজা গামছায় মুখ মুছিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

'১৯১১ সালের শীতকালে আমরা মুঙ্গেরে ছিলাম। রামবিনোদ আর রামকিশোরের তখন ঘিয়ের ব্যবসা ছিল, কলকাতায় ঘি চালান দিত। মস্ত ঘিয়ের আড়ৎ ছিল। আমি ছিলাম কর্মচারী, আড়তে বসতাম। ওরা দুই ভাই যাওয়া আসা করত।

'হঠাৎ একদিন মুঙ্গেরে প্লেগ দেখা দিল। মানুষ মরে উড়কুড় উঠে যেতে লাগল, যারা বেঁচে রইল তারা ঘর-দোর ফেলে পালাতে লাগল। শহর শূন্য হয়ে গেল। রাম-বিনোদ আর রামকিশোর তখন মুঙ্গেরে, তারা বড় মুশকিলে পড়ল। আড়তে ষাট-সত্তর হাজার টাকার মাল রয়েছে, ফেলে পালানো যায় না; হয়তো সব চোরে নিয়ে যাবে। আমরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির করলাম, গঙ্গার বুকে নৌকো ভাড়া করে থাকব, আর পালা করে রোজ একজন এসে আড়ৎ তদারক করে যাব। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে। একটা সুবিধে ছিল, আড়ৎ গঙ্গা থেকে বেশী দূরে নয়।

'রামবিনোদের এক ছেলেবেলার বন্ধু মুঙ্গেরে স্কুল মাস্টারি করত—ঈশান মজুমদার। ঈশান সেদিন সর্পাঘাতে মারা গেছে। সেও নৌকোয় এসে জুটল। মাঝি মাল্লা নেই, শুধু আমরা চারজন—নৌকোটা বেশ বড় ছিল; নৌকোতেই রান্নাবান্না, নৌকোতেই থাকা। গঙ্গার মাঝখানে চড়া পড়েছিল, কখনও সেখানে গিয়ে রাত কাটাতাম। শহরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কেবল দিনে একবার গিয়ে আড়ৎ দেখে আসা।

'এইভাবে দশ বারো দিন কেটে গেল। তারপর একদিন রামবিনোদকে প্লেগে ধরল। শহরে গিয়েছিল জ্বর নিয়ে ফিরে এল। আমরা চড়ায় গিয়ে নৌকো লাগালাম, রাম-বিনোদকে চড়ায় নামালাম। একে তো প্লেগের কোনও চিকিৎসা নেই, তার ওপর মাঝ-গঙ্গায় কোথায় ওষুধ, কোথায় ডাক্তার। রামবিনোদ পরের দিনই মারা গেল।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল, 'তারপর আপনারা কি করলেন?'

চাঁদমোহন বলিলেন, 'আর থাকতে সাহস হল না। আড়তের মায়া ত্যাগ করে নৌকো ভাসিয়ে ভাগলপুরে পালিয়ে এলাম।'

'রামবিনোদের দেহ সৎকার করেছিলেন?'

চাঁদমোহন গামছায় মুখ মুছিয়া বলিলেন, 'দাহ করবার উপকরণ ছিল না; দেহ গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

'চল, এবার ফেরা যাক। এখানকার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।'

সিঁড়ির দিকে যাইতে যাইতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি মনে হল? চাঁদমোহন সত্যি কথা বলেছে?'

'একটু মিথ্যে বলেছে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই।'

সিঁড়ি দিয়া নামিতে যাইব, দেখিলাম তুলসী অদূরে একটি গাছের ছায়ায় খেলাঘর পাতিয়াছে, একাকিনী খেলায় এমন মগ্ন হইয়া গিয়াছে যে আমাদের লক্ষ্যই করিল না। ব্যোমকেশ কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ফারিত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। ব্যোমকেশ একটু সস্নেহ হাসিয়া বলিল, 'তোমার নাম তুলসী, না? কি মিষ্টি তোমার মুখখানি।'

তুলসী তেমনি অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'আমরা দুর্গে আছি, তুমি আসো না কেন? এসো—অনেক গল্প বলব।'

তুলসী তেমনি তাকাইয়া রহিল, উত্তর দিল না। আমরা চলিয়া আসিলাম।

## ৭

দুর্গে ফিরিয়া কিছুক্ষণ সিঁড়ি ওঠা-নামার ক্লান্তি দূর করিলাম। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করতে গেলেন। যদি হয়ে যায়, তাহলে ওদের বাড়িতে একটা নাড়াচাড়া তোলাপাড়া হবে; বংশী আর মুরলীধর হয়তো শহরে গিয়ে বাড়ি-ভাড়া করে থাকতে চাইবে। তার আগেই এ ব্যাপারের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার।'

প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, কিছু বুঝছ? আমি তো যতই দেখছি, ততই জট পাকিয়ে যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একটা আবছায়া চলচ্চিত্রের ছবি মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। ছবিটা ছোট নয়; অনেক মানুষ অনেক ঘটনা অনেক সংঘাত জড়িয়ে তার রূপ। একশো বছর আগে এই নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছিল, এখনও শেষ হয়নি।—ভাল কথা, কাল রাত্রের আলগা পাথরটার কথা মনে ছিল না। চল, দেখি গিয়ে তার তলায় গর্ত আছে কিনা।'

'চল।'

পাথরটার উপর অল্প-অল্প চুন সুরকি জমাট হইয়া আছে, আশেপাশের পাথরগুলির মত মসৃণ নয়। ব্যোমকেশ দেখিয়া বলিল, 'মনে হচ্ছে পাথরটাকে তুলে আবার উল্টো করে বসানো হয়েছে। এসো, তুলে দেখা যাক।'

আমরা আঙুল দিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পাথর উঠিল না। তখন সীতা-রামকে ডাকা হইল। সীতারাম করিতকর্মা লোক, সে একটা খুন্তি আনিয়া চাড়া দিয়া পাথর তুলিয়া ফেলিল।

পাথরের নীচে গর্তটর্ত কিছু নাই, ভরাট চুন সুরকি। ব্যোমকেশ পাথরের উল্টা পিঠ পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওহে, এই দ্যাখো, উর্দু-ফারসী লেখা রয়েছে!'

দেখিলাম পাথরের উপর কয়েক পংক্তি বিজাতীয় লিপি খোদাই করা রহিয়াছে। খোদাই খুব গভীর নয়, উপরন্তু লেখার উপর ধুলোবালি জমিয়া প্রায় অলক্ষণীয় হইয়া পড়িয়াছে। ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল, 'আমার মনে হচ্ছে—। দাঁড়াও, ঈশানবাবুর খাতাটা নিয়ে আসি।'

ঈশানবাবুর খাতা ব্যোমকেশ নিজের কাছে রাখিয়াছিল। সে তাহা আনিয়া যে-পাতায় ফারসী লেখা ছিল, তাহার সহিত পাথরের উৎকীর্ণ লেখাটা মিলাইয়া দেখিতে লাগিল। আমিও দেখিলাম। অর্থবোধ হইল না বটে, কিন্তু দুটি লেখার টান যে একই রকম তাহা সহজেই চোখে পড়ে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'হয়েছে। এবার চল।'

পাথরটি আবার যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ঘরে আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার বুঝলে?'

'তুমি পরিষ্কার করে বল।'

'একশ বছর আগের কথা স্মরণ কর। সিপাহীরা আসছে শুনে রাজারাম তাঁর পরিবার-বর্গকে সরিয়ে দিলেন, দুর্গে রইলেন কেবল তিনি আর জয়রাম। তারপর বাপবেটায় সমস্ত ধনরত্ন লুকিয়ে ফেললেন।

'কিন্তু সোনাদানা লুকিয়ে রাখার পর রাজারামের ভয় হল, সিপাহীদের হাতে তাঁরা যদি মারা পড়েন, তাহলে তাঁদের স্ত্রী-পরিবার সম্পত্তি উদ্ধার করবে কি করে? তিনি পাথরের উপর সংকেত-লিপি লিখলেন; এমন ভাষায় লিখলেন যা সকলের আয়ত্ত নয়। তারপর

ধুলোকাদা দিয়ে লেখাটা অস্পষ্ট করে দিলেন, যাতে সহজে সিপাহীদের নজরে না পড়ে

'সিপাহীরা এসে কিছুই খুঁজে পেল না। রাগে তারা বাপবেটাকে হত্যা করে চলে গেল তারপর রাজারামের পরিবারবর্গ যখন ফিরে এল, তারাও খুঁজে পেল না রাজারাম কোথায় তাঁর ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছেন। পাথরের পাটিতে খোদাই করা ফারসী সঙ্কেত-লিপি কারুর চোখে পড়ল না।'

বলিলাম, 'তাহলে তোমার বিশ্বাস, রাজারামের ধনরত্ন এখনও দুর্গে লুকোনো আছে।'

'তাই মনে হয়। তবে সিপাহীরা যদি রাজারাম আর জয়রামকে যন্ত্রণা দিয়ে গুপ্তস্থানের সন্ধান বার করে নিয়ে থাকে তাহলে কিছুই নেই।'

'তারপর বল।'

'তারপর একশ বছর পরে এলেন অধ্যাপক ঈশান মজুমদার। ইতিহাসের পণ্ডিত ফারসী-জানা লোক; তার ওপর বন্ধু রামবিনোদের কাছে দুর্গের ইতিবৃত্ত শুনেছিলেন। তিনি সন্ধান করতে আরম্ভ করলেন; প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। তাঁর এই গুপ্ত অনুসন্ধান কতদূর এগিয়েছিল জানি না, কিন্তু একটি জিনিস তিনি পেয়েছিলেন—ঐ পাথরে খোদাই করা সঙ্কেত-লিপি। তিনি সযত্নে তার নকল খাতায় টুকে রেখেছিলেন, আর পাথরটাকে উল্টে বসিয়েছিলেন, যাতে আর কেউ না দেখতে পায়। তারপর—তারপর যে কী হল সেইটেই আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

ব্যোমকেশ খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া রহিল। আমিও আপন মনে এলোমেলো চিন্তা করিতে লাগিলাম। পাণ্ডেজি এবেলা বোধহয় আসিলেন না।...কলিকাতায় সত্যবতীর খবর কি...ব্যোমকেশ হঠাৎ তুলসীর সহিত এমন সস্নেহে কথা বলিল কেন? মেয়েটার চৌদ্দ বছর বয়স, দেখিলে মনে হয় দশ বছরেরটি...

দ্বারের কাছে ছায়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তুলসী আর গদাধর। তুলসীর চোখে শঙ্কা ও আগ্রহ, বোধহয় একা আসিতে সাহস করে নাই, তাই গদাধরকে সঙ্গে আনিয়াছে গদাধরের কিন্তু লেশমাত্র শঙ্কা-সঙ্কোচ নাই; তাহার হাতে লাট্টু, মুখে কান-এঁটো-করা হাসি। আমাকে দেখিয়া হাস্য সহকারে বলিল, 'হে হে জামাইবাবুর সঙ্গে তুলসীর বিয়ে হবে—হে হে হে—'

তুলসী বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া তাহার গালে একটি চড় বসাইয়া দিল। গদাধর ক্ষণেক গাল ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর গম্ভীরমুখে লাট্টুতে লেত্তি পাকাইতে পাকাইতে প্রস্থান করিল। বুঝিলাম ছোট বোনের হাতে চড়-চাপড় খাইতে সে অভ্যস্ত।

তুলসীকে ব্যোমকেশ আদর করিয়া ঘরের মধ্যে আহ্বান করিল, তুলসী কিন্তু আসিতে চায় না, দ্বারের খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যোমকেশ তখন তাহাকে হাত ধরিয়া আনিয়া খাটের উপর বসাইয়া দিল।

তবু তুলসীর ভয় ভাঙে না, ব্যাধশঙ্কিতা হরিণীর মত তার ভাবভঙ্গী। ব্যোমকেশ নরম সুরে সমবয়স্কের মত তাহার সহিত গল্প করিতে আরম্ভ করিল। দুটা হাসি তামাসার কথা, মেয়েদের খেলাধুলা পুতুলের বিয়ে প্রভৃতি মজার কাহিনী,—শুনিতে শুনিতে তুলসীর ভয় ভাঙিল। প্রথমে দু' একবার 'হুঁ' 'না', তারপর সহজভাবে কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

মিনিট পনরোর মধ্যে তুলসীর সঙ্গে আমাদের সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দেখিলাম তাহার মন সরল, বুদ্ধি সতেজ; কেবল তাহার স্নায়ু সুস্থ নয়; সামান্য কারণে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সহজতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। ব্যোমকেশ তাহার চরিত্র ঠিক ধরিয়াছিল তাই সস্নেহ ব্যবহারে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে।

তুলসীর সহিত আমাদের যে সকল কথা হইল, তাহা আগাগোড়া পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই, তাহাদের পরিবার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানা গেল যাহা পূর্বেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাকিগুলি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'এখানে এসে যিনি ছিলেন, তোমার বাবার বন্ধু ঈশানবাবু, তাঁর

সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছিল?'

তুলসী বলিল, 'হ্যাঁ। তিনি আমাকে কত গল্প বলতেন। রাত্তিরে তাঁর ঘুম হত না; আমি অনেক বার দুপুর রাত্তিরে এসে তাঁর কাছে গল্প শুনেছি।'

'তাই নাকি! তিনি যে-রাত্তিরে মারা যান সে-রাত্তিরে তুমি কোথায় ছিলে?'

'সে-রাত্তিরে আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল! সে কি!'

'হ্যাঁ। আমি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াই কিনা, তাই ওরা সুবিধে পেলেই আমাকে বন্ধ করে রাখে।'

'ওরা কারা?'

'সবাই। বাবা বড়দা মেজদা জামাইবাবু—'

'সে-রাত্তিরে কে তোমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল?'

'বাবা।'

'হুঁ। আর কাল রাত্রে বুঝি মেজদা তোমাকে ঘরে বন্ধ করেছিল?'

'হ্যাঁ—তুমি কি করে জানলে?'

'আমি সব জানতে পারি। আচ্ছা, আর একটা কথা বল দেখি। তোমার বড়দার বিয়ে হয়েছিল, বৌদিদিকে মনে আছে?'

'কেন থাকবে না? বৌদিদি খুব সুন্দর ছিল। দিদি তাকে ভারি হিংসে করত।'

'তাই নাকি! তা তোমার বৌদিদি আত্মহত্যা করল কেন?'

'তা জানি না। সে-রাত্তিরে দিদি আমাকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল।'

'ও—'

ব্যোমকেশ আমার সহিত একটা দৃষ্টি বিনিময় করিল। কিছুক্ষণ অন্য কথার পর ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা তুলসী, বল দেখি বাড়ির মধ্যে তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসো?'

তুলসী নিঃসঙ্কোচে অলজ্জিত মুখে বলিল, 'মাস্টার মশাইকে। উনিও আমাকে খুব ভালবাসেন।'

'আর মণিলালকে তুমি ভালবাসো না?'

তুলসীর চোখ দুটো যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—'না। ও কেন মাস্টার মশাইকে হিংসে করে! ও কেন মাস্টার মশায়ের নামে বাবার কাছে লাগায়? ও যদি আমাকে বিয়ে করে আমি ওকে পাহাড় থেকে ঠেলে ফেলে দেব!' বলিয়া তুলসী ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'বেচারি!'

আধ ঘণ্টা পরে স্নানের জন্য উঠি-উঠি করিতেছি, রমাপতি আসিয়া দ্বারে উঁকি মারিল, কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, 'তুলসী এদিকে এসেছিল না কি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, এই খানিকক্ষণ হল চলে গেছে। এস—বোসো।'

রমাপতি সঙ্কুচিতভাবে আসিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'রমাপতি, প্রথম যেদিন আমরা এখানে আসি, তুমি বলেছিলে এবার ঈশানবাবুর মৃত্যু-সমস্যার সমাধান হবে। অর্থাৎ, তুমি মনে কর ঈশানবাবুর মৃত্যুর একটা সমস্যা আছে। কেমন?'

রমাপতি চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'ধরে নেওয়া যাক ঈশানবাবুর মৃত্যুটা রহস্যময়, কেউ তাকে খুন করেছে। এখন আমি তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব, তুমি তার সোজাসুজি উত্তর দাও। সঙ্কোচ কোরো না। মনে কর তুমি আদালতে হলফ্ নিয়ে সাক্ষী দিচ্ছ।'

রমাপতি ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বাড়ির সকলকেই তুমি ভাল করে চেনো। বল দেখি, ওদের মধ্যে

এমন কে আছে যে মানুষ খুন করতে পারে?'

রমাপতি সভয়ে কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, 'আমার বলা উচিত নয়, আমি ওঁদের আশ্রিত। কিন্তু অবস্থায় পড়লে বোধহয় সবাই মানুষ খুন করতে পারেন।'

'সবাই? রামকিশোরবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'বংশীধর?'

'হ্যাঁ।'

'মুরলীধর?'

'হ্যাঁ। ওঁদের প্রকৃতি বড় উগ্র—'

'নায়েব চাঁদমোহন?'

'বোধহয় না। তবে কর্তার হুকুম পেলে লোক লাগিয়ে খুন করাতে পারেন।'

'মণিলাল?'

রমাপতির মুখ অন্ধকার হইল, সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, 'নিজের হাতে মানুষ খুন করবার সাহস ওঁর নেই। উনি কেবল চুকলি খেয়ে মানুষের অনিষ্ট করতে পারেন।'

'আর তুমি? তুমি মানুষ খুন করতে পার না?'

'আমি—!'

'আচ্ছা, যাক্।—তুমি টর্চ চুরি করেছিলে?'

রমাপতি তিক্তমুখে বলিল, 'আমার বদনাম হয়েছে জানি। কে বদনাম দিয়েছে তাও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন, যদি চুরিই করতে হয়, একটা সামান্য টর্চ চুরি করব!'

'অর্থাৎ চুরি করনি।—যাক, মণিলালের সঙ্গে তুলসীর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তুমি জানো?'

রমাপতির মুখ কঠিন হইয়া উঠিল কিন্তু সে সংযতভাবে বলিল, 'জানি। কর্তার তাই ইচ্ছে।'

'আর কারুর ইচ্ছে নয়?'

'না।'

'তোমারও ইচ্ছে নয়?'

রমাপতি উঠিয়া দাঁড়াইল,—'আমি একটা গলগ্রহ, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় কী আসে যায়। কিন্তু এ বিয়ে যদি হয়, একটা বিশ্রী কাণ্ড হবে।' বলিয়া আমাদের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'ছোকরার সাহস আছে!'

## ৮

বৈকালে সীতারাম চা লইয়া আসিলে ব্যোমকেশ তাহাকে বলিল, 'সীতারাম, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। বছর দুই আগে একদল বেদে এসে এখানে তাঁবু ফেলে ছিল। তোমাকে বুলাকিলালের কছে খবর দিতে হবে, বাড়ির কে কে বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত—এ বিষয়ে যত খবর পাও যোগাড় করবে।'

সীতারাম বলিল, 'জি হুজুর। বুলাকিলাল এখন বাবুদের নিয়ে শহরে গেছে, ফিরে এলে খোঁজ নেব।'

সীতারাম প্রস্থান করিলে বলিলাম, 'বেদে সম্বন্ধে কৌতূহল কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বিষ! সাপের বিষ কোত্থেকে এল খোঁজ নিতে হবে না?'

'ও—'

এই সময় পান্ডেজি উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কাঁধ হইতে চামড়ার ফিতায় বাইনা-

কুলার ঝুলিতেছে। ব্যোমকেশ বলিল, 'একি; দূরবীন কি হবে?'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আনলাম আপনার জন্যে, যদি কাজে লাগে।—সকালে আসতে পারিনি, কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই এবেলা সকাল-সকাল বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় আসতে আসতে দেখি রামকিশোরবাবুও শহর থেকে ফিরছেন। তাঁদের ইঞ্জিন বিগড়েছে, বুলাকিলাল হুইল ধরে বসে আছে, রামকিশোরবাবু গাড়ির মধ্যে বসে আছেন, আর জামাই মণিলাল গাড়ি ঠেলছে।'

'তারপর?'

'দাঁড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ি টেনে নিয়ে এলাম।'

'ওঁদের আদালতের কাজকর্ম চুকে গেল?'

'না, একটু বাকি আছে, কাল আবার যাবেন।—তারপর, নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

'অনেক নতুন খবর আছে।'

খবর শুনিতে শুনিতে পাণ্ডেজি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে বলিলেন, 'আর সন্দেহ নেই। ঈশানবাবু তোষাখানা খুঁজে বার করেছিলেন, তাই তাঁকে কেউ খুন করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কে খুন করতে পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'রামকিশোরবাবু থেকে সন্নিসি ঠাকুর পর্যন্ত সবাই খুন করতে পারে। কিন্তু এটাই একমাত্র প্রশ্ন নয়। আরও প্রশ্ন আছে।'

'যেমন?'

'যেমন, বিষ এল কোত্থেকে। সাপের বিষ তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তারপর ধরুন, সাপের বিষ শরীরে ঢোকাবার জন্যে এমন একটা যন্ত্র চাই যেটা ঠিক সাপের দাঁতের মত দাগ রেখে যায়।'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ—'

'ইন্‌জেকশানের ছুঁচের দাগ খুব ছোট হয়, দু'চার মিনিটের মধ্যেই মিলিয়ে যায়। আপনি ঈশানবাবুর পায়ে দাগ দেখেছেন, ইন্‌জেকশানের দাগ বলে মনে হয় কি?'

'উহুঁ। তাছাড়া, দুটো দাগ পাশাপাশি—'

'ওটা কিছু নয়। যেখানে রুগী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সেখানে পাশাপাশি দু'বার ছুঁচ ফোটানো শক্ত কি?'

'তা বটে।—আর কি প্রশ্ন?'

'আর, ঈশানবাবু যদি গুপ্ত তোষাখানা খুঁজে বার করে থাকেন তবে সে তোষাখানা কোথায়?'

'এই দুর্গের মধ্যেই নিশ্চয় আছে।'

'শুধু দুর্গের মধ্যেই নয়, এই বাড়ির মধ্যেই আছে। মুরলীধর যে সাপের ভয় দেখিয়ে আমাদের তাড়াবার চেষ্টা করছে, তার কারণ কি?'

পাণ্ডেজি তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিলেন, 'মুরলীধর?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। মোট কথা, ঈশানবাবু আসবার আগে তোষাখানার সন্ধান কেউ জানত না। তারপর ঈশানবাবু ছাড়া আর একজন জানতে পেরেছে এবং ঈশানবাবুকে খুন করেছে। তবে আমার বিশ্বাস, মাল সরাতে পারেনি।'

'কি করে বুঝলেন?'

'দেখুন, আমরা দুর্গে আছি, এটা কারুর পছন্দ নয়। এর অর্থ কি?'

'বুঝেছি। তাহলে আগে তোষাখানা খুঁজে বার করা দরকার। কোথায় তোষাখানা থাকতে পারে: আপনি কিছু ভেবে দেখেছেন কি?'

ব্যোমকেশ একটু হাসিল, বলিল, 'কাল থেকে একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে ঘুরছে—'

আমি বলিলাম, 'গজাল!'

এই সময় সীতারাম চায়ের পাত্রগুলি সরাইয়া লইতে আসিল। ব্যোমকেশ তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, 'বুলাকিলাল ফিরে এসেছে!'

সীতারাম মাথা ঝুঁকাইয়া পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল। পাণ্ডে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওকে কোথাও পাঠালেন নাকি?'

'হ্যাঁ, বুলাকিলালের কাছে কিছু দরকার আছে।'

'যাক। এবার আপনার সন্দেহের কথা বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঐ গজালগুলো। কেবল সন্দেহ হচ্ছে ওদের প্রকাশ্য প্রয়োজনটাই একমাত্র প্রয়োজন নয়, যাকে বলে ধোঁকার টাটি, ওরা হচ্ছে তাই।'

পাণ্ডে গজালগুলিকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, 'হুঁ। তা কি করা যেতে পারে।'

'আমার ইচ্ছে ওদের একটু নেড়েচেড়ে দেখা। আপনি এসেছেন, আপনার সামনেই যা কিছু করা ভাল। যদি তোষাখানা বেরোয়, আমরা তিনজনে জানব, আর কাউকে আপাতত জানতে দেওয়া হবে না।—অজিত, দরজা বন্ধ কর।'

দরজা বন্ধ করিলে ঘর অন্ধকার হইল। তখন লণ্ঠন জ্বালিয়া এবং টর্চের আলো ফেলিয়া আমরা অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। সর্বসুদ্ধ পনরোটি গজাল। আমরা প্রত্যেকটি টানিয়া ঠেলিয়া উঁচু দিকে আকর্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। গজালগুলি মরিচা-ধরা কিন্তু বজ্রের মত দৃঢ়, একচুলও নড়িল না।

হঠাৎ পাণ্ডে বলিয়া উঠিলেন, 'এই যে! নড়ছে—একটু একটু নড়ছে—!' আমরা ছুটিয়া তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার সামনে যে দেয়াল, তাহার মাঝখানে একটা গজাল। পাণ্ডে গজাল ধরিয়া ভিতর দিকে ঠেলা দিতেছেন; নড়িতেছে কিনা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। পাণ্ডে বলিলেন, 'আমার একার কর্ম নয়। ব্যোমকেশবাবু, আপনিও ঠেলুন।'

ব্যোমকেশ হাঁটু গাড়িয়া দুই হাতে পাথরে ঠেলা দিতে শুরু করিল। চতুষ্কোণ পাথর ধীরে ধীরে পিছন দিকে সরিতে লাগিল। তাহার নীচে অন্ধকার গর্ত দেখা গেল।

আমি টর্চের আলো ফেলিলাম। গর্তটি লম্বা-চওড়ায় দুই হাত, ভিতরে একপ্রস্থ সরু সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে।

পাণ্ডে মহা উত্তেজিতভাবে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিলেন, 'সাবাস! পাওয়া গেছে তোষাখানা।—ব্যোমকেশবাবু, আপনি আবিষ্কর্তা, আপনি আগে ঢুকুন।'

টর্চ লইয়া ব্যোমকেশ আগে নামিল, তারপর পাণ্ডেজি, সর্বশেষে লণ্ঠন লইয়া আমি। ঘরটি উপরের ঘরের মতই প্রশস্ত। একটি দেওয়ালের গা ঘেঁষিয়া সারি সারি মাটির কুণ্ডা কুণ্ডার মুখে ছোট ছোট হাঁড়ি, হাঁড়ির মুখ সরা দিয়া ঢাকা। ঘরের অন্য কোণে একটি বড় উনান, তাহার সহিত একটি হাপরের নল সংযুক্ত রহিয়াছে। হাপরের চামড়া অবশ্য শুকাইয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু কাঠামো দেখিয়া হাপর বলিয়া চেনা যায়। ঘরে আর কিছু নাই।

আমাদের ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল, পেট মোটা কুণ্ডাগুলিতে না জানি কোন্ রাজার সম্পত্তি সঞ্চিত রহিয়াছে। কিন্তু আগে ঘরের অন্যান্য স্থান দেখা দরকার। এদিক-ওদিক আলো ফেলিতে এককোণে একটা চকচকে জিনিস চোখে পড়িল। ছুটিয়া কাছে গিয়া দেখি—একটি ছোট বৈদ্যুতিক টর্চ। তুলিয়া লইয়া জ্বালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু টর্চ জ্বালাই ছিল, জ্বলিয়া জ্বলিয়া সেল্ ফুরাইয়া নিভিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঈশানবাবু যে এ ঘরের সন্ধান পেয়েছিলেন, তার অকাট্য প্রমাণ।'

তখন আমরা হাঁড়িগুলি খুলিয়া দেখিলাম। সব হাঁড়িই শূন্য, কেবল একটা হাঁড়ির তলায় নুনের মত খানিকটা গুঁড়া পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ একখামচা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল, তারপর রুমালে বাঁধিয়া পকেটে রাখিল। বলিল, 'নুন হতে পারে, চূণ হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।'

অতঃপর কুণ্ডাগুলি একে একে পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু হায়, সাত রাজার ধন মিলিল না। সব কুণ্ডা খালি, কোথাও একটা কপর্দক পর্যন্ত নাই।

আমরা ফ্যাল ফ্যাল চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। তারপর ঘরটিতে আঁতিপাঁতি করা হইল, কিন্তু কিছু মিলিল না।

উপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে গুপ্তম্বার টানিয়া বন্ধ করা হইল। তারপর ঘরের দরজা খুলিলাম। বাহিরে অন্ধকার হইয়া গিয়াছে; সীতারাম দ্বারের বাহিরে ঘোরাঘুরি করিতেছে। ব্যোমকেশ ক্লান্তস্বরে বলিল, 'সীতারাম, আর একদফা চা তৈরি কর।'

চেয়ার লইয়া তিনজনে বাহিরে বসিলাম। পাণ্ডে দমিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, 'কি হল বলুন দেখি? মাল গেল কোথায়?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে। এক, সিপাহীরা সব লুটে নিয়ে গিয়েছে। দুই, ঈশানবাবুকে যে খুন করেছে, সে সেই রাত্রেই মাল সরিয়েছে। তিন, রাজারাম অন্য কোথাও মাল লুকিয়েছেন।'

'কোন্ সম্ভাবনাটা আপনার বেশী মনে লাগে?'

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া 'বলাকা' কবিতার শেষ পংক্তি আবৃত্তি করিল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

চা পান করিতে করিতে ব্যোমকেশ সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বুলাকিলালের দেখা পেলে?'

সীতারাম বলিল, 'জী। গাড়ির ইঞ্জিন মেরামত করছিল, দু-চারটে কথা হল।'

'কি বললে সে?'

'হুজুর, বুলাকিলাল একটা আস্ত বুদ্ধু। সন্ধ্যে হলেই ভাঙ খেয়ে বেদম ঘুমোয়, রাত্তিরের কোনও খবরই রাখে না। তবে দিনের বেলা বাড়ির সকলেই বেদের তাঁবুতে যাতায়াত করত। এমনকি, বুলাকিলালও দু-চারবার গিয়েছিল।'

'বুলাকিলাল গিয়েছিল কেন?'

'হাত দেখাতে। বেদেনীরা নাকি ভাল হাত দেখতে জানে, ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারে। বুলাকিলালকে বলেছে ও শীগ্গির লাট সাহেবের মোটর ড্রাইভার হবে।'

'বাড়ির আর কে কে যেতো?'

'মালিক মালিকের দুই বড় ছেলে, জামাইবাবু, নায়েববাবু, সবাই যেতো। আর ছোট ছেলেমেয়ে দুটো সর্বদাই ওখানে ঘোরাঘুরি করত।'

'হু, আর কিছু?'

'আর কিছু নয় হুজুর।'

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া পাণ্ডেজি উঠিলেন। ব্যোমকেশ তাঁহাকে রুমালে বাঁধা পুঁটুলি দিয়া বলিল, 'এটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্ করিয়ে দেখবেন। আমরা এ পর্যন্ত যতটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাতে নিরাশ হবার কিছু নেই। অন্তত ঈশানবাবুকে যে হত্যা করা হয়েছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, বাকি খবর ক্রমে পাওয়া যাবে।'

পাণ্ডেজি রুমালের পুঁটুলি পকেটে রাখিতে গিয়া বলিলেন, 'আরে, ডাকে আপনার একটা চিঠি এসেছিল, সেটা এতক্ষণ দিতেই ভুলে গেছি। এই নিন।—আচ্ছা, কাল আবার আসব।'

পাণ্ডেজিকে সিঁড়ি পর্যন্ত পোঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। ব্যোমকেশ চিঠি খুলিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সত্যবতীর চিঠি নাকি?'

'না, সুকুমারের চিঠি।'

'কি খবর?'

'নতুন খবর কিছু নেই। তবে সব ভাল।'

রাত্রিটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল।

পরদিন সকালে ব্যোমকেশ ঈশানবাবুর খাতা লইয়া বসিল। কখনও খাতাটা পড়িতেছে,

কখনও ঊর্ধ্বপানে চোখ তুলিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়িতেছে, কথাবার্তা বলিতেছে না।

বাইনাকুলার কাল পাণ্ডেজি রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলাম, 'কিসের গবেষণা হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ সংক্ষেপে বলিল, 'মোহনলাল।'

মোহনলালের নামে আজ, কেন জানি না, বহুদিন পূর্বে পঠিত 'পলাশীর যুদ্ধ' মনে পড়িয়া গেল। বলিলাম, 'আবার আবার সেই কামান গর্জন...কাঁপাইয়া গঙ্গাজল—'

ব্যোমকেশ ভর্ৎসনা-ভরা চক্ষু তুলিয়া আমার পানে চাহিল। আমি বলিলাম, 'দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন, গর্জিল মোহনলাল নিকট শমন।'

ব্যোমকেশের চোখের ভর্ৎসনা ক্রমে হিংস্র ভাব ধারণ করিতেছে দেখিয়া আমি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। কেহ যদি বীররসাত্মক কাব্য সহ্য করিতে না পারে, তাহার উপর জুলুম করা উচিত নয়।

বাহিরে স্বর্ণোজ্জ্বল হৈমন্ত প্রভাত। দূরবীনটা হাতেই ছিল, আমি সেটা লইয়া প্রাকারে উঠিলাম। চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরের পর্বতচূড়া কাছে আসিয়াছে, বনানীর মাথার উপর আলোর ঢেউ খেলিতেছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে রামকিশোরবাবুর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ির খুঁটিনাটি সমস্ত দেখিতে পাইতেছি। রামকিশোর শহরে যাইবার জন্য বাহির হইলেন, সঙ্গে দুই পুত্র এবং জামাই। তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পরে মোটর চলিয়া গেল।...বাড়িতে রহিল মাস্টার রমাপতি, গদাধর আর তুলসী।

ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ তখনও জলপানরত মুরগীর মত একবার কোলের দিকে ঝুঁকিয়া খাতা পড়িতেছে, আবার উঁচু দিকে মুখ তুলিয়া আপন মনে বিজ্ বিজ্ করিতেছে। বলিলাম, 'ওহে, রামকিশোরবাবুরা শহরে চলে গেলেন।'

ব্যোমকেশ আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া মুরগীর মত জল পান করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিল, 'মোহনলাল মস্ত বীর ছিল—না?'

'সেই রকম তো শুনতে পাই।'

ব্যোমকেশ আর কথা কহিল না। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সে আজ খাতা ছাড়িয়া উঠিবে না। সকালবেলাটা নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটিয়া যাইবে ভাবিয়া বলিলাম, 'চল না, সাধু-দর্শন করা যাক। তিনি হয়তো হাত গুণতে জানেন।'

অন্যমনস্কভাবে চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এখন নয়, ওবেলা দেখা যাবে।'

দুপুরবেলা শয্যায় শুইয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। রামকিশোরবাবু ঠিক বলিয়াছিলেন; এই নির্জনে দু'দিন বাস করিলে প্রাণ পালাই-পালাই করে।

পৌনে তিনটা পর্যন্ত বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া আর পারা গেল না, উঠিয়া পড়িলাম। দেখি, ব্যোমকেশ ঘরে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, সে প্রাকারের উপর উঠিয়া পায়চারি করিতেছে। রৌদ্র তেমন কড়া নয় বটে, কিন্তু এ সময় প্রাকারের উপর বায়ু সেবনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইল না। তবু হয়তো নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে ভাবিয়া আমিও সেই দিকে চলিলাম।

আমাকে দেখিয়া সে যেন নিজের মনের ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল, যন্ত্রবৎ বলিল, 'একটা তূরপুন চাই।'

'তূরপুন!' দেখিলাম, তাহার চোখে অধীর বিভ্রান্ত দৃষ্টি। এ-দৃষ্টি আমার অপরিচিত নয়, সে কিছু পাইয়াছে। বলিলাম, 'কি পেলে?'

ব্যোমকেশ এবার সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া আমাকে দেখিতে পাইল, ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল, 'না না, কিছু না! তুমি দিব্যি ঘুমুচ্ছিলে, ভাবলাম এখানে এসে দূরবীনের সাহায্যে নিসর্গ-শোভা নিরীক্ষণ করি। তা দেখবার কিছু নেই।—এই নাও, তুমি দ্যাখো।'

প্রাকারের আলিসার উপর দূরবীনটা রাখা ছিল, সেটা আমাকে ধরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ

নামিয়া গেল। আমি একটু অবাক হইলাম। ব্যোমকেশের আজ এ কী ভাব!

চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। আতপ্ত বাতাসে বহিঃপ্রকৃতি ঝিম ঝিম করিতেছে। দূরবীন চোখে দিলাম; দূরবীন এদিক-ওদিক ঘুরিয়া রামকিশোরবাবুর বাড়ির উপর স্থির হইল।

দূরবীন দিয়া দেখার সহিত আড়ি পাতার একটা সাদৃশ্য আছে; এ যেন চোখ দিয়া আড়ি পাতা। রামকিশোরবাবুর বাড়িটা দূরবীনের ভিতর দিয়া আমার দশ হাতের মধ্যে আসিয়া গিয়াছে; বাড়ির সবই আমি দেখিতে পাইতেছি, অথচ আমাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না।

বাড়ির সদরে কেহ নাই, কিন্তু দরজা খোলা। দূরবীন উপরে উঠিল। হাঁটু পর্যন্ত আলিসা-ঘেরা ছাদ, সিঁড়ি পিছন দিকে। রমাপতি আলিসার উপর গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে, তাহার পাশের ভাগ দেখিতে পাইতেছি। ছাদে আর কেহ নাই; রমাপতি কপাল কুঁচকাইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

রমাপতি চমকিয়া মুখ তুলিল। সিঁড়ি দিয়া তুলসী উঠিয়া আসিল, তাহার মুখে-চোখে গোপনতার উত্তেজনা। লঘু দ্রুতপদে রমাপতির কাছে আসিয়া সে আঁচলের ভিতর হইতে ডান হাত বাহির করিয়া দেখাইল। হাতে কি একটা রহিয়াছে, কালো রঙের পেন্সিল কিম্বা ফাউণ্টেন পেন।

দূরবীনের ভিতর দিয়া দেখিতেছি, কিন্তু কিছু শুনিতে পাইতেছি না; যেন সে-কালের নির্বাক চলচ্চিত্র। রমাপতি উত্তেজিত হইয়া কি বলিতেছে, হাত নাড়িতেছে। তুলসী তাহার গলা জড়াইয়া অনুনয় করিতেছে, কালো জিনিসটা তাহার হাতে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় রঙ্গমঞ্চে আরও কয়েকটি অভিনেতার আবির্ভাব হইল। রামকিশোরবাবু সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে বংশীধর ও মুরলীধর; সর্বশেষে মণিলাল।

সকলেই ক্রুদ্ধ; রমাপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া কাঠ হইয়া রহিল। বংশীধর বিকৃত মুখভঙ্গী করিয়া তুলসীকে তাড়না করিল এবং কালো জিনিসটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তুলসী কিছুক্ষণ সতেজ তর্ক করিল, তারপর কাঁদো-কাঁদো মুখে নামিয়া গেল। তখন রমাপতিকে ঘিরিয়া বাকি কয়জন তর্জন-গর্জন করিতে লাগিলেন, কেবল মণিলাল কটমট চক্ষে চাহিয়া অধরোষ্ঠ সম্বদ্ধ করিয়া রাখিল।

বংশীধর সহসা রমাপতির গালে একটা চড় মারিল। রামকিশোর বাধা দিলেন, তারপর আদেশের ভঙ্গীতে সিঁড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। সকলে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

এই বিচিত্র দৃশ্যের অর্থ কি, সংলাপের অভাবে তাহা নির্ধারণ করা অসম্ভব। আমি আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করিলাম, কিন্তু নাটকীয় ব্যাপার আর কিছু দেখিতে পাইলাম না; যাহা কিছু ঘটিল বাড়ির মধ্যে আমার চক্ষুর অন্তরালে ঘটিল।

নামিয়া আসিয়া ব্যোমকেশকে বলিলাম। সে গভীর মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবুরা তাহলে সদর থেকে ফিরে এসেছেন।—তুলসীর হাতে জিনিসটা চিনতে পারলে না?'

'মনে হল ফাউণ্টেন পেন।'

'দেখা যাক, হয়তো শীগ্‌গিরই খবর পাওয়া যাবে। রমাপতি আসতে পারে।'

রমাপতি আসিল না, আসিল তুলসী। ঝড়ের আগে শুষ্ক পাতার মত সে যেন উড়িতে উড়িতে আসিয়া আমাদের ঘরের চৌকাঠে আটকাইয়া গেল। তাহার মূর্তি পাগলিনীর মত, দুই চক্ষু রাঙা টকটক করিতেছে। সে খাটের উপর ব্যোমকেশকে উপবিষ্ট দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহার কোলের উপর আছড়াইয়া পড়িল, চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'আমার মাস্টার মশাইকে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়িয়ে দিয়েছে?'

তুলসীর কান্না থামানো সহজ হইল না। যাহোক, ব্যোমকেশের সস্নেহ সান্ত্বনায় কান্না ক্রমে ফোঁপানিতে নামিল, তখন প্রকৃত তথ্য জানা গেল।

জামাইবাবুর দুইটি ফাউণ্টেন পেন আছে; একটি তাঁহার নিজের, অন্যটি তিনি বিবাহের সময় যৌতুক পাইয়াছিলেন...জামাইবাবু দুইটি কলম লইয়া কি করিবেন? তাই আজ তুলসী জামাইবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁহার দেরাজ হইতে কলম লইয়া মাস্টার মশাইকে দিতে গিয়াছিল—মাস্টার মশায়ের একটিও কলম নাই—মাস্টার মশাই কিন্তু লইতে চান নাই, রাগ করিয়া কলম যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে হুকুম দিয়াছিলেন, এমন সময় বাড়ির সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মাস্টার মশাইকে চোর বলিয়া ধরিল...তুলসী এত বলিল মাস্টার মশাই চুরি করেন নাই কিন্তু কেহ শুনিল না। শেষ পর্যন্ত মারধর করিয়া মাস্টার মশাইকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে।

আমি দূরবীনের ভিতর দিয়া যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহার সহিত তুলসীর কাহিনীর কোথাও গরমিল নাই। আমরা দুইজনে মিলিয়া তুলসীকে প্রবোধ দিতে লাগিলাম, মাস্টার আবার ফিরিয়া আসিবে, কোনও ভাবনা নাই; প্রয়োজন হইলে আমরা গিয়া তুলসীর বাবাকে বলিব।

দ্বারের কাছে গলা খাঁকারির শব্দ শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখি, জামাই মণিলাল দাঁড়াইয়া আছে। তুলসী তাহাকে দেখিয়া তীরের মত তাহার পাশ কাটাইয়া অদৃশ্য হইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন মণিবাবু।'

মণিলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'কর্তা পাঠিয়েছিলেন তুলসীর খোঁজ নেবার জন্যে। ও ভারি দুরন্ত, আপনাদের বেশী বিরক্ত করে না তো?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোটেই বিরক্ত করে না। ওর মাস্টারকে নাকি তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই বলতে এসেছিল।'

মণিলাল একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, বলিল, 'হ্যাঁ, রমাপতিকে কর্তা বিদেয় করে দিলেন। আমরা কেউ বাড়িতে ছিলাম না, পরচাবি দিয়ে আমার দেরাজ খুলে একটা কলম চুরি করেছিল। দামী কলম—'

ব্যোমকেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, 'যে কলমটা আপনার বুক পকেটে রয়েছে ঐটে কি?'

'হ্যাঁ।' মণিলাল কলম ব্যোমকেশের হাতে দিল।

পার্কারের কলম, দামী জিনিস। ব্যোমকেশ কলম ভালবাসে, সে তাহার মাথার ক্যাপ খুলিয়া দেখিল, পিছন খুলিয়া কালি ভরিবার যন্ত্র দেখিল; তারপর কলম ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'ভাল কলম। চুরি করতে হলে এই রকম কলমই চুরি করা উচিত। বাড়িতে আর কার ফাউণ্টেন পেন আছে?'

মণিলাল বলিল, 'আর কারুর নেই। বাড়িতে পড়ালেখার বিশেষ রেওয়াজ নেই। কেবল কর্তা দোয়াত কলমে লেখেন।'

'হুঁ। তুলসী বলছে ও নিজেই আপনার দেরাজ থেকে কলম বার করেছিল—'

মণিলাল দুঃখিত ভাবে বলিল, 'তুলসী মিথ্যে কথা বলছে। রমাপতির ও দোষ বরাবরই আছে। এই সেদিন একটা ইলেক্‌ট্রিক টর্চ—'

আমি বলিতে গেলাম, 'ইলেকট্রিক টর্চ তো—'

কিন্তু আমি কথা শেষ করিবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল, 'ইলেকট্রিক টর্চ একটা তুচ্ছ জিনিস। রমাপতি হাজার হোক বুদ্ধিমান লোক, সে কি একটা টর্চ চুরি করে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করবে?'

মণিলাল কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার কথায় আমার ধোঁকা লাগছে, কি জানি যদি সে টর্চ না চুরি করে থাকে। কিন্তু আজ আমার কলমটা—। তবে কি তুলসী সত্যিই—!'

আমি জোর দিয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ, তুলসী সত্যি কথা বলেছে। আমি—'

ব্যোমকেশ আবার আমার মুখে থাবা দিয়া বলিল, 'মণিলালবাবু, আপনাদের পারি-

বারিক ব্যাপারে আমাদের মাথা গলানো উচিত নয়। আমরা দু' দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছি, কি দরকার আমাদের ওসব কথায়! আপনারা যা ভাল বুঝেছেন করেছেন।'

'তাহলেও—কারুর নামে মিথ্যে বদনাম দেওয়া ভাল নয়—' বলিতে বলিতে মণিলাল দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আপনাদের সদরের কাজ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ, সকাল সকাল কাজ হয়ে গেল। কেবল দস্তখৎ করা বাকি ছিল।'

'যাক, এখন তাহলে নিশ্চিন্ত।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

মণিলাল প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ দরজায় উঁকি মারিয়া আসিয়া বলিল, 'আর একটু হলেই দিয়েছিলে সব ফাঁসিয়ে!'

'সে কি! কী ফাঁসিয়ে দিয়েছিলাম!'

'প্রথমে তুমি বলতে যাচ্ছিলে যে হারানো টর্চ পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর বলতে যাচ্ছিলে যে দূরবীন দিয়ে ছাদের দৃশ্য দেখেছ!'

'হ্যাঁ, তাতে কী ক্ষতি হত?'

'মণিলালকে কোনও কথা বলা মানেই বাড়ির সকলকে বলা। গর্দভচর্মাবৃত যে সিংহটিকে আমরা খুঁজছি সে জানতে পারত যে আমরা তোষাখানার সন্ধান পেয়েছি এবং দূরবীন দিয়ে ওদের ওপর অষ্টপ্রহর নজর রেখেছি। শিকার ভড়কে যেত না?'

এ কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই।

এই সময় সীতারাম চা লইয়া আসিল। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডেজি আসিলেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক তাজা খাদ্যদ্রব্য আনিয়াছেন। সীতারাম সেগুলো মোটর হইতে আনিতে গেল। আমরা চা পান করিতে করিতে সংবাদের আদান-প্রদান করিলাম।

আমাদের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডেজি বলিলেন, 'জাল থেকে মাছ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ রমাপতি গিয়েছে, কাল বংশীধর আর মুরলীধর যাবে। তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলা দরকার।—হ্যাঁ, বংশীধর কলেজ হোস্টেলে থাকতে যে কুকীর্তি করেছিল তার খবর পাওয়া গেছে।'

'কি কুকীর্তি করেছিল?'

'একটি ছেলের সঙ্গে ওর ঝগড়া হয়, তারপর মিটমাট হয়ে যায়। বংশীধর কিন্তু মনে মনে রাগ পুষে রেখেছিল; দোলের দিন সিদ্ধির সঙ্গে ছেলেটাকে ধুতরোর বিচি খাইয়ে দিয়েছিল। ছেলেটা মরেই যেত, অতি কষ্টে বেঁচে গেল।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'হুঁ। তাহলে বিষ প্রয়োগের অভ্যাস বংশীধরের আছে।'

'তা আছে। শুধু গোঁয়ার নয়, রাগ পুষে রাখে।'

পাঁচটা বাজিল। ব্যোমকেশ বলিল, 'চলুন, আজ সন্ন্যাসী ঠাকুরের সঙ্গে একটু আলাপ করে আসা যাক।'

## ১০

দেউড়ি পর্যন্ত নামিবার পর দেখিলাম বাড়ির দিকের সিঁড়ি দিয়া বংশীধর গট্‌গট্ করিয়া নামিয়া আসিতেছে। আমাদের দেখিতে পাইয়া তাহার সতেজ গতিভঙ্গী কেমন যেন এলোমেলো হইয়া গেল; কিন্তু সে থামিল না, যেন শহরের রাস্তা ধরিবে এমনিভাবে আমাদের পিছনে রাখিয়া আগাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ চুপি চুপি বলিল, 'বংশীধর সাধুবাবার কাছে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে ভড়কে

গিয়ে অন্য পথ ধরেছে।'

বংশীধর তখনও বেশী দূর যায় নাই, পাণ্ডেজি হাঁক দিলেন, 'বংশীধরবাবু!'

বংশীধর ফিরিয়া ভ্রূ নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমরা কাছে গেলাম, পাণ্ডেজি কৌতুকের সুরে বলিলেন, 'কোথায় চলেছেন হন্‌হনিয়ে?'

বংশীধর রুক্ষ সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, 'বেড়াতে যাচ্ছি।'

পাণ্ডেজি হাসিয়া বলিলেন, 'এই তো শহর বেড়িয়ে এলেন। আরও বেড়াবেন?'

বংশীধরের রগের শিরা উঁচু হইয়া উঠিল, সে উদ্ধতস্বরে বলিল, 'হ্যাঁ, বেড়াবো। আপনি পুলিস হতে পারেন, কিন্তু আমার বেড়ানো রুক্‌তে পারেন না।'

পাণ্ডেজিরও মুখ কঠিন হইল। তিনি কড়া সুরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, পারি। কলেজ হোস্টেলে আপনি একজনকে বিষ খাইয়েছিলেন, সে মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ফৌজদারী মামলার তামাদি হয় না। আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি।'

ভয়ে বংশীধরের মুখ নীল হইয়া গেল। উগ্রতা এত দ্রুত আতঙ্কে পরিবর্তিত হইতে পারে চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। সে জালবদ্ধ পশুর ন্যায় ক্ষিপ্রচক্ষে এদিক ওদিক চাহিল, তারপর যে পথে আসিয়াছিল সেই সিঁড়ি দিয়া পলকের মধ্যে বাড়ির দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পাণ্ডেজি মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।

'বংশীধরের বিক্রম বোঝা গেছে।—চলুন।'

সাধুবাবার নিকট উপস্থিত হইলাম। চারিদিকের ঝাঁক্‌ড়া গাছ স্থানটিকে প্রায় অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে। জ্বলন্ত ধুনির সম্মুখে বাবাজী বসিয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া নীরব অথচ ইঙ্গিতপূর্ণ হাস্যে তাঁহার মুখ ভরিয়া উঠিল, তিনি হাতের ইশারায় আমাদের বসিতে বলিলেন।

পাণ্ডেজী তাঁহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দীতেই কথাবার্তা হইল। পাণ্ডেজির গায়ে পুলিসের খাকি কামিজ ছিল, সাধুবাবা তাঁহার সহিত সমধিক আগ্রহে কথা বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ সাধারণভাবে কথা হইল। সন্ন্যাস জীবনের মাহাত্ম্য এবং গার্হস্থ্য জীবনের পঙ্কিলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত হইলাম। হৃষ্ট বাবাজী ঝুলি হইতে গাঁজা বাহির করিয়া সাজিবার উপক্রম করিলেন।

পাণ্ডেজি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখানে গাঁজা কোথায় পান বাবা?'

বাবাজী ঊর্ধ্বে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন, 'পরমাত্মা মিলিয়ে দেন বেটা।'

চিমটা দিয়া ধুনি হইতে একখণ্ড অঙ্গার তুলিয়া বাবাজী কলিকার মাথায় রাখিলেন। এই সময় তাঁহার চিমটাটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলাম। সাধুরা যে নির্ভয়ে বনে-বাদাড়ে বাস করেন তাহা নিতান্ত নিরস্ত্রভাবে নয়। চিম্‌টা ভালভাবে ব্যবহার করিতে জানিলে ইহার দ্বারা বোধ করি বাঘ মারা যায়। আবার তাহার সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণ প্রান্ত দুটির সাহায্যে ক্ষুদ্র অঙ্গার খণ্ডও যে তুলিয়া লওয়া যায় তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিলাম। সাধুরা এই একটি মাত্র লৌহাস্ত্র দিয়া নানা কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

যাহোক, বাবাজী গাঁজার কলিকায় দম দিলেন। তাঁহার গ্রীবা এবং রগের শিরা-উপশিরা ফুলিয়া উঠিল। দীর্ঘ একমিনিটব্যাপী দম দিয়া বাবাজী নিঃশোষিত কলিকাটি উপুড় করিয়া দিলেন।

তারপর ধোঁয়া ছাড়িবার পালা। এ কার্যটি বাবাজী প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া করিলেন; দাড়ি-গোঁফের ভিতর হইতে মন্দ মন্দ ধূম বাহির হইয়া বাতাসকে সুরভিত করিয়া তুলিল।

বাবাজী বলিলেন, 'বম্‌! বম্‌ শঙ্কর!'

এই সময় পায়ের শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, একটি লোক আসিতেছে। লোকটি আমাদের দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন চিনিলাম, রামকিশোরবাবু! তিনি আমাদের চিনিতে পারিয়া স্খলিত স্বরে বলিলেন, 'ও—আপনারা—!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আসুন।'

রামকিশোর ঈষৎ নিরাশ কণ্ঠে বলিলেন, 'না, আপনারা সাধুজীর সঙ্গে কথা বলছেন বলুন। আমি কেবল দর্শন করতে এসেছিলাম।' জোড়হস্তে সাধুকে প্রণাম করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

সাধুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই বিচিত্র হাসি। হাসিটিকে বিশ্লেষণ করিলে কতখানি আধ্যাত্মিকতা এবং কতখানি নষ্টামি পাওয়া যায় তাহা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ সমান সমান।

এইবার ব্যোমকেশ বলিল, 'সাধুবাবা, আপনি তো অনেকদিন এখানে আছেন। সেদিন একটি লোক এখানে সর্পাঘাতে মারা গেছে, জানেন কি?'

সাধু বলিলেন, 'জানতা হ্যায়। হম্ ক্যা নহি জানতা!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, সে রাত্রে কেউ দুর্গে গিয়েছিল কি না আপনি দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, দেখা।'

বাবাজীর মুখে আবার সেই আধ্যাত্মিক নষ্টামিভরা হাসি দেখা দিল। ব্যোমকেশ সাগ্রহে আবার তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, আবার পিছন দিকে পায়ের শব্দ হইল। আমরা ঘাড় ফিরাইলাম, বাবাজীও প্রখর চক্ষে সেই দিকে চাহিলেন। কিন্তু আগন্তুক কেহ আসিল না; হয়তো আমাদের উপস্থিতি জানিতে পারিয়া দূর হইতেই ফিরিয়া গেল।

ব্যোমকেশ আবার বাবাজীকে প্রশ্ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া পরিষ্কার বাঙলায় বলিলেন, 'এখন নয়। রাত বারোটার সময় এসো, তখন বলব।'

আমি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ব্যোমকেশ কিন্তু চট করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, 'আচ্ছা বাবা, তাই আসব। ওঠ অজিত।'

বৃক্ষ-বাটিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রাত্রি হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও পাণ্ডেজি চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সন্দেহভাজন কাহাকেও দেখা গেল না।

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'আমি আজ এখান থেকেই ফিরি। রাত বারোটা পর্যন্ত থাকতে পারলে হত। কিন্তু উপায় নেই। কাল সকালেই আসব।'

পাণ্ডেজি চলিয়া গেলেন।

দুর্গে ফিরিতে ফিরিতে প্রশ্ন করিলাম, 'সাধুবাবা বাঙালী?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সাক্ষাৎ বাঙালী।'

দুর্গে ফিরিয়া ঘড়ি দেখিলাম, সাতটা বাজিয়াছে। মুক্ত আকাশের তলে চেয়ার পাতিয়া বসিলাম।

সাধুবাবা নিশ্চয় কিছু জানে। কী জানে? সে রাত্রে ঈশানবাবুর হত্যাকারীকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল? বৃক্ষ-বাটিকা হইতে দুর্গে উঠিবার সিঁড়ি দেখা যায় না; বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রে। তবে কি সাধুবাবা গভীর রাত্রে সিঁড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়? ......তাহার চিমটা কিন্তু সামান্য অস্ত্র নয়—ঐ চিমটার আগায় বিষ মাখাইয়া যদি—

ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম; সে কেবল গলার মধ্যে চাপা কাশির মত শব্দ করিল।

রাত্রি দশটার মধ্যে আহার সমাধা করিয়া আমরা আবার বাহিরে গিয়া বসিলাম। এখনও দু'ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হইবে। সীতারাম আহার সম্পন্ন করিয়া আড়ালে গেল; বোধ করি দু' একটা বিড়ি টানিবে। লণ্ঠনটা ঘরের কোণে কমানো আছে।

ঘড়ির কাঁটা এগারোটার দিকে চলিয়াছে। মনের উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্রমাগত হাই উঠিতেছে—

'ব্যোমকেশবাবু!'

চাপা গলার শব্দে চমকিয়া জড়তা কাটিয়া গেল। দেখিলাম, অদূরে ছায়ার মত একটি মূর্তি দাঁড়াইয়া আছে। ব্যোমকেশ উঠিয়া বলিল, 'রমাপতি! এস।'

রমাপতিকে লইয়া আমরা ঘরের মধ্যে গেলাম। ব্যোমকেশ আলো বাড়াইয়া দিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, 'এবেলা কিছু খাওয়া হয়নি দেখছি।—সীতারাম!'

সীতারাম পাঁচ মিনিটের মধ্যে কয়েকটা ডিম ভাজিয়া আনিয়া রমাপতির সম্মুখে রাখিল।

রমাপতি দ্বিরুক্তি না করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ বসিয়া গিয়াছে; গায়ের হাফ-শার্ট স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, পায়ে জুতা নাই। খাইতে খাইতে বলিল, 'সব শুনেছেন তাহলে? কার কাছে শুনলেন?'

'তুলসীর কাছে। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'জঙ্গলে। তারপর দুর্গের পেছনে।'

'বেশী মারধর করেছে নাকি?'

রমাপতি পিঠের কামিজ তুলিয়া দেখাইল, দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া লাল দাগ ফুটিয়া আছে। ব্যোমকেশের মুখ শক্ত হইয়া উঠিল।

'বংশীধর?'

রমাপতি ঘাড় নাড়িল।

'শহরে চলে গেলে না কেন?'

রমাপতি উত্তর দিল না, নীরবে খাইতে লাগিল।

'এখানে থেকে আর তোমার লাভ কি?'

রমাপতি অস্ফুট স্বরে বলিল, 'তুলসী—'

'তুলসীকে তুমি ভালবাসো?'

রমাপতি একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর আস্তে আস্তে বলিল, 'ওকে সবাই যন্ত্রণা দেয়, ঘরে বন্ধ করে রাখে, কেউ ভালবাসে না। আমি না থাকলে ও মরে যাবে।'

আহার শেষ হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে নিজের বিছানা দেখাইয়া বলিল, 'শোও।'

রমাপতি ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া শয়ন করিল। ব্যোমকেশ দীর্ঘকাল তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, 'রমাপতি, ঈশানবাবুকে কে খুন করেছে তুমি জানো?'

'না, কে খুন করেছে জানি না। তবে খুন করেছে।'

'হরিপ্রিয়াকে কে খুন করেছিল জানো?'

'না, দিদি বলবার চেষ্টা করেছিল—কিন্তু বলতে পারেনি।'

'বংশীধরের বৌ কেন পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়েছিল জানো?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া রমাপতি বলিল, 'জানি না, কিন্তু সন্দেহ হয়েছিল। দিদি তাকে দেখতে পারত না, দিদির মনটা বড় কুচুটে ছিল। বোধ হয় মুখোশ পরে তাকে ভূতের ভয় দেখিয়েছিল—'

'মুখোশ?'

'দিদির একটা জাপানী মুখোশ ছিল। ঐ ঘটনার পরদিন মুখোশটা জঙ্গলের কিনারায় কুড়িয়ে পেলাম; বোধ হয় হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়েছিল। আমি সেটা এনে দিদিকে দেখালাম, দিদি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললে।'

'বংশীধর মুখোশের কথা জানে?'

'আমি কিছু বলিনি।'

'সাধুবাবাকে নিশ্চয় দেখেছ। কি মনে হয়?'

'আমার ভক্তি হয় না। কিন্তু কর্তা খুব মান্য করেন। বাড়ি থেকে সিধে যায়।'

'ঈশানবাবু কোনদিন সাধুবাবা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছিলেন?'

'না। দর্শন করতেও যাননি। উনি সাধু সন্ন্যাসীর ওপর চটা ছিলেন।'

ব্যোমকেশ ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'বারোটা বাজে। রমাপতি, তুমি ঘুমোও, আমরা একটু বেরুচ্ছি।'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রমাপতি বলিল, 'কোথায়?'

'বেশী দূর নয়, শীগ্‌গিরই ফিরব। এস অজিত।'

বড় টর্চটা লইয়া আমরা বাহির হইলাম।

রামকিশোরবাবুর বাড়ি নিষ্প্রদীপ। দেউড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনিলাম

বুলাকিলাল সগর্জনে নাক ডাকাইতেছে।

বৃক্ষ-বাটিকায় গাঢ় অন্ধকার, কেবল ভস্মাচ্ছাদিত ধুনি হইতে নিরুদ্ধ প্রভা বাহির হইতেছে। সাধুবাবা ধুনির পাশে শুইয়া আছেন; শয়নের ভঙ্গীটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।

ব্যোমকেশ তাঁহার মুখের উপর তীব্র আলো ফেলিল, বাবাজী কিন্তু জাগিলেন না। ব্যোমকেশ তখন তাঁহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া দিল এবং সশব্দে নিশ্বাস টানিয়া বলিল, 'অ্যাঁ—!'

টর্চের আলো বাবাজীর সর্বাঙ্গ লেহন করিয়া পায়ের উপর স্থির হইল। দেখা গেল গোড়ালির উপরিভাগে সাপের দাঁতের দুটি দাগ।

১১

ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক, এতদিনে রামবিনোদ সত্যি সত্যি দেহরক্ষা করলেন।'

'রামবিনোদ!'

'তুমি যে আকাশ থেকে পড়লে। বুঝতে পারনি? ধন্য তুমি।'

ধুনিতে ইন্ধন নিক্ষেপ করিয়া বহ্নিমান করিয়া তোলা হইয়াছে। বাবাজীর শব তাহার পাশে শক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আমরা দুইজন কিছুদূরে মুখোমুখি উপু হইয়া বসিয়া সিগারেট টানিতেছি।

ব্যোমকেশ বলিল, 'মনে আছে, প্রথম রামকিশোরবাবুকে দেখে চেনা-চেনা মনে হয়েছিল? আসলে তার কিছুক্ষণ আগে বাবাজীকে দেখেছিলাম। দুই ভায়ের চেহারায় সাদৃশ্য আছে; তখন ধরতে পারিনি। দ্বিতীয়বার রামকিশোরকে দেখে বুঝলাম।'

'কিন্তু রামবিনোদ যে প্লেগে মারা গিয়েছিল!'

'রামবিনোদের প্লেগ হয়েছিল, কিন্তু সে মরবার আগেই বাকি সকলে তাকে চড়ায় ফেলে পালিয়েছিল। চাঁদমোহনের কথা থেকে আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। তারপর রামবিনোদ বেঁচে গেল। এ যেন কতকটা ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার মত।'

'এতদিন কোথায় ছিল?'

'তা জানি না। বোধ হয় প্রথমটা বৈরাগ্য এসেছিল, সাধু-সন্ন্যাসীর দলে মিশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারপর হঠাৎ রামকিশোরের সন্ধান পেয়ে এখানে এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ওকথা যাক, এখন মড়া আগ্লোবার ব্যবস্থা করা দরকার। অজিত, আমি এখানে আছি, তুমি টর্চ নিয়ে যাও, সীতারামকে ডেকে নিয়ে এস। আর যদি পারো, বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিয়ে তাকেও ডেকে আনো। ওরা দু'জনে মড়া পাহারা দিক।'

বলিলাম, 'তুমি একলা এখানে থাকবে? সেটি হচ্ছে না। থাকতে হয় দু'জনে থাকব, যেতে হয় দু'জনে যাব।'

'ভয় হচ্ছে আমাকেও সাপে ছোব্লাবে! এ তেমন সাপ নয় হে, জাগা মানুষকে ছোব্লায় না। যাহোক, বলছ যখন, চল দু'জনেই যাই।'

দেউড়িতে আসিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'দাঁড়াও, বুলাকিলালকে জাগানো যাক।'

অনেক ঠেলাঠেলির পর বুলাকিলালের ঘুম ভাঙিল। তাহাকে বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ সাধুবাবা ভাঙ খেয়েছিলেন?'

'জী, এক ঘটি খেয়েছিলেন।'

'আর কে কে ভাঙ খেয়েছিল?'

'আর বাড়ি থেকে চাকর এসে এক ঘটি নিয়ে গিয়েছিল।'

'বেশ, এখন যাও, বাবাজীকে পাহারা দাও গিয়ে। আমি সীতারামকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

বুলাকিলাল ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়া গেল। মনে হইল, ঘুম ভাঙিলেও তাহার নেশার ঘোর কাটে নাই।

দুর্গে ফিরিয়া দেখিলাম সীতারাম জাগিয়া বসিয়া আছে। খবর শুনিয়া সে কেবল একবার চক্ষু বিস্ফারিত করিল, তারপর নিঃশব্দে নামিয়া গেল।

ঘরের মধ্যে রমাপতি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইলাম না, বাহিরে আসিয়া বসিলাম। রাত্রি সাড়ে বারোটা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আজ আর ঘুমনো চলবে না। অন্তত একজনকে জেগে থাকতে হবে। অজিত, তুমি না হয় ঘণ্টা দুই ঘুমিয়ে নাও, তারপর তোমাকে তুলে দিয়ে আমি ঘুমবো।'

উঠিতে মন সরিতেছিল না, মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়াছিল। প্রশ্ন করিলাম, 'ব্যোমকেশ, বাবাজীকে মারলে কে?'

'ঈশানবাবুকে যে মেরেছে সে।'

'সে কে?'

'তুমিই বল না। আন্দাজ করতে পারো না?'

এই কথাটাই মাথায় ঘুরিতেছিল। আস্তে আস্তে বলিলাম, 'বাবাজী যদি রামবিনোদ হন তাহলে কে তাঁকে মারতে পারে? এক আছেন রামকিশোরবাবু—'

'তিনি ভাইকে খুন করবেন?'

'তিনি মুমূর্ষু ভাইকে ফেলে পালিয়েছিলেন। সেই ভাই ফিরে এসেছে, হয়তো সম্পত্তির বখরা দাবী করেছে—'

'বেশ, ধরা যাক রামকিশোর ভাইকে খুন করেছেন। কিন্তু ঈশানবাবুকে খুন করলেন কেন?'

'ঈশানবাবু রামবিনোদের প্রাণের বন্ধু ছিলেন, সন্ন্যাসীকে দেখে চিনতে পেরেছিলেন। হয়তো রামকিশোরকে শাসিয়েছিলেন, ভালয় ভালয় সম্পত্তির ভাগ না দিলে সব ফাঁস করে দেবেন। সন্ন্যাসীকে রামবিনোদ বলে সনাক্ত করতে পারে দু'জন—চাঁদমোহন আর ঈশানবাবু। চাঁদমোহন মালিকের মুঠোর মধ্যে, ঈশানবাবুকে সরাতে পারলে সব গোল মিটে যায়—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ আমার পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল, 'অজিত! ব্যাপার কি হে? তুমি যে ধারাবাহিক যুক্তিসঙ্গত কথা বলতে আরম্ভ করেছ! তবে কি এতদিনে সত্যিই বোধোদয় হল! কিন্তু আর নয়, শুয়ে পড় গিয়ে। ঠিক তিনটের সময় তোমাকে তুলে দেব।'

আমি গমনোদ্যত হইলে সে খাটো গলায় কতকটা নিজ মনেই বলিল, 'রমাপতি ঘুমোচ্ছে —না মটকা মেরে পড়ে আছে?—যাক, ক্ষতি নেই, আমি জেগে আছি।'

বেলা আটটা আন্দাজ পাণ্ডেজি আসিলেন। বাবাজীর মৃত্যুসংবাদ নীচেই পাইয়াছিলেন, বাকি খবরও পাইলেন। ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনি লাস নিয়ে ফিরে যান। আবার আসবেন কিন্তু—আর শুনুন—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে কিছুক্ষণ কথা বলিল। পাণ্ডেজি বলিলেন, 'বেশ, আমি দশটার মধ্যেই ফিরব। রমাপতিকে ঘর থেকে বেরুতে দেবেন না।'

তিনি চলিয়া গেলেন।

সাড়ে ন'টার সময় আমি আর ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুর বাড়িতে গেলাম। বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপর রামকিশোর বসিয়া ছিলেন, পাশে মণিলাল। বংশীধর ও মুরলীধর তক্তপোশের সামনে পায়চারি করিতেছিল, আমাদের দেখিয়া নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইল। বোধ হয় পারিবারিক মন্ত্রণা সভা বসিয়াছিল, আমাদের আবির্ভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

রামকিশোরের গাল বসিয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটরগত। কিন্তু তিনি বাহিরে অবিচলিত আছেন। ক্ষীণ হাসিয়া বলিলেন, 'আসুন—বসুন।'

তক্তপোশের ধারে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। রামকিশোর একবার গলা ঝাড়া দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন, 'সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও সাপে কামড়েছে। ক্রমে দেখছি এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বংশী আর মুরলী দু'একদিনের মধ্যে চলে যাচ্ছে, আমরা বাকী

ক'জন এখানেই থাকব ভেবেছিলাম। কিন্তু সাপের উৎপাত যদি এভাবে বাড়তেই থাকে—'
ব্যোমকেশ বলিল, 'শীতকালে সাপের উৎপাত—আশ্চর্য!'
রামকিশোর বলিলেন, 'তার ওপর বাড়িতে কাল রাত্রে আর এক উৎপাত। এ বাড়িতে আজ পর্যন্ত চোর ঢোকেনি—'
মণিলাল বলিল, 'এ মামুলী চোর নয়।'
ব্যোমকেশ বলিল, 'কি হয়েছিল?'
রামকিশোর বলিলেন, 'আমার শরীর খারাপ হয়ে অবধি মণিলাল রাত্রে আমার ঘরে শোয়। কাল রাত্রে আন্দাজ বারোটার সময়—। মণিলাল, তুমিই বল। আমার যখন ঘুম ভাঙল চোর তখন পালিয়েছে।'
মণিলাল বলিল, 'আমার খুব সজাগ ঘুম। কাল গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল দরজার বাইরে পায়ের শব্দ। এ বাড়ির নিয়ম রাত্রে কেউ দোরে খিল দিয়ে শোয় না, এমন কি সদর দরজাও ভেজানো থাকে। আমার মনে হল আমাদের ঘরের দোর কেউ সন্তর্পণে ঠেলে খোলবার চেষ্টা করছে। আমার খাট দরজা থেকে দূরে; আমি নিঃশব্দে উঠলাম, পা টিপে টিপে দোরের কাছে গেলাম। ঘরে আলো থাকে না, অন্ধকারে দেখলাম দোরের কপাট আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে। এই সময় আমি একটা বোকামি করে ফেললাম। আর একটু অপেক্ষা করলেই চোর ঘরে ঢুকতো, তখন তাকে ধরতে পারতাম। তা না করে আমি দরজা টেনে খুলতে গেলাম। চোর সতর্ক ছিল, সে দুড় দুড় করে পালাল।'
রামকিশোর বলিলেন, 'এই সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল।'
ব্যোমকেশ বলিল, 'যাকে চোর মনে করছেন সে তুলসী নয় তো? তুলসীর শুনেছি রাত্রে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।'
রামকিশোরের মুখের ভাব কড়া হইল, তিনি বলিলেন, 'না, তুলসী নয়। তাকে আমি কাল রাত্রে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম।'
ব্যোমকেশ মণিলালকে জিজ্ঞাসা করিল, 'চোরকে আপনি চিনতে পারেন নি?'
'না। কিন্তু—'
'আপনার বিশ্বাস চেনা লোক?'
'হ্যাঁ।'
রামকিশোর বলিলেন, 'লুকোছাপার দরকার নেই। আপনারা তো জানেন রমাপতিকে কাল আমি তাড়িয়ে দিয়েছি! মণিলালের বিশ্বাস সেই কোন মতলবে এসেছিল।'
ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক ক'টার সময় এই ব্যাপার ঘটেছিল বলতে পারেন কি?'
রামকিশোর বলিলেন, 'ঠিক পৌনে বারোটার সময়। আমার বালিশের তলায় ঘড়ি থাকে, আমি দেখেছি।'
ব্যোমকেশ আমার পানে সংকেতপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল, আমি মুখ টিপিয়া রহিলাম। রমাপতি যে পৌনে বারোটার সময় ব্যোমকেশের খাটে শুইয়া ছিল তাহা বলিলাম না।
রামকিশোর বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'আজ সকালে আর একটা কথা জানা গেল। রমাপতি তার জিনিসপত্র নিয়ে যায়নি, তার ঘরেই পড়ে ছিল। আজ সকালে ঘর তল্লাস করালাম। তার টিনের ভাঙা তোরঙ্গ থেকে এই জিনিসটা পাওয়া গেল।' পকেট হইতে একটি সোনার কাঁটা বাহির করিয়া তিনি ব্যোমকেশের হাতে দিলেন।
মেয়েরা যে-ধরনের লোহার দু'ভাঁজ কাঁটা দিয়া চুল বাঁধেন সেই ধরনের সোনার কাঁটা। আকারে একটু বড় ও স্থূল, দুই প্রান্ত ছুঁচের মত তীক্ষ্ণ। সেটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া ব্যোমকেশ সপ্রশ্নচক্ষে রামকিশোরের পানে চাহিল; তিনি বলিলেন, 'আমার বড় মেয়ে হরিপ্রিয়ার চুলের কাঁটা। তার মৃত্যুর পর হারিয়ে গিয়েছিল।'
কাঁটা ফেরৎ দিয়া ব্যোমকেশ পূর্ণদৃষ্টিতে রামকিশোরের পানে চাহিয়া বলিল, 'রামকিশোরবাবু, এবার সোজাসুজি বোঝাপড়ার সময় হয়েছে।'
রামকিশোর যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, 'বোঝাপড়া!'

'হ্যাঁ। আপনার দাদা রামবিনোদবাবুর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার।'

রামকিশোরের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। তিনি কথা বলিবার জন্য মুখ খুলিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তারপর অতিকষ্টে নিজেকে আয়ত্ত করিতে করিতে অর্ধরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, 'আমার দাদা—! কার কথা বলছেন আপনি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'কার কথা বলছি তা আপনি জানেন। মিথ্যে অভিনয় করে লাভ নেই। সর্পাঘাত যে সত্যিকার সর্পাঘাত নয় তাও আমরা জানি। আপনার দাদাকে কাল রাত্রে খুন করা হয়েছে!'

মণিলাল বলিয়া উঠিল, 'খুন করা হয়েছে!'

'হ্যাঁ। আপনি জানেন কি, সন্ন্যাসীঠাকুর হচ্ছেন, আপনার শ্বশুরের দাদা, রামবিনোদ সিংহ!'

রামকিশোর এতক্ষণে অনেকটা সামলাইয়াছেন, তিনি তীব্রস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! আমার দাদা অনেকদিন আগে প্লেগে মারা গেছেন। এসব রোমাণ্টিক গল্প কোথা থেকে তৈরী করে আনলেন? সন্ন্যাসী আমার দাদা প্রমাণ করতে পারেন! সাক্ষী আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'একজন সাক্ষী ছিলেন ঈশানবাবু, তাঁকেও খুন করা হয়েছে।'

রামকিশোর এবার ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, ঊর্ধ্বস্বরে বলিলেন, 'মিথ্যে কথা! মিথ্যে! এসব পুলিসের কারসাজি। যান আপনারা আমার বাড়ি থেকে, এই দণ্ডে দুর্গ থেকে বেরিয়ে যান। আমার এলাকায় পুলিসের গুপ্তচরের জায়গা নেই।'

এই সময় বাহিরে জানালায় মুরলীধরের ভয়ার্ত মুখ দেখা গেল—'বাবা! পুলিস বাড়ি ঘেরাও করেছে।' বলিয়াই সে অপসৃত হইল।

চমকিয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখি পায়ের বুট হইতে মাথার হেল্‌মেট পর্যন্ত পুলিস পোষাক-পরা পাণ্ডেজি ঘরে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহার পিছনে ব্যাগ হাতে ডাঃ ঘটক।

## ১২

পাণ্ডে বলিলেন, 'তল্লাসী পরোয়ানা আছে, আপনার বাড়ি খানাতল্লাস করব। ওয়ারেন্ট দেখতে চান?'

রামকিশোর ভীত পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ভাঙা গলায় বলিলেন, 'এর মানে?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'আপনার এলাকায় দুটো খুন হয়েছে। পুলিসের বিশ্বাস অপরাধী এবং অপরাধের প্রমাণ এই বাড়িতেই আছে। আমরা সার্চ করে দেখতে চাই।'

রামকিশোর আরও কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া 'বেশ, যা ইচ্ছে করুন'—বলিয়া তাকিয়ার উপর এলাইয়া পড়িলেন।

'ডাক্তার!'

ডাক্তার ঘটক প্রস্তুত ছিল, দুই মিনিটের মধ্যে রামকিশোরকে ইন্‌জেকশন দিল। তারপর নাড়ী টিপিয়া বলিল, 'ভয় নেই।'

ইতিমধ্যে আমি জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, বাহিরে পুলিস গিস্‌গিস্‌ করিতেছে; সিঁড়ির মুখে অনেকগুলো কনেস্টবল দাঁড়াইয়া যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর দুবে ঘরে আসিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইল, 'সকলে নিজের নিজের ঘরে আছে, বেরুতে মানা করে দিয়েছি।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'বেশ। দু'জন বে-সরকারী সাক্ষী চাই। অজিতবাবু, ব্যোমকেশবাবু, আপনারা সাক্ষী থাকুন। পুলিস কোনও বে-আইনি কাজ করে কি না আপনারা লক্ষ্য

রাখবেন।'

মণিলাল এতক্ষণ আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, 'আমিও কি নিজের ঘরে গিয়ে থাকব?'

পাণ্ডে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'মণিলালবাবু! না চলুন, আপনার ঘরটাই আগে দেখা যাক।'

'আসুন।'

পাণ্ডে, দুবে, ব্যোমকেশ ও আমি মণিলালের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরটি বেশ বড়, একপাশে খাট, তাছাড়া আলমারি দেরাজ প্রভৃতি আসবাব আছে।

মণিলাল বলিল, 'কি দেখবেন দেখুন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেশী কিছু দেখবার নেই। আপনার দুটো ফাউণ্টেন পেন আছে, সেই দুটো দেখলেই চলবে।'

মণিলালের মুখ হইতে ক্ষণকালের জন্য যেন একটা মুখোশ সরিয়া গেল। সেই যে ব্যোমকেশ বলিয়াছিল, গর্দভচর্মাবৃত সিংহ, মনে হইল সেই হিংস্র শ্বাপদটা নিরীহ চর্মাবরণ ছাড়িয়া বাহির হইল; একটা ভয়ংকর মুখ পলকের জন্য দেখিতে পাইলাম। তারপর মণিলাল গিয়া দেরাজ খুলিল; দেরাজ হইতে পার্কারের কলমটি বাহির করিয়া দ্রুতহস্তে তাহার দু'দিকের ঢাক্‌নি খুলিয়া ফেলিল; কলমটাকে ছোরার মত মুঠিতে ধরিয়া ব্যোমকেশের পানে চোখ তুলিল। সে-চক্ষে যে কী ভীষণ হিংসা ও ক্রোধ ছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। মণিলাল শ্বাদন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া বলিল, 'এই যে কলম। নেবে? এস, নেবে এস।'

আমরা জড়মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। পাণ্ডে কোমর হইতে রিভলবার বাহির করিলেন।

মণিলাল হায়েনার মত হাসিল। তারপর নিজের বামহাতের কব্জির উপর কলমের নিব বিঁধিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কালিভরা পিচ্‌কারিটা টিপিয়া ধরিল।

ব্যোমকেশ রামকিশোরবাবুকে বলিল, 'দুধ কলা খাইয়ে কালসাপ পুষেছিলেন। ভাগ্যে পুলিসের এই গুপ্তচরটা ছিল তাই বেঁচে গেলেন। কিন্তু এবার আমরা চললাম, আপনার আতিথ্যে আর আমাদের রুচি নেই। কেবল সাপের বিষের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি।'

রামকিশোর বিহ্বল ব্যাকুল চক্ষে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ দ্বার পর্যন্ত গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'আর একটা কথা বলে যাই। আপনার পূর্বপুরুষেরা অনেক সোনা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে সোনা কোথায় আছে আমি জানি? কিন্তু যে-জিনিস আমার নয় তা আমি ছুঁতেও চাই না। আপনার পৈতৃক সম্পত্তি আপনি ভোগ করুন।— চলুন পাণ্ডেজি। এস অজিত।'

অপরাহ্নে পাণ্ডেজির বাসায় আরাম-কেদারায় অর্ধশয়ান হইয়া ব্যোমকেশ গল্প বলিতেছিল। শ্রোতা ছিলাম আমি, পাণ্ডেজি এবং রমাপতি।

'খুব সংক্ষেপে বলছি। যদি কিছু বাদ পড়ে যায়, প্রশ্ন কোরো।'

পাণ্ডে বলিলেন, 'একটা কথা আগে বলে নিই। সেই যে সাদা গুঁড়ো পরীক্ষা করতে দিয়েছিলেন, কেমিস্টের রিপোর্ট এসেছে। এই দেখুন।'

রিপোর্ট পড়িয়া ব্যোমকেশ ভ্রূকুঞ্চিত করিল— 'Sodium Tetra Borate—Borax, মানে সোহাগা? সোহাগা কোন্ কাজে লাগে? এক তো জানি, সোনায় সোহাগা। আর কোনও কাজে লাগে কি?'

পাণ্ডে বলিলেন, 'ঠিক জানি না। সেকালে হয়তো ওষুধ-বিষুধ তৈরির কাজে লাগত।'

রিপোর্ট ফিরাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'যাক। এবার শোনো। মণিলাল বাইরে বেশ ভাল মানুষটি ছিল, কিন্তু তার স্বভাব রাক্ষসের মত; যেমন নিষ্ঠুর তেমনি লোভী। বিয়ের পর সে মনে মনে ঠিক করল শ্বশুরের গোটা সম্পত্তিটাই গ্রাস করবে। শালাদের কাছ থেকে

সে সদ্‌ব্যবহার পায়নি, স্ত্রীকেও ভালবাসেনি। কেবল শ্বশুরকে নরম ব্যবহারে বশ করেছিল।

'মণিলালের প্রথম সুযোগ হল যখন একদল বেদে এসে ওখানে তাঁবু ফেলল। সে গোপনে তাদের কাছ থেকে সাপের বিষ সংগ্রহ করল।

'স্ত্রীকে সে প্রথমেই কেন খুন করল আপাতদৃষ্টিতে তা ধরা যায় না। হয়তো দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীর কাছে নিজের মতলব ব্যক্ত করে ফেলেছিল, কিম্বা হয়তো হরিপ্রিয়াই কলমে সাপের বিষ ভরার প্রক্রিয়া দেখে ফেলেছিল। মোট কথা প্রথমেই হরিপ্রিয়াকে সরানো দরকার হয়েছিল। কিন্তু তাতে একটা মস্ত অসুবিধে, শ্বশুরের সঙ্গে সম্পর্কই ঘুচে যায়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরকে এমন বশ করেছিল যে তার বিশ্বাস ছিল রামকিশোর তার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবেন না। তুলসীর দিকে তার নজর ছিল।

'যাহোক, হরিপ্রিয়ার মৃত্যুর পর কোনও গণ্ডগোল হল না, তুলসীর সঙ্গে কথা পাকা হয়ে রইল। মণিলাল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল, সম্পর্কটা একবার পাকা হয়ে গেলেই শালাগুলিকে একে একে সরাবে। দু'বছর কেটে গেল, তুলসী প্রায় বিয়ের যুগ্যি হয়ে এসেছে, এমন সময় এলেন ঈশানবাবু; তার কিছুদিন পরে এসে জুটলেন সাধুবাবা। এঁদের দু'জনের মধ্যে অবশ্য কোনও সংযোগ ছিল না; দু'জনে শেষ পর্যন্ত জানতে পারেননি যে বন্ধুর এত কাছে আছেন।

'রামকিশোরবাবু ভাইকে মৃত্যুর মুখে ফেলে পালিয়েছেন এ গ্লানি তাঁর মনে ছিল। সন্ন্যাসীকে চিনতে পেরে তাঁর হৃদয়যন্ত্র খারাপ হয়ে গেল, যায়-যায় অবস্থা। একটু সামলে উঠে তিনি ভাইকে বললেন, 'যা হবার হয়েছে, কিন্তু এখন সত্যি কথা প্রকাশ হলে আমার বড় কলঙ্ক হবে। তুমি কোনও তীর্থস্থানে গিয়ে মঠ তৈরি করে থাকো, যত খরচ লাগে আমি দেব।' রামবিনোদ কিন্তু ভাইকে বাগে পেয়েছেন, তিনি নড়লেন না; গাছতলায় বসে ভাইকে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন।

'এটা আমার অনুমান। কিন্তু রামকিশোর যদি কখনও সত্যি কথা বলেন, দেখবে অনুমান মিথ্যে নয়। মণিলাল কিন্তু শ্বশুরের অসুখে বড় মুশকিলে পড়ে গেল; শ্বশুর যদি হঠাৎ পটল তোলে তার সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে, শালারা তদ্দণ্ডেই তাকে তাড়িয়ে দেবে। সে শ্বশুরকে মন্ত্রণা দিতে লাগল, বড় দুই ছেলেকে পৃথক করে দিতে। তাতে মণিলালের লাভ, রামকিশোর যদি হার্টফেল করে মরেও যান, নাবালকদের অভিভাবকরূপে অর্ধেক সম্পত্তি তার কব্জায় আসবে। তারপর তুলসীকে সে বিয়ে করবে, আর গদাধর সর্পাঘাতে মরবে।

'মণিলালকে রামকিশোর অগাধ বিশ্বাস করতেন, তাছাড়া তাঁর নিজেরও ভয় ছিল তাঁর মৃত্যুর পর বড় দুই ছেলে নাবালক ভাইবোনকে বঞ্চিত করবে। তিনি রাজী হলেন; উকিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

'ওদিকে দুর্গে আর একটি ঘটনা ঘটছিল; ঈশানবাবু গুপ্তধনের সন্ধানে লেগেছিলেন। প্রথমে তিনি পাটিতে খোদাই করা ফারসী লেখাটা পেলেন। লেখাটা তিনি সযত্নে খাতায় টুকে রাখলেন এবং অনুসন্ধান চালাতে লাগলেন। তারপর নিজের শোবার ঘরে গজাল নাড়তে নাড়তে দেখলেন, একটা পাথর আলগা। বুঝতে বাকি রইল না যে ঐ পাথরের তলায় দুর্গের তোষাখানা আছে।

'কিন্তু পাথরটা জগদ্দল ভারী; ঈশানবাবু রুগ্ন বৃদ্ধ। পাথর সরিয়ে তোষাখানায় ঢুকবেন কি করে? ঈশানবাবুর মনে পাপ ছিল, অভাবে তাঁর স্বভাব নষ্ট হয়েছিল। তিনি রামকিশোরকে খবর দিলেন না, একজন সহকারী খুঁজতে লাগলেন।

'দু'জন পূর্ণবয়স্ক লোক তাঁর কাছে নিত্য যাতায়াত করত, রমাপতি আর মণিলাল। ঈশানবাবু মণিলালকে বেছে নিলেন। কারণ মণিলাল ষণ্ডা বেশী। আর সে শালাদের ওপর খুশী নয় তাও ঈশানবাবু বুঝেছিলেন।

'বোধ হয় আধাআধি বখরা ঠিক হয়েছিল। মণিলাল কিন্তু মনে মনে ঠিক করলে সবটাই সে নেবে, শ্বশুরের জিনিস পরের হাতে যাবে কেন? নির্দিষ্ট রাত্রে দু'জনে পাথর সরিয়ে তোষাখানায় নামলেন।

'হাঁড়িকলসীগুলো তল্লাস করবার আগেই ঈশানবাবু মেঝের ওপর একটা মোহর কুড়িয়ে পেলেন। মণিলালের ধারণা হল হাঁড়িকলসীতে মোহর ভরা আছে। সে আর দেরি করল না, হাতের টর্চ দিয়ে ঈশানবাবুর ঘাড়ে মারল এক ঘা। ঈশানবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। তারপর তাঁর পায়ে কলমের খোঁচা দেওয়া শক্ত হল না।

'কিন্তু খুনীর মনে সর্বদাই একটা ত্বরা জেগে থাকে। মণিলাল ঈশানবাবুর দেহ ওপরে নিয়ে এল। এই সময় আমার মনে হয়, বাইরে থেকে কোনও ব্যাঘাত এসেছিল। মুরলীধর ঈশানবাবুকে তাড়াবার জন্যে ভয় দেখাচ্ছিলই, হয়তো সেই সময় ইট-পাটকেল ফেলেছিল। মণিলাল ভয় পেয়ে গুপ্তম্বার বন্ধ করে দিল। হাঁড়িগুলো দেখা হল না; টর্চটাও তোষাখানায় রয়ে গেল।

'তোষাখানায় যে সোনাদানা কিছু নেই একথা বোধ হয় মণিলাল শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। ঈশানবাবুর মৃত্যুর হাঙ্গামা জুড়োতে না জুড়োতে আমরা গিয়ে বসলাম; সে আর খোঁজ নিতে পারল না। কিন্তু তার ধৈর্যের অভাব ছিল না; সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর শ্বশুরকে ভজাতে লাগল দুর্গটা যাতে তুলসীর ভাগে পড়ে।

'আমরা স্রেফ হাওয়া বদলাতে যাইনি, এ সন্দেহ তার মনে গোড়া থেকেই ধোঁয়াচ্ছিল, কিন্তু কিছু করবার ছিল না। তারপর কাল বিকেল থেকে এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটল যে মণিলাল ভয় পেয়ে গেল। তুলসী তার কলম চুরি করে রমাপতিকে দিতে গেল। কলমে তখন বিষ ছিল কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলম সম্বন্ধে তার দুর্বলতা স্বাভাবিক। রমাপতিকে সে দেখতে পারত না—ভাবী পত্নীর প্রেমাস্পদকে কেই বা দেখতে পারে? এই ছুতো করে সে রমাপতিকে তাড়ালো। যাহোক, এ পর্যন্ত বিশেষ ক্ষতি হয়নি, কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আর এক ব্যাপার ঘটল। আমরা যখন সাধুবাবার কাছে বসে তাঁর লম্বা লম্বা কথা শুনছি 'হাম ক্যা নহি জান্তা' ইত্যাদি—, সেই সময় মণিলাল বাবাজীর কাছে আসছিল; দূর থেকে তাঁর আস্ফালন শুনে ভাবল, বাবাজী নিশ্চয় তাকে ঈশানবাবুর মৃত্যুর রাত্রে দুর্গে যেতে দেখেছিলেন, সেই কথা তিনি দুপুর রাত্রে আমাদের কাছে ফাঁস করে দেবেন।

'মণিলাল দেখল, সর্বনাশ! তার খুনের সাক্ষী আছে। বাবাজী যে ঈশানবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তা সে ভাবতে পারল না; ঠিক করল রাত বারোটার আগেই বাবাজীকে সাবাড় করবে।

'আমরা চলে আসবার পর বাবাজী এক ঘটি সিদ্ধি চড়ালেন। তারপর বোধ হয় মণিলাল গিয়ে আর এক ঘটি খাইয়ে এল। বাবাজী নির্ভয়ে খেলেন, কারণ মণিলালের ওপর তাঁর সন্দেহ নেই। তারপর তিনি নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন; এবং যথাসময়ে মণিলাল এসে তাঁকে মহাসুষুপ্তির দেশে পাঠিয়ে দিলে।'

আমি বলিলাম, 'আচ্ছা, সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি কিছু জানতেন না, তবে আমাদের রাত দুপুরে ডেকেছিলেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ডেকেছিলেন তাঁর নিজের কাহিনী শোনাবার জন্যে, নিজের আসল পরিচয় দেবার জন্যে।'

'আর একটা কথা। কাল রাত্রে যে রামকিশোরবাবুর ঘরে চোর ঢুকেছিল সে চোরটা কে?'

'কাল্পনিক চোর। মণিলাল সাধুবাবাকে খুন করে ফিরে আসবার সময় ঘরে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়েছিল, তাতে রামকিশোরবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তাই চোরের আবির্ভাব। রামকিশোরবাবু আফিম খান, আফিম-খোরের ঘুম সহজে ভাঙে না, তাই মণিলাল নিশ্চিন্ত ছিল; কিন্তু ঘুম যখন ভাঙল তখন মণিলাল চট্ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলল। তাতে রমাপতির ওপর একটা নতুন সন্দেহ জাগানো হল, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানো হল। রমাপতির তোরঙ্গতে হরিপ্রিয়ার সোনার কাঁটা লুকিয়ে রেখেও ঐ একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। যা শত্রু পরে পরে। যদি কোনও বিষয়ে কারুর ওপর সন্দেহ হয় রমাপতির ওপর সন্দেহ হবে।'

ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল।

প্রশ্ন করিলাম, 'মণিলাল যে আসামী এটা বুঝলে কখন?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, 'অস্ত্রটা কী তাই প্রথমে ধরতে পারছিলাম না। তুলসী প্রথম যখন ফাউণ্টেন পেনের উল্লেখ করল, তখন সন্দেহ হল। তারপর মণিলাল যখন ফাউণ্টেন পেন আমার হাতে দিলে তখন এক মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। মণিলাল নিজেই বললে বাড়িতে আর কারুর ফাউণ্টেন পেন নেই। কেমন সহজ অস্ত্র দেখ? সর্বদা পকেটে বাহার দিয়ে বেড়াও, কেউ সন্দেহ করবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর পাণ্ডেজি বলিলেন, 'গুপ্তধনের রহস্যটা কিন্তু এখনও চাপাই আছে।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিল।

বাড়ির সদরে একটা মোটর আসিয়া থামিল এবং হর্ন বাজাইল। জানালা দিয়া দেখিলাম, মোটর হইতে নামিলেন রামকিশোরবাবু ও ডাক্তার ঘটক।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রামকিশোর জোড়হস্তে বলিলেন, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। বুদ্ধির দোষে আমি সব ভুল বুঝেছিলাম। রমাপতি, তোকেই আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছি বাবা। তুই আমার সঙ্গে ফিরে চল।'

রমাপতি সলজ্জে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

## ১৩

রামকিশোরবাবুকে খাতির করিয়া বসানো হইল। পাণ্ডেজি বোধ করি চায়ের হুকুম দিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

ডাক্তার ঘটক হাসিয়া বলিল, 'আমার রুগীর পক্ষে বেশী উত্তেজনা কিন্তু ভাল নয়। উনি জোর করলেন বলেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি, নইলে ওঁর উচিত বিছানায় শুয়ে থাকা।'

রামকিশোর গাঢ়স্বরে বলিলেন, 'আর উত্তেজনা! আজ সকাল থেকে আমার ওপর দিয়ে যা গেছে তাতেও যখন বেঁচে আছি তখন আর ভয় নেই ডাক্তার।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'সত্যিই আর ভয় নেই। একে তো সব বিপদ কেটে গেছে, তার ওপর ডাক্তার পেয়েছেন। ডাক্তার ঘটক যে কত ভাল ডাক্তার তা আমি জানি কিনা। কিন্তু একটা কথা বলুন। সন্ন্যাসীকে দাদা বলতে কি আপনি এখনও রাজী নন?'

রামকিশোর লজ্জায় নতমুখ হইলেন।

'ব্যোমকেশবাবু, নিজের লজ্জাতে নিজেই মরে আছি, আপনি আর লজ্জা দেবেন না। দাদাকে হাতে পায়ে ধরেছিলাম, দাদা সংসারী হতে রাজী হননি। বলেছিলাম, আমি হরিদ্বারে মন্দির করে দিচ্ছি সেখানে সেবায়েৎ হয়ে রাজার হালে থাকুন। দাদা শুনলেন না। শুনলে হয়তো অপঘাত মৃত্যু হত না।' তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন।

পাণ্ডেজি ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে আমাদের পূর্বদৃষ্ট মোহরটি। সেটি রামকিশোরকে দিয়া বলিলেন, 'আপনার জিনিস আপনি রাখুন।'

রামকিশোর সাগ্রহে মোহরটি লইয়া দেখিলেন, কপালে ঠেকাইয়া বলিলেন, 'আমার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি। তাঁরা সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমাদের কপালের দোষে এতদিন পাইনি। ব্যোমকেশবাবু, সত্যিই কি সন্ধান পেয়েছেন?'

'পেয়েছি বলেই আমার বিশ্বাস। তবে চোখে দেখিনি।'

'তাহলে—তাহলে—!' রামকিশোরবাবু ঢোক গিলিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিল।

'আপনার এলাকার মধ্যেই আছে। খুঁজে নিন না।'

'খোঁজবার কি ত্রুটি করেছি, ব্যোমকেশবাবু? কেল্লা কিনে অবধি তার আশপাশতলা তন্ন তন্ন করেছি। পাইনি; হতাশ হয়ে ভেবেছি সিপাহীরা লুটেপুটে নিয়ে গেছে। আপনি

যদি জানেন, বলুন। আমি আপনাকে বঞ্চিত করব না, আপনিও বখরা পাবেন। এ'দের সালিশ মানছি, পান্ডেজি আর ডাক্তার ঘটক যা ন্যায্য বিবেচনা করবেন তাই দেব। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন, যদি অর্ধেক বখরাও চান—'

ব্যোমকেশ নীরস স্বরে বলিল, 'বখরা চাই না। কিন্তু দুটো শর্ত আছে।'

'শর্ত! কী শর্ত?'

'প্রথম শর্ত, রমাপতির সঙ্গে তুলসীর বিয়ে দিতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত, বিয়ের যৌতুক হিসেবে আপনার দুর্গ রমাপতিকে লেখাপড়া করে দিতে হবে।'

ব্যোমকেশ যে ভিতরে ভিতরে ঘটকালি করিতেছে তাহা সন্দেহ করি নাই। সকলে উচ্চকিত হইয়া উঠিলাম। রমাপতি লজ্জিত মুখে সরিয়া গেল।

রামকিশোর কয়েক মিনিট হেঁটমুখে চিন্তা করিয়া মুখ তুলিলেন। বলিলেন, 'তাই হবে। রমাপতিকে আমার অপছন্দ নয়। ওকে চিনি, ও ভাল ছেলে। অন্য কোথাও বিয়ে দিলে আবার হয়তো একটা ভূত-বাঁদর জুটবে। তার দরকার নেই।'

'আর দুর্গ?'

'দুর্গ লেখাপড়া করে দেব। আপনি চান পৈতৃক সোনাদানা তুলসী আর রমাপতি পাবে, এই তো? বেশ তাই হবে।'

'কথার নড়চড় হবে না?'

রামকিশোর একটু কড়া সুরে বলিলেন, 'আমি রাজা জানকীরামের সন্তান। কথার নড়চড় কখনও করিনি।'

'বেশ। আজ তো সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কাল সকালে আমরা যাব।'

পরদিন প্রভাতে আমরা আবার দুর্গে উপস্থিত হইলাম। আমরা চারজন—আমি, ব্যোমকেশ, পান্ডেজি ও সীতারাম। অন্য পক্ষ হইতে কেবল রামকিশোর ও রমাপতি। বুলাকিলালকে হুকুম দেওয়া হইয়াছিল দুর্গে যেন আর কেহ না আসে। সে দেউড়িতে পাহারা দিতেছিল।

ব্যোমকেশ বলিল, 'আপনারা অনেক বছর ধরে খুঁজে খুঁজে যা পাননি ঈশানবাবু দু'হপ্তায় তা খুঁজে বার করেছিলেন। তার কারণ তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন, কোথায় খুঁজতে হয় জানতেন। প্রথমে তিনি পেলেন একটা শিলালিপি, তাতে লেখা ছিল,—'যদি আমি বা জয়রাম বাঁচিয়া না থাকি আমাদের তামাম ধনসম্পত্তি সোনাদানা মোহনলালের জিম্মায় গচ্ছিত রহিল।' এ লিপি রাজারামের লেখা। কিন্তু মোহনলাল কে? ঈশানবাবু বুঝতে পারলেন না। বুঝতে পারলে মনে হয় কোন গন্ডগোলই হত না, তিনি চুরি করবার বৃথা চেষ্টা না করে সরাসরি রামকিশোরকে খবর দিতেন।

'তারপর ঈশানবাবু পেলেন গুপ্ত তোষাখানার সন্ধান; ভাবলেন সব সোনাদানা সেইখানেই আছে। আমরা জানি তোষাখানায় একটি গড়িয়ে পড়া মোহর ছাড়া আর কিছুই ছিল না; বাকি সব কিছু রাজারাম সরিয়ে ফেলেছিলেন। এইখানে বলে রাখি, সিপাহীরা তোষাখানা খুঁজে পায়নি;, পেলে হাঁড়িকলসীগুলো আস্ত থাকত না।

'সে যাক। প্রশ্ন হচ্ছে, মোহনলাল কে, যার জিম্মায় রাজারাম তামাম ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় মোহনলাল মানুষ হতে পারে না। দুর্গে সে সময় রাজারাম আর জয়রাম ছাড়া কেউ ছিল না; রাজারাম সকলকে বিদেয় করে দিয়েছিলেন। তবে কার জিম্মায় সোনাদানা গচ্ছিত রাখলেন? মোহনলাল কেমন জীব?

'আমিও প্রথমটা কিছু ধরতে পারছিলাম না। তারপর অজিত হঠাৎ একদিন পলাশীর যুদ্ধ আবৃত্তি করল—"আবার আবার সেই কামান গর্জন—গর্জিল মোহনলাল..."। কামান—মোহনলাল। সেকালে বড় বড় বীরের নামে কামানের নামকরণ হত। বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল মোহনলাল কে! কার জিম্মায় সোনাদানা আছে। ঐ যে মোহনলাল।' ব্যোমকেশ

অঙ্গুলি দিয়া ভূমিশয়ান কামানটি দেখাইল।

আমরা সকলেই উত্তেজিত হইয়াছিলাম; রামকিশোর অস্থির হইয়া বলিলেন, 'অ্যাঁ! তাহলে কামানের নীচে সোনা পোঁতা আছে!'

'কামানের নীচে নয়। সেকালে সকলেই মাটিতে সোনা পুঁতে রাখত; রাজারাম অমন কাঁচা কাজ করেননি। তিনি কামানের নলের মধ্যে সোনা ঢেলে দিয়ে কামানের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ঐ যে দেখছেন কামানের মুখ থেকে শুকনো ঘাসের গোছা গলা বাড়িয়ে আছে, একশো বছর আগে সিপাহীরাও অমনি শুকনো ঘাস দেখেছিল; তারা ভাবতেও পারেনি যে ভাঙা অকর্মণ্য কামানের পেটের মধ্যে সোনা জমাট হয়ে আছে।'

রামকিশোর অধীর কণ্ঠে বলিলেন, 'তবে আর দেরি কেন? আসুন, মাটি খুঁড়ে মোহর বের করা যাক।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'মোহর? মোহর কোথায়? মোহর আর নেই রামকিশোরবাবু। রাজারাম এমন বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন যে সিপাহীরা সন্ধান পেলেও সোনা তুলে নিয়ে যেতে পারত না।'

'মানে—মানে—কিছু বুঝতে পারছি না।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'পাণ্ডেজি, তোষাখানায় একটা উনন আর হাপর দেখেছিলেন মনে আছে? সোহাগাও একটা হাঁড়িতে ছিল। বুঝতে পারলেন? রাজারাম তাঁর সমস্ত মোহর গলিয়ে ঐ কামানের মুখে ঢেলে দিয়েছিলেন। ওর ভেতরে আছে জমাট সোনার একটা থাম।'

'তাহলে—তাহলে—!'

'ওর মুখ থেকে মাটি খুঁড়ে সোনা দেখতে পাবেন হয়তো। কিন্তু বার করতে পারবেন না।'

'তবে উপায়?'

'উপায় পরে করবেন। কলকাতা থেকে অক্‌সি-অ্যাসিটিলিন্‌ আনিয়ে কামান কাটতে হবে; তিন ইঞ্চি পুরু লোহা ছেনি বাটালি দিয়ে কাটা যাবে না। আপাতত মাটি খুঁড়ে দেখা যেতে পারে আমার অনুমান সত্যি কিনা—সীতারাম!'

সীতারামের হাতে লোহার তুরপুন প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছিল। আদেশ পাইয়া সে ঘোড়সোয়ারের মত কামানের পিঠে চড়িয়া বসিল। আমরা নীচে কামানের মুখের কাছে সমবেত হইলাম। সীতারাম মহা উৎসাহে মাটি খুঁড়িতে লাগিল।

প্রায় এক ফুট কাটিবার পর সীতারাম বলিল, 'হুজুর, আর কাটা যাচ্ছে না। শক্ত লাগছে!'

পাণ্ডেজি বলিলেন, 'লাগাও তুরপুন!'

সীতারাম তখন কামানের মুখের মধ্যে তুরপুন ঢুকাইয়া পাক দিতে আরম্ভ করিল। দু'চারবার ঘুরাইবার পর চাক্‌লা চাক্‌লা সোনার ফালি ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আমরা সকলে উত্তেজনায় দিশাহারা হইয়া কেবল অর্থহীন চীৎকার করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, 'ব্যস, সীতারাম, এবার বন্ধ কর। আমার অনুমান যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। রামকিশোরবাবু, দুর্গের মুখে মজবুত দরজা বসান, পাহারা বসান; যতদিন না সব সোনা বেরোয় ততদিন আপনারা সপরিবারে এসে এখানে বাস করুন। এত সোনা আলগা ফেলে রাখবেন না।'

সেদিন বাসায় ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের নামে 'তার' আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল। হঠাৎ 'তার' কেন? কাহার 'তার'?—সত্যবতী ভাল আছে তো!

তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল। আমি অদূরে দাঁড়াইয়া অপলকচক্ষে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

'তার' পড়িতে পড়িতে তাহার মুখখানা কেমন এক রকম হইয়া গেল; তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, 'ওদিকেও সোনা।'

সোনা!

'হ্যাঁ—ছেলে হয়েছে।'

ছয় মাস পরে বৈশাখের গোড়ার দিকে কলকাতা শহরে গরম পড়ি-পড়ি করিতেছিল। একদিন সকালবেলা আমি এবং ব্যোমকেশ ভাগাভাগি করিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছি, সত্যবতী একবাটি দুধ ও ছেলে লইয়া মেঝেয় বসিয়াছে, দুধ খাওয়ানো উপলক্ষে মাতা-পুত্রে মল্লযুদ্ধ চলিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় খট্‌খট্ শব্দ হইল। সত্যবতী ছেলে লইয়া পলাইবার উপক্রম করিল। আমি দ্বার খুলিয়া দেখি রমাপতি ও তুলসী। রমাপতির হাতে একটি চৌকশ বাক্স, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, মুখে সলজ্জ হাসি।

তুলসীকে দেখিয়া আর চেনা যায় না। এই কয় মাসে সে রীতিমত একটা যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসে তাহাদের বিবাহ উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যাইতে পারি নাই। ছয় মাস পরে তাহাদের দেখিলাম।

তুলসী ঘরে আসিয়াই একেবারে ঝড় বহাইয়া দিল। সত্যবতীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার কোল হইতে খোকাকে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিতে করিতে ঘরময় ছুটাছুটি করিল; তারপর তাহাকে রমাপতির কোলে ফেলিয়া দিয়া সত্যবতীর আঁচল ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল। তাহাদের কলকাকলি ও হাসির শব্দ পর্দা ভেদ করিয়া আমাদের কানে আসিতে লাগিল।

তুলসীর চরিত্র যেন পাথরের তলায় চাপা ছিল, এখন মুক্তি পাইয়াছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ।

ঘর ঠাণ্ডা হইলে ব্যোমকেশ রমাপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাক্স কিসের? গ্রামোফোন নাকি?'

'না। আমরা আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করিয়ে এনেছি,'—বলিয়া রমাপতি বাক্স খুলিয়া যে জিনিসটি বাহির করিল আমরা তাহার পানে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিলাম। আগাগোড়া সোনার গড়া দুর্গের একটি মডেল। ওজন প্রায় দুই সের, অপূর্ব কারুকার্য। আসল দুর্গের সহিত কোথাও এক তিল তফাত নাই; এমন কি কামানটি পর্যন্ত যথাস্থানে রহিয়াছে।

আমরা চমৎকৃত স্বরে বলিলাম, 'বাঃ!'

তারপর খাওয়া-দাওয়া গল্পগাছা রঙ্গতামাসায় বেলা কাটিয়া গেল। রামকিশোর-বাবুদের খবর জানা গেল, কর্তার শরীর ভালই যাইতেছে, বংশীধর নিজের জমিদারীতে বাড়ি তৈয়ারী করিয়াছে; মুরলীধর শহরে বাড়ি কিনিয়া বাস করিতেছে; গদাধর তুলসী ও রমাপতিকে লইয়া কর্তা শৈলগৃহেই আছেন; চাঁদমোহন আবার জমিদারী দেখাশুনা করিতেছেন। দুর্গটিকে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করানো হইতেছে। তুলসী ও রমাপতি সেখানে বাস করিবে।

অপরাহ্ণে তাহারা বিদায় লইল। বিদায়কালে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুলসী, তোমার মাস্টার কেমন?'

মাস্টারের দিকে কপট-কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া তুলসী বলিল, 'বিচ্ছিরি।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ। একদিন আমার কোলে বসে মাস্টারের জন্যে কেঁদেছিলে মনে আছে?'

এবার তুলসীর লজ্জা হইল। মুখে আঁচল চাপা দিয়া সে বলিল, 'ধেৎ!'

# চিড়িয়াখানা

## এক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরের ঘটনা। গ্রীষ্মকাল। ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার সত্যবতীকে ও খোকাকে লইয়া দার্জিলিং গিয়াছে। ব্যোমকেশ ও আমি হ্যারিসন রোডের বাসায় পড়িয়া চিংড়িপোড়া হইতেছি।

ব্যোমকেশের কাজকর্মে মন্দা যাইতেছিল। ইহা তাহার পক্ষে এমন কিছু নূতন কথা নয়; কিন্তু এবার নৈষ্কর্মের দৈর্ঘ্য ও নিরবচ্ছিন্নতা এতই বেশি যে আমাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। উপরন্তু খোকা ও সত্যবতী গৃহে নাই। মরিয়া হইয়া আমরা শেষ পর্যন্ত দাবা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম।

আমি মোটামুটি দাবা খেলিতে জানিতাম, ব্যোমকেশকে শিখাইয়াছিলাম। প্রথম প্রথম সে সহজেই হারিয়া যাইত; ক্রমে তাহাকে মাত করা কঠিন হইল। অবশেষে একদিন আসিল যেদিন সে বড়ের কিস্তিতে আমাকে মাত করিয়া দিল।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ে গৌরবের হানি হয় না জানি। কিন্তু যাহাকে মাত্র কয়দিন আগে হাতে ধরিয়া দাবার চাল দিতে শিখাইয়াছি, তাহার কাছে হারিয়া গেলে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উপর সন্দেহ হয়। আমার চিত্তে আর সুখ রহিল না।

তার উপর এবার গরমও পড়িয়াছে প্রচণ্ড। সেই যে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি একদিন গলদ্‌ঘর্ম হইয়া সকালে ঘুম ভাঙিয়াছিল, তারপর এই দেড় মাস ধরিয়া গরম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। মাঝে দু'-এক পশলা বৃষ্টি যে হয় নাই এমন নয়, কিন্তু তাহা হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব তাপের মাত্রা বর্ধিত করিয়াছিল। দিবারাত্র ফ্যান চালাইয়াও নিষ্কৃতি ছিল না, মনে হইতেছিল সারা গায়ে রসগোল্লার রস মাখিয়া বসিয়া আছি।

দেহমনের এইরূপ নিরাশজনক অবস্থা লইয়া একদিন পূর্বাহ্নে তক্তপোষের উপর দাবার ছক পাতিয়া বসিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ আমাকে গজ-চক্র করিবার ব্যবস্থা প্রায় পাকা করিয়া আনিয়াছে, আমি অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া অনর্গল ঘর্মত্যাগ করিতেছি, এমন সময় বাধা পড়িল।

দরজায় খুট্‌খুট্‌ কড়া নাড়ার শব্দ। ডাকপিয়ন নয়, তাহার কড়া নাড়ার ভঙ্গীতে একটা বেপরোয়া উগ্রতা আছে। তবে কে? আমরা ব্যগ্র আগ্রহে পরস্পর মুখের পানে চাহিলাম। এতদিন পরে সত্যই কি নূতন রহস্যের শুভাগমন হইল!

ব্যোমকেশ টপ করিয়া পাঞ্জাবিটা গলাইয়া লইয়া দ্রুত গিয়া দ্বার খুলিল। আমি ইতিমধ্যে নিরাবরণ দেহে একটা উড়ানি চাদর জড়াইয়া ভদ্র হইয়া বসিলাম।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন মধ্যবয়স্ক একটি ভদ্রলোক। আকৃতি মধ্যম, একটু নিরেট গোছের, চাঁচা-ছোলা ধারালো মুখ, চোখে ফ্রেমহীন ধূমল কাচের চশমা। পরিধানে মরাল-শুভ্র প্যাণ্টুলুন ও সিল্কের হাতকাটা কামিজ। পায়ে মোজা নাই, কেবল বিননি-করা চামড়ার গ্রীসান স্যাণ্ডাল। ছিমছাম চেহারা।

মার্জিত কণ্ঠে বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমিই।—আসুন!'

সে ভদ্রলোকটিকে আনিয়া চেয়ারে বসাইল, মাথার উপর পাখাটা জোর করিয়া দিল। ভদ্রলোক একটি কার্ড বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিলেন।

কার্ডে ছাপা ছিল—

নিশানাথ সেন
গোলাপ কলোনী
মোহনপুর, ২৪ পরগণা
বি, এ, আর

কার্ডের অন্য পিঠে টেলিগ্রামের ঠিকানা 'গোলাপ' এবং ফোন নম্বর।

ব্যোমকেশ কার্ড হইতে চোখ তুলিয়া বলিল,—'গোলাপ কলোনী। নামটা নতুন ধরনের মনে হচ্ছে।'

নিশানাথবাবুর মুখে একটু হাসির ভাব দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'গোলাপ কলোনী আমার ফুলের বাগান। আমি ফুলের ব্যবসা করি। শাকসব্জিও আছে, ডেয়ারি ফার্মও আছে। নাম দিয়েছি গোলাপ কলোনী।'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে তীক্ষ্ণ চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'ও।—মোহনপুর কলকাতা থেকে কত দূর?'

নিশানাথ বলিলেন,—'শিয়ালদা থেকে ঘণ্টাখানেকের পথ—তবে রেলওয়ে লাইনের ওপর পড়ে না। স্টেশন থেকে মাইল দুই দূরে।'

নিশানাথবাবুর কথা বলিবার ভঙ্গিটি ত্বরাহীন, যেন আলস্যভরে কথা বলিতেছেন। কিন্তু এই মন্থরতা যে সত্যই আলস্য বা অবহেলা নয়, বরং তাঁহার সাবধানী মনের বাহ্য আবরণ মাত্র, তাহা তাঁহার সজাগ সতর্ক মুখ দেখিয়া বোঝা যায়। মনে হয় দীর্ঘকাল বাক্-সংযমের ফলে তিনি এইরূপ বাচনভঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়াছেন।

ব্যোমকেশের বাক্প্রণালীও অতিথির প্রভাবে একটু চিন্তা-মন্থর হইয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনি বলছেন ব্যবসা করেন। আপনাকে কিন্তু ব্যবসাদার বলে মনে হয় না, এমন কি বিলিতি সওদাগরী অফিসের ব্যবসাদারও নয়। আপনি কতদিন এই ব্যবসা করছেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'দশ বছরের কিছু বেশি।—আমাকে আপনার কী মনে হয়, বলুন দেখি?'

'মনে হয় আপনি সিভিলিয়ান ছিলেন। জজ কিম্বা ম্যাজিস্ট্রেট।'

ধোঁয়াটে চশমার আড়ালে নিশানাথবাবুর চোখ দুটি একবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি শান্ত-মন্থর কণ্ঠেই বলিলেন,—'কি করে আন্দাজ করলেন জানি না। আমি সত্যিই বোম্বাই প্রদেশের বিচার বিভাগে ছিলাম, সেশন জজ পর্যন্ত হয়েছিলাম। তারপর অবসর নিয়ে এই দশ বছর ফুলের চাষ করছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত?'

'সাতান্ন চলছে।'

'তার মানে সাতচল্লিশ বছর বয়সে রিটায়ার করেছেন। যতদূর জানি সরকারী চাকরির মেয়াদ পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত।'

নিশানাথবাবু একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আমার ব্লাড-প্রেসার আছে। দশ বছর আগে তার সূত্রপাত হয়। ডাক্তারেরা বললেন মস্তিষ্কের কাজ বন্ধ করতে হবে, নইলে বাঁচব না। কাজ থেকে অবসর নিলাম। তারপর বাংলা দেশে এসে ফুলের ফসল ফলাচ্ছি। ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই, কিন্তু রক্তের চাপ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই যাচ্ছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাবনা-চিন্তা কিছু নেই বলছেন। কিন্তু সম্প্রতি আপনার ভাবনার বিশেষ কারণ ঘটেছে। নইলে আমার কাছে আসতেন না।'

নিশানাথ হাসিলেন; অধর প্রান্তে শুভ্র দন্তরেখা অল্প দেখা গেল। বলিলেন,—'হ্যাঁ—! এটা অবশ্য অনুমান করা শক্ত নয়। কিছুদিন থেকে আমার কলোনীতে একটা ব্যাপার ঘটছে—' তিনি থামিয়া গিয়া আমার দিকে চোখ ফিরাইলেন,—'আপনি অজিতবাবু?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ, উনি আমার সহকারী। আমার কাছে যা বলবেন ওঁর কাছে তা গোপন থাকবে না।'

নিশানাথ বলিলেন,—'না না, আমার কথা গোপনীয় নয়। উনি সাহিত্যিক, তাই ওঁর কাছে একটা কথা জানবার ছিল। অজিতবাবু, blackmail শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ কি?'

আকস্মিক প্রশ্নে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম। বাংলা ভাষা লইয়া অনেকদিন নাড়াচাড়া করিতেছি, জানিতে বাকী নাই যে বঙ্গভারতী আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেন নাই; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদেশী ভাবকে বিদেশী শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হয়। আমি আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম,—'Blackmail—গুপ্ত কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। যতদূর জানি এককথায় এর বাংলা প্রতিশব্দ নেই।'

নিশানাথবাবু একটু অবজ্ঞার স্বরে বলিলেন,—'আমিও তাই ভেবেছিলাম। যাহোক, ওটা অবান্তর কথা। এবার ঘটনাটা সংক্ষেপে বলি শুনুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সংক্ষেপে বলবার দরকার নেই, বিস্তারিত করেই বলুন। তাতে আমাদের বোঝবার সুবিধা হবে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'বেশ।—আমার গোলাপ কলোনীতে যারা আমার অধীনে কাজ করে, মালীদের বাদ দিলে তারা সকলেই ভদ্রশ্রেণীর মানুষ, কিন্তু সকলেই বিচিত্র ধরনের লোক। কাউকেই ঠিক সহজ সাধারণ মানুষ বলা যায় না। স্বাভাবিক পথে জীবিকা অর্জন তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই তারা আমার কাছে এসে জুটেছে। আমি তাদের থাকবার জায়গা দিয়েছি, খেতে পরতে দিই, মাসে মাসে কিছু হাতখরচ দিই। এই শর্তে তারা কলোনীর কাজ করে। অনেকটা মঠের মত ব্যবস্থা। খুব আরামের জীবন না হতে পারে, কিন্তু না খেয়ে মরবার ভয় নেই।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটু পরিষ্কার করে বলুন। এদের পক্ষে স্বাভাবিক পথে জীবন নির্বাহ সম্ভব নয় কেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'এদের মধ্যে একদল আছে যারা শরীরের কোনও না কোনও খুঁতের জন্যে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে না। যেমন, পানুগোপাল। বেশ স্বাস্থ্যবান ছেলে, অথচ সে কানে ভাল শুনতে পায় না, কথা বলাও তার পক্ষে কষ্টকর। অ্যাডেনয়েডের দোষ আছে। লেখাপড়া শেখেনি। তাকে আমি গোশালার ভার দিয়েছি, সে গরু-মোষ নিয়ে আছে।'

'আর অন্য দল?'

'অন্য দলের অতীত জীবনে দাগ আছে। যেমন ধরুন, ভুজঙ্গধরবাবু। এমন তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি লোক কম দেখা যায়। ডাক্তার ছিলেন, সার্জারিতে অসাধারণ হাত ছিল; এমন কি প্ল্যাস্টিক সার্জারি পর্যন্ত জানতেন। কিন্তু তিনি এমন একটি দুর্নৈতিক কাজ করেছিলেন যে তাঁর ডাক্তারির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি এখন কলোনীর ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার হয়ে আছেন।'

'বুঝেছি। তারপর বলুন।'

ব্যোমকেশ অতিথির সম্মুখে সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল, কিন্তু তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,—'ব্লাড্-প্রেসার বাড়ার পর ছেড়ে দিয়েছি।' তারপর তিনি ধীরে অত্বরিত কণ্ঠে বলিতে শুরু করিলেন,—'কলোনীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনও নূতনত্ব নেই, দিনের পর দিন একই কাজের পুনরভিনয় হয়। ফুল ফোটে, শাকসব্জি গজায়, মুর্গী ডিম পাড়ে, দুধ থেকে ঘি মাখন তৈরি হয়। কলোনীর একটা ঘোড়া-টানা ভ্যান আছে, তাতে বোঝাই হয়ে রোজ সকালে মাল স্টেশনে যায়। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতায় আসে। মুনিসিপাল মার্কেটে আমাদের দুটো স্টল আছে, একটাতে ফুল বিক্রি হয়, অন্যটাতে শাকসব্জি। এই ব্যবসা থেকে যা আয় হয় তাতে ভালভাবেই চলে যায়।

'এইভাবে চলছিল, হঠাৎ মাস ছয়েক আগে একটা ব্যাপার ঘটল। রাত্রে নিজের ঘরে ঘুমচ্ছিলাম, জানালার কাচ ভাঙার ঝন্ঝন্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে আলো জেবলে দেখি মেঝের ওপর পড়ে আছে—মোটরের একটি স্পার্কিং প্লাগ।'

আমি বলিয়া উঠিলাম,—'স্পার্কিং প্লাগ!'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ। বাইরে থেকে কেউ ওটা ছুঁড়ে মেরে জানালার কাচ ভেঙেছে। শীতের অন্ধকার রাত্রি, কে এই দুষ্কার্য করেছে জানা গেল না। ভাবলাম, বাইরের কোনও দুষ্ট লোক নিরর্থক বজ্জাতি করেছে। গোলাপ কলোনীর কম্পাউণ্ডের মধ্যে আসা-যাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই, গরু-ছাগল আট্কাবার জন্যে ফটকে আগড় আছে বটে, কিন্তু মানুষের যাতায়াতের পক্ষে সেটা গুরুতর বাধা নয়।

'এই ঘটনার পর দশ-বারো দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেল। তারপর একদিন সকালবেলা সদর দরজা খুলে দেখি দরজার বাইরে একটা ভাঙা কারবুরেটার পড়ে রয়েছে। তার দু'হপ্তা পরে এল একটা মোটর হর্ন। তারপর ছেঁড়া মোটরের টায়ার। এইভাবে চলেছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মনে হচ্ছে টুকরো টুকরো ভাবে কেউ আপনাকে একখানি মোটর উপহার দেবার চেষ্টা করছে। এর মানে কি বুঝতে পেরেছেন?'

এতক্ষণে নিশানাথবাবুর মুখে একটু দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করিলাম। তিনি ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'পাগলের রসিকতা হতে পারে।—কিন্তু আমার এ অনুমান আমার নিজের কাছেও সন্তোষজনক নয়। তাই আপনার কাছে এসেছি।'

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া ঘুরন্ত পাখার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর প্রশ্ন করিল,—'শেষবার মোটরের ভগ্নাংশ কবে পেয়েছেন?'

'কাল সকালে। তবে এবার ভগ্নাংশ নয়, একটি আস্ত ছেলেখেলার মোটর।'

'বাঃ! লোকটি সত্যিই রসিক মনে হচ্ছে। এ ব্যাপার অবশ্য কলোনীর সবাই জানে?'

'জানে। এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আচ্ছা, আপনার মোটর আছে?'

'না। আমাদের কোথাও যাতায়াত নেই, মেলামেশা নেই,—সামাজিক জীবন কলোনীর মধ্যেই আবদ্ধ। তাই ইচ্ছে করেই মোটর রাখিনি।'

'কলোনীতে এমন কেউ আছে যার কোনকালে মোটরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল?'

নিশানাথবাবুর অধরপ্রান্ত সস্মিত ব্যঙ্গভরে একটু প্রসারিত হইল,—'আমাদের কোচম্যান মুস্কিল মিঞা আগে মোটর ড্রাইভার ছিল, বারবার র‍্যাশ্ ড্রাইভিং-এর জন্যে তার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে।'

'কি নাম বললেন, মুস্কিল মিঞা?'

'তার নাম নুরুদ্দিন কিম্বা ঐ রকম কিছু। সকলে ওকে মুস্কিল মিঞা বলে। মুস্কিল শব্দটা ওর কথার মাত্রা।'

'ও—আর কেউ?'

'আর আমার ভাইপো বিজয়ের একটা মোটর-বাইক ছিল, কখনও চলত, কখনও চলত না। গত বছর বিজয় সেটা বিক্রি করে দিয়েছে।'

'আপনার ভাইপো। তিনিও কলোনীতে থাকেন?'

'হ্যাঁ। মুানিসিপাল মার্কেটের ফুলের স্টল সেই দেখে। আমার ছেলেপুলে নেই, বিজয়কেই আমার স্ত্রী পনরো বছর বয়স থেকে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন।'

ব্যোমকেশ আবার ফ্যানের দিকে চোখ তুলিয়া বসিয়া রহিল। তারপর বলিল,—'মিস্টার সেন, আপনার জীবনে কখনও—দশ বছর আগে হোক বিশ বছর আগে হোক—এমন কোনও লোকের সংস্পর্শে এসেছিলেন কি যার মোটর ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্ক আছে? ধরুন, মোটরের দালাল কিম্বা ঐরকম কিছু? মোটর মেকানিক—?'

এবার নিশানাথবাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর যখন কথা কহিলেন তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আরও চাপা শুনাইল। বলিলেন,—'বারো বছর আগে আমি যখন সেশন জজ ছিলাম, তখন লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়ে আমার এজলাসে এসেছিল। তার একটা ছোট মোটর মেরামতের কারখানা ছিল।'

'তারপর?'

'লাল সিং ভয়ানক ঝগড়াটে বদ্‌রাগী লোক ছিল, তার কারখানার একটা মিস্ত্রিকে মোটরের স্প্যানার দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছিল। বিচারে আমি তাকে ফাঁসির হুকুম দিই।' একটু হাসিয়া বলিলেন,—'হুকুম শুনে লাল সিং আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর আমার রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হল। আপীলে আমার রায় বহাল রইল বটে, কিন্তু ফাঁসি মকুব হয়ে চৌদ্দ বছর জেল হল।'

'চৌদ্দ বছর জেল! তার মানে লাল সিং এখনও জেলে আছে।'

নিশানাথবাবু বলিলেন,—'জেলের কয়েদীরা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকলে তাদের মেয়াদ কিছু মাফ হয়। লাল সিং হয়তো বেরিয়েছে।'

'খোঁজ নিয়েছেন? জেল-বিভাগের দপ্তরে খোঁজ নিলেই জানা যেতে পারে।'

'আমি খোঁজ নিইনি।'

নিশানাথবাবু উঠিলেন। বলিলেন,—'আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না, আজ উঠি। আমার যা বলবার ছিল সবই বলেছি। দেখবেন যদি কিছু হদিস পান। কে এমন অনর্থক উৎপাত করছে জানা দরকার।'

ব্যোমকেশও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—'অনর্থক উৎপাত নাও হতে পারে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাহলে উৎপাতের অর্থ কি সেটা আরও বেশি জানা দরকার।' প্যাণ্টুলুনের পকেট হইতে এক গোছা নোট লইয়া কয়েকটা গণিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, —'আপনার পারিশ্রমিক পঞ্চাশ টাকা আগাম দিয়ে গেলাম। যদি আরও লাগে পরে দেব।— আচ্ছা।'

নিশানাথবাবু দ্বারের দিকে চলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'ধন্যবাদ।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া নিশানাথবাবু দ্বিধাভরে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—'আর একটা কথা মনে পড়ল। সামান্য কাজ, ভাবছি সে কাজ আপনাকে করতে বলা উচিত হবে কিনা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বলুন না।'

নিশানাথ কয়েক পা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'একটি স্ত্রীলোকের সন্ধান করতে হবে। সিনেমার অভিনেত্রী ছিল, নাম সুনয়না। বছর দুই আগে কয়েকটা বাজে ছবিতে ছোট পার্ট করেছিল, তারপর হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। যদি তার সন্ধান পান ভালই, নচেৎ তার সম্বন্ধে যত কিছু খবর সংগ্রহ করা যায় সংগ্রহ করতে হবে। আর যদি সম্ভব হয়, তার একটা ফটোগ্রাফ যোগাড় করতে হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যখন সিনেমার অভিনেত্রী ছিল তখন ফটো যোগাড় করা শক্ত হবে না। দু'এক দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে খবর দেব।'

'ধন্যবাদ।'

নিশানাথবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রথমেই পাঞ্জাবিটা খুলিয়া ফেলিল, তারপর নোটগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া গণিয়া দেখিল। তাহার মুখে সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। নোটগুলি দেরাজের মধ্যে রাখিতে রাখিতে সে বলিল—'নিশানাথবাবু কেতাদুরস্ত সিভিলিয়ান হতে পারেন কিন্তু তিনি বিষয়ী লোক নন।'

আমি উড়ানির খোলস ছাড়িয়া দাবার ঘুঁটিগুলি কৌটায় তুলিয়া রাখিতেছিলাম, প্রশ্ন করিলাম,—'কেন?'

সিগারেট ধরাইয়া ব্যোমকেশ তক্তপোষে আসিয়া বসিল, বলিল,—'পঞ্চাশ টাকা দিলাম বলে ষাট টাকার নোট রেখে গেছেন। লোকটি বুদ্ধিমান, কিন্তু টাকাকড়ি সম্বন্ধে ঢিলে প্রকৃতির।'

আমি বলিলাম,—'আচ্ছা ব্যোমকেশ, উনি যে সিভিলিয়ান ছিলেন, তুমি এত সহজে বুঝলে কি করে?'

সে বলিল,—'বোঝা সহজ বলেই সহজে বুঝলাম। উনি যে-বেশে এসেছিলেন, সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক ও-বেশে বেড়ায় না, নিজের পরিচয় দেবার জন্যে কার্ডও বের করে না।

ওটা বিশেষ ধরনের শিক্ষাদীক্ষার লক্ষণ। ওঁর কথা বলার ভঙ্গীতেও একটা হাকিমী মন্থরতা আছে।—কিন্তু ও কিছু নয়, আসল কথা হচ্ছে উনি কি জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন।'

'তার মানে?'

'উনি দুটো সমস্যা নিয়ে এসেছিলেন: এক হচ্ছে মোটরের ভগ্নাংশ লাভ; আর দ্বিতীয়, চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না।—কোন্‌টা প্রধান?'

'আমার তো মনে হল মোটরের ব্যাপারটাই প্রধান—তোমার কি অন্যরকম মনে হচ্ছে?'

'বুঝতে পারছি না। নিশানাথবাবু চাপা স্বভাবের লোক, হয়তো আমার কাছেও ওঁর প্রকৃত উদ্বেগের কারণ প্রকাশ করতে চান না।'

কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া বলিলাম,—'কিন্তু যে-বয়সে মানুষ চিত্রাভিনেত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে ওঁর সে বয়স নয়।'

'তার চেয়ে বড় কথা, ওঁর মনোবৃত্তি সে রকম নয়; নইলে বুড়ো লম্পট আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য নয়। ওঁর পরিমার্জিত বাচনভঙ্গী থেকে মনোবৃত্তির যেটুকু ইঙ্গিত পেলাম তাতে মনে হয় উনি মনুষ্য জাতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না। ঘৃণাও করেন না; একটু তিক্ত কৌতুকমিশ্রিত অবজ্ঞার ভাব। উচ্ছের সঙ্গে তেঁতুল মেশালে যা হয় তাই।'

উচ্ছে ও তেঁতুলের কথায় মনে পড়িয়া গেল আজ পুঁটিরামকে উক্ত দুইটি উপকরণ সহযোগে অম্বল রাঁধিবার ফরমাশ দিয়াছি। আমি স্নানাহারের জন্য উঠিয়া পড়িলাম। বলিলাম,—'তুমি এখন কি করবে?'

সে বলিল,—'মোটরের ব্যাপারে চিন্তা ছাড়া কিছু করবার নেই। আপাতত পলাতক অভিনেত্রী সুনয়নার পশ্চাদ্ধাবন করাই প্রধান কাজ।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরবে সিগারেট টানিল, ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—'Blackmail কথাটা সম্বন্ধে নিশানাথবাবুর এত কৌতূহল কেন? বাংলা ভাষায় blackmail- এর প্রতিশব্দ আছে কিনা তা জেনে ওঁর কি লাভ?'

আমি মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে বলিলাম,—'আমার বিশ্বাস ওটা অবচেতন মনের ক্রিয়া। হয়তো লাল সিং জেল থেকে বেরিয়েছে, সে-ই মোটরের টুকরো পাঠিয়ে ওঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।'

'লাল সিং যদি জেল থেকে বেরিয়েই থাকে, সে নিশানাথবাবুকে blackmail করবার চেষ্টা করবে কেন? উনি তো বে-আইনী কিছু করেননি; আসামীকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া বে-আইনী কাজ নয়। তবে লাল সিং প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে। হয়তো এই বারো বছর ধরে সে রাগ পুষে রেখেছে। কিন্তু নিশানাথবাবুর ভাব দেখে তা মনে হয় না। তিনি যদি লাল সিংকে সন্দেহ করতেন তাহলে অন্তত খোঁজ নিতেন সে জেল থেকে বেরিয়েছে কি না।'

ব্যোমকেশ সিগারেটের দগ্ধাবশেষ ফেলিয়া দিয়া তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া শুইল। নিজ মনেই বলিল,—'নিশানাথবাবুর স্মৃতিশক্তি বোধ হয় খুব প্রখর।'

'এটা জানলে কি করে?'

'তিনি হাকিম-জীবনে নিশ্চয় হাজার হাজার ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করেছেন। সব আসামীর নাম মনে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি লাল সিংয়ের নাম ঠিক মনে করে রেখেছেন।'

'লাল সিং তাঁকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছিল, হয়তো সেই কারণেই নামটা মনে আছে।'

'তা হতে পারে' বলিয়া সে আবার সিগারেট ধরাইবার উপক্রম করিল।

আমি বলিলাম,—'না না, আর সিগারেট নয়, ওঠো এবার। বেলা একটা বাজে।'

## দুই

বৈকালে ব্যোমকেশ বলিল,—'তোমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তো আজকাল সিনেমার দলে ভিড়ে পড়েছেন। তা তোমার চেনাশোনা কেউ ওদিকে আছেন নাকি?'

অবস্থাগতিকে সাহিত্যিক মহলে আমার বিশেষ মেলামেশা নাই। যাঁহারা উল্ললাট সাহিত্যিক তাঁহারা আমাকে কল্‌কে দেন না, কারণ আমি গোয়েন্দা কাহিনী লিখি; আর যাঁহারা সাহিত্য-খ্যাতি অর্জন করিবার পর শিং ভাঙিয়া বাছুরের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছেন তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার আগ্রহ আমার নাই। কেবল চিত্র-নাট্যকার ইন্দু রায়ের সহিত সদ্ভাব ছিল। তিনি সিনেমার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়াও সহজ মানুষের মত বাক্যালাপ ও আচার-ব্যবহার করিতেন।

ব্যোমকেশ ইন্দু রায়ের নামোল্লেখ করিলে সে বলিল,—'বেশ তো। ওঁর বোধ হয় টেলিফোন আছে, দেখ না যদি সুনয়নার খবর পাও।'

ডায়রেক্‌টরী ঘাঁটিয়া ইন্দুবাবুর ফোন নম্বর বাহির করিলাম। তিনি বাড়িতেই ছিলেন, আমার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন,—'সুনয়না! কৈ, নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না তো। আমি অবশ্য ওদের বড় খবর রাখি না—'

বলিলাম,—'ওদের খবর রাখে এমন কারুর খবর দিতে পারেন?'

ইন্দুবাবু ভাবিয়া বলিলেন,—'এক কাজ করুন। রমেন মল্লিককে চেনেন?'

'না। কে তিনি? সিনেমার লোক?'

'সিনেমার লোক নয় কিন্তু সিনেমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এমন লোক নেই যার নাড়ীনক্ষত্র জানেন না। ঠিকানা দিচ্ছি, তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন। অতি অমায়িক লোক, তাঁর শিষ্টতায় মুগ্ধ হবেন।' বলিয়া রমেন মল্লিকের ঠিকানা দিলেন।

সন্ধ্যার পর ব্যোমকেশ ও আমি মল্লিক মহাশয়ের ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। তিনি সাজগোজ করিয়া বাহির হইতেছিলেন, আমাদের লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। দেখিলাম, রমেনবাবু ধনী ও বিনয়ী, তাঁহার বয়স চল্লিশের আশেপাশে, হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘ আকৃতি; মুখখানি পেঁপে ফলের ন্যায় চোয়ালের দিকে ভারি, মাথার দিকে সঙ্কীর্ণ; গোঁফজোড়া সূক্ষ্ম ও যত্নলালিত; পরিধানে শৌখিন দেশী বেশ—কোঁচান কাঁচি ধুতির উপর গিলে-করা স্বচ্ছ পাঞ্জাবি; পায়ে বার্ণিশ পাম্প।

ব্যোমকেশের নাম শুনিয়া এবং আমরা ইন্দুবাবুর নির্দেশে আসিয়াছি জানিতে পারিয়া রমেনবাবু যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ বরফ দেওয়া ঘোলের সরবৎ ও সন্দেশ আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদর-আপ্যায়নের ফাঁকে ব্যোমকেশ কাজের কথা পাড়িল, বলিল,—'আপনি শুনলাম চলচ্চিত্রের বিশ্বকোষ, সিনেমা জগতে এমন মানুষ নেই যার নাড়ীর খবর জানেন না।'

রমেনবাবু সলজ্জ বিনয়ে বলিলেন,—'ওটা আমার একটা নেশা। কিছু নিয়ে থাকা চাই তো। তা বিশেষ কারুর কথা জানতে চান নাকি?'

'হ্যাঁ, সুনয়না নামে একটি মেয়ে বছর দুই আগে—'

রমেনবাবু চকিত চক্ষে চাহিলেন,—'সুনয়না! মানে—নেত্যকালী?'

'নেত্যকালী!'

'সুনয়নার আসল নাম নৃত্যকালী। তার সম্বন্ধে কোনও নতুন খবর পাওয়া গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সুনয়নার কথা আমরা কিছুই জানি না—নামটা ছাড়া। আপনার কাছে খবর পাব এই আশায় এসেছি।'

রমেনবাবু বলিলেন,—'ও—আমি ভেবেছিলাম আপনি পুলিসের পক্ষ থেকে—। যাহোক, নেত্যকালীর অনেক খবরই আমি জানি, কেবল ল্যাজা আর মুড়োর খবর পাইনি।'

'সেটা কি রকম?'

'নেত্যকালী কোথা থেকে এসেছিল জানি না, আবার কোথায় লোপাট হয়ে গেল তাও জানি না।'

'ভারি রহস্যময় ব্যাপার দেখছি। এর মধ্যে পুলিসের গন্ধও আছে!—আপনি যা যা জানেন দয়া করে বলুন।'

রমেনবাবু আমাদের সিগারেট দিলেন এবং দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দিলেন। তারপর বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'ঘটনাচক্রে নেত্যকালীর সিনেমালীলা প্রস্তাবনা থেকেই তাকে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল; আর যবনিকা পতন পর্যন্ত সেই লীলার খবর যে রেখেছিলাম তার কারণ মুরারি আমার বন্ধু ছিল। মুরারি দত্তর নাম বোধ হয় আপনারা জানেন না। তার কথা পরে আসবে।

'আজ থেকে আন্দাজ আড়াই বছর আগে একদিন সকালের দিকে আমি গৌরাঙ্গ স্টুডিওর মালিক গৌরহরিবাবুর অফিসে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। একটি নতুন মেয়ে দেখা করতে এল। গৌরহরিবাবু তখন 'বিষবৃক্ষ' ধরেছেন, প্রধান ভূমিকার অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস্ নেওয়া হয়ে গেছে, কেবল মাইনর পার্টের লোক বাকি।

'সেই নেত্যকালীকে প্রথম দেখলাম। চেহারা এমন কিছু আহা-মরি নয়; তবে বয়স কম, চটক আছে। গৌরহরিবাবু ট্রাই নিতে রাজী হলেন।

'ট্রাই নিতে গিয়ে গৌরহরিবাবুর তাক্ লেগে গেল। ভেবেছিলেন ঝি চাকরানীর পার্ট দেবেন, কিন্তু অভিনয় দেখার পর বললেন, তুমি কুন্দনন্দিনীর পার্ট কর। নেত্যকালী কিন্তু রাজী হল না, বললে, বিধবার পার্ট করবে না। গৌরহরিবাবু তখন তাকে কমলমণির পার্ট দিলেন। নেত্যকালী নাম সিনেমায় চলে না, তার নতুন নাম হল সুনয়না।'

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'বিধবার পার্ট করবে না কেন?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'কম বয়সী অভিনেত্রীরা বিধবার পার্ট করতে চায় না। তবে নেত্যকালী অন্য ওজর তুলেছিল; বলেছিল, সে সধবা, গেরস্ত ঘরের বৌ, টাকার জন্যে সিনেমায় নেমেছে, কিন্তু বিধবা সেজে স্বামীর অকল্যাণ করতে পারবে না। যাকে বলে নাচতে নেমে ঘোমটা!'

'আশ্চর্য রটে! তারপর?'

'গৌরহরিবাবু তাকে মাইনে দিয়ে রেখে দিলেন। শুটিং চলল। তারপর যথা সময় ছবি বেরুল। ছবি অবশ্য দাঁড়াল না, কিন্তু কমলমণির অভিনয় দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে আশ্চর্য তার মেক্-আপ। সে নিজে নিজের মেক্-আপ করত; এত চমৎকার মেক্-আপ করেছিল যে পর্দায় তাকে দেখে নেত্যকালী বলে চেনাই গেল না।'

'তাই নাকি; আর অন্য যে সব ছবিতে কাজ করেছিল—?'

'অন্য আর একটা ছবিতেই সে কাজ করেছিল, তারক গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতায়"। শ্যামা ঝি'র পার্ট করেছিল। সে কী অপূর্ব অভিনয়! আর শ্যামা ঝি'কে দেখে কার সাধ্য বলে সে-ই বিষবৃক্ষের কমলমণি। একেবারে আলাদা মানুষ!—এখন মনে হয় নেত্যকালীর আসল চেহারাও হয়তো আসল চেহারা নয়, মেক্-আপ।'

'তার আসল চেহারার ফটো বোধ হয় নেই?'

'না। থাকলে পুলিসের কাজে লাগত।'

'হুঁ। তারপর বলুন।'

রমেনবাবু আর একবার আমাদের সিগারেট পরিবেশন করিয়া আরম্ভ করিলেন—

'এই তো গেল সুনয়নার সিনেমা-জীবনের ইতিহাস। ভেতরে ভেতরে আর একটা ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছিল। সুনয়না সিনেমায় ঢোকবার মাস দুই পরে স্টুডিওতেই মুরারির সঙ্গে তার দেখা হল। মুরারিকে আপনারা চিনবেন না, কিন্তু দত্ত-দাস কোম্পানির নাম নিশ্চয় শুনেছেন—বিখ্যাত জহরতের কারবার; মুরারি হল গিয়ে দত্তদের বাড়ির ছেলে। অগাধ বড়মানুষ।

'মুরারি আমার বন্ধু ছিল, এক গেলাসের ইয়ার বলতে পারেন। আমাদের মধ্যে,

যাকে স্ত্রীদোষ বলে তা একটু আছে, ওটা তেমন দোষের নয়। মুরারিরও ছিল। পালে-পার্বণে একটু-আধটু আমোদ করা, বাঁধাবাঁধি কিছু নয়। কিন্তু মুরারি সুনয়নাকে দেখে একেবারে ঘাড় মুচকে পড়ল। সুনয়না এমন কিছু পরী-অপ্সরী নয়, কিন্তু যার সঙ্গে যার মজে মন! মুরারি সকাল-বিকেল গৌরাঙ্গ স্টুডিওতে ধর্না দিয়ে পড়ল।

'মুরারির বয়স হয়েছিল আমারই মতন। এ বয়সে সে যে এমন ছেলেমানুষি আরম্ভ করবে তা ভাবিনি। সুনয়না কিন্তু সহজে ধরা দেবার মেয়ে নয়। তার বাড়ি কোথায় কেউ জানত না, ট্রামে বাসে আসত, ট্রামে বাসে ফিরে যেত; কোনও দিন স্টুডিওর গাড়ি ব্যবহার করেনি। মুরারি অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারেনি তার বাসা কোথায়।

'মুরারি আমাকে মনের কথা বলত। আমি তাকে বোঝাতাম, সুনয়না ভদ্রঘরের বৌ, ভয়ানক পতিব্রতা; ওদিকে তাকিও না। মুরারি কিন্তু বুঝত না। তাকে তখন কালে ধরেছে, সে বুঝবে কেন?

'মাস ছয়-সাত কেটে গেল। সুনয়না মুরারিকে আমল দিচ্ছে না, মুরারিও জোঁকের মত লেগে আছে। এইভাবে চলেছে।

''স্বর্ণলতায়' সুনয়নার কাজ শেষ হয়ে গেল। সে স্টুডিও থেকে দু'মাসের মাইনে আগাম নিয়ে কিছুদিনের ছুটিতে যাবে কাশ্মীর বেড়াতে, এমন সময় একদিন মুরারি এসে আমাকে বললে, সব ঠিক হয়ে গেছে। আশ্চর্য হলাম, আবার হলাম না। স্ত্রীজাতির চরিত্র, বুঝতেই পারছেন। সুনয়না যে অন্য মতলবে ধরা দেবার ভান করছে তা তখন জানব কি করে?

'দত্ত-দাস কোম্পানির বাগবাজারের দোকানটা মুরারি দেখত। দোকানের পেছনদিকে একটা সাজানো ঘর ছিল। সেটা ছিল মুরারির আড্ডা-ঘর, অনেক-সময় সেখানেই রাত কাটাতো।

'পরদিন সকালে হৈ হৈ কাণ্ড। মুরারি তার আড্ডা-ঘরে মরে পড়ে আছে। আর দোকানের শো-কেস থেকে বিশ হাজার টাকার হীরের গয়না গায়েব হয়ে গেছে।

'পুলিস এল, লাস পরীক্ষার জন্যে চালান দিলে। কিন্তু কে মুরারিকে মেরেছে তার হদিস পেলে না। সে-রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল তা বোধ হয় আমি ছাড়া আর কেউ জানত না। মুরারি আর কাউকে বলেনি।

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে মোটেই ছিল না, অথচ না বললেও নয়। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের খাতিরে পুলিসকে গিয়ে বললাম।

'পুলিস অন্ধকারে হাঁ করে বসে ছিল, এখন তুড়ে তল্লাস শুরু করে দিলে। সুনয়নার নামে ওয়ারেন্ট বেরুল। কিন্তু কোথায় সুনয়না! সে কর্পূরের মত উবে গেছে। তার যে সব ফটোগ্রাফ ছিল তা থেকে সনাক্ত করা অসম্ভব। তার আসল চেহারা স্টুডিওর সকলকারই চেনা ছিল, কিন্তু এই ব্যাপারের পর আর কেউ সুনয়নাকে চোখে দেখেনি।

'তাই বলেছিলাম সুনয়নার ল্যাজা-মুড়ো দুই-ই আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে। সে কোথা থেকে এসেছিল, কার মেয়ে কার বৌ কেউ জানে না; আবার ভোজবাজির মত কোথায় মিলিয়ে গেল তাও কেউ জানে না।'

রমেনবাবু চুপ করিলেন। ব্যোমকেশও কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল, তারপর বলিল,—'মুরারিবাবুর মৃত্যুর কারণ জানা গিয়েছিল?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'তার পেটে বিষ পাওয়া গিয়েছিল।'

'কোন্ বিষ জানেন?'

'ঐ যে কি বলে—নামটা মনে পড়ছে না—তামাকের বিষ।'

'তামাকের বিষ! নিকোটিন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নিকোটিন। তামাক থেকে যে এমন দুর্দান্ত বিষ তৈরি হয় তা কে জানত?—আসুন।' বলিয়া সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিলেন।

ব্যোমকেশ হাস্যমুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'ধন্যবাদ, আর না। আপনার অনেক

সময় নষ্ট করলাম। আপনি কোথাও বেরুচ্ছিলেন—'

'সে কি কথা! বেরুনো তো রোজই আছে, আপনাদের মতো সজ্জনের সঙ্গ পাওয়া কি সহজ কথা!—আমি যাচ্ছিলাম একটি মেয়ের গান শুনতে। নতুন এসেছে, খাসা গায়। তা এখনও তো রাত বেশি হয়নি, চলুন না আপনারাও দুটো ঠুংরি শুনে আসবেন।'

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল,—'আমি তো গানের কিছুই বুঝি না, আমার যাওয়া বৃথা; আর অজিত ধ্রুপদ ছাড়া কোনও গান পছন্দই করে না। সুতরাং আজ থাক। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার যদি খবরের দরকার হয়, আপনার শরণাপন্ন হব।'

'একশ'বার।—যখনই দরকার হবে তলব করবেন।'

'আচ্ছা, আসি তবে। নমস্কার।'

'নমস্কার। নমস্কার।'

## তিন

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শুনিতে পাইলাম, পাশের ঘরে ব্যোমকেশ কাহাকে ফোন করিতেছে। দুই চারিটা ছাড়াছাড়া কথা শুনিয়া বুঝিলাম সে নিশানাথবাবুকে সুনয়নার কাহিনী শুনাইতেছে।

নিশানাথবাবুর আগমনের পর হইতে আমাদের তাপদগ্ধ কর্মহীন জীবনে নূতন সজীবতার সঞ্চার হইয়াছিল। তাই ব্যোমকেশ যখন টেলিফোনের সংলাপ শেষ করিয়া আমার ঘরে আসিয়া ঢুকিল এবং বলিল,—ওহে ওঠো, মোহনপুর যেতে হবে'—তখন তিলমাত্র আলস্য না করিয়া সটান উঠিয়া বসিলাম।

'কখন যেতে হবে?'

'এখনি। রমেনবাবুকেও নিয়ে যেতে হবে। নিশানাথবাবুর কথার ভাবে মনে হল তাঁর সন্দেহ ভূতপূর্ব অভিনেত্রী সুনয়না দেবী কাছাকাছি কোথাও বিরাজ করছেন। তাঁর সন্দেহ যদি সত্যি হয়, রমেনবাবু গিয়ে আসামীকে সনাক্ত করতে পারেন।'

আটটার মধ্যেই রমেনবাবুর বাড়িতে পৌঁছিলাম। তিনি লুঙ্গি ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিয়া বৈঠকখানায় 'আনন্দবাজার' পড়িতেছিলেন, আমাদের সহর্ষে স্বাগত করিলেন।

ব্যোমকেশের প্রস্তাব শুনিয়া তিনি উল্লাসভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—'যাব না? আলবাৎ যাব। আপনারা দয়া করে পাঁচ মিনিট বসুন, আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।' বলিয়া তিনি অন্দরের দিকে অন্তর্ধান করিলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনি তৈয়ার হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। একেবারে ফিট্‌ফাট বাবু; যেমনটি কাল সন্ধ্যায় দেখিয়াছিলাম।

শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছিয়া তিনি আমাদের টিকিট কিনিতে দিলেন না, নিজেই তিনখানা প্রথম শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া ট্রেনে অধিষ্ঠিত হইলেন। দেখিলাম আমাদের চেয়ে তাঁরই ব্যগ্রতা ও উৎসাহ বেশি।

ঘণ্টাখানেক পরে উদ্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছান গেল। লোকজন বেশী নাই; বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া একটি লোক পান চিবাইতে চিবাইতে দোকানীর সহিত রসালাপ করিতেছে। ব্যোমকেশ নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—'গোলাপ কলোনী কোন্ দিকে বলতে পারেন?'

লোকটি এক চক্ষু মুদিত করিয়া আমাদের ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর এড়ো গলায় বলিল,—'চিড়িয়াখানা দেখতে যাবেন?'

'চিড়িয়াখানা!'

'ঐ যার নাম চিড়িয়াখানা তারই নাম গোলাপ কলোনী। আজব জায়গা—আজব মানুষগুলি। অমন চিড়িয়াখানা আলিপুরেও নেই। তা—যাবার আর কষ্ট কি? ঐ যে চিড়িয়াখানার

রথ রয়েছে ওতে চড়ে বসুন, গড়গড় করে চলে যাবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, স্টেশন-প্রাঙ্গণের এক পাশে একটি জীর্ণকায় ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েদের স্কুল-কলেজের গাড়ির মত লম্বা ধরনের গাড়ি। তাহার গায়ে এককালে সোনার জলে গোলাপ কলোনী লেখা ছিল, কিন্তু এখন তাহা প্রায় অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। গাড়িতে লোকজন কেহ আছে বলিয়া বোধ হইল না, কেবল ঘোড়াটা একক দাঁড়াইয়া পা ছুঁড়িয়া মাছি তাড়াইতেছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম গাড়ির পিছনের পা-দানে বসিয়া একটি লোক নিবিষ্টমনে বিড়ি টানিতেছে। লোকটি মুসলমান, বয়স হইয়াছে। দাড়ির প্রাচুর্য নাই, মুখময় ডুমো ডুমো ব্রণের ন্যায় মাংস উঁচু হইয়া আছে, চোখ দুটিতে ঘোলাটে অভিজ্ঞতা; পরনে ময়লা পায়জামার উপর ফতুয়া। আমাদের দেখিয়া সে বিড়ি ফেলিয়া উঠিয়া বলিল,—'কলকাতা হতে আসতেছেন?'

'হ্যাঁ। গোলাপ কলোনী যাব।'

'আসেন। আপনাগোরে লইয়া যাইবার কথা বাবু কইছেন। কিন্তু মুস্কিল হইছে—'

বুঝিলাম ইনিই মুস্কিল মিঞা। ব্যোমকেশ বলিল,—'মুস্কিল কিসের?'

মুস্কিল বলিল,—'রসিকবাবুরও এই টেরেনে আওনের কথা। তা তিনি আইলেন না। পরের টেরনের জৈন্য সবুর করতি হইব। তা বাবু মশয়রা গাড়ির মধ্যে বসেন।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রসিকবাবুটি কে?'

মুস্কিল বলিল,—'কলোনির বাবু, রোজ দু'বেলা রেলে আয়েন যায়েন, আজ কি কারণে দেরি হইছে। বসেন না, পরের গাড়ি এখনই আইব।'

মুস্কিল গাড়ির দ্বার খুলিয়া দিল। ভিতরে মানুষ বসিবার স্থান তিন চারিটি আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থান স্তূপীকৃত শূন্য চ্যাঙারির দ্বারা পূর্ণ। অনুমান করা যায় প্রত্যহ প্রাতে এইসব চ্যাঙারিতে গোলাপ কলোনী হইতে ফুল শাকসব্জি স্টেশনে আসে এবং কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইয়া যায়; ওদিকে কলিকাতা হইতে পূর্বদিনের শূন্য চ্যাঙারিগুলি ফিরিয়া আসে। কর্মী মানুষগুলিরও যাতায়াত এই ভ্যানের সাহায্যেই সাধিত হয়।

রৌদ্রের তাপ বাড়িতেছিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকার চেয়ে গাড়ির ছায়ান্তরালে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া আমরা গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম।

মুস্কিল মিঞা গাল্পিক লোক, মানুষ পাইলে গল্প করিতে ভালবাসে। সে বলিল,—'বাবু মশয়রা দুই-চারিদিন হেথায় থাকবেন তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আজই ফিরব।—তুমি মুস্কিল মিঞা?'

মুস্কিল মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল,—'নাম তো কর্তা সৈয়দ নুরুদ্দিন। কিন্তু মুস্কিল হৈছে বাবুরা আদর কৈরা মুস্কিল মিঞা ডাকেন।'

'এ আর মুস্কিল কি?—কতদিন আছো গোলাপ কলোনীতে?'

'আন্দাজ সাত আট বছর হৈতে চলল। তখন বোষ্টম ঠাকুর ছাড়া আর কোনও কর্তাই দেখা দেন নাই। আমি পুরান লোক।'

'হুঁ। তোমার গাড়ি আর ঘোড়াও তো বেশ পুরানো মনে হচ্ছে।'

মুস্কিল আক্ষেপ করিয়া বলিল,—'আর কন্ কেন কর্তা। ঘোড়াডার মরবার বয়স হইছে, নেহাৎ আদত পড়ে গেছে তাই গাড়ি টানে। বড়বিবিরে কতবার কইছি, ও দুটো গাড়ি ঘোড়ারে ব্যাতিল কৈরা নূতন মটর-ভ্যান খরিদ কর। তা মুস্কিল হৈছে, বড়বিবি কয় টাকা নাই।'

'বড়বিবি কে? নিশানাথবাবুর স্ত্রী?'

'হ। ভারি লক্ষ্মীমন্তর মেইয়া।'

'তিনিই বুঝি কলোনী দেখাশোনা করেন?'

'দেখাশুনা কর্তাবাবুও করে। কিন্তু টাকাকড়ি হিসাব-নিকাশ বড়বিবির হাতে।'

'তা বড়বিবি টাকা নাই বলে কেন? কলোনীর ব্যবসা কি ভাল চলে না?'

মুস্কিল মিঞার ঘোলাটে চোখে একটা গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—'চলে তো ভালই। এত ফুল ফল ঘি মাখন আন্ডা যায় কোথায়? তবে কি জানেন কর্তা, লাভের গুড় পিপ্‌ড়ো খাইয়া যায়।' ইঙ্গিতপূর্ণ চক্ষে আমাদের তিনজনকে একে একে নিরীক্ষণ করিল।

মুস্কিল মিঞার নিকট হইতে ব্যোমকেশ হয়তো আরও আভ্যন্তরীণ তথ্য সংগ্রহ করিত, কিন্তু এই সময় দক্ষিণ হইতে একটি ট্রেন আসিয়া স্টেশনে থামিল। এবং অল্পকাল পরে একটি ক্ষিপ্রচারী ভদ্রলোক আসিয়া গাড়ির কাছে দাঁড়াইলেন। ইনি বোধ হয় রসিকবাবু।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ, কিন্তু আকৃতি ম্লান ও শুষ্ক। বৃষকাষ্ঠের মত দেহে লংক্লথের পাঞ্জাবি অত্যন্ত বেমানানভাবে ঝুলিয়া আছে, গাল-বসা খাপ্‌রা-ওঠা মুখ, জোড়া ভুরুর নিচে চোখদুটি ঘন-সন্নিবিষ্ট, মুখে খুঁৎখুঁতে অতৃপ্ত ভাব। গাড়ির মধ্যে আমাদের বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহার মুখ আরও খুঁৎখুঁতে হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনারা—?'

ব্যোমকেশ নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবু আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন—।'

রসিকবাবুর ঘন-সন্নিবিষ্ট চোখে একটা ক্ষণস্থায়ী আশঙ্কা পলকের জন্য চমকিয়া উঠিল; মনে হইল তিনি ব্যোমকেশের নাম জানেন। তারপর তিনি চট্ করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বলিলেন,—'মুস্কিল, গাড়ি হাঁকাও। দেরি হয়ে গেছে।'

মুস্কিল ইতিমধ্যে সামনে উঠিয়া বসিয়াছিল, ঘোড়ার নিতম্বে দু'চার ঘা খেজুর ছড়ি বসাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

রসিকবাবু তখন আত্ম-পরিচয় দিলেন। তাঁহার নাম রসিকলাল দে, গোলাপ কলোনীর বাসিন্দা, হগ্ সাহেবের বাজারে তরিতরকারির দোকানের ইন্‌চার্জ।

এই সময় তাঁহার ডান হাতের দিকে দৃষ্টি পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম। হাতের অঙ্গুষ্ঠ ছাড়া বাকি আঙুলগুলা নাই, কে যেন ভোজালির এক কোপে কাটিয়া লইয়াছে।

ব্যোমকেশও হাত লক্ষ্য করিয়াছিল. সে শান্তস্বরে বলিল,—'আপনি কি আগে কোনও কল-কারখানায় কাজ করতেন?'

রসিকবাবু হাতখানি পকেটের মধ্যে লুকাইলেন, ম্লানকণ্ঠে বলিলেন,—'কটন মিলের কারখানায় মিস্ত্রি ছিলাম, ভাল মাইনে পেতাম। তারপর করাত-মেসিনে আঙুলগুলো গেল; কিছু খেসারৎ পেলাম বটে, নাকের বদলে নরুন! কিন্তু আর কাজ জুটল না। বছর দুই থেকে নিশানাথবাবুর পিঁজরাপোলে আছি।' তাঁহার মুখ আরও শীর্ণ-ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল।

আমরা নীরব রহিলাম। গাড়ি ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী পার হইয়া খোলা মাঠের রাস্তা ধরিল।

ভাবিতে লাগিলাম, গোলাপ কলোনীর দেখি অনেকগুলি নাম! কেহ বলে চিড়িয়াখানা, কেহ বলে পিঁজরাপোল। না জানি সেখানকার অন্য লোকগুলি কেমন! যে দুইটি নমুনা দেখিলাম তাহাতে মনে হয় চিড়িয়াখানা ও পিঁজরাপোল দুটি নামই সার্থক।

## চার

রাস্তাটি ভাল; পাশ দিয়া টেলিফোনের খুঁটি চলিয়াছে। যুদ্ধের সময় মার্কিন পথিকৃৎ এই পথ ও টেলিফোনের সংযোগ নিজেদের প্রয়োজনে তৈয়ার করিয়াছিল, যুদ্ধের শেষে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

পথের শেষে আরও যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন চোখে পড়িল; একটা স্থানে অগণিত সামরিক মোটর গাড়ি। পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধভাবে গাড়িগুলি সাজানো; সর্বাঙ্গে মরিচা ধরিয়াছে, রঙ্ চটিয়া গিয়াছে. কিন্তু তাহাদের শ্রেণীবিন্যাস ভগ্ন হয় নাই। হঠাৎ দেখিলে মনে হয় এ যেন যান্ত্রিক সভ্যতার গোরস্থান।

এই সমাধিক্ষেত্র যেখানে শেষ হইয়াছে সেখান হইতে গোলাপ কলোনীর সীমানা আরম্ভ। আন্দাজ পনরো-কুড়ি বিঘা জমি কাঁটা-তার দিয়া ঘেরা, কাঁটা-তারের ধারে ধারে ত্রিশিরা মণি-মনসার ঝাড়। ভিতরে বাগান, বাগানের ফাঁকে ফাঁকে লাল টালি ছাওয়া ছোট ছোট কুঠি। মালীরা রবারের নলে করিয়া বাগানে জল দিতেছে। চারিদিকের ঝলসানো পরিবেশের মাঝখানে গোলাপ কলোনী যেন একটি শ্যামল ওয়েসিস্।

ক্রমে কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। ফটকে দ্বার নাই, কেবল আগড় লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। দুইদিকের স্তম্ভ হইতে মাধবীলতা উঠিয়া মাথার উপর তোরণ-মাল্য রচনা করিয়াছে। গাড়ি ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল।

ফটকে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই একটি বাড়ি। টালির ছাদ, বাংলো ধরনের বাড়ি; নিশানাথ-বাবু এখানে থাকেন। আমরা গাড়ির মধ্যে বসিয়া দেখিলাম বাড়ির সদর দরজার পাশে দাঁড়াইয়া একটি মহিলা ঝারিতে করিয়া গাছে জল দিতেছেন। গাড়ির শব্দে তিনি মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন; ক্ষণেকের জন্য একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম। তারপর তিনি ঝারি রাখিয়া দ্রুত বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমরা তিনজনেই যুবতীকে দেখিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ বক্রচক্ষে একবার রমেনবাবুর পানে চাহিল। রমেনবাবু অধরোষ্ঠ সংকুচিত করিয়া অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িলেন, কথা বলিলেন না। লক্ষ্য করিয়াছিলাম, কলিকাতার বাহিরে পা দিয়া রমেনবাবু কেমন যেন নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতার যাঁহারা খাস বাসিন্দা তাঁহারা কলিকাতার বাহিরে পদার্পণ করিলে ডাঙায় তোলা মাছের মত একটু অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন।

গাড়ি আসিয়া দ্বারের সম্মুখে থামিলে আমরা একে একে অবতরণ করিলাম। নিশানাথবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া আমাদের সম্ভাষণ করিলেন। পরিধানে ঢিলা পায়জামা ও লিনেনের কুর্তা। হাসিমুখে বলিলেন,—'আসুন! রোদ্দুরে খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়।'—এই পর্যন্ত বলিয়া রসিক দে'র প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। রসিক দে আমাদের সঙ্গে গাড়ি হইতে নামিয়াছিল এবং অলক্ষিতে নিজের কুঠির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া নিশানাথবাবুর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, তিনি বলিলেন,—'রসিক, তোমার হিসেব এনেছ?'

রসিক যেন কুঁচ্‌কাইয়া গেল, ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আজ্ঞে, আজ হয়ে উঠল না। কাল-পরশুর মধ্যেই—'

নিশানাথবাবু আর কিছু বলিলেন না, আমাদের লইয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন।

বসিবার ঘরটি মাঝারি আয়তনের; আসবাবের জাঁকজমক নাই কিন্তু পারিপাট্য আছে। মাঝখানে একটি নিচু গোল টেবিল, তাহাকে ঘিরিয়া কয়েকটি গদিযুক্ত চেয়ার। দেয়ালের গায়ে বইয়ের আলমারি। এক কোণে টিপাইয়ের উপর টেলিফোন, তাহার পাশে রোল্-টপ্ টেবিল। বাহিরের দিকের দেয়ালে দুটি জানালা, উপস্থিত রৌদ্রের ঝাঁঝ নিবারণের জন্য গাঢ় সবুজ রঙের পর্দা দিয়া ঢাকা।

রমেনবাবুর পরিচয় দিয়া আমরা উপবিষ্ট হইলাম। নিশানাথবাবু বলিলেন,—'তেতে পুড়ে এসেছেন, একটু জিরিয়ে নিন। তারপর বাগান দেখাব। এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের সঙ্গেও পরিচয় হবে।' তিনি সুইচ টিপিয়া বৈদ্যুতিক পাখা চালাইয়া দিলেন।

ব্যোমকেশ ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'আপনার বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে দেখছি।'

নিশানাথবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ, আমার নিজের ডায়নামো আছে। বাগানে জল দেবার জন্যে কুয়ো থেকে জল পাম্প করতে হয়। তাছাড়া আলো-বাতাসও পাওয়া যায়।'

আমিও ছাদের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিলাম টালির নিচে সমতল করিয়া তক্তা বসানো, তক্তা ভেদ করিয়া মোটা লোহার ডাণ্ডা বাহির হইয়া আছে, ডাণ্ডার বাঁকা হুক হইতে পাখা ঝুলিতেছে। অনুরূপ আর একটা ডাণ্ডার প্রান্তে আলোর বাল্‌ব।

পাখা চালু হইলে তাহার উপর হইতে কয়েকটি শুষ্ক ঘাসের টুকরা ঝরিয়া টেবিলের উপর পড়িল। নিশানাথ বলিলেন,—'চড়ুই পাখি। কেবলই পাখার ওপর বাসা বাঁধবার চেষ্টা করছে। ক্লান্তি নেই, নৈরাশ্য নেই, যতবার ভেঙে দেওয়া হচ্ছে ততবার বাঁধছে।' তিনি ঘাসের

টুকরাগুলি কুড়াইয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন।

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—'ভারি একগুঁয়ে পাখি।'

নিশানাথবাবুর মুখে একটু অম্লরসাক্ত হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন,—'এই একগুঁয়েমি যদি মানুষের থাকত!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মানুষের বুদ্ধি বেশি, তাই একগুঁয়েমি কম।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তাই কি? আমার তো মনে হয় মানুষের চরিত্র দুর্বল, তাই একগুঁয়েমি কম।'

ব্যোমকেশ তাঁহার পানে হাস্য-কুঞ্চিত চোখে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'আপনি দেখছি মানুষ জাতটাকে শ্রদ্ধা করেন না।'

নিশানাথ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া হাল্কা সুরে বলিলেন,—'বর্তমান সভ্যতা কি শ্রদ্ধা হারানোর সভ্যতা নয়? যারা নিজের ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছে তারা আর কাকে শ্রদ্ধা করবে?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার জন্য মুখ খুলিয়াছিল এমন সময় ভিতর দিকের পর্দা নড়িয়া উঠিল। যে মহিলাটিকে পূর্বে গাছে জল দিতে দেখিয়াছিলাম তিনি বাহির হইয়া আসিলেন; তাঁহার হাতে একটি ট্রে'র উপর কয়েকটি সরবতের গেলাস।

মহিলাটিকে দূর হইতে দেখিয়া যতটা অল্পবয়স্কা মনে হইয়াছিল আসলে ততটা নয়। তবে বয়স ত্রিশ বছরের বেশিও নয়। সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, সুশ্রী মুখ, টক্‌টকে রঙ; যৌবনের অপরপ্রান্তে আসিয়াও দেহ যৌবনের লালিত্য হারায় নাই। সবার উপর একটি সংযত আভিজাত্যের ভাব।

তিনি কে তাহা জানি না, তবু আমরা তিনজনেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশানাথবাবু নীরস কণ্ঠে পরিচয় দিলেন,—'আমার স্ত্রী—দময়ন্তী।'

নিশানাথবাবুর স্ত্রী!

প্রস্তুত ছিলাম না। স্বভাবতই ধারণা জন্মিয়াছিল নিশানাথবাবুর স্ত্রী বয়স্থা মহিলা; দ্বিতীয় পক্ষের কথা একেবারেই মনে আসে নাই। আমাদের মুখের বোকাটে বিস্ময় বোধ করি অসভ্যতাই প্রকাশ করিল। তারপর আমরা নমস্কার করিলাম। দময়ন্তী দেবী সরবতের ট্রে টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া বুকের কাছে দুই হাত যুক্ত করিয়া প্রতিনমস্কার করিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'এঁরা আজ এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

দময়ন্তী দেবী একটু হাসিয়া ঘাড় ঝুঁকাইলেন, তারপর ধীরপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

আমরা আবার উপবেশন করিলাম। নিশানাথ আমাদের হাতে সরবতের গেলাস দিয়া কথাচ্ছলে বলিলেন,—'এখানে চাকর-বাকর নেই, নিজেদের কাজ আমরা নিজেরাই করি।'

ব্যোমকেশ ঈষৎ উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল,—'সে তো খুব ভাল কথা। কিন্তু আমরা এসে মিসেস সেনের কাজ বাড়িয়ে দিলাম না তো? আমাদের জন্যে আবার নতুন করে রান্নাবান্না—'

নিশানাথ বলিলেন,—'আপনাদের আসার খবর ওদের আগেই দিয়েছি, কোনও অসুবিধা হবে না। মুকুল বলে একটি মেয়ে আছে, রান্নার ভার তারই; আমার স্ত্রী সাহায্য করেন। এখানে আলাদা রান্নাবান্নার ব্যবস্থা নেই; একটা রান্নাঘর আছে, সকলের রান্না একসঙ্গে হয়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার এখানকার ব্যবস্থা দেখে সত্যিকার আশ্রম বলে মনে হয়।'

নিশানাথবাবু কেবল একটু অম্লরসাক্ত হাসিলেন। ব্যোমকেশ সরবতে চুমুক দিয়া বলিল,—'বাঃ, চমৎকার ঠাণ্ডা সরবৎ, কিন্তু বরফ দেওয়া নয়। ফ্রিজিডেয়ার আছে!'

নিশানাথ বলিলেন,—'তা আছে।—এবার মোটরের টুকরোগুলো আপনাকে দেখাই। ফ্রিজিডেয়ারের অস্তিত্ব যেমন চট্ করে বলে দিলেন আমার অজ্ঞাত উপহারদাতার নামটাও তেমনি বলে দিন তবে বুঝব।'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবু, পৃথিবীর সব রহস্য যদি আপনার ফ্রিজিডেয়ারের মত স্বয়ংসিদ্ধ হত তাহলে আমার মতন যারা বুদ্ধিজীবী তাদের অন্ন

জুটত না।—ভাল কথা, কাল আপনি আমাকে পঞ্চাশ টাকা না দিয়ে ষাট টাকা দিয়ে এসেছিলেন।'

নিশানাথবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—'তাই নাকি? ভাগ্যে কম টাকা দিইনি। তা ও টাকা আপনার কাছেই থাক, পরে না হয় হিসেব দেবেন।'

হিসাব দেওয়া কিন্তু ঘটিয়া ওঠে নাই।

নিশানাথ রোল্-টপ টেবিল খুলিয়া কয়েকটা মোটরের ভাঙা টুকরা আমাদের সম্মুখে রাখিলেন। স্পার্কিং প্লাগ, ছেঁড়া রবারের মোটর-হর্ন, টিনের লাল রঙ্-করা খেলনা মোটর, সবই রহিয়াছে; ব্যোমকেশ সেগুলিকে দেখিল, কিন্তু বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। কেবল খেলনা মোটরটিকে সন্তর্পণে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। বলিল,—'এতে কারুর আঙুলের টিপ দেখছি না, একেবারে ঝাড়া মোছা।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আঙুলের ছাপ আমিও খুঁজেছিলাম কিন্তু কিছু পাইনি। আমার উপহারদাতা খুব সাবধানী লোক।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ। মোটরের টুকরোগুলো অবশ্য দাতা মহাশয় পাশের মোটর-ভাগাড় থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ থেকে একটা কথা আন্দাজ করা যায়।'

'কী আন্দাজ করা যায়?'

'দাতা মহাশয় কাছেপিঠের লোক। এখানে আশেপাশে কোনও বসতি আছে নাকি?'

'না। মাইলখানেক আরও এগিয়ে গেলে মোহনপুর গ্রাম পাওয়া যায়। আমার মালীরা সেখান থেকেই কাজ করতে আসে।'

'মোহনপুরে ভদ্রশ্রেণীর কেউ থাকে?'

'দু' এক ঘর থাকতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগই চাষাভুষো! তাদের কাউকে আমি চিনিও না। অবশ্য মালীদের ছাড়া।'

'সুতরাং সেদিক থেকে উপহার পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ যিনি উপহার পাঠাচ্ছেন তিনি ভদ্রশ্রেণীর লোক। চলুন এবার আপনারা, কলোনী পরিদর্শন করা যাক।'

কলোনী পরিদর্শনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কলোনীর মানুষগুলিকে, বিশেষ নারীগুলিকে চাক্ষুষ করা, একথা আমরা সকলে মনে মনে জানিলেও মুখে কেহই তাহা প্রকাশ করিল না। নিশানাথবাবু আমাদের জন্য তিনটি ছাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইলাম। তিনি নিজে একটি সোলা-হ্যাট্ পরিয়া লইলেন। কালো কাচের চশমা তাঁহার চোখেই ছিল।

এইখানে, উদ্যান পরিক্রমা আরম্ভ করিবার আগে, গোলাপ কলোনীর একটি নক্সা পাঠকের সম্মুখে স্থাপন করিতে চাই। নক্সা থাকিলে দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন হইবে না।—

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আমরা বাঁ দিকের পথ ধরিলাম। সুরকি-ঢাকা পথ সংকীর্ণ কিন্তু পরিচ্ছন্ন, আঁকিয়া বাঁকিয়া কলোনীর সমস্ত গৃহগুলিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমেই পড়িল ফটকের পাশে লম্বা টানা একটা ঘর। মাথার উপর টালির ফাঁকে ফাঁকে কাচ বসানো, দেওয়ালেও বড় বড় কাচের জানালা। কিন্তু ঘরটি অনাদৃত, কাচগুলি অধিকাংশই ভাঙিয়া গিয়াছে; অন্ধের চক্ষুর মত ভাঙা ফোকরের ভিতর দিয়া কেবল অন্ধকার দেখা যায়।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এটা কি?'

নিশানাথ বলিলেন,—'হট্-হাউস করেছিলাম, এখন পড়ে আছে। বেশি শীত বা গরম পড়লে কচি চারাগাছ এনে রাখা হয়।'

পাশ দিয়া যাইবার সময় ভাঙা দরজা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ভিতরে কয়েকটা ধুলিধুসর বেঞ্চি পড়িয়া আছে। মেঝের উপর কতকগুলি মাটিভরা চ্যাঙারি রহিয়াছে, তাহাতে নবাঙ্কুরিত গাছের চারা।

এখান হইতে সম্মুখের সীমানার সমান্তরালে খানিক দূর অগ্রসর হইবার পর গোহালের কাছে উপস্থিত হইলাম। চেঁচারির বেড়া দিয়া ঘেরা অনেকখানি জমি, তাহার পিছন দিকে

লম্বা খড়ের চালা; চালার মধ্যে অনেকগুলি গরু-বাছুর বাঁধা রহিয়াছে। খোলা বাথানে খড়ের আঁটি ডাঁই করা।

গোহালের ঠিক গায়ে একটি ক্ষুদ্র টালি-ছাওয়া কুঠি। আমরা গোহালের সম্মুখে উপস্থিত হইলে একটি লম্বা-চওড়া যুবক কুঠির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। গায়ে গেঞ্জি, হাঁটু পর্যন্ত কাপড়; দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবকের দেহ বেশ বলিষ্ঠ কিন্তু মুখখানি বোকাটে ধরনের। আমাদের কাছে আসিয়া সে দুই কানের ভিতর হইতে খানিকটা করিয়া তুলা বাহির করিয়া ফেলিল এবং আমাদের পানে চাহিয়া হাবলার মত হাসিতে লাগিল। হাসি কিন্তু সম্পূর্ণ নীরব হাসি, গলা হইতে কোনও আওয়াজ বাহির হইতে শুনিলাম না।

নিশানাথ বলিলেন,—'এর নাম পানু। গো-পালন করে তাই ওকে পানুগোপাল বলা হয়। কানে কম শোনে।'

পানুগোপাল পূর্ববৎ হাসিতে লাগিল, সে নিশানাথবাবুর কথা শুনিতে পাইয়াছে
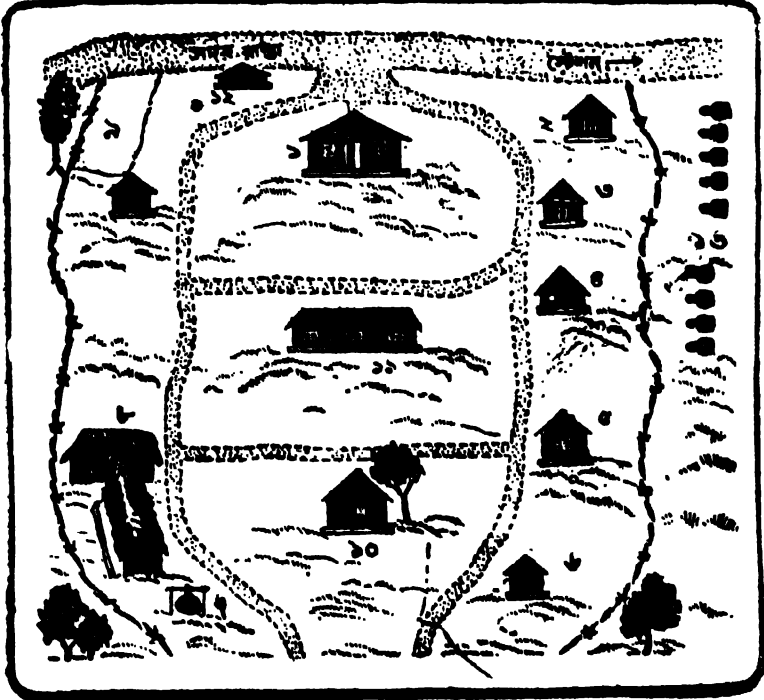
১। নিশানাথ গৃহ; ২ বিজয়ের ঘর; ৩। বনলক্ষ্মীর ঘর; ৪। ভুজঙ্গধরের ঘর ও ঔষধালয়; ৫। ব্রজদাসের ঘর; ৬। রসিকের ঘর; ৭। কূপ; ৮। আস্তাবল ও মুস্কিলের ঘর; ৯। গোশালা ও পানুর ঘর; ১০। মুকুল ও নেপালের ঘর; ১১। ভোজনকক্ষ ও পাকশালা; ১২। অব্যবহৃত হট্-হাউস; ১৩। সামরিক মোটরের সমাধিক্ষেত্র।

বলিয়া মনে হইল না। নিশানাথবাবু একটু গলা চড়াইয়া বলিলেন,—'পানুগোপাল, তোমার গরু-বাছুরের খবর কি? সব ভাল তো?'

প্রত্যুত্তরে পানুগোপালের কণ্ঠ হইতে ছাগলের মত কম্পিত মিহি আওয়াজ বাহির হইল। চমকিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম সে প্রাণপণে কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। নিশানাথবাবু হাত তুলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন, খাটো গলায় বলিলেন,—'পানু যে একেবারে কথা বলতে পারে না তা নয়, কিন্তু একটু উত্তেজিত হলেই কথা আটকে যায়। ছেলেটা ভাল, কিন্তু ভগবান মেরেছেন।'

অতঃপর আমরা আবার অগ্রসর হইলাম, পানুগোপাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু দূর গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম পানুগোপাল আবার কানে তুলা গুঁজিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'পানুগোপাল কানে তুলো গোঁজে কেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'কানে পুঁজ হয়।'

কিছুদূর চলিবার পর বাঁ দিকে রাস্তার একটা শাখা গিয়াছে দেখিলাম; রাস্তাটি নিশানাথবাবুর বাড়ির পিছন দিক দিয়া গিয়াছে, মাঝে পাতা-বাহার ক্রোটন গাছে ভরা জমির ব্যবধান। এই রাস্তার মাঝামাঝি একটি লম্বাটে গোছের বাড়ি। নিশানাথবাবু সেই দিকে মোড় লইয়া বলিলেন,—'চলুন, আমাদের রান্নাঘর খাবারঘর দেখবেন।'

পূর্বে শুনিয়াছি মুকুল নামে একটি মেয়ে কলোনীর রান্নাবান্না করে। অনুমান করিলাম মুকুলকে দেখাইবার জন্যই নিশানাথবাবু আমাদের এদিকে লইয়া যাইতেছেন।

ভোজনালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখা গেল, একটি লম্বা ঘরকে তিন ভাগ করা হইয়াছে; একপাশে রান্নাঘর, মাঝখানে আহারের ঘর এবং অপর পাশে স্নানাদির ব্যবস্থা। রান্নাঘর হইতে ছ্যাঁক্ছোঁক শব্দ আসিতেছিল, নিশানাথবাবু সে দিকে চলিলেন।

আমাদের সাড়া পাইয়া দময়ন্তী দেবী রান্নাঘরের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কোমরে আঁচল জড়ানো, হাতে খুন্তি। তাঁহাকে এই নূতন পরিবেশের মধ্যে দেখিয়া মনে হইল, আগে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম ইনি সে-মানুষ নন, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। প্রথমে দূর হইতে দেখিয়া একরকম মনে হইয়াছিল, তারপর সরবতের ট্রে হাতে তাঁহার অন্যরূপ আকৃতি দেখিয়াছিলাম, এখন আবার আর এক রূপ। কিন্তু তিনটি রূপই প্রীতিকর।

দময়ন্তী দেবী একটু উৎকণ্ঠিতভাবে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'তুমি রান্না করছ? মুকুল কোথায়?'

দময়ন্তী দেবী বলিলেন,—'মুকুলের বড় মাথা ধরেছে, সে রান্না করতে পারবে না। শুয়ে আছে।'

নিশানাথ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—'তাহলে বনলক্ষ্মীকে ডেকে পাঠাওনি কেন? সে তোমাকে যোগান দিতে পারত।'

দময়ন্তী বলিলেন,—'দরকার নেই, আমি একলাই সামলে নেব।'

নিশানাথের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া রহিল, তিনি আর কিছু না বলিয়া ফিরিলেন। এই সময় স্নানঘরের ভিতর হইতে একটি যুবক তোয়ালে দিয়া মাথা মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল,—'কাকিমা, শীগ্গির শীগ্গির—এখনি কলকাতা যেতে হবে—' এই পর্যন্ত বলিবার পর সে তোয়ালে হইতে মুখ বাহির করিয়া আমাদের দেখিয়া থামিয়া গেল।

দময়ন্তী বলিলেন,—'আসন পেতে বোসো, ভাত দিচ্ছি। সব রান্না কিন্তু হয়নি এখনও।' তিনি রান্নাঘরের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

আমাদের সম্মুখে যুবক স্নানসিক্ত নগ্নদেহে বিশেষ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল, সে তোয়ালে গায়ে জড়াইয়া আসন পাতিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার বয়স আন্দাজ ছাব্বিশ-সাতাশ, বলবান সুদর্শন চেহারা। নিশানাথ অপ্রসন্নভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'বিজয়, তুমি এখনও কাজে যাওনি?'

বিজয় কাঁচুমাচু হইয়া বলিল,—'আজ দেরি হয়ে গেছে কাকা।—হিসেবটা তৈরি করছিলাম—'

নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হিসেব কতদূর?'

'আর দু'তিন দিন লাগবে।'

ওষ্ঠাধর দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নিশানাথ দ্বারের দিকে চলিলেন, আমরা অনুবর্তী হইলাম। হিসাব লইয়া গোলাপ কলোনীতে একটা গোলযোগ পাকাইয়া উঠিতেছে মনে হইল।

দ্বারের নিকট হইতে পিছন ফিরিয়া দেখি, বিজয় বিস্ময়-কুতূহলী চক্ষে আমাদের পানে তাকাইয়া আছে। আমার সহিত চোখাচোখি হইতে সে ঘাড় নিচু করিল।

বাহিরে আসিয়া ব্যোমকেশ নিশানাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনার ভাইপো? উনিই বুঝি ফুলের দোকান দেখেন?'

'হ্যাঁ।'

## পাঁচ

যেদিক দিয়া আসিয়াছিলাম সেই দিক দিয়াই ফিরিয়া চলিলাম। মোড় পর্যন্ত পেঁছিবার আগেই দেখা গেল সম্মুখের রাস্তা দিয়া একটি যুবতী এক ঝাঁক পাতিহাঁস তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

যুবতী আমাদের দেখিতে পায় নাই। তাহার মাথার কাপড় খোলা, পরনে মোটা তাঁতের লুঙ্গি-ডুরে শাড়ি, দেহে ভরা যৌবন। অন্যমনস্কভাবে যাইতে যাইতে আমাদের দিকে চোখ ফিরাইয়া যুবতী লজ্জায় যেন শিহরিয়া উঠিল। ক্ষিপ্রহস্তে মাথার উপর ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি হাঁসগুলিকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া গেল। কলোনীর পিছন দিকে প্রকাণ্ড ইঁদারার পাশে কয়েকটা ঘর রহিয়াছে, সেইখানে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিশানাথ বলিলেন,—'মুস্কিলের বৌ। কলোনীর হাঁস-মুরগীর ইন-চার্জ।'

মনে আবার একটা বিস্ময়ের ধাক্কা লাগিল। এখানে কি প্রভু-ভৃত্য সকলেরই দ্বিতীয় পক্ষ? ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'ওদিকে কোথায় গেল?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ওদিকটা আস্তাবল। মুস্কিলও ওখানেই থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভদ্রঘরের মেয়ে বলে মনে হয়।'

'ওদের মধ্যে কে ভদ্র, কে অভদ্র বলা শক্ত। জাতের কড়াকড়ি নেই কিনা।'

'কিন্তু পর্দার কড়াকড়ি আছে।'

'আছে, তবে খুব বেশি নয়। আমাদের দেখে নজর বিবি এখন আর লজ্জা করে না। আপনারা নতুন লোক, তাই বোধহয় লজ্জা পেয়েছে।'

নজর বিবি! নামটা যেন সুনয়নার কাছ ঘেঁষিয়া যায়! চকিতে মাথায় আসিল, যে স্ত্রীলোক খুন করিয়া আত্মগোপন করিতে চায়, মুসলমান অন্তঃপুরের চেয়ে আত্মগোপনের প্রকৃষ্টতর স্থান সে কোথায় পাইবে? আমি রমেনবাবুর দিকে সরিয়া গিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কেমন দেখলেন?'

রমেনবাবু দ্বিধাভরে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—'উঁহু, নেত্যকালী নয়;—কিন্তু—কিছু বলা যায় না—'

বুঝিলাম, রমেনবাবু নেত্যকালীর মেক্-আপ করিবার অসামান্য ক্ষমতার কথা ভাবিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল মিঞার বৌ দিবারাত্র মেক্-আপ করিয়া থাকে ইহাই বা কি করিয়া সম্ভব?

ইতিমধ্যে আমরা আর একটি বাড়ির সম্মুখীন হইতেছিলাম। ভোজনালয় যে রাস্তার উপর তাহার পিছনে সমান্তরাল একটি রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে একটি কুঠি। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এখানে কে থাকে?'

নিশানাথ বলিলেন,—'এখানে থাকেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত আর তাঁর মেয়ে মুকুল।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নেপাল গুপ্ত—নামটা চেনা-চেনা ঠেকছে। বছর তিন-চার আগে

এ'র নাম কাগজে দেখেছি মনে হচ্ছে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'অসম্ভব নয়। নেপালবাবু এক কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি রাত্রে গিয়ে ল্যাবরেটারিতে কাজ করতেন। একদিন ল্যাবরেটারিতে বিরাট বিস্ফোরণ হল, নেপালবাবু গুরুতর আহত হলেন। কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করলেন নেপালবাবু লুকিয়ে লুকিয়ে বোমা তৈরি করছিলেন। চাকরি তো গেলই, পুলিসের নজরবন্দী হয়ে রইলেন। যুদ্ধের পর পুলিসের শুভদৃষ্টি থেকে মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু চাকরি আর জুটল না। বিস্ফোরণের ফলে তাঁর চেহারা এবং চরিত্র দুই-ই দাগী হয়ে গিয়েছে।'

'সত্যিই কি উনি বোমা তৈরি করছিলেন? উনি নিজে কি বলেন?'

নিশানাথ মুখ টিপিয়া হাসিলেন,—'উনি বলেন গাছের সার তৈরি করছিলেন।'

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। নিশানাথ বলিয়া চলিলেন,—'এখানে এসেও সার তৈরি করা ছাড়েন নি। বাড়িতে ল্যাবরেটারি করেছেন, অর্থাৎ গ্যাস-সিলিণ্ডার, বুনসেন বার্নার, টেস্ট-টিউব, রেটর্ট ইত্যাদি যোগাড় করেছেন। একবার খানিকটা সার তৈরি করে আমাকে দিলেন, বললেন, পেঁপে গাছের গোড়ায় দিলে ইয়া ইয়া পেঁপে ফলবে। আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু উনি শুনলেন না—'

'শেষ পর্যন্ত কি হল?'

'পেঁপে গাছগুলি সব মরে গেল।'

নেপালবাবুর কুঠিতে প্রবেশ করিলাম। বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর একটি অর্ধ-উলঙ্গ বৃদ্ধ থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার সম্মুখে দাবার ছক। ছকের উপর কয়েকটি ঘুঁটি সাজানো রহিয়াছে, বৃদ্ধ একাগ্র দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া আছেন। সেই যে ইংরেজী খবরের কাগজে দাবা খেলার ধাঁধা বাহির হয়, সাদা ঘুঁটি প্রথমে চাল দিবে এবং তিন চালে মাত করিবে, বোধহয় সেই জাতীয় ধাঁধার সমাধান করিতেছেন। আমরা দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু তিনি জানিতে পারিলেন না।

নিশানাথবাবু আমাদের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বুঝিলাম ইনিই বোমারু অধ্যাপক নেপাল গুপ্ত।

নেপালবাবু বয়সে নিশানাথের সমসাময়িক, কিন্তু গুণ্ডার মত চেহারা। গায়ের রঙ তামাটে কালো, মুখের একটা পাশ পুড়িয়া ঝামার মত কর্কশ ও সচ্ছিদ্র হইয়া গিয়াছে, বোধকরি বোমা বিস্ফোরণের চিহ্ন। তাঁহার মুখখানা স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো এতটা ভয়াবহ ছিল না, কিন্তু এখন দেখিলে বুক গুরগুর করিয়া ওঠে।

নিশানাথ ডাকিলেন,—'কি হচ্ছে প্রফেসার?'

নেপালবাবু দাবার ছক হইতে চোখ তুলিলেন, তখন তাঁহার চোখ দেখিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলাম। চোখ দুটা আকারে হাঁসের ডিমের মত এবং মণির চারিপাশে রক্ত যেন জমাট হইয়া আছে। দৃষ্টি বাঘের মত উগ্র।

তিনি হেঁড়ে গলায় বলিলেন,—'নিশানাথ! এস। সঙ্গে কারা?'

দেখিলাম নেপালবাবু আশ্রয়দাতার সঙ্গে সমকক্ষের মত কথা বলেন, এমন কি কণ্ঠস্বরে একটু মুরুব্বিয়ানাও প্রকাশ পায়।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। নেপালবাবু শিষ্টতার নিদর্শন স্বরূপ হাঁটু দুটির উপর কেবল একটু কাপড় টানিয়া দিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'এ'রা কলকাতা থেকে বাগান দেখতে এসেছেন।'

নেপালবাবুর গলায় অবজ্ঞাসূচক একটি শব্দ হইল, তিনি বলিলেন,—'বাগানে দেখবার কি আছে তোমার? আমার সার যদি লাগাতে তাহলে বটে দেখবার মত হত।'

নিশানাথ বলিলেন,—'তোমার সার লাগালে আমার বাগান মরুভূমি হয়ে যেত।'

নেপালবাবু গরম স্বরে বলিলেন,—'দেখ নিশানাথ, তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে তর্ক

কোরো না। সয়েল কেমিস্ট্রির কী জানো তুমি? পেঁপেগাছগুলো মরে গেল তার কারণ সারের মাত্রা বেশি হয়েছিল—তোমার মালীগুলো সব উল্লুক।' বলিয়া একটা আধপোড়া বর্মা চুরুট তক্তপোষ হইতে তুলিয়া লইয়া বজ্র-দন্তে কামড়াইয়া ধরিলেন।

নিশানাথ বলিলেন,—'সে যাক, এখন নতুন গবেষণা কি হচ্ছে?'

নেপালবাবু চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন,—'তামাক নিয়ে experiment আরম্ভ করেছি।'

'এবার কি মানুষ মারবে?'

নেপালবাবু চোখ পাকাইয়া তাকাইলেন,—'মানুষ মারব! নিশানাথ, তোমার বুদ্ধিটা একেবারে সেকেলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার দিয়ে যায় না। বিজ্ঞানের কৌশলে বিষও অমৃত হয়, বুঝেছ?'

ঠোঁটের কোণে গোপন হাসি লইয়া নিশানাথ বলিলেন,—'তামাক থেকে যখন অমৃত বেরুবে তখন তোমাকে কিন্তু প্রথম চেখে দেখতে হবে।—এখন যাই, বেলা বাড়ছে, এঁদের বাকী বাগানটা দেখিয়ে বাড়ি ফিরব। হ্যাঁ, ভাল কথা, মুকুলের নাকি ভারি মাথা ধরেছে?'

নেপালবাবু উত্তর দিবার পূর্বে ঘনঘন চুরুট টানিয়া ঘরের বাতাস কটু করিয়া তুলিলেন, শেষে বলিলেন,—'মুকুলের মাথা! কি জানি, ধরেছে বোধহয়।' অবহেলা ভরে এই তুচ্ছ প্রসঙ্গ শেষ করিয়া বলিলেন,—'অবৈজ্ঞানিক লে-ম্যান হলেও তোমাদের জানা উচিত যে, নতুন ওষুধ প্রথমে ইতর প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখতে হয়, যেমন ইঁদুর, গিনিপিগ। তাদের ওপর যখন ফল ভাল হয় তখন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয়।'

'কিন্তু মানুষের ওপর ফল যদি মারাত্মক হয়?'

'এমন মানুষের ওপর পরীক্ষা করতে হয় যারা মরলেও ক্ষতি নেই। অনেক অপদার্থ লোক আছে যারা ম'লেই পৃথিবীর মঙ্গল।'

'তা আছে।' অর্থপূর্ণভাবে এই কথা বলিয়া নিশানাথ দ্বারের দিকে চলিলেন। কিন্তু ব্যোমকেশের বোধহয় এত শীঘ্র যাইবার ইচ্ছা ছিল না, সে নেপালবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি বুঝি ভাল দাবা খেলেন?'

এতক্ষণে নেপালবাবু ব্যোমকেশকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন, ব্যাঘ্রচক্ষে চাহিয়া বলিলেন,—'আপনি জানেন দাবা খেলতে?'

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল,—'সামান্য জানি।'

নেপালবাবু ছকের উপর ঘুঁটি সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন,—'আসুন, তাহলে এক দান খেলা যাক।'

নিশানাথ বলিলেন,—'আরে না না, এখন দাবায় বসলে দু'ঘণ্টাতেও খেলা শেষ হবে না।'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দশ মিনিটেও শেষ হয়ে যেতে পারে।—আসুন।'

ব্যোমকেশ আমাদের দিকে একবার চোখের ইশারা করিয়া খেলায় বসিয়া গেল। মুহূর্ত-মধ্যে দু'জনের আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না। নিশানাথ খাটো গলায় বলিলেন,—'নেপাল খেলার লোক পায় না, আজ একজনকে পাকড়েছে, সহজে ছাড়বে না,—চলুন, আমরাই ঘুরে আসি।'

বাহির হইলাম। আমরা যে-উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি তাহাতে ব্যোমকেশের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক নয়, রমেনবাবুর উপস্থিতিই আসল।

বাড়ির বাহিরে আসিয়া পিছন দিকে জানালা খোলার শব্দে আমরা তিনজনেই পিছু ফিরিয়া চাহিলাম। বাড়ির পাশের দিকে একটা জানালা খুলিয়া গিয়াছে এবং একটি উনিশ-কুড়ি বছরের মেয়ে রুক্ষ উৎকণ্ঠাভরা চক্ষে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। আমরা ফিরিতেই সে দ্রুত জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

এক নজর দেখিয়া মনে হইল মেয়েটি দেখিতে ভাল; রঙ ফরসা, কোঁকড়া চুল, মুখের গড়ন একটু কঠিন গোছের। রমেনবাবু স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বন্ধ জানালার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, বলিলেন,—'ও কে?'

নিশানাথ বলিলেন,—'মুকুল—নেপালবাবুর মেয়ে।'

রমেনবাবু গভীর নিশ্বাস টানিয়া আবার সশব্দে ত্যাগ করিলেন,—'ওকে আগে দেখেছি -সিনেমার স্টুডিওতে দেখেছি—'

নিশানাথ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে মৃদুস্বরে বলিলেন,—'কিন্তু ও সুনয়না নয়?'

রমেনবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—'না—বোধ হয়—সুনয়না নয়।'

## ছয়

রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথবাবুকে প্রশ্ন করিলাম,—'আচ্ছা, নেপালবাবুরা কতদিন হল এখানে এসেছেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'প্রায় দু'বছর। এক-আধ মাস কম হতে পারে।'

মনে মনে নোট করিলাম, সুনয়না প্রায় ঐ সময় কলিকাতা হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ঠিক ঠিক সময়টা মনে নেই?'

নিশানাথ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—'দু'বছর আগে, বোধহয় সেটা জুলাই মাস। মনে আছে, আমার স্ত্রী লেখাপড়া ছেড়ে দেবার দু'-তিন দিন পরেই ওরা এসেছিল।'

'আপনার স্ত্রী—লেখাপড়া—'

'আমার স্ত্রীর মাঝে লেখাপড়া আর বিলিতী আদবকায়দা শেখবার শখ হয়েছিল। মাস আষ্টেক-দশ নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করেছিলেন, একটা বিলিতী মেয়ে-স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পোষালো না। উনি স্কুল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি এসে বসবার দু'-তিন দিন পরে নেপালবাবু মুকুলকে নিয়ে উপস্থিত হলেন।'

সংবাদটি হজম করিয়া পূর্ব-প্রসঙ্গে ফিরিয়া গেলাম,—'নেপালবাবু কলোনীর কোন্ কাজ করেন?'

নিশানাথ অম্লতিক্ত হাসিলেন,—বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন, দাবা খেলেন, আর সব কাজে আমার খুঁত ধরেন।'

'আপনার খুঁত ধরেন?'

'হ্যাঁ, আমি যে-ভাবে কলোনীর কাজ চালাই ওঁর পছন্দ হয় না। ওঁর বিশ্বাস, ওঁর হাতে পরিচালনার ভার দিলে ঢের ভাল চালাতে পারেন।'

'উনি তাহলে কোনও কাজই করেন না?'

একটু নীরব থাকিয়া নিশানাথ বলিলেন,—'মুকুল খুব কাজের মেয়ে।'

মুকুল কাজের মেয়ে হইতে পারে; পিতার নৈষ্কর্ম্য সে নিজের পরিশ্রম দিয়া পুরাইয়া দেয়। কিন্তু আমরা আসিব শুনিয়া তাহার মাথা ধরিল কেন? এবং জানালা দিয়া লুকাইয়া আমাদের পর্যবেক্ষণ করিবারই বা তাৎপর্য কি?

মোড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। সামনে পিছনে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, রাস্তার ধারে দূরে দূরে কয়েকটি কুঠি (নক্সা পশ্য)। কুঠিগুলির ব্যবধানস্থল পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের গাছ। প্রচুর জলসিঞ্চন সত্ত্বেও ফুলগাছগুলি মুহ্যমান।

মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিশানাথ পিছনের কুঠির দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিলেন,— 'সবশেষের কুঠিতে রসিক থাকে। তার এদিকের কুঠি ব্রজদাসের। ঐ যে ব্রজদাস বারান্দায় বসে কি করছে।'

তিনি সেইদিকে আগাইয়া গেলেন,—'কি হে ব্রজদাস, কি হচ্ছে?'

কুঠির বারান্দায় একটি প্রবীণ ব্যক্তি মাটিতে বসিয়া একটা হামান্‌দিস্তা দুই পায়ে ধরিয়া কিছু কুটিতেছিলেন। বেঁটে গোলগাল লোকটি, মাথায় পাকা চুলের বাব্‌রি, গলায় কণ্ঠি, কপালে হরিচন্দনের তিলক। নিশানাথের গলা শুনিয়া তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং হাস্যমুখে বলিলেন,—'একটা গরু রুগিয়েছে, তার জন্যে জোলাপ তৈরি করছি.—নিমের পাতা, তিলের খোল আর এণ্ডির বিচি।'

'বেশ বেশ। যদি পারো প্রফেসার গুপ্তকে একটু খাইয়ে দিও, উপকার হবে।' বলিয়া নিশানাথ ফিরিয়া চলিলেন।

বৈষ্ণব ব্রজদাস মিটিমিটি হাসিতে হাসিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু দুটি কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভাবাবেশে ঢুলু ঢুলু নয়, বেশ সজাগ এবং সতর্ক। দুইজন আগন্তুককে দেখিয়া তাঁহার চক্ষে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল তাহা তিনি মুখে প্রকাশ করিলেন না। নিশানাথও পরিচয় দিলেন না।

ফিরিয়া চলিতে চলিতে নিশানাথ বলিলেন,—'ব্রজদাস চিরকাল বৈষ্ণব ছিল না। ও বৈষ্ণব হয়ে গরু-বাছুরগুলোর ভারী সুখ হয়েছে। বড় যত্ন করে, গো-বদ্যির কাজও শিখেছে। গো-সেবা বৈষ্ণবের ধর্ম কিনা।'

নিশানাথবাবুর কথার মধ্যে একটু শ্লেষের ছিটা ছিল। প্রশ্ন করিলাম,—'উনি বৈষ্ণব হওয়ার আগে কী ছিলেন?'

নিশানাথ বলিলেন,—'জজ-সেরেস্তার কেরানি। ওকে অনেকদিন থেকে জানি। মাইনে বেশি পেত না কিন্তু গান-বাজনা ফুর্তির দিকে ঝোঁক ছিল। সেরেস্তার কেরানিরা উপরি টাকাটা সিকেটা নিয়েই থাকে। কিন্তু ব্রজদাস একবার একটা গুরুতর দুষ্কার্য করে বসল। ঘুষ নিয়ে দপ্তর থেকে একটা জরুরী দলিল সরিয়ে ফেলল।'

'তারপর?'

'তারপর ধরা পড়ে গেল। ঘটনাচক্রে আমিই ওকে ধরে ফেললাম। আদালতে মামলা উঠল, আমাকে সাক্ষী দিতে হল। ছ'বছরের জন্যে ব্রজদাস শ্রীঘর গেল। ইতিমধ্যে আমি চাকরি ছেড়ে কলোনী নিয়ে পড়েছি, জেল থেকে বেরিয়ে ব্রজদাস সটান এখানে এসে উপস্থিত। দেখলাম, একেবারে বদলে গেছে; জেলের লাপ্সি খেয়ে খাঁটি বৈষ্ণব হয়ে উঠেছে। আমি সাক্ষী দিয়ে জেলে পাঠিয়েছিলাম সেজন্যে আমার ওপর রাগ নেই বরং কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ। সেই থেকে আছে।'

বলিলাম,—'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।'

নিশানাথ একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—'ঠিক তাও নয়। ওর মনের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা বলছি না। তবে লক্ষ্য করেছি ও মিথ্যে কথা বলে না।'

কথা বলিতে বলিতে আমরা আর একটা কুঠির সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, শুনিতে পাইলাম কুঠির ভিতর হইতে মৃদু সেতারের আওয়াজ আসিতেছে। আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে নিশানাথ বলিলেন,—'ডাক্তার ভুজঙ্গধর। ওর সেতারের সখ আছে।'

রমেনবাবু একাগ্র মনে শুনিয়া বলিলেন,—'খাসা হাত। গৌড়-সারঙ বাজাচ্ছেন।'

ডাক্তার ভুজঙ্গধর বোধহয় জানালা দিয়া আমাদের দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেতারের বাজনা থামিয়া গেল। তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—'একি মিস্টার সেন, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কেন? রোদ লাগিয়ে ব্লাড-প্রেসার বাড়াতে চান?'

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের বয়স আন্দাজ চল্লিশ, দৃঢ় শরীর, ধারালো মুখ। মুখের ভাব একটু ব্যঙ্গ-বঙ্কিম; যেন বুদ্ধির ধার সিধা পথে যাইতে না পাইয়া বিদ্রূপের বাঁকা পথ ধরিয়াছে।

নিশানাথ বলিলেন,—'এ'দের বাগান দেখাচ্ছি।'

ডাক্তার বলিলেন,—'বাগান দেখাবার এই সময় বটে। তিনজনেরই সর্দিগর্মি হবে তখন হ্যাঁপা সামলাতে হবে এই নাম-কাটা ডাক্তারকে।'

'না, আমরা এখনি ফিরব। কেবল বনলক্ষ্মীকে একবার দেখে যাব।'

ডাক্তার বাঁকা হাসিয়া বলিলেন,—'কেন বলুন দেখি? বনলক্ষ্মী বুঝি আপনার বাগানের একটি দর্শনীয় বস্তু, তাই এ'দের দেখাতে চান?'

নিশানাথ সংক্ষেপে বলিলেন,—'সেজন্যে নয়, অন্য দরকার আছে।'

'ও—তাই বলুন—তা ওকে ওর ঘরেই পাবেন বোধহয়। এত রোদ্দুরে সে বেরুবে না, ননীর অঙ্গ গলে যেতে পারে।'

'ডাক্তার, তুমি বনলক্ষ্মীকে দেখতে পার না কেন বল দেখি?'

ডাক্তার একটু জোর করিয়া হাসিলেন,—'আপনারা সকলেই তাকে দেখতে পারেন, আমি দেখতে না পারলেও তার ক্ষতি নেই।—সে যাক, আপনার আবার রক্তদান করবার সময় হল। আজ বিকেলে আসব নাকি ইন্‌জেকশনের পিচ্‌কিরি নিয়ে?'

'এখনো দরকার বোধ করছি না।' বলিয়া নিশানাথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

## সাত

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'রক্তদানের কথা কি বললেন ডাক্তার?'

নিশানাথ বলিলেন,—'ব্লাড-প্রেসারের জন্যে আমি ওষুধ-বিষুধ বিশেষ খাই না, প্রেশ বাড়লে ডাক্তার এসে সিরিঞ্জ দিয়ে খানিকটা রক্ত বার করে দেয়। সেই কথা বলছিল। প্রায় মাসখানেক রক্ত বার করা হয়নি।'

এই সময় ব্যোমকেশ পিছন হইতে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। নিশানাথ অবাক হইয়া বলিলেন,—'এ কি! এরি মধ্যে খেলা শেষ হয়ে গেল?'

ব্যোমকেশের মুখ বিমর্ষ। সে বলিল,—'নেপালবাবু লোকটি অতি ধূর্ত এবং ধড়িবাজ।'

'কী হয়েছে?'

'কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করছে কিছু বুঝতেই দিলে না। তারপর যখন বুঝলাম তখন উপায় নেই। মাত হয়ে গেলাম।'

আমরা হাসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসি নয়। নেপালবাবুকে দেখে মনে হয় হোঁৎকা, কিন্তু আসলে একটি বিচ্ছু।'

আমরা আবার হাসিলাম। ব্যোমকেশ তখন এই অরুচিকর প্রসঙ্গ পাল্টাইবার জন্য বলিল,—'পিছনের কুঠির বারান্দায় যাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম উনি কে?'

'উনি ভূতপূর্ব ডাক্তার ভুজঙ্গধর দাস।'

'উনি এখানে কদ্দিন আছেন?'

'প্রায় বছর চারেক হতে চলল।'

'বরাবর এইখানেই আছেন?'

'হ্যাঁ। মাঝে মাঝে দু'চার দিনের জন্যে ডুব মারেন, আবার ফিরে আসেন।'

'কোথায় যান?'

'তা জানি না। কখনও জিগ্যেস করিনি, উনিও বলেননি।'

এতক্ষণে আমরা বনলক্ষ্মীর কুঠির সামনে উপস্থিত হইলাম। ইহার পর কলোনীর সম্মুখভাগে কেবল একটি কুঠি, সেটি বিজয়ের (নক্সা পশ্য)। আমাদের উদ্যান পরিক্রমা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

নিশানাথবাবু বারান্দার দিকে পা বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভিতর হইতে একটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিতেছে; তাহার বাম বাহুর উপর কোঁচানো শাড়ি এবং গামছা, মাথার চুল খোলা। সহসা আমাদের দেখিয়া সে জড়সড়ভাবে দাঁড়াইল এবং ডান কাঁধের উপর কাপড় টানিয়া দিল। দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে সে স্নান করিতে যাইতেছে।

নিশানাথবাবু একটু অপ্রতিভ হইয়া সেই কথাই বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী, তুমি স্নান করতে যাচ্ছ। আজ এত দেরি যে?'

বনলক্ষ্মী মুখ নীচু করিয়া বলিল,—'অনেক সেলাই বাকি পড়ে গিছল কাকাবাবু। আজ সব শেষ করলুম।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'বনলক্ষ্মী হচ্ছে আমাদের দর্জিখানার পরিচালিকা, কলোনীর সব কাপড়-জামা ওই সেলাই করে।—আচ্ছা, আমরা যাচ্ছি বনলক্ষ্মী। তোমাকে শুধু বলতে এসেছিলাম, মুকুলের মাথা ধরেছে সে রাঁধতে পারবে না, দময়ন্তী একা রান্না

নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তুমি সাহায্য করলে ভাল হত।'

'ওমা, এতক্ষণ জানতে পারিনি!' বনলক্ষ্মী কোনও দিকে দ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুত আমাদের সামনে দিয়া বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

বনলক্ষ্মী চলিয়া গেল কিন্তু আমার মনে একটি রেশ রাখিয়া গেল। পল্লীগ্রামের শীতল তরুছায়া, পুকুরঘাটের টলমল জল—তাহাকে দেখিলে এই সব মনে পড়িয়া যায়। সে রূপসী নয়, কিন্তু তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে; মুখখানিতে একটি কাঁচা স্নিগ্ধতা আছে। বয়স উনিশ-কুড়ি, নিটোল স্বাস্থ্য-মসৃণ দেহ, কিন্তু দেহে যৌবনের উগ্রতা নাই। নিতান্ত ঘরোয়া আটপৌরে গৃহস্থঘরের মেয়ে।

বনলক্ষ্মী দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেলে ব্যোমকেশ বলিল,—'রমেনবাবু, কি বলেন?'

রমেনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। নিশানাথ বলিলেন,—'মিছে আপনাদের কষ্ট দিলাম। আমারই ভুল, সুনয়না এখানে নেই।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এখানে আর কোনও মহিলা নেই?'

'না। চলুন এবার ফেরা যাক। খাবার তৈরি হতে এখনও বোধহয় দেরি আছে। তৈরি হলেই দময়ন্তী খবর পাঠাবে।'

সিধা পথে নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া পাখার তলায় বসিলাম। রমেনবাবু হঠাৎ বলিলেন,—'আচ্ছা, নেত্যকালী—মানে সুনয়না যে এখানে আছে এ সন্দেহ আপনার হল কি করে? কেউ কি আপনাকে খবর দিয়েছিল?'

নিশানাথ শুষ্কস্বরে বলিলেন,—'এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। It is not my secret. অন্য কিছু জানতে চান তো বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা অবান্তর প্রশ্ন করছি কিছু মনে করবেন না। কেউ কি আপনাকে blackmail করছে?'

নিশানাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—'না।'

তারপর সাধারণ গল্পগুজবে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। পেটের মধ্যে একটু ক্ষুধার কামড় অনুভব করিতেছি এমন সময় ভিতর দিকের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল বনলক্ষ্মী। স্নানের পর বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, পিঠে ভিজা চুল ছড়ানো। বলিল,—'কাকাবাবু, খাবার দেওয়া হয়েছে।'

নিশানাথ উঠিয়া বলিলেন,—'কোথায়?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'এই পাশের ঘরে। আপনারা আবার কষ্ট করে অতদূরে যাবেন, তাই আমরা খাবার এখানে নিয়ে এসেছি।'

নিশানাথ আমাদের বলিলেন,—'চলুন। ওরাই যখন কষ্ট করেছে তখন আমাদের আর কষ্ট করতে হল না।—কিন্তু আর সকলের কি ব্যবস্থা হবে?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'গোঁসাইদাদা রান্নাঘরের ভার নিয়েছেন।—আসুন।'

পাশের ঘরে টেবিলের উপর আহারের আয়োজন। তবে ছুরি-কাঁটা নাই, শুধু চামচ। আমরা বসিয়া গেলাম। রান্নার পদ অনেকগুলি: ঘি-ভাত, সোনামুগের ডাল, ইঁচড়ের ডালনা, চিংড়িমাছের কাটলেট, কাঁচা আমের ঝোল, পায়স ও ছানার বরফি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলাম। দময়ন্তী দেবী ও বনলক্ষ্মীর নিপুণ পরিচর্যায় ভোজনপর্ব পরম পরিতৃপ্তির সহিত সম্পন্ন হইল; লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবী অতি সুদক্ষা গৃহিণী, তাঁহার চোখের ইঙ্গিতে বনলক্ষ্মী যন্ত্রের মত কাজ করিয়া গেল।

আহারান্তে আবার বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম। পান ও সিগারেট লইয়া বনলক্ষ্মী আসিল, টেবিলের উপর রাখিয়া আমাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন কৌতূহলের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

'তোমরা এবার খেয়ে নাও' বলিয়া নিশানাথও ভিতরে গেলেন।

বনলক্ষ্মীকে এতক্ষণ দেখিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যেন একটা ধারণা করিতে পারিয়াছি। সে স্বভাবতই মুক্ত-প্রাণ extrovert প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু কোনও কারণে নিজেকে চাপিয়া

রাখিয়াছে, কাহারও কাছে আপন প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিতেছে না।

কিছুকাল ধরিয়া ধূমপান চলিল। নিশানাথ ভিতরে বাহিরে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন,—'আপনাদের ফিরে যাবার তাড়া নেই তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাড়া থাকলেও অসমর্থ। মিসেস সেন যে-রকম খাইয়েছেন, নড়বার ক্ষমতা নেই। আপনি কি বলেন, রমেনবাবু?'

রমেনবাবু একটি উদ্‌গার তুলিয়া বলিলেন,—'খাওয়ার পর নড়াচড়া আমার গুরুর বারণ।'

নিশানাথ হাসিলেন,—'তবে আসুন, ওঘরে বিছানা পাতিয়ে রেখেছি, একটু গড়িয়ে নিন।'

একটি বড় ঘর। তাহার মেঝেয় তিনজনের উপযোগী বিছানা পাতা হইয়াছে। ঘরের দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি একানে খাট; খাটের পাশে টুলের উপর টেবিল-ফ্যান। অনুমান করিলাম নিশানাথবাবুর এটি শয়নকক্ষ। ঘরের জানালাগুলি বন্ধ, তাই ঘরটি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। আমরা বিছানায় বসিলাম। নিশানাথবাবু টেবিল-ফ্যানটি মেঝেয় নামাইয়া চালাইয়া দিলেন। বলিলেন,—'এ ঘরের সীলিং-ফ্যানটা সারাতে দিয়েছি তাই টেবিল-ফ্যান চালাতে হচ্ছে। কষ্ট হবে না তো?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিছু কষ্ট হবে না। আপনি এবার একটু বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

নিশানাথ বলিলেন,—'দিনের বেলা শোয়া আমার অভ্যাস নেই—'

'তাহলে বসুন, খানিক গল্প করা যাক।'

নিশানাথ বসিলেন। রমেনবাবু কিন্তু পাঞ্জাবি খুলিয়া লম্বা হইলেন। গুরুভক্ত লোক, গুরুর আদেশ অমান্য করেন না। আমরা তিনজনে বসিয়া নিম্নস্বরে আলাপ করিতে লাগিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'বনলক্ষ্মী কি চলে গেছে?'

নিশানাথ বলিলেন,—'হ্যাঁ, এই চলে গেল। কেন বলুন দেখি?'

'ওর ইতিহাস শুনতে চাই। ও যখন গোলাপ কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে তখন ওর নিশ্চয় কোন দাগ আছে।'

'তা আছে। ইতিহাস খুবই সাধারণ। ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, এক লম্পট ওকে ভুলিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসে, তারপর কিছুদিন পরে ফেলে পালায়। গাঁয়ে ফিরে যাবার মুখ নেই, কলকাতায় খেতে পাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কলোনীতে আশ্রয় পেয়েছে।'

'কতদিন আছে?'

'বছর দেড়েক।'

'ওর গল্প সত্যি কিনা যাচাই করেছিলেন?'

'না। ও নিজের গ্রামের নাম কিছুতেই বলল না।'

'হুঁ। গোলাপ কলোনীর সন্ধান ও পেল কি করে? এটা তো সরকারী অনাথ আশ্রম নয়।'

নিশানাথ একটু মুখ গম্ভীর করিলেন, বলিলেন,—'ও নিজে আসেনি, বিজয় একদিন ওকে নিয়ে এল। কলকাতায় হগ্‌ মার্কেটের কাছে একটা রেস্তোরাঁ আছে, বিজয় রোজ বিকেলে সেখানে চা খায়। একদিন দেখল একটি মেয়ে কোণের টেবিলে একলা বসে বসে কাঁদছে। বনলক্ষ্মীর তখন হাতে একটি পয়সা নেই, দু'দিন খেতে পায়নি, স্রেফ চা খেয়ে আছে। ওর কাহিনী শুনে বিজয় ওকে নিয়ে এল।'

'ওর চাল-চলন আপনার কেমন মনে হয়?'

'ওর কোনও দোষ আমি কখনও দেখিনি। যদি ওর পদস্খলন হয়ে থাকে সে ওর চরিত্রের দোষ নয়, অদৃষ্টের দোষ।' এই বলিয়া নিশানাথ হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন। 'এবার বিশ্রাম করুন' বলিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার এই হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া কেমন যেন বেখাপ্পা লাগিল। পাছে ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তরে আরও কিছু বলিতে হয় তাই কি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন?

আমরা শয়ন করিলাম। মাথার কাছে গুঞ্জনধ্বনি করিয়া পাখা ঘুরিতেছে। পাশে রমেন-বাবু ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার নাক ডাকিতেছে না, চুপি চুপি জল্পনা করিতেছে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, একটি চটক-দম্পতী কোন্ অদৃশ্য ছিদ্রপথে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছাদের একটি লোহার আংটায় বাসা বাঁধিতেছে। চোরের মত কুটা মুখে করিয়া আসিতেছে, কুটা রাখিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পাখার মৃদু শব্দ হইতেছে—ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌—

চিৎ হইয়া শুইয়া তাহাদের নিভৃত গৃহ-নির্মাণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুদিয়া আসিল।

## আট

বৈকালে আবার বাহিরের ঘরে সমবেত হইলাম। দময়ন্তী দেবী চায়ের বদলে শীতল ঘোলের সরবৎ পরিবেশন করিয়া গেলেন। নিশানাথ বলিলেন, 'রোদ একটু পড়ুক, তারপর বেরুবেন। সাড়ে পাঁচটার সময় মুস্কিল গাড়ি নিয়ে স্টেশনে যায়, সেই গাড়িতে গেলেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন পাবেন।'

সরবৎ পান করিতে করিতে আর এক দফা কলোনীর অধিবাসীবৃন্দের সহিত দেখা হইয়া গেল। প্রথমে আসিলেন প্রফেসার নেপাল গুপ্ত, সঙ্গে কন্যা মুকুল। মুকুল অন্দরের দিকে চলিয়া যাইতেছিল, নিশানাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'এবেলা তোমার মাথা কেমন?'

মুকুল ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াইয়া বলিল,—'সেরে গেছে'—বলিয়া যেন একান্ত সন্ত্রস্তভাবে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহার গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা, একটু খস্‌খসে; সর্দি-কাশিতে স্বরযন্ত্র বিপন্ন হইলে যেমন আওয়াজ বাহির হয় অনেকটা সেই রকম।

এবেলা তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে যদি এত বেশী প্রসাধন না করিত তাহা হইলে বোধহয় তাহাকে আরও ভাল দেখাইত। কিন্তু মুখে পাউডার ও ঠোঁটে রক্তের মত লাল রঙ লাগাইয়া সে যেন তাহার সহজ লাবণ্যকে ঢাকা দিয়াছে। তার উপর চোখের দৃষ্টিতে একটা শুষ্ক কঠিনতা। অল্প বয়সে বারবার আঘাত পাইয়া যাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের চোখেমুখে এইরূপ অকাল কঠিনতা বোধহয় স্বাভাবিক।

এদিকে নেপালবাবুও যেন জাপানী মুখোশ দিয়া মুখের অর্ধেকটা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ব্যোমকেশকে দেখিয়া তাঁহার চোখে কুটিল কৌতুক নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'কী, এবেলা আর এক দান হবে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মাফ করবেন।'

নেপালবাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—'ভয় কি? না হয় আবার মাত হবেন। ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেললে খেলা শিখতে পারবেন। কথায় বলে, লিখতে লিখতে সরে, আর—'

ভাগ্যক্রমে প্রবাদবাক্য শেষ হইতে পাইল না, বৈষ্ণব ব্রজদাসকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া নেপালবাবু তাঁহার দিকে ফিরিলেন—'কি হে ব্রজদাস, তুমি নাকি গরুকে ওষুধ খাওয়াতে আরম্ভ করেছ? গো-চিকিৎসার কী জান তুমি?'

ব্রজদাস মাথা চুলকাইয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে—'

'বোষ্টম হয়ে গো-হত্যা করতে চাও! নিশানাথ, তোমারই বা কেমন আক্কেল? হাজার বার বলেছি একটা গো-বদ্যি যোগাড় কর, তা নয়, দুটো হেতুড়ের হাতে গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়েছ।'

নিশানাথবাবু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিলাম, কিন্তু তিনি নীরব রহিলেন।

নেপালবাবু বলিলেন,—'যার কর্ম তারে সাজে। আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখবে দু'দিনে গরুগুলোর চেহারা ফিরিয়ে দেব। আমি শুধু কেমিস্ট নই, বায়ো-কেমিস্ট, বুঝলে? চল বোষ্টম, তোমার গরু দেখি।'

ব্রজদাস কাতর চক্ষে নিশানাথের পানে চাহিলেন। নিশানাথ এবার একটু কড়া সুরে বলিলেন,—'নেপাল, গরু যত ইচ্ছে দেখ, কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে যেও না।'

নেপালবাবু অধীর উপেক্ষাভরে বলিলেন,—'তুমি কিছু বোঝো না, কেবল সর্দারি কর। আমি গরুর চিকিৎসা করব। দেখিয়ে দেব—'

ছুরির মত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিশানাথ বলিলেন,—'নেপাল, আমার হুকুম ডিঙিয়ে যদি এ কাজ কর, তোমাকে কলোনী ছাড়তে হবে।'

নেপালবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হাঁসের ডিমের মত চোখ হইতে রক্ত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। তিনি বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—'আমাকে অপমান করছ তুমি—আমাকে? এত বড় সাহস! ভেবেছ আমি কিছু জানি না?—ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি!'

নিশানাথ শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলাম তাঁহার রগের শিরা ফুলিয়া দপ্-দপ্ করিতেছে। তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—'নেপাল, তুমি যাও—এই দণ্ডে এখান থেকে বিদেয় হও—'

নেপালবাবু হিংস্র মুখবিকৃতি করিয়া আবার গর্জন করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভিতর দিক হইতে মুকুল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিল। 'বাবা! কি করছ তুমি! চল, এক্ষুনি চল'—বলিয়া নেপালবাবুকে টানিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মুকুলের ধমক খাইয়া নেপালবাবু নির্বিবাদে তাহার সঙ্গে গেলেন।

পরিণতবয়স্ক দুই ভদ্রলোকের মধ্যে সামান্য সূত্রে এই উগ্র কলহ, আমরা যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছিলাম। এতক্ষণে লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস বেগতিক দেখিয়া নিঃসাড়ে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং ডাক্তার ভুজঙ্গধর কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। নিশানাথবাবু শিথিল দেহে বসিয়া পড়িলে তিনি সশব্দে একটি নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিতভাবে মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে আসিয়া নিশানাথের পাশের চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন,—'বেশী উত্তেজনা আপনার শরীরের পক্ষে ভাল নয় মিঃ সেন। যদি মাথার একটা ছোট্ট শিরা জখম হয় তাহলে গুরুতর কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু—। দেখি আপনার নাড়ী।'

নিশানাথ বলিলেন,—দরকার নেই, আমি ঠিক আছি।'

ডাক্তার আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া আমাদের দিকে ফিরিলেন, একে একে আমাদের নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'এ'দের সকালে দেখেছি, কিন্তু পরিচয় পাইনি।'

নিশানাথ বলিলেন,—'এ'রা বাগান দেখতে এসেছেন।'

ডাক্তার মুখের একপাশে বাঁকা হাসিলেন,—'তা মোটর রহস্যের কোনও কিনারা হল?'

আমরা চমকিয়া চাহিলাম। নিশানাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,—'ওঁরা কি জন্যে এসেছেন তুমি জানো?'

'জানি না। কিন্তু আন্দাজ করা কি এতই শক্ত? এই কাঠ-ফাটা গরমে কেউ বাগান দেখতে আসে না। তবে অন্য কী উদ্দেশ্যে আসতে পারে? কলোনীতে সম্প্রতি একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটছে। অতএব দুই আর দুয়ে চার।' বলিয়া ব্যোমকেশের দিকে সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু। কেমন, ঠিক ধরেছি কিনা?'

ব্যোমকেশ অলস কণ্ঠে বলিল,—'ঠিকই ধরেছেন। এখন আপনাকে যদি দু'-একটা প্রশ্ন করি উত্তর দেবেন কি?'

'নিশ্চয় দেব। কিন্তু আমার কেচ্ছা আপনি বোধহয় সবই শুনেছেন।'

'সব শুনিনি।'

'বেশ, প্রশ্ন করুন।'

ব্যোমকেশ সরবতের গেলাসে ছোট একটি চুমুক দিয়া বলিল,—'আপনি বিবাহিত?'

ডাক্তার প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি অবাক হইয়া চাহিলেন। তারপর ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, বিবাহিত।'

'আপনার স্ত্রী কোথায়?'

'বিলেতে।'

'বিলেতে?'

ডাক্তার তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস হাসিমুখে প্রকাশ করিলেন,—'ডাক্তারি পড়া উপলক্ষে তিন বছর বিলেতে ছিলাম, একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করেছিলাম। কিন্তু তিনি বেশী দিন কালা আদমিকে সহ্য করতে পারলেন না, একদিন আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন। আমিও দেশের ছেলে দেশে ফিরে এলাম। তারপর থেকে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।'

টেবিলের উপর হইতে সিগারেটের টিন লইয়া তিনি নির্বিকার মুখে সিগারেট ধরাইলেন। তাঁহার কথার ভাব-ভঙ্গীতে একটা মার্জিত নির্লজ্জতা আছে, যাহা একসঙ্গে আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ করে। ব্যোমকেশ বলিল,—আর একটা প্রশ্ন করব।—যে অপরাধের জন্যে আপনার ডাক্তারির লাইসেন্স খারিজ করা হয়েছিল সে অপরাধটা কি?'

ডাক্তার স্মিতমুখে ধোঁয়ার একটি সুদর্শনচক্র ছাড়িয়া বলিলেন,—'একটি কুমারীকে লোকলজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি।'

## নয়

মুস্কিল মিঞার ভ্যানে চড়িয়া আমরা স্টেশন যাত্রা করিলাম। নিশানাথবাবু ম্রিয়মান-ভাবে আমাদের বিদায় দিলেন। নেপাল গুপ্তর সঙ্গে ওই ব্যাপার ঘটিয়া যাওয়ার পর তিনি যেন কচ্ছপের মত নিজেকে সংহরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

ডাক্তার ভুজঙ্গধর আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন,—'চলুন, খানিকদূর আপনাদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'

গাড়ি ফটকের বাহির হইয়া চলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনার সব প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি, কিন্তু আমার গোড়ার প্রশ্নের জবাব আপনি দিলেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোন্ প্রশ্ন?'

'মোটর রহস্যের কিনারা হল কি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না। কিছুই ধরা-ছোঁয়া যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার কোনও ধারণা আছে না কি?'

'ধারণা একটা আছে বৈ কি। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না। আমার ধারণা যদি ভুল হয়, মিথ্যে অপবাদ দেওয়া হবে।'

'তবু বলুন না শুনি।'

'আমার বিশ্বাস এ ওই ন্যাপ্‌লা বুড়োর কাজ। ও নিশানাথবাবুকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বাইরে যেমন দাম্ভিক, ভেতরে তেমনি পেঁচালো।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুকে ভয় দেখিয়ে ওঁর লাভ কি?'

'তবে বলি শুনুন। নেপালবাবুর ইচ্ছে উনিই গোলাপ কলোনীর হর্তাকর্তা হয়ে বসেন। কিন্তু নিশানাথবাবু তা দেবেন কেন? তাই উনি নিশানাথবাবুর বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধ লাগিয়েছেন, যাকে বলে war of nerves. নিশানাথবাবুর একে রক্তের চাপ বেশী, তার ওপর যদি স্নায়ুপীড়ায় অকর্মণ্য হয়ে পড়েন, তখন নেপালবাবুই কর্তা হবেন।'

'কিন্তু নিশানাথবাবুর স্ত্রী রয়েছেন, ভাইপো রয়েছেন। তাঁরা থাকতে নেপালবাবু কর্তা হবেন কি করে?'

'অসম্ভব মনে হয় বটে, কিন্তু—অসম্ভব নয়।'

'কেন?'

'মিসেস সেন নেপালবাবুকে ভারি ভক্তি করেন।'

কথাটা ভুজঙ্গধরবাবু এমন একটু শ্লেষ দিয়া বলিলেন যে, ব্যোমকেশ চট্ করিয়া বলিল,—'তাই নাকি! ভক্তির কি বিশেষ কোনও কারণ আছে?'

ভুজঙ্গধরবাবু একপেশে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি বুদ্ধিমান লোক, আমিও একেবারে নির্বোধ নই, বেশী কথা বাড়িয়ে লাভ কি? হয়তো আমার ধারণা আগাগোড়াই ভুল। আপনি আমার মতামত জানতে চেয়েছিলেন, আমার যা ধারণা আমি বললাম। এর বেশী বলা আমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়—আচ্ছা, এবার আমি ফিরব। ওরে মুস্কিল, তোর পক্ষিরাজ একবার থামা।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা কথা। মুকুলও কি বাপের দলে?'

ডাক্তার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন,—'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে মুকুলেরও স্বার্থ আছে।'

গাড়ি থামিয়াছিল, ডাক্তার নামিয়া পড়িলেন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—'আচ্ছা, নমস্কার। আবার দেখা হবে নিশ্চয়।' বলিয়া পিছন ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের গাড়ি আবার অগ্রসর হইল। ব্যোমকেশ গুম হইয়া রহিল।

ডাক্তার ভুজঙ্গধরের আচরণ একটু রহস্যময়। তিনি নেপালবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু মুকুল বা দময়ন্তী দেবী সম্বন্ধে প্রশ্ন এড়াইয়া গেলেন কেন?...কী উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে এতদূর আসিয়াছিলেন?...তাঁহার থিওরী কি সত্য! নেপাল-বাবু মোটরের টুকরো উপহার দিতেছেন।...সুনয়না তো এখানে নাই। কিম্বা আছে, রমেনবাবু চিনিতে পারেন নাই।...মোটরের টুকরো উপহারের সহিত সুনয়নার অজ্ঞাতবাসের কি কোনও সম্বন্ধ আছে?

স্টেশনে পৌঁছিয়া টিকিট কিনিতে গিয়া জানা গেল ট্রেন আগের স্টেশনে আটকাইয়া গিয়াছে, কতক্ষণে আসিবে ঠিক নাই। ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিয়া ভ্যানের পা-দানে বসিল, নিজে একটি সিগারেট ধরাইল এবং মুস্কিল মিঞাকে একটি সিগারেট দিয়া তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল।

'কদ্দিন হল বিয়া করেছ মিঞা?'

মুস্কিল সিগারেটটিকে গাঁজার কলিকার মত ধরিয়া তাহাতে এক টান দিয়া বলিল,—'কোন্ বিয়া?'

'তুমি কি অনেকগুলি বিয়ে করেছ নাকি?'

'অনেকগুলি আর কৈ কর্তা। কেবল দুইটি।'

'তা শেষেরটিকে কবে বিয়ে করলে?'

'দ্যাড় বছর হৈল।'

'কোথায় বিয়ে করলে? দ্যাশে?'

'কলকত্তায় বিয়া করছি কর্তা। গফুর শেখ চামড়াওয়ালা—কানপুরের লোক, কলকত্তায় জুতার দোকান আছে—তার বিবির বুন হয়।'

'তবে তো বড় ঘরে বিয়ে করেছ।'

'হ। কিন্তু মুস্কিল হৈছে, উয়ারা সব পচ্ছিমা খোট্টা—বাংলা বুঝে না; অনেক কষ্টে নজর জানেরে বাংলায় তালিম দিয়া লইছি।'

'বেশ বেশ। তা তোমার আগের বৌটি মারা গেছে বুঝি?'

'মারা আর গেল কৈ? বাঁজা মনিষ্যি ছিল, মানুষটা মন্দ ছিল না। কিন্তু নতুন বৌটারে যখন ঘরে আনলাম, কর্তাবাবু কইলেন, দুটা বৌ লৈয়া কলোনীতে থাকা চলব না। কি করা! দিলাম পুরান বৌটারে তালাক দিয়া।'

এই সময় হুড়মুড় শব্দে ট্রেন আসিয়া পড়িল। মুস্কিল মিঞার সহিত রসালাপ অসমাপ্ত রাখিয়া আমরা ট্রেন ধরিলাম।

ট্রেনে উঠিয়া ব্যোমকেশ আর কথা বলিল না, অন্যমনস্কভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু রমেনবাবু, গাড়ি যতই কলিকাতার নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। আমরা দুজনে নানা গল্প করিতে করিতে চলিলাম। একবার সুনয়নার কথা উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আদালতে হলফ্ নিয়ে যদি বলতে হয়, তবে

বলব সুনয়না ওখানে নেই। কিন্তু তবুও মনের খুঁৎখুঁতুনি যাচ্ছে না।'

আমি বলিলাম,—'কিন্তু সুনয়না ছদ্মবেশে ওখানে আছে এটাই বা কি করে হয়? রাতদিন মেক্-আপ করে থাকা কি সম্ভব?'

রমেনবাবু বলিলেন,—'সুনয়না ছদ্মবেশে কলোনীতে আছে একথা আমিও বলছি না। ওখানে স্বাভাবিক বেশেই আছে। কিন্তু সে ছদ্মবেশ ধারণ করে সিনেমা করতে গিয়েছিল, আমি তাকে ছদ্মবেশে দেখেছি, এটা তো সম্ভব?'

এই সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'ঝড় আসছে!'

উৎসুকভাবে বাহিরের দিকে তাকাইলাম। কিন্তু কোথায় ঝড়! আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। সবিস্ময়ে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া দেখি সে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। বলিলাম, —'ঝড়ের স্বপ্ন দেখছ নাকি?'

সে চোখ খুলিয়া বলিল,—'এ ঝড় সে ঝড় নয়—গোলাপ কলোনীতে ঝড় আসছে। অনেক উত্তাপ জমা হয়েছে, এবার একটা কিছু ঘটবে।'

'কি ঘটবে?'

'তা যদি জানতাম তাহলে তার প্রতিকার করতে পারতাম।' বলিয়া সে আবার চোখ বুজিল।

শিয়ালদা স্টেশনে যখন পৌঁছিলাম তখন রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। রমেনবাবুর সহিত ছাড়াছাড়ি হইবার পূর্বে ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটু কষ্ট দেব। সুনয়নার দুটো স্টিল-ফটো যোগাড় করতে হবে। একটা কমলমণির ভূমিকায়, একটা শ্যামা-ঝি'র।'

রমেনবাবু বলিলেন,—'কালই পাবেন।'

## দশ

পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠ শেষ হইলে ব্যোমকেশ নিজের ভাগের কাগজ সযত্নে পাট করিতে করিতে বলিল,—'কাল চারটি স্ত্রীলোককে আমরা দেখেছি। তার মধ্যে কোন্‌টিকে সবচেয়ে সুন্দরী বলে মনে হয়?'

স্ত্রীলোকের রূপ লইয়া আলোচনা করা ব্যোমকেশের স্বভাব নয়; কিন্তু হয়তো তাহার কোনও উদ্দেশ্য আছে, তাই বলিলাম,—'দময়ন্তী দেবীকেই সবচেয়ে সুন্দরী বলতে হয়—'

'কিন্তু—'

চকিত হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু কি?'

'তোমার মনে কিন্তু আছে।' ব্যোমকেশ সহসা আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল,—'কাল রাত্রে কাকে স্বপ্ন দেখেছ?'

এবার সত্যই ঘাবড়াইয়া গেলাম,—'স্বপ্ন! কৈ না—'

'মিছে কথা বোলো না। কাকে স্বপ্ন দেখেছ?'

তখন বলিতে হইল। স্বপ্ন দেখার উপর যদিও কাহারও হাত নাই, তবু লজ্জিতভাবেই বলিলাম,—'বনলক্ষ্মীকে।'

'কি স্বপ্ন দেখলে?'

'দেখলাম, সে যেন হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকছে, আর হাসছে।—কিন্তু একটা আশ্চর্য দেখলাম, তার দাঁতগুলো যেন ঠিক তার দাঁতের মত নয়। যতদূর মনে পড়ে তার সত্যিকারের দাঁত বেশ পাটি-মেলানো। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম, কেমন যেন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো—'

ব্যোমকেশ অবাক হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'তোমার স্বপ্নেও দাঁত আছে!'

'তার মানে? তুমিও স্বপ্ন দেখেছ নাকি? কাকে?'

সে হাসিয়া বলিল,—'সত্যবতীকে। কিন্তু তার দাঁত নিজের মত নয়, অন্যরকম। তাকে জিগ্যেস করলাম, তোমার দাঁত অমন কেন? সত্যবতী জোরে হেসে উঠল, আর তার দাঁতগুলো ঝর্ ঝর্ করে পড়ে গেল।'

আমিও জোরে হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম,—'এসব মনঃসমীক্ষণের ব্যাপার। চল, গিরীন্দ্রশেখর বসুকে ধরা যাক, তিনি হয়তো স্বপ্ন-মঙ্গলের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।'

এই সময় দ্বারের কড়া নড়িল।

ব্যোমকেশ দ্বার খুলিয়া দিলে ঘরে প্রবেশ করিল বিজয়। ঠোঁট চাটিয়া বলিল,—'আমি নিশানাথবাবুর ভাইপো—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পরিচয় দিতে হবে না, বিজয়বাবু, কাল আপনাকে দেখেছি। তা কি খবর?'

বিজয় বলিল,—'কাকা চিঠি দিয়েছেন। আমাকে বললেন চিঠিখানা পেঁৗছে দিতে।'

সে পকেট হইতে একটা খাম বাহির করিয়া ব্যোমকেশকে দিল। বিজয়ের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় তাহার মন খুব সুস্থ নয়। সে রুমাল দিয়া গলার ঘাম মুছিল, একটা কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, তারপর কিছু না বলিয়াই প্রস্থানোদ্যত হইল।

ব্যোমকেশ চিঠি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'বসুন।'

বিজয় ক্ষণকাল ন যযৌ হইয়া রহিল, তারপর চেয়ারে বসিল। অপ্রতিভ হাসিয়া বলিল,—'কাল আমিও আপনাকে দেখেছিলাম, কিন্তু তখন পরিচয় জানতাম না—'

'পরিচয় কার কাছে জানলেন?'

'কাল সন্ধ্যের পর কলোনীতে ফিরে গিয়ে জানতে পারলাম। কাকা আপনাকে কোনও দরকারে ডেকেছিলেন বুঝি?'

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—'একথা আপনার কাকাকে জিগ্যেস করলেন না কেন?'

বিজয়ের মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'কাকা সব কথা আমাদের বলেন না। তবে ঐ মোটরের টুকরো নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছেন তাই বোধহয়—'

'মোটরের টুকরো সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?'

'আমার তো মনে হয় একেবারে ছেলেমানুষি। মাইলখানেক দূরে গ্রাম আছে, গ্রামের ছোঁড়ারা প্রায়ই ঐ মোটরগুলোর মধ্যে এসে খেলা করে। আমার বিশ্বাস তারাই বজ্জাতি করে মোটরের টুকরো কলোনীতে ফেলে যায়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হুঁ, আচ্ছা ওকথা যাক। প্রফেসর নেপাল গুপ্তর খবর কি?'

বিজয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে বলিল,—'কাল ফিরে গিয়ে শুনলাম নেপালবাবু কাকাকে অপমান করেছে। কাকা তাই সহ্য করলেন, আমি থাকলে—'

'নেপালবাবু কলোনীতে আছেন এখনও?'

বিজয় অন্ধকার মুখে বলিল,—'হ্যাঁ। মুকুল এসে কাকিমার হাতে পায়ে ধরেছে। কাকিমা ভালমানুষ, গলে গেছেন, কাকাকে গিয়ে বলেছেন। কাকা কাকিমার কথা ঠেলতে পারেন না—'

'তাহলে নেপালবাবু রয়ে গেলেন। লোকটি ভাল নয়, গেলেই বোধহয় ভাল হত। আচ্ছা বলুন দেখি, ওঁর মেয়েটি কেমন?'

বিজয় থমকিয়া গেল। একবার বিস্ফারিত চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া দ্রুতকণ্ঠে বলিল,—'মুকুল! বাপের মত নয়—ভালই—তবে।—আচ্ছা আজ উঠি, দেরি হয়ে গেল—দোকানে যেতে হবে। নমস্কার।'

বিজয় ত্বরিতপদে প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর ফিরিয়া আসিয়া তক্তপোষে বসিল। ভাবিতে ভাবিতে বলিল,—'বিজয় সুনয়নার ব্যাপার বোধহয় জানে না, কিন্তু মুকুলের কথায় অমন ভড়কে পালাল কেন?'

আমি বলিলাম,—'কাল ডাক্তার ভুজঙ্গধরও মুকুল সম্বন্ধে খোলসা কথা বললেন না—'

'হুঁ। এখন নিশানাথবাবু কি লিখেছেন দেখা যাক। কিন্তু তিনি চিঠি লিখলেন কেন? টেলিফোন করলেই পারতেন।'

খাম ছিঁড়িয়া চিঠি পড়িতে পড়িতে ব্যোমকেশের মুখের ভাব ফ্যাল্‌ফেলে হইয়া গেল। সে বলিল,—'ও—এই জন্য চিঠি!'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি লিখেছেন নিশানাথবাবু?'

'পড়ে দেখ' বলিয়া সে আমার হাতে চিঠি দিল।

ইংরেজী চিঠি, মাত্র কয়েক ছত্র—

প্রিয় ব্যোমকেশবাবু,

আপনাকে যে কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম সে কার্যে আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। আপনাকে যে টাকা দিয়াছি আপনার পারিশ্রমিক রূপে আশা করি তাহাই যথেষ্ট হইবে। ইতি—

ভবদীয়
নিশানাথ সেন

চিঠি হইতে মুখ তুলিয়া নিরাশ কণ্ঠে বলিলাম,—'নিশানাথবাবু হঠাৎ মত বদলালেন কেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পাছে এই প্রশ্ন তুলি তাই তিনি টেলিফোন করেননি, চিঠিতে সব চুকিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু কেন?'

'বোধহয় তাঁর ভয় হয়েছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। নিশানাথবাবুর জীবনে একটা গুপ্ত রহস্য আছে। শুনলে না, কাল রাগের মাথায় নেপাল গুপ্ত বললেন—ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি?'

'তাহলে নেপালবাবু ওঁর গুপ্ত রহস্য জানেন?'

'জানেন বলেই মনে হয়। এবং হাটে হাঁড়ি ভাঙার ভয় দেখিয়ে ওঁকে blackmail করছেন।'

'কিন্তু—কাল নিশানাথবাবু তো বেশ জোর দিয়েই বললেন, কেউ তাঁকে blackmail করছে না।'

'হুঁ—' বলিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল এবং ধূমপান করিতে করিতে চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সকালবেলাটা মন খারাপের মধ্যে দিয়া কাটিয়া গেল। একটা বিচিত্র রহস্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম, অনেকগুলা বিচিত্র প্রকৃতির মানুষের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে একটা নাটকীয় সংস্থা চোখের সম্মুখে গড়িয়া উঠিতেছিল, নাটকের প্রথম অঙ্ক শেষ হইবার পূর্বেই কে যেন আমাদের প্রেক্ষাগৃহ হইতে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিল।

বৈকালে দিবানিদ্রা সারিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ একান্তে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কিছু লিখিতেছে। আমি তাহার পিছন হইতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ডায়েরির মত একটা ছোট খাতায় ক্ষুদি ক্ষুদি অক্ষরে লিখিতেছে। বলিলাম,—'এত লিখছ কি?'

লেখা শেষ করিয়া ব্যোমকেশ মুখ তুলিল,—'গোলাপ কলোনীর পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-চিত্র তৈরি করেছি। খুব সংক্ষিপ্ত চিত্র—যাকে বলে thumbnail portrait'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কিন্তু গোলাপ কলোনীর সঙ্গে তোমার তো সম্বন্ধ ঘুচে গেছে। এখন চরিত্র-চিত্র এঁকে লাভ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'লাভ নেই। কেবল নিরাসক্ত কৌতূহল। এখন অবধান কর। যদি কিছু বলবার থাকে পরে বোলো।'

সে খাতা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল—

নিশানাথ সেন: বয়স ৫৭। বোম্বাই প্রদেশে জজ ছিলেন, কাজ ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে গোলাপ বাগান করিয়াছেন। চাপা প্রকৃতির লোক। জীবনে কোনও গুপ্ত রহস্য আছে। সুনয়না নামে জনৈকা চিত্রাভিনেত্রী সম্বন্ধে জানিতে চান। সম্প্রতি কেহ তাঁহাকে মোটরের টুকরো উপহার দিতেছে। (কেন?)

দময়ন্তী সেন: বয়স আন্দাজ ৩০। এখনও সুন্দরী। বোধহয় নিশানাথের দ্বিতীয় পক্ষ। নিপুণা গৃহিণী। কলোনীর সমস্ত টাকা ও হিসাব তাঁহার হাতে। আচার-আচরণ সম্ভ্রম উৎপাদক। দুই বছর আগে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়মিত কলিকাতা যাতায়াত করিতেন।

বিজয়: বয়স ২৬-২৭। নিশানাথের পালিত ভ্রাতুষ্পুত্র। ফুলের দোকানের ইন্-চার্জ। দোকানের হিসাব দিতে বিলম্ব করিতেছে। আবেগপ্রবণ নার্ভাস প্রকৃতি। কাকাকে ভালবাসে, সম্ভবত কাকিমাকেও। নেপালবাবুকে দেখিতে পারে না। মুকুল সম্বন্ধে মনে জট পাকানো আছে—একটা গুপ্ত রহস্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পানুগোপাল: বয়স ২৪-২৫। কান ও স্বরযন্ত্র বিকল। লেখাপড়া জানে না। নিশানাথের একান্ত অনুগত। চরিত্র বিশেষত্বহীন।

নেপাল গুপ্ত: বয়স ৫৬-৫৭। কুটিল ও কটুভাষী। প্রচণ্ড দাম্ভিক। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। এখনও এক্সপেরিমেণ্ট করেন, ফল কিন্তু বিপরীত হয়। নিশানাথকে ঈর্ষা করেন, বোধহয় নিশানাথের জীবনের কোনও লজ্জাকর গুপ্ত কথা জানেন। দময়ন্তী দেবী তাঁহাকে ভক্তি করেন। (ভয়ে ভক্তি?)

মুকুল: বয়স ১৯-২০। সুন্দরী কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। রুজ পাউডারের সাহায্যে মুখসজ্জা করিতে অভ্যস্ত। বর্তমান অবস্থার জন্য মনে ক্ষোভ আছে কিন্তু পিতার মত হঠকারী নয়। প্রায় দুই বছর পিতার সহিত কলোনীতে বাস করিতেছে।

ব্রজদাস: বয়স ৬০। নিশানাথের সেরেস্তার কেরানি ছিল, চুরির জন্য নিশানাথ তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। জেল হইতে বাহির হইয়া ব্রজদাস কলোনীতে আশ্রয় লইয়াছে। সে নাকি এখন সদা সত্য কথা বলে। লোকটিকে দেখিয়া চতুর ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়।

ভুজঙ্গধর দাস: বয়স ৩৯-৪০। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অবস্থার শোচনীয় অবনতি সত্ত্বেও মনের ফুর্তি নষ্ট হয় নাই। ধর্মজ্ঞান প্রবল নয়, লজ্জাকর দুর্নৈতিক কর্মে ধরা পড়িয়াও লজ্জা নাই। বনলক্ষ্মীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ। (কেন?) ভাল সেতার বাজাইতে পারেন। চার বছর কলোনীতে আছেন।

বনলক্ষ্মী: বয়স ২২-২৩। স্নিগ্ধ যৌবনশ্রী; যৌন আবেদন আছে—(অজিত তাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছে) কিন্তু তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না সে কুলত্যাগিনী। চঞ্চলা নয়, প্রগল্ভা নয়। কর্মকুশলা; একটু গ্রাম্য ভাব আছে। দেড় বছর আগে বিজয় তাহাকে কলোনীতে আনিয়াছে।

মুস্কিল মিঞা: বয়স ৫০। নেশাখোর (বোধহয় আফিম) কিন্তু হুঁশিয়ার লোক। কলোনীর সব খবর রাখে। তাহার বিশ্বাস কলিকাতার দোকানে চুরি হইতেছে। দেড় বছর আগে নূতন বিবি বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছে, পুরাতন বিবিকে তালাক দিয়াছে।

নজর বিবি: বয়স ২০-২১। পশ্চিমের মেয়ে, আগে বাংলা জানিত না, বিবাহের পর শিখিয়াছে। ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়া মনে হয়। কলোনীর অধিবাসীদের লজ্জা করে না, কিন্তু বাহিরের লোক দেখিলে ঘোমটা টানে।

রসিক দে: বয়স ৩৫। নিজের বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট নয়। দোকানের হিসাব লইয়া নিশানাথের সহিত গণ্ডগোল চলিতেছে। চেহারা রুগ্ন, চরিত্র বৈশিষ্ট্যহীন। (কালো ঘোড়া?)

খাতা বন্ধ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'কেমন?'

ব্যোমকেশ আমাকে বনলক্ষ্মী সম্পর্কে খোঁচা দিয়াছে, আমিও তাহাকে খোঁচা দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—'ঠিক আছে। কেবল একটা কথা বাদ গেছে। নেপালবাবু ভাল দাবা খেলেন উল্লেখ করা উচিত ছিল।'

ব্যোমকেশ আমাকে একবার ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তারপর হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, শোধ-বোধ।'

সন্ধ্যার সময় রমেনবাবুর চাকর আসিয়া একটি খাম দিয়া গেল। খামের মধ্যে দুইটি

ফটো।

ফটো দুইটি আমরা পরম আগ্রহের সহিত দর্শন করিলাম। কমলমণি সত্যই বঙ্কিম-চন্দ্রের কমলমণি, লাবণ্যে মাধুর্যে ঝলমল করিতেছে। আর শ্যামা ঝি সত্যই জবরদস্ত্ শ্যামা ঝি। দুইটি আকৃতির মধ্যে কোথাও সাদৃশ্য নাই। এবং গোলাপ কলোনীর কোনও মহিলার সঙ্গে ছবি দুইটির তিলমাত্র মিল নাই।

## এগারো

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিল টেলিফোনের শব্দে।

টেলিফোনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন, টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ কখনও কখনও ভয়ঙ্কর ভবিতব্যতার আভাস বহন করিয়া আনে। যেন তারের অপর প্রান্তে যে-ব্যক্তি টেলিফোন ধরিয়াছে, তাহার অব্যক্ত হৃদয়াবেগ বিদ্যুতের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।

বিছানায় উঠিয়া বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। দুই-তিন মিনিট পরে ব্যোমকেশ টেলিফোন রাখিয়া আমার ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখে-চোখে একটা অনভ্যস্ত ধাঁধা-লাগার আভাস; সে বলিল,—'ঝড় এসে গেছে।'

'ঝড়!'

'নিশানাথবাবু মারা গেছেন। চল, এখনি বেরুতে হবে।'

আমার মাথায় যেন অতর্কিত লাঠির ঘা পড়িল! কিছুক্ষণ হতভম্ব থাকিয়া শেষে ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম,—'নিশানাথবাবু মারা গেছেন! কি হয়েছিল?'

'সেটা এখনও বোঝা যায়নি। স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে, আবার না হতেও পারে।'

'কিন্তু এ যে বিশ্বাস হচ্ছে না। আজ মারা গেলেন?'

'কাল রাত্রে। ঘুমন্ত অবস্থায় হয়তো রক্তের চাপ বেড়েছিল, হার্টফেল করে মারা গেছেন। রাত্তিরে কেউ জানতে পারেনি, আজ সকালে দেখা গেল বিছানায় মরে পড়ে আছেন।'

'কে ফোন করেছিল?'

'বিজয়। ওর সন্দেহ হয়েছে স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। ভয় পেয়েছে মনে হল।—নাও, চটপট উঠে পড়। ট্রেনে গেলে দেরি হবে, ট্যাক্সিতে যাব।'

ট্যাক্সিতে যখন গোলাপ কলোনীর ফটকের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখনও আটটা বাজে নাই, কিন্তু সূর্যের তাপ কড়া হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

বাগান নিঝুম; মালীরা কাজ করিতেছে না। কুঠিগুলিও যেন শূন্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কোথাও জনমানব নাই।

আমরা নিশানাথবাবুর বাড়ির সম্মুখীন হইলে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। তাহার চুল এলোমেলো, গায়ে একটা চাদর, পা খালি, চোখ জবাফুলের মত লাল। ভাঙা গলায় বলিল,—'আসুন।'

বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন, আগে একবার দেখি, তারপর সব কথা শুনব।'

বিজয় আমাদের পাশের ঘরে লইয়া গেল; যে-ঘরে সেদিন দুপুরবেলা আমরা শয়ন করিয়াছিলাম সেই ঘর। জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরের একপাশে খাট, খাটের উপর সাদা চাদর-ঢাকা মৃতদেহ।

আমরা খাটের পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্যোমকেশ সন্তর্পণে চাদর তুলিয়া লইল।

নিশানাথবাবু যেন ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে কেবল সিল্কের ঢিলা পায়জামা, গায়ে জামা নাই। তাঁহার মুখের ভাব একটু ফুলো ফুলো, যেন মুখে অধিক রক্ত সঞ্চার

হইয়াছে। এ ছাড়া মৃত্যুর কোনও চিহ্ন শরীরে বিদ্যমান নাই।

নীরবে কিছুক্ষণ মৃতদেহ পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল,—'এ কি? পায়ে মোজা!'

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই—নিশানাথের পায়ের চেটো পায়জামার কাপড়ে প্রায় ঢাকা ছিল—এখন দেখিলাম সত্যই তাঁহার পায়ে মোজা। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল,—'গরম মোজা! উনি কি মোজা পায়ে দিয়ে শুতেন?'

বিজয় আচ্ছন্নের মত দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা নাড়িয়া বলিল,—'না।'

অতঃপর ব্যোমকেশ মৃতদেহের উপর আবার চাদর ঢাকা দিয়া বলিল,—'চলুন, দেখা হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছেন কি? ডাক্তারের সার্টিফিকেট তো দরকার হবে।'

বিজয় বলিল,—'মুস্কিল গাড়ি নিয়ে শহরে গেছে, ডাক্তার নগেন পাল এখানকার বড় ডাক্তার—। কি বুঝলেন, ব্যোমকেশবাবু?'

'ও কথা পরে হবে।—আপনার কাকিমা কোথায়?'

'কাকিমা অজ্ঞান হয়ে আছেন।' বিজয় আমাদের পাশের ঘরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল। পর্দা সরাইয়া দেখিলাম, ও ঘরটিও শয়নকক্ষ। খাটের উপর দময়ন্তী দেবী বিস্রস্তভাবে পড়িয়া আছেন, ডাক্তার ভুজঙ্গধর পাশে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন; মাথায় মুখে জল দিতেছেন, নাকের কাছে অ্যামোনিয়ার শিশি ধরিতেছেন।

আমাদের দেখিতে পাইয়া ভুজঙ্গধরবাবু লঘুপদে আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণগম্ভীর; স্বভাবসিদ্ধ বেপরোয়া চটুলতা সাময়িকভাবে অস্তমিত হইয়াছে। তিনি খাটো গলায় বলিলেন,—'এখনও জ্ঞান হয়নি, তবে বোধহয় শীগ্‌গিরই হবে।'

ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কথা হইতে লাগিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে আছেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'প্রায় তিন ঘণ্টা। উনিই প্রথমে জানতে পারেন। ঘুম ভাঙার পর বোধহয় স্বামীর ঘরে গিয়েছিলেন, দেখে চীৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এখনও জ্ঞান হয়নি।'

'আপনি মৃতদেহ দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আপনার কি মনে হয়? স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ডাক্তার একবার চোখ বড় করিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। পাকা ডাক্তার আসুন, তিনি যা হয় বলবেন।' বলিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আবার দময়ন্তী দেবীর খাটের পাশে গিয়া বসিলেন।

আমরা বাহিরের ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ইতিমধ্যে বৈষ্ণব ব্রজদাস বাহিরের ঘরে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া নত হইয়া নমস্কার করিলেন। তাঁহার মুখে শোকাহত ব্যাকুলতার সহিত তীক্ষ্ন উৎকণ্ঠার চিহ্ন মুদ্রিত রহিয়াছে। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'এ কি হল আমাদের! এতদিন পর্বতের আড়ালে ছিলাম, এখন কোথায় যাব?'

আমরা উপবেশন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'কোথাও যাবার দরকার হবে না বোধহয়। কলোনী যেমন চলছে তেমনি চলবে।—বসুন।'

ব্রজদাস বসিলেন না, দ্বিধাগ্রস্ত মুখে জানালায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কাল নিশানাথবাবুকে আপনি শেষ কখন দেখেছিলেন?'

'বিকেলবেলা। তখন তো বেশ ভালই ছিলেন।'

'ব্লাড্‌-প্রেসারের কথা কিছু বলেছিলেন?'

'কিছু না।'

বাহিরে মুস্কিলের গাড়ি আসিয়া থামিল। বিজয় বাহিরে গিয়া ডাক্তার নগেন্দ্র পালকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার পালের হাতে ব্যাগ, পকেটে স্টেথস্কোপ, লোকটি প্রবীণ

কিন্তু বেশ চট্‌পটে। মৃদু কণ্ঠে আক্ষেপের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করিতে করিতে বিজয়ের সঙ্গে পাশের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার কথার ভগ্নাংশ কানে আসিল,—'সব রোগের ওষুধ আছে, মৃত্যু রোগের ওষুধ নেই......'

তিনি পাশের ঘরে অন্তর্হিত হইলে ব্যোমকেশ ব্রজদাসকে জিজ্ঞাসা করিল,—'ডাক্তার পাল প্রায়ই আসেন বুঝি?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'মাসে দু' মাসে একবার আসেন। কলোনীর বাঁধা ডাক্তার। অবশ্য ভুজঙ্গধরবাবুই এখানকার কাজ চালান। নেহাৎ দরকার হলে এঁকে ডাকা হয়।'

পনরো মিনিট পরে ডাক্তার পাল বাহিরে আসিলেন। মুখে একটু লৌকিক বিষণ্ণতা। তাঁহার পিছনে বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবুও আসিলেন। ডাক্তার পাল ব্যোমকেশের প্রতি একটি চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মনে হইল তিনি বিজয়ের কাছে ব্যোমকেশের পরিচয় শুনিয়াছেন। তারপর চেয়ারে বসিয়া ব্যাগ হইতে শিরোনামা ছাপা কাগজের প্যাড্ বাহির করিয়া লিখিবার উপক্রম করিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিল,—'মাফ করবেন, আপনি কি ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখছেন?'

ডাক্তার পাল ভ্রূ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি তাহলে মনে করেন স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ডাক্তার পাল ঠোঁটের কোণ তুলিয়া একটু হাসিলেন, বলিলেন,—'স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কিছু নেই, সব মৃত্যুই অস্বাভাবিক। শরীরের অবস্থা যখন অস্বাভাবিক হয়, তখনই মৃত্যু হতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা ঠিক। কিন্তু শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থা আপনা থেকে ঘটতে পারে, আবার বাইরে থেকে ঘটানো যেতে পারে।'

ডাক্তার পালের ভ্রূ আর একটু উপরে উঠিল। তিনি বলিলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু, না? আপনি কী বলতে চান আমি বুঝেছি। কিন্তু আমি নিশানাথবাবুর দেহ ভাল করে পরীক্ষা করেছি, কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই। মৃত্যুর সময় কাল রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে। আমার বিচারে কাল রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ওঁর মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়, তারপর ঘুমন্ত অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে। যারা ব্লাড্-প্রেসারের রুগী তাদের মৃত্যু সাধারণতঃ এইভাবেই হয়ে থাকে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু ওঁর পায়ে মোজা ছিল লক্ষ্য করেছেন বোধহয়। এই দারুণ গ্রীষ্মে তিনি মোজা পরে শুয়েছিলেন একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?'

ডাক্তার পালের মুখে একটু দ্বিধার ভাব দেখা গেল। তিনি বলিলেন,—'ওটা যদিও ডাক্তারী নিদানের এলাকায় পড়ে না, তবু ভাববার কথা। নিশানাথবাবু এই গরমে মোজা পায়ে দিয়ে শুয়েছিলেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আর কেউ তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় মোজা পরিয়ে দিয়েছে তাই বা কি করে বিশ্বাস করা যায়? কেউ সে-চেষ্টা করলে তিনি জেগে উঠতেন না? আপনার কি মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আগে একটা কথা বলুন। ব্লাড্-প্রেসারের রুগী পায়ে মোজা পরলে ব্লাড্-প্রেসার বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে কি?'

ডাক্তার পাল বলিলেন,—'তা আছে। কিন্তু মাথার শিরা ছিঁড়ে মারা যাবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। বিশেষ ক্ষেত্রে মারা যেতে পারে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ডাক্তারবাবু, আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেবেন না। নিশানাথবাবুর শরীরের মধ্যে কী ঘটেছে বাইরে থেকে হয়তো সব বোঝা যাচ্ছে না। পোস্ট-মর্টেম হওয়া উচিত।'

ডাক্তার তীক্ষ্ন চক্ষে কিছুক্ষণ ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর কলমের মাথা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন,—'আপনি ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন। বেশ, তাই ভালো, ক্ষতি তো আর কিছু হবে না।' ব্যাগ হাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'আমি চললাম। থানায়

খবর পাঠাব, আর অর্টোপ্সির ব্যবস্থা করব।'

ডাক্তারকে বিদায় দিয়া বিজয় ফিরিয়া আসিল, ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

ভুজঙ্গধরবাবু তখনও ভিতর দিকের দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সদয় কণ্ঠে বলিলেন,—'বিজয়বাবু, আপনি নিজের কুঠিতে গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমি না হয় একটা সেডেটিভ্ দিচ্ছি। এ সময় ভেঙে পড়লে তো চলবে না।'

বিজয় হাতের ভিতর হইতে মুখ তুলিল না, রুদ্ধস্বরে বলিল,—'আমি ঠিক আছি।'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখে একটু ক্ষুব্ধ অসন্তোষ ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—'নিশানাথবাবুও ঐ কথা বলতেন। শরীরে রোগ পুষে রেখেছিলেন, ওষুধ খেতেন না। আমি রক্ত বার করবার জন্য পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, দরকার নেই, আমি ঠিক আছি। তার ফল দেখছেন তো?'

ব্যোমকেশ চট্ করিয়া তাঁহার দিকে ঘাড় ফিরাইল,—'তাহলে আপনিও বিশ্বাস করেন এটা স্বাভাবিক মৃত্যু?'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আমার বিশ্বাসের কোনও মূল্য নেই। আপনাদের সন্দেহ হয়েছে পরীক্ষা করিয়ে দেখুন। কিন্তু কিছু পাওয়া যাবে না।'

'পাওয়া যাবে না কি করে জানলেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু একটু মলিন হাসিলেন। 'আমিও ডাক্তার ছিলাম একদিন।' বলিয়া ধীরে ধীরে ভিতর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ব্যোমকেশ বিজয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গধরবাবু ঠিক বলেছেন, আপনার বিশ্রাম দরকার—'

বিজয় কাতর মুখ তুলিয়া বলিল,—'আমি এখন শুয়ে থাকতে পারব না ব্যোমকেশবাবু। কাকা—' তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

'তা বটে। আচ্ছা, তাহলে বলুন কাল থেকে কি কি ঘটেছে। কাল সকালে আপনি আমাকে চিঠি দিয়ে দোকানে গেলেন। ভাল কথা, আপনার কাকা আমাকে কি লিখেছিলেন আপনি জানেন?'

'না। কি লিখেছিলেন?'

'লিখেছিলেন আমার সাহায্য আর তাঁর দরকার নেই। কিন্তু ওকথা যাক। আপনি কলকাতা থেকে ফিরলেন কখন?'

'পাঁচটার গাড়িতে।'

'কাকার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?'

'কাকা বাগানে বেড়াচ্ছেন দেখেছিলাম। কথা হয়নি।'

'শেষ তাঁকে কখন দেখেছিলেন?'

'সেই শেষ, আর দেখিনি। সন্ধ্যের পর আমি এখানে আসছিলাম কাকার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে কিন্তু বাইরে থেকে শুনতে পেলাম রসিকবাবুর সঙ্গে কাকার বচসা হচ্ছে—'

'রসিকবাবু? যিনি শাকসব্জির দোকান দেখেন? তাঁর সঙ্গে কী নিয়ে বচসা হচ্ছিল?'

'সব কথা শুনতে পাইনি। কেবল কাকা বলছিলেন শুনতে পেলাম—তোমাকে পুলিসে দেব। আমি আর ভেতরে এলাম না, ফিরে গেলাম।'

'হুঁ। রাত্রে খাবার সময় কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না। আমি—সকাল সকাল খেয়ে আবার আটটার ট্রেনে কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'আবার কলকাতায় গিয়েছিলেন?' ব্যোমকেশ স্থির নেত্রে বিজয়ের পানে চাহিয়া রহিল। বিজয়ের শুষ্ক মুখ যেন আরও ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। সে একটু বিদ্রোহের সুরে বলিল,—'হ্যাঁ। আমার দরকার ছিল।'

কী দরকার ছিল এ প্রশ্ন ব্যোমকেশ করিল না। শান্তস্বরে বলিল,—'কখন ফিরলেন?'

'বারোটার পর। নিজের কুঠিতে গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ সকালে মুকুল এসে—'

'মুকুল?'

'মুকুল ভোরবেলা এদিক দিয়ে যাচ্ছিল, কাকিমার চীৎকার শুনতে পেয়ে ছুটে এসে দেখল কাকিমা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছেন আর কাকা মারা গেছেন। তখন মুকুল দৌড়ে গিয়ে আমাকে তুলল।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে সিগারেট মুখে দিতে গিয়া থামিয়া গেল, সিগারেট আবার কৌটায় রাখিতে রাখিতে বলিল,—'রসিকবাবু কোথায়?'

বিজয় বলিল,—'রসিকবাবুকে আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাঁর কুঠি খালি পড়ে আছে।'

'তাই নাকি?'

এই সময় ব্রজদাস কথা বলিলেন। তিনি এতক্ষণ জানালায় ঠেস দিয়া নীরবে সমস্ত শুনিতেছিলেন, এখন গলা খাঁকারি দিয়া বলিলেন,—'রসিকবাবু বোধহয় কাল রাত্রেই চলে গেছেন। ওঁর কুঠি আমার পাশেই, রাত্রে ওঁর ঘরে আলো জ্বলতে দেখিনি।'

বিজয় বলিল,—'তা হবে। হয়তো কাকার সঙ্গে বকাবকির পর—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হয়তো ফিরে আসবেন। কলোনীর আর সবাই যথাস্থানে আছে তো? নেপালবাবু—'

'আর সকলেই আছে।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, এবার বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয় এ সন্দেহ আপনার হল কেন?'

বিজয় বলিল,—'প্রথমে ওঁর পায়ে মোজা দেখে। কাকা শীতকালেও মোজা পরতেন না মোজা তাঁর ছিলই না। দ্বিতীয়ত, আমি ঘরে ঢুকে দেখলাম জানালা বন্ধ রয়েছে।'

'বন্ধ রয়েছে!'

'হ্যাঁ, ছিটকিনি লাগানো। কাকা কখনই রাত্রে জানালা বন্ধ করে শোননি। তবে কে জানালা বন্ধ করলে?'

'তা বটে।—বিজয়বাবু, আপনাকে একটা ঘরের কথা জিগ্যেস করছি, কিছু মনে করবেন না। আপনার কাকার জীবনে কি কোনও গোপন কথা ছিল?'

বিজয়ের চোখের মধ্যে যেন ভয়ের ছায়া পড়িল, সে অস্পষ্ট স্বরে বলিল,—'গোপন কথা! না, আমি কিছু জানি না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'না জানা আশ্চর্য নয়। হয়তো তাঁর যৌবনকালে কিছু ঘটেছিল। কিন্তু কোনও দিন সন্দেহও কি হয়নি?'

'না।' বলিয়া বিজয় ক্লান্তভাবে দু'হাতে মুখ ঢাকিল।

এই সময় দেখিলাম বৈষ্ণব ব্রজদাস কখন নিঃসাড়ে ঘর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমাদের মনোযোগ বিজয়ের দিকে আকৃষ্ট ছিল বলিয়াই বোধহয় তাঁহার নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য করি নাই।

ভিতর দিকের দ্বার দিয়া ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইলেন, খাটো গলায় বলিলেন,—'মিসেস সেনের জ্ঞান হয়েছে।'

বিজয় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া গমনোদ্যত হইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহাকে ক্ষণেকের জন্য আট্কাইলেন, বলিলেন,—'পোস্ট-মর্টেমের কথা এখন মিসেস সেনকে না বলাই ভাল।'

বিজয় চলিয়া গেল। কয়েক সেকেন্ড পরেই দময়ন্তী দেবীর ঘর হইতে মর্মান্তিক কান্নার আওয়াজ আসিল।

'কাকিমা—।'

'বাবা বিজয়—।'

ভুজঙ্গধরবাবু একটা অর্ধোচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস চাপিয়া যে-পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে ফিরিয়া গেলেন। আমরা নেপথ্য হইতে দুইটি শোকার্ত মানুষের বিলাপ শুনিতে লাগিলাম।

## বারো

হাতের ঘড়ি দেখিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সাড়ে ন'টা: এখনও পুলিস আসতে অনেক দেরি। চল একটু ঘুরে আসা যাক।'

'কোথায় ঘুরবে?'

'কলোনীর মধ্যেই এদিক ওদিক। এস।'

দু'জনে বাহির হইলাম। দময়ন্তী দেবীর কান্নাকাটির শব্দ এখনও থামে নাই। বিজয় কাকিমার কাছেই আছে। ভুজঙ্গধরবাবুও বোধহয় উপস্থিত আছেন।

আমরা সদর দরজা দিয়া বাহির হইলাম। বাঁ-হাতি পথ ধরিয়াছি, কয়েক পা যাইবার পর একটা দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া গেলাম। বাড়ির এ-পাশে কয়েকটা কামিনী ফুলের ঝাড় বাড়ির দুটি জানালাকে আংশিকভাবে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। দুটি জানালার আগেরটি নিশানাথবাবুর ঘরের জানালা, পিছনেরটি দময়ন্তী দেবীর ঘরের। দেখিলাম, দময়ন্তী দেবীর জানালার ঠিক নীচে একটি স্ত্রীলোক সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া একাগ্র ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে চকিতে মুখ তুলিল এবং সরীসৃপের মত ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়া বাড়ির পিছনে অদৃশ্য হইল।

মুস্কিলের বৌ নজর বিবি।

ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া ছিল। বলিলাম,—'দেখলে?'

ব্যোমকেশ আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া বলিল,—'জানালায় আড়ি পেতে শুনছিল।'

'কি মতলবে?'

'নিছক কৌতূহল হতে পারে। মেয়েমানুষ তো! নিশানাথবাবু মারা গেছেন অথচ ওরা বিশেষ কোনও খবর পায়নি। সরাসরি জিজ্ঞেস করবারও সাহস নেই। তাই হয়তো—'

আমার মনঃপূত হইল না। মেয়েরা কৌতূহলের বশে আড়ি পাতিয়া থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কি শুধুই কৌতূহল?

গোহালের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম পানুগোপাল নিজের কুঠির পৈঠায় বসিয়া হতাশা-ভরা চক্ষে আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। আমাদের দেখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দু' হাতে নিজের চুলের মুঠি ধরিয়া কিছু বলিতে চাহিল। তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু গলা দিয়া আওয়াজ বাহির হইল না। তারপর সে আবার বসিয়া পড়িল। এই অসহায় মানুষটি নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে কতখানি কাতর হইয়াছে একটি কথা না বলিয়াও তাহা প্রকাশ করিল।

আমরা দাঁড়াইলাম না, আগাইয়া চলিলাম। সামনের একটা মোড় ছাড়িয়া দ্বিতীয় মোড় ঘুরিয়া নেপালবাবুর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

নেপালবাবু অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় তক্তপোষে বসিয়া একটা বাঁধানো খাতায় কিছু লিখিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া দ্রুত খাতা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। চোখ পাকাইয়া আমাদের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অপ্রসন্ন স্বরে বলিলেন,—'আপনারা!'

ব্যোমকেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের পাশে বসিল, দুঃখিত মুখে মিথ্যা কথা বলিল,—'নিশানাথবাবু চিঠি লিখে নেমন্তন্ন করেছিলেন। আজ এসে দেখি—এই ব্যাপার।'

নেপালবাবু সতর্ক চক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া গলার মধ্যে একটা শব্দ করিলেন এবং অর্ধদগ্ধ সিগার ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা তো একেবারে ঘাবড়ে গেছি। নিশানাথবাবু এমন হঠাৎ মারা যাবেন ভাবতেই পারিনি।'

নেপালবাবু ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন,—'ব্লাড্‌প্রেসারের রুগী ঐভাবেই মরে। নিশানাথ বড় একগুঁয়ে ছিল, কারুর কথা শুনতো না। কতবার বলেছি—'

'আপনার সঙ্গে তো তাঁর খুবই সদ্ভাব ছিল!'

নেপালবাবু একটু দম লইয়া বলিলেন,—'হ্যাঁ, সদ্ভাব ছিল বৈকি। তবে ওর একগুঁয়েমির

জন্যে মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হত।'

'কথা কাটাকাটির কথায় মনে পড়ল। সেদিন আমাদের সামনে আপনি ওঁকে বলেছিলেন, ভাঙব নাকি হাটে হাঁড়ি! তা থেকে আমার মনে হয়েছিল, আপনি ওঁর জীবনের কোনও গুপ্তকথা জানেন।'

নেপালবাবুর এবার আর একটু ভাব-পরিবর্তন হইল, তিনি সৌহৃদ্যসূচক হাসিলেন। বলিলেন,—'গুপ্তকথা! আরে না, ও আপনার কল্পনা। রাগের মাথায় যা মুখে এসেছিল বলেছিলাম, ওর কোনও মানে হয় না।—তা আপনারা এসেছেন; আজ তো এখানে খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যবস্থাই নেই, হবে বলেও মনে হয় না। মুকুল—আমার মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হবারই কথা। উনিই তো প্রথম জানতে পারেন। খুবই শক লেগেছে। —আচ্ছা নেপালবাবু, কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করি। আপনার মেয়ের সঙ্গে কি বিজয়বাবুর কোনও রকম—'

নেপালবাবুর সুর আবার কড়া হইয়া উঠিল,—'কোনও রকম কী?'

'কোনও রকম ঘনিষ্ঠতা—?'

'কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার মেয়ে আমার নয়। তবে—প্রথম এখানে আসার কয়েকমাস পরে বিজয়ের সঙ্গে মুকুলের বিয়ের কথা তুলেছিলাম। বিজয় প্রথমটা রাজী ছিল, তারপর উল্‌টে গেল।' কিছুক্ষণ গুম হইয়া থাকিয়া বলিলেন,—'বিজয়টা ঘোর নির্লজ্জ।'

ব্যোমকেশ সঙ্কুচিতভাবে প্রশ্ন করিল,—'বিজয়বাবুর কি চরিত্রের দোষ আছে?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'দোষ ছাড়া আর কি। স্বভাবের দোষ। ভাল মেয়ে ছেড়ে যারা নষ্ট-কুলটার পেছনে ঘুরে বেড়ায় তাদের কি সচ্চরিত্র বলব?'

বিজয়-মুকুলঘটিত রহস্যটি পরিষ্কার হইবার উপক্রম করিতেছিল কিন্তু বাধা পড়িল। ভুজঙ্গধরবাবু প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—'মুকুল এখন কেমন আছে?'

নেপালবাবু বলিলেন,—'যেমন ছিল তেমনি। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটা। তুমি একবার দেখবে?'

'চলুন। কোথায় সে?'

'শুয়ে আছে।' বলিয়া নেপালবাবু তক্তপোষ হইতে উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, আমরাও তাহলে উঠি!'

নেপালবাবু উত্তর দিলেন না, ভুজঙ্গবাবুকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাতাটা তক্তপোষের উপর পড়িয়া ছিল। ব্যোমকেশ টপ্‌ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া দ্রুত পাতা উল্টাইল, তারপর খাতা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল,—'চল।'

বাহিরে রাস্তায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—'খাতায় কী দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিশেষ কিছু নয়। কলোনীর সকলের নামের ফিরিস্তি। তার মধ্যে পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীর নামের পাশে ঢ্যারা।'

'তার মানে?'

নেপালবাবু বোধহয় কালনেমির লঙ্কাভাগ শুরু করে দিয়েছেন। ওঁর ধারণা হয়েছে উনিই এবার কলোনীর শূন্য সিংহাসনে বসবেন। পানুগোপাল আর বনলক্ষ্মীকে কলোনী থেকে তাড়াবেন, তাই তাদের নামে ঢ্যারা পড়েছে। কিন্তু ওকথা যাক, মুকুল আর বিজয়ের ব্যাপার বুঝলে?'

'খুব স্পষ্টভাবে বুঝিনি। কী ব্যাপার?'

'নেপালবাবুরা কলোনীতে আসার পর মুকুলের সঙ্গে বিজয়ের মাখামাখি হয়েছিল, বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। তারপর এল বনলক্ষ্মী। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয় তার দিকে ঝুঁকল, মুকুলের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিলে।'

'ও—তাই নষ্ট-কুলটার কথা। কিন্তু বিজয়ও তো বনলক্ষ্মীর ইতিহাস জানে। প্রেম হলেও বিয়ে হবে কি করে?'

'বিজয় যদি জেনেশুনে বিয়ে করতে চায় কে বাধা দেবে?'

'নিশানাথবাবু নিশ্চয় বাধা দিয়েছিলেন।'

'সম্ভব। তিনি বনলক্ষ্মীকে স্নেহ করতেন কিন্তু তার সঙ্গে ভাইপোর বিয়ে দিতে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না।—বড় জটিল ব্যাপার অজিত, যত দেখছি ততই বেশী জটিল মনে হচ্ছে। নিশানাথবাবুর মৃত্যুতে অনেকেরই সুবিধা হবে।'

'নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয় এ বিষয়ে তুমি নিঃসংশয়?'

'নিঃসংশয়। তাঁর ব্লাড্‌-প্রেসার তাঁকে পাহাড়ের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছিল, তারপর পিছন থেকে কেউ ঠেলা দিয়েছে।'

নিশানাথবাবুর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বিজয় বলিল,—'কাকিমাকে ভুজঙ্গধরবাবু মরফিয়া ইন্‌জেকশন দিয়েছেন। কাকিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভাল। ঘুম ভাঙলে অনেকটা শান্ত হবেন। ইতিমধ্যে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করা যাবে।'

## তেরো

এগারোটার সময় পুলিস ভ্যান আসিল। তাহাতে কয়েকজন কনেস্টবল ও স্থানীয় থানার দারোগা প্রমোদ বরাট।

প্রমোদ বরাটের বয়স বেশী নয়। কালো রঙ, কাটালো মুখ, শালপ্রাংশু দেহ। পুলিসের ছাঁচে পড়িয়াও তাহার মনটা এখনও শক্ত হইয়া ওঠে নাই; মুখে একটু ছেলেমানুষী ভাব এখনও লাগিয়া আছে। করজোড়ে ব্যোমকেশকে নমস্কার করিয়া তদ্‌গত মুখে বলিল,—'আপনিই ব্যোমকেশবাবু?'

বুঝিলাম পুলিসের লোক হইলেও সে ব্যোমকেশের ভক্ত। ব্যোমকেশ হাসিমুখে তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিশানাথবাবুর মৃত্যুর সন্দেহজনক হাল বয়ান করিল। প্রমোদ বরাট একাগ্রমনে শুনিল। তারপর ব্যোমকেশ তাহাকে লইয়া মৃতের কক্ষে প্রবেশ করিল। বিজয় ও আমি সঙ্গে গেলাম।

ঘরে প্রবেশ করিয়া বরাট দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল এবং চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। এই সময় মেঝের উপর একটা লঘু গোলক বাতাসে গড়াইতে গড়াইতে যাইতেছে দেখিয়া বরাট নত হইয়া সেটা কুড়াইয়া লইল। খড়, শুকনা ঘাস, শণের সুতো মিশ্রিত একটি গুচ্ছ। বরাট বলিল,—'এটা কি? কোত্থেকে এল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'চড়াই পাখির বাসা। ঐ দেখুন, ওখান থেকে খসে পড়েছে।' বলিয়া ঊর্ধ্বে পাখা ঝুলাইবার আংটার দিকে দেখাইল। দেখা গেল চড়াই পাখিরা নির্বিকার, শূন্য আংটায় আবার বাসা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

খড়ের গোলাটা ফেলিয়া দিয়া বরাট মৃতদেহের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং চাদর সরাইয়া মৃতদেহের উপর চোখ বুলাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'পায়ে মোজা দেখছেন? ঐটেই সন্দেহের মূল কারণ। আমি মৃতদেহ ছুঁইনি. পুলিসের আগে মৃতদেহ স্পর্শ করা অনুচিত হত। কিন্তু মোজার তলায় কী আছে, পায়ে কোনও চিহ্ন আছে কিনা জানা দরকার।'

'বেশ তো, এখনই দেখা যেতে পারে' বলিয়া বরাট মোজা খুলিয়া লইল। ব্যোমকেশ ঝুঁকিয়া পায়ের গোছ পর্যবেক্ষণ করিল। আপাতদৃষ্টিতে অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় পায়ের গোছের কাছে অল্প দাগ রহিয়াছে; মোজার উপর ইল্যাস্টিক গার্টার পরিলে যে-রকম দাগ হয় সেই রকম।

দাগ দেখিয়া ব্যোমকেশের চোখ জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল; সে বরাটকে বলিল,—'দেখলেন?'

বরাট বলিল,—'হ্যাঁ। বাঁধনের দাগ মনে হয়। কিন্তু এ থেকে কী অনুমান করা যেতে

পারে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অন্তত এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, নিশানাথবাবু মৃত্যুর পূর্বে নিজে মোজা পরেননি, আর কেউ পরিয়েছে।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু কেন? এর থেকে কি মনে হয়? আপনি বুঝতে পেরেছেন?'

'বোধহয় পেরেছি। কিন্তু যতক্ষণ শব পরীক্ষা না হচ্ছে ততক্ষণ কিছু না বলাই ভাল। আপনি মৃতদেহ নিয়ে যান। ডাক্তারকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে বলবেন গায়ে কোথাও হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের চিহ্ন আছে কিনা।'

'বেশ।'

আমরা আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। বরাট কনেস্টবলদের ডাকিয়া মৃতদেহ ভ্যানে তুলিবার হুকুম দিল। বিজয় এতক্ষণ কোনও মতে নিজেকে শক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, এখন মুখে হাত চাপা দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ কোমল স্বরে বলিল,—'আপনার আজ আর সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই, আমরা যাচ্ছি। আপনি বরং কাল সকালে যাবেন।—কি বলেন, ইন্সপেক্টর বরাট?'

বরাট বলিল,—'সেই ভাল। কাল সকালের আগে রিপোর্ট পাওয়া যাবে না। আমি কাল সকালে ওঁকে নিয়ে আপনার বাসায় যাব।'

'বেশ। চলুন তাহলে। আপনার ভ্যানে আমাদের জায়গা হবে তো?'

'হবে। আসুন।'

ব্যোমকেশ বিজয়ের পিঠে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে আশ্বাস দিল, তারপর আমরা দ্বারের দিকে পা বাড়াইলাম। এই সময় ভিতরের দরজার সম্মুখে বনলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ শুষ্ক শ্রীহীন, পরনের ময়লা শাড়ির আঁচলে কালি ও হলুদের ছোপ। আমাদের সহিত চোখাচোখি হইতে সে বলিল,—'রান্না হয়েছে। আপনারা খেয়ে যাবেন না?'

ব্যোমকেশ বলিয়া উঠিল,—'রান্না! কে রাঁধলে?'

বনলক্ষ্মী চোখ নামাইয়া সঙ্কুচিত স্বরে বলিল,—'আমি।'

তাহার আঁচলে কালি ও হলুদের দাগ, অনভ্যস্ত রন্ধনক্রিয়ার চিহ্ন। যাক, তবু কলোনীর একজন মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াছে, যত মর্মান্তিক ঘটনাই ঘটুক এতগুলো লোকের আহার চাই তাহা সে ভোলে নাই। দেখিলাম, বিজয় মুখ তুলিয়া একদৃষ্টে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিয়া আছে, যেন তাহাকে এই নূতন দেখিল।

ব্যোমকেশ বলিল—'আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। খাওয়া থাক। এমনিতেই আপনাদের কষ্টের শেষ নেই, আমরা আব হাঙ্গামা বাড়াব না। আপনি বরং এ'দের ব্যবস্থা করুন।' বলিয়া বিজয়ের দিকে ইঙ্গিত করিল।

বনলক্ষ্মী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, ভারী গলায় বলিল,—'চলুন, স্নান করে নেবেন।'

আমরা বাহির হইলাম।

পুলিস ভ্যান একটি শবদেহ ও কয়েকটি জীবন্ত মানুষ লইয়া কলিকাতাব অভিমুখে চলিল।

পথে বেশী কথা হইল না। এক সময় ব্যোমকেশ বলিল,—'রসিক দে নামে একটি লোক কলোনীতে থাকত, কাল থেকে সে নিরুদ্দেশ। খুব সম্ভব দোকানের টাকা চুরি করেছে। তার খোঁজ নেবেন। তার হাতের আঙুল কাটা। খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।'

বরাট নোটবুকে লিখিয়া লইল।

ঘণ্টাখানেক পরে বাসার সম্মুখে আমাদের নামাইয়া দিয়া পুলিস ভ্যান চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন মনটা বিভ্রান্ত হইয়া রহিল। নিশানাথবাবুর ছায়ামূর্তি মনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিকালবেলা তিনটার সময় দেখিলাম ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া বাহির হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কোথায়?'

সে বলিল,—'একটু খোঁজ-খবর নিতে বেরুচ্ছি।'

'কার খোঁজ-খবর?'

'কারুর ওপর আমার পক্ষপাত নেই, কলোনীর অধিবাসীদের যার খবর পাব যোগাড় করব। আপাতত দেখি ডাক্তার ভুজঙ্গধর আর লাল সিং সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করতে পারি কিনা।'

'লাল সিংকে ভোলোনি?'

'কাউকে ভুলিনি।' বলিয়া ব্যোমকেশ নিষ্ক্রান্ত হইল।

সে বাহির হইবার আধ ঘণ্টা পরে টেলিফোন আসিল। বিজয় কলোনী হইতে টেলিফোন করিতেছে। ওদিকের খবর ভালই, দময়ন্তী দেবী এখনও জাগেন নাই। অন্য খবরের মধ্যে ব্রজদাস গোঁসাইকে পাওয়া যাইতেছে না, দ্বিপ্রহরে আহারের পূর্বেই তিনি অন্তর্ধান করিয়াছেন।

অভিনব সংবাদ। প্রথমে রসিক দে, তারপর বৈষ্ণব বাবাজী! ইনিও কি কলোনীর টাকা হাত সাফাই করিতেছিলেন?

ব্যোমকেশ ফিরিলে সংবাদ দিব বলিয়া টেলিফোন ছাড়িয়া দিলাম।

সন্ধ্যার প্রক্কালে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নামিল। যেন অনেকদিন একজ্বরী ভোগ করিবার পর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। ব্যোমকেশ রৌদ্রের জন্য ছাতা লইয়া বাহির হইয়াছে, বৃষ্টিতেও ছাতা কাজে আসিবে।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় ব্যোমকেশ ফিরিল। জামা ভিজিয়া গোবর হইয়াছে, ছাতাটার অবস্থা ঝোড়ো কাকের মত; সেই অবস্থায় চেয়ারে বসিয়া পরম তৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল। তারপর গলা চড়াইয়া হাঁকিল,—'পুঁটিরাম, চা নিয়ে এস।'

তাহাকে বিজয়ের বার্তা শুনাইলাম। সে কিছুক্ষণ অন্যমনে রহিল, শেষে বলিল,—'একে একে নিভিছে দেউটি। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত মুস্কিল মিঞা ছাড়া আর কেউ থাকবে না। কিন্তু বাবাজী এত দেরীতে পালালেন কেন? পোস্ট-মর্টেমের নাম শুনে ঘাবড়ে গেছেন?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তারপর তোমার কি হল? ভুজঙ্গধরবাবুর খবর পেলে?'

'নতুন খবর বড় কিছু নেই। তিনি যা যা বলেছিলেন সবই সত্যি। চীনেপাটিতে তাঁর ডিসপেন্সারি আর নার্সিং হোম ছিল। অনেক রোজগার করতেন! তারপরই দুর্মতি হল।'

'আর লাল সিং?'

ব্যোমকেশ ভিজা জামা খুলিয়া মাটিতে ফেলিল,—'লাল সিং বছর দুই আগে জেলে মারা গেছে। তার স্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু চিঠি ফিরে এসেছে। স্ত্রীর পাত্তা কেউ জানে না।'

বাহিরে বৃষ্টি চলিতেছে; চারিদিক ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পুঁটিরাম চা আনিয়া দিল। ব্যোমকেশ চায়ে একটি ক্ষুদ্র চুমুক দিয়া বলিল,—'এই বৃষ্টিটা যদি কাল রাত্তিরে হত তাহলে নিশানাথবাবুর মোজা পরার একটা মানে পাওয়া যেত, মনে হত উনি নিজেই মোজা পরেছেন। অন্তত সম্ভাবনাটা বাদ দেওয়া যেত না। ভাগ্যিস কাল বৃষ্টি হয়নি!'

## চৌদ্দ

পরদিন সকালবেলা বরাট ও বিজয় আসিল। বিজয়ের পা খালি, অশৌচের বেশ। ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসিল।

ব্যোমকেশ বরাটের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল,—'কৈ, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট দেখি।'

বোতাম-আঁটা পকেট খুলিতে খুলিতে বরাট বলিল,—'পরিষ্কার রিপোর্ট; সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি। রক্তে কোনও বিষ বা ওষুধের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। মাথার মধ্যে

হেমারেজ্ হয়ে মারা গেছেন!'

'হাইপোডারমিক সিরিঞ্জের দাগ নেই?'

'কনুইয়ের কাছে শিরের ওপর ছুঁচ ফোটানোর কয়েকটা দাগ আছে কিন্তু সেগুলো দু'তিন মাসের পুরানো।'

'আর পায়ের দাগ?'

'ডাক্তার বলেন ও-দাগের সঙ্গে মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।'

বরাট রিপোর্ট বাহির করিয়া দিল। ব্যোমকেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পড়িল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া রিপোর্ট বরাটকে ফেরত দিয়া বলিল,—'দেহ থেকে কিছু পাওয়া যাবে আমার মনে করাই অন্যায় হয়েছিল।'

বরাট বলিল,—'তাহলে কি সোজাসুজি ব্লাড-প্রেসার থেকে মৃত্যু বলেই ধরতে হবে?'

'কখনই না। হত্যাকারী ব্লাড্-প্রেসারের সুযোগ নিয়েছে, তাই হত্যার কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কিন্তু—কিভাবে সুযোগ নিয়েছে বুঝতে পারছি না। আমাকে যদি তদন্ত চালাতে হয় তাহলে ধরা-ছোঁয়া যায় এমন একটা কিছু চাই তো। আপনি কাল বলেছিলেন মোজা পরার কারণ বুঝতে পেরেছেন। কী বুঝতে পেরেছেন আমায় বলুন।'

বিজয় এতক্ষণ আঙ্গুল দিয়া কপালের দুই পাশ টিপিয়া নির্জীবভাবে বসিয়াছিল, এখন চোখ তুলিয়া ব্যোমকেশের পানে চাহিল। ব্যোমকেশও তাহার পানে চাহিয়া একটু যেন ইতস্তত করিল। তারপর বলিল,—'সব প্রমাণ আপনাদের চোখের সামনে রয়েছে। কিছু অনুমান করতে পারছেন না?'

বরাট বলিল,—'না, আপনি বলুন!'

'চড়াই পাখির বাসা মেঝেয় পড়েছিল, তা থেকে কিছু ধরতে পারলেন না?'

'না।'

ব্যোমকেশ আবার একটু ইতস্তত করিল। 'বড় বীভৎস মৃত্যু' বলিয়া সে বিজয়ের দিকে সসঙ্কোচ দৃষ্টিপাত করিল।

বিজয় চাপা গলায় বলিল,—'তবু আপনি বলুন।'

ব্যোমকেশ তখন ধীরে ধীরে বলিল,—'আপনাদের বলছি, কিন্তু কথাটা যেন চাপা থাকে।—নিশানাথবাবুর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠের আংটা থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ব্লাড্-প্রেসার ছিলই, তার ওপর শরীরের সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে মাথায় চাপ দিয়েছিল। মাথার শিরা ছিঁড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হল। তারপর তাঁকে নামিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। কিন্তু আমাদের ভাগ্যবশে মোজা খুলে নিয়ে যেতে ভুলে গেল। চতুর অপরাধীরাও ভুল করে, নইলে তাদের ধরবার উপায় থাকত না।'

আমরা স্তম্ভিত হতবাক্ হইয়া রহিলাম। বিজয়ের গলা দিয়া একটা বিকৃত আওয়াজ বাহির হইল। দেখিলাম, তাহার মুখ ছাইবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বরাট প্রথম কথা কহিল,—'কী ভয়ানক! এখন বুঝতে পারছি, পাছে পায়ে দড়ির দাগ হয় তাই মোজা পরিয়েছিল। আংটায় দড়ি পরাবার সময় চড়াই পাখির বাসা খসে পড়েছিল —ঘরে একটা টুল আছে, তাতে উঠে আংটায় দড়ি পরাবার কোনই অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যোমকেশবাবু, একটা কথা। এত ব্যাপারেও নিশানাথবাবুর ঘুম ভাঙল না?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথবাবু বোধহয় জেগেই ছিলেন। রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে এই ব্যাপার হয়েছিল। কাল ডাক্তার পাল তাই বলেছিলেন, রিপোর্ট থেকেও তাই পাওয়া যাচ্ছে।'

'তবে?'

জানা লোক নিশানাথবাবুকে খুন করেছে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম হত্যাকারী ইন্জেকশন দিয়ে প্রথমে তাঁকে অজ্ঞান করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছে। আজকাল এমন অনেক ইন্জেকশন বেরিয়েছে যাতে দু' মিনিটের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে যায় অথচ রক্তের

মধ্যে ওষুধের কোনও চিহ্ন থাকে না—যেমন Sodium Pentothal. কিন্তু শরীরে যখন ছুঁচ ফোটানোর দাগ পাওয়া যায়নি তখন বুঝতে হবে সাবেক প্রথা অনুসারেই নিশানাথবাবুকে অজ্ঞান করা হয়েছিল।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ স্যান্ড ব্যাগ্। ঘাড়ের উপর মোলায়েম হাতে এক ঘা দিলেই অজ্ঞান হয়ে যাবে, অথচ ঘাড়ে দাগ থাকবে না।'

কিছুক্ষণ সকলে নীরব রহিলাম। তারপর বিজয় পাংশু মুখ তুলিয়া বলিল,—'কিন্তু কে? কেন?'

তাহার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝিয়া ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'তা এখনও জানি না। আর একটা কথা বুঝতে পারছি না, মিসেস সেন রাত্রি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে নিশ্চয় পাশের ঘরে ছিলেন। তিনি কিছু জানতে পারলেন না?'

বিজয় নিজের অজ্ঞাতসারে উঠিয়া দাঁড়াইল, স্খলিতকণ্ঠে বলিল,—'কাকিমা! না. না, তিনি কিছু জানেন না—তিনি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন—'

আমরা অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়া আছি দেখিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কথা যাক। যথা-সময়ে সব প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাবে। আপাতত একটা কথা বলুন তো, নিশানাথবাবুর উত্তরাধিকারী কে?'

বিজয় উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিল,—'আমি আর কাকিমা—সমান ভাগ।'

ব্যোমকেশ ও বরাটের মধ্যে একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বরাট উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল,—'আজ তাহলে ওঠা যাক। বিজয়বাবুর এখনও অনেক কাজ, মৃতদেহ সংকার করতে হবে.—'

সকলে উঠিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'ওবেলা আমরা একবার কলোনীতে যাব। ভাল কথা. রসিক দে'র খবর পাওয়া গেল?'

বরাট বলিল,—'আমি লোক লাগিয়েছি। এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি।'

ব্যোমকেশ বিজয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—'ব্রজদাস বাবাজী ফিরে আসেনি?'

বিজয় মাথা নাড়িল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ইন্সপেক্‌টর বরাট, আপনার একজন খদ্দের বাড়ল। ব্রজদাসেরও খোঁজ নেবেন।'

বরাট লিখিয়া লইতে লইতে বলিল,—'ওদিকে যখন যাবেন থানায় একবার আসবেন নাকি?'

'যাব।'

তাহারা প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ প্রায় আধ ঘণ্টা ঘাড় গুঁজিয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল। আমি দুটো সিগারেট শেষ করিবার পর নীরবতার মৌন উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম,—'বিজয়কে কী মনে হয়? অভিনয় করছে নাকি?'

ব্যোমকেশ ঘাড় তুলিয়া বলিল,—'এ যদি ওর অভিনয় হয়, তাহলে ওর মত অভিনেতা বাংলা দেশে নেই।'

'তাহলে কাকার মৃত্যুতে সত্যি শোক পেয়েছে। কাকিমাকেও ভালবাসে মনে হল।'

'হুঁ। এবং সেজন্যেই ওর ভয় হয়েছে।'

কিছুক্ষণ কাটিবার পর আবার প্রশ্ন করিলাম,—'আচ্ছা, মোটরের টুকরো পাঠানোর সঙ্গে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর কি কোনও সম্বন্ধ আছে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।'

'লাল সিং তো দু' বছর আগে মরে গেছে। নিশানাথবাবুকে তবে মোটরের টুকরো পাঠাচ্ছিল কে?'

'তা জানি না। কিন্তু একটা ভুল কোরো না। মোটরের টুকরোগুলো যে নিশানাথ-বাবুর উদ্দেশ্যেই পাঠানো হচ্ছিল তার কোনও প্রমাণ নেই। তিনি নিজে তাই মনে করেছিলেন

বটে, কিন্তু তা না হতেও পারে।'

'তবে কার উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছিল?'

ব্যোমকেশ উত্তর দিল না। দুই-তিন মিনিট অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলাম উত্তর দিবে না, তখন অন্য প্রশ্ন করিলাম,—'সুনয়না-উপাখ্যানের সঙ্গে নিশানাথবাবুর মৃত্যুর যোগাযোগ আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'থাকলেও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মুরারি দত্তকে মেরেছিল সুনয়না নিকোটিন বিষ খাইয়ে। নিশানাথবাবুকে মেরেছে পুরুষ।'

'পুরুষ?'

'হ্যাঁ। নিশানাথবাবু লম্বা-চওড়া লোক ছিলেন না, তবু তাঁকে দড়ি দিয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া একজন স্ত্রীলোকের কর্ম নয়।'

'তা বটে। কিন্তু মোটিভ কি হতে পারে?'

ব্যোমকেশ উঠিয়া আলস্য ভাঙিল।

'আমাকে নিশানাথবাবু ডেকেছিলেন, এইটেই হয়তো সবচেয়ে বড় মোটিভ!' বলিয়া সে সিগারেট ধরাইয়া স্নানঘরের দিকে চলিয়া গেল।

## পনরো

সায়াহ্নে মোহনপুরের স্টেশনে যখন পেঁছিলাম তখনও গ্রীষ্মের বেলা অনেকখানি বাকি আছে। স্টেশনের প্রাঙ্গণে বাহির হইয়া দেখি কলোনীর গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, মুস্কিল মিঞা পা-দানে বসিয়া বিড়ি টানিতেছে।

মুস্কিলকে এ কয়দিন দেখি নাই, সে যেন আর একটু বুড়ো হইয়া গিয়াছে, আরও ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। সেলাম করিয়া বলিল,—'বিজয়বাবু আপনাগোর জৈন্য গাড়ি পাঠাইয়াছেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ওরা ঘাট থেকে ফিরেছে তাহলে?'

মুস্কিল বলিল,—'হ—ফিরছেন।'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'নতুন খবর কিছু আছে নাকি?'

মুস্কিল নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'আর নূতন খবর কী কর্তা। সব তো শেষ হইয়া গিছে।'

'তা বটে। চল—কিন্তু একবার থানা হয়ে যেতে হবে।'

'চলেন।—কর্তাবাবুর নাকি ময়না তদন্ত হৈছে?'

'হ্যাঁ। তুমি খবর পেলে কোত্থেকে?'

'শুন্ গুন্ কানে আইল। তা ময়না তদন্তে কী জানা গেল? সহজ মৃত্যু নয়?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা পাশ কাটাইয়া গেল, বলিল,—'সে কথা ডাক্তার জানেন। মুস্কিল মিঞা, তুমি তো আফিম খেয়ে ঝিমোও, তুমি এত খবর পাও কি করে?'

মুস্কিলের মুখে একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দিল, সে বলিল,—'আমি ঝিমাইলে কি হৈব কর্তা, আমার বিবিজানডার চারটা চোখ চারটা কান। তার চোখ কান এড়ায়া কিছু হৈবার বো নাই। আমি সব খবর পাই। একটা কিছু যে ঘটবো তা আগেই বুঝছিলাম।'

'কি করে বুঝলে?'

মুস্কিল একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ আক্ষেপভরে হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিল,—'মেইয়া মানুষ লইয়া লট্‌খট্। রাতের আঁধারে এ উয়ার ঘরে যায়, ও ইয়ার ঘরে যায়—ই সব নষ্টামিতে কি ভাল হয় কর্তা? হয় না।'

বিস্মিতস্বরে ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কার ঘরে যায়?'

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া মুস্কিল একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, বলিল,—'কারে বাদ

দিমু কর্তা? মেইয়া লোকগুলাই দুষ্ট হয় বেশী, মরদের সর্বনাশের জৈন্যাই তো খোদা উয়াদের বানাইছেন।'

'মানে...তুমি বলতে চাও রাত্রে কলোনীর মেয়েরা লুকিয়ে পুরুষদের ঘরে যায়। কে কার ঘরে যায় বলতে পার?'

'তা কেমনে কৈব কর্তা? আঁধারে কি কারো মুখ দেখা যায়। তবে ভিতর ভিতর নষ্টামি চলছে। এখন কর্তাবাবু নাই, বড়বিবিও সাদাসিদা মেইয়া, এখন তো হদ্দ বাড়াবাড়ি হৈব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'মেয়েরা কারা তা না হয় বলতে পারলে না, কিন্তু কার ঘরে যায় সেটা তো বলতে পার।'

মুস্কিল একটু অধীরস্বরে বলিল,—'কি মুস্কিল, সেটা আন্দাজ কৈরা লন না। মেইয়া লোক জোয়ান মরদের ঘরে যাইব না তো কি বুড়ার ঘরে যাইব?'

মুস্কিল মিঞার জীবন-দর্শনে মার-প্যাঁচ নাই। মনে মনে হিসাব করিলাম, জোয়ান মরদের মধ্যে আছে বিজয়, রসিক, পানুগোপাল। ডাক্তার ভুজঙ্গধরকেও ধরা যাইতে পারে।

ব্যোমকেশ আর প্রশ্ন করিল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—'চল, এবার যাওয়া যাক। থানা কতদূর?'

'কাছেই, রাস্তায় পড়ে।' মুস্কিল চালকের আসনে উঠিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিল।

থানায় উপস্থিত হইলে প্রমোদ বরাট আমাদের খাতির করিয়া নিজের কুঠুরিতে বসাইল এবং সিগারেটের টিন খুলিয়া ধরিল। ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—'নিশানাথবাবুকে কেউ খুন করেছে এ প্রত্যয় আপনার হয়েছে?'

বরাট বলিল,—'আমার হয়েছে, কিন্তু কর্তারা তানানানা করছেন। তাঁরা বলেন, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে যখন কিছু পাওয়া যায়নি তখন ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ কি! আমি কিন্তু ছাড়ছি না, লেগে থাকব।—আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সন্দেহ এখনও কারুর ওপর পড়েনি। কিন্তু এই ঘটনার একটা পটভূমিকা আছে, সেটা আপনার জানা দরকার। বলি শুনুন।' বলিয়া সুনয়না ও মোটরের টুকরা সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিবৃত করিল।

শুনিয়া বরাট উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,—'ঘোরালো ব্যাপার দেখছি।—আমাকে কী করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপাতত দুটো কাজ করা দরকার। এক, কলোনীর সকলের হাতের টিপ নিতে হবে—'

'তাতে কী লাভ?'

'ওটা থাকা ভাল। কখন কি কাজে লাগবে বলা যায় না।'

বরাট একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'কাজটা ঠিক আইনসঙ্গত হবে কিনা বলতে পারি না, তবু আমি করব। দ্বিতীয় কাজ কী?'

'দ্বিতীয় কাজ, আমরা কলোনীতে যাচ্ছি, আপনিও চলুন। আপনার সামনে আমি কলোনীর প্রত্যেককে প্রশ্ন করব, আপনি শুনবেন এবং দরকার হলে নোট করবেন।'

'কী ধরনের প্রশ্ন করবেন?'

'আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য হবে, সে-রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে কে কোথায় ছিল, কার অ্যালিবাই আছে কার নেই, এই নির্ণয় করা।'

'বেশ, চলুন তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক, কাজ সেরে ফিরতে রাত হবে।'

টিপ লইবার সরঞ্জামসহ একজন হেড্ কনেস্টবল আমাদের সঙ্গে চলিল।

সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় কলোনীতে পৌঁছিলাম। গত রাত্রির বর্ষণ এখানেও মাটি ভিজাইয়া দিয়া গিয়াছে। বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিজয়ের সহিত কথা বলিতেছিলেন। বিজয়ের মুখে এখনও শ্মশানবৈরাগ্যের ছায়া লাগিয়া আছে। ভুজঙ্গধর-বাবুর মুখ কিন্তু প্রফুল্ল, তাঁহার মুখে অম্লরসাক্ত একপেশে হাসি আবার ফিরিয়া

আসিয়াছে।

আমাদের সঙ্গে প্রমোদ বরাট ও কনস্টেবলকে দেখিয়া বিজয়ের চোখে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল। ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আসুন। বিজয়বাবুকে মোহমুদ্গর শোনাচ্ছি—কা তব কান্তা—নলিনীদলগত-জলমতিতরলং—'

তাঁহার লঘুতা সময়োচিত নয়; মনে হইল বিজয়ের মন প্রফুল্ল করিবার জন্য তিনি আধিক্য দেখাইতেছেন।

বরাট পুলিসী গাম্ভীর্যের সহিত বলিল,—'আপনাদের সকলের হাতের টিপ দিতে হবে।'

বিজয়ের চোখের প্রশ্ন আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, ভুজঙ্গধরবাবুও চকিতভাবে চাহিলেন। ব্যোমকেশ ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিল,—'কলোনী থেকে যে-ভাবে একে একে লোক খসে পড়ছে, বাকিগুলি কতদিন টিকে থাকবে বলা যায় না। তাই সতর্কতা।'

বিজয় বলিল,—'বেশ তো—নিন।' তাহার চোখের দৃষ্টি নীরবে প্রশ্ন করিতে লাগিল,—কেন? নতুন কিছু পাওয়া গেছে কি?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আশা করি কারুর আপত্তি হবে না। কারণ যিনি আপত্তি করবেন স্বভাবতই তাঁর উপর সন্দেহ হবে। ভুজঙ্গধরবাবু, আপনার আপত্তি নেই তো?'

'বিন্দুমাত্র না। আসুন—' বলিয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠ বাড়াইয়া দিলেন।

বরাট কনেস্টবলকে ইঙ্গিত করিল, কনেস্টবল অঙ্গুষ্ঠের ছাপ তুলিতে প্রবৃত্ত হইল। ভুজঙ্গধরবাবু বাঁকা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'দেখছি আমি ভুল করেছিলাম। আঙুলের ছাপ যখন নেওয়া হচ্ছে তখন লাস পরীক্ষায় কিছু পাওয়া গেছে।'

তাঁহার এই অর্ধ-প্রশ্নের জবাব কেহ দিল না। কাগজের উপর তাঁহার ও বিজয়ের নাম ও ছাপ লিখিত হইলে ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আর কার কার ছাপ নিতে হবে বলুন, আমি কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

বরাট বলিল,—'সকলের ছাপই নিতে হবে। মেয়ে পুরুষ কেউ বাদ যাবে না।'

'মিসেস সেনেরও?'

'হ্যাঁ, মিসেস সেনেরও।'

'বেশ—আও সিপাহী।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর একটা কথা। টিপ নেবার সময় সকলকে বলে দেবেন যেন আধ ঘণ্টা পরে এই বাড়িতে আসেন। দু'চারটে প্রশ্ন করব।'

ভুজঙ্গধরবাবু কনেস্টবলকে লইয়া চলিয়া গেলেন। আমরা বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলাম। বিজয় আলো জ্বালিয়া দিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, এবার আপনি আমাদের সওয়াল জবাবের একটা জায়গা করে দিন।'

বিজয় বলিল,—'কি করতে হবে বলুন, করে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'এ ঘরটা হোক ওয়েটিং রুম—যাঁরা সাক্ষী দিতে আসবেন তাঁরা এ ঘরে বসবেন। আর পাশের ঘরে আমরা বসব, প্রত্যেককে আলাদা ডেকে প্রশ্ন করা হবে। কি বলেন ইন্সপেক্টর বরাট?'

বরাট বলিল,—'সেই ঠিক হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে বিজয়বাবু, ও ঘরে একটা টেবিল আর গোটাকয়েক চেয়ার আনিয়ে দিন। আর কিছুর দরকার হবে না।'

বিজয় চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করিতে গেল। পনরো মিনিট পরে ভুজঙ্গধরবাবু কনেস্টবলসহ ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন,—'এই নিন; টিপ সই হয়ে গেছে। ন্যাপ্‌লো একটু গোলমাল করবার তালে ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল।—সকলকে বলে দিয়েছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবে। আমিও আসছি হাত-মুখ ধুয়ে।' বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

## ষোল

নিশানাথ যে-কক্ষে শয়ন করিতেন সেই কক্ষে টেবিল পাতা হইয়াছে। টেবিলের দুই পাশে দুইটি চেয়ারে ব্যোমকেশ ও বরাট, মাঝে একটি খালি চেয়ার। আমি দ্বারের কাছে টুল লইয়া বসিয়াছি, দুই ঘরের দিকেই আমার দৃষ্টি আছে। মাথার উপর উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলিতেছে।

প্রথমে দময়ন্তী দেবীকে ডাকা হইল। বিজয় তাঁহার হাত ধরিয়া ভিতরের ঘর হইতে লইয়া আসিল, তিনি শূন্য চেয়ারটিতে বসিলেন। বিধবার বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, মাথায় সিঁদুর নাই, সুন্দর মুখখানিতে মোমের মত ঈষদচ্ছ পাণ্ডুরতা। তিনি নতনেত্রে স্থির হইয়া রহিলেন।

বিজয় চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার দুই কাঁধের উপর হাত রাখিল, বলিল,—আমি যদি এখানে থাকি আপনাদের আপত্তি হবে কি?'

ব্যোমকেশ একটু অনিচ্ছাভরে বলিল,—'থাকুন।' তারপর কোমলকণ্ঠে দময়ন্তী দেবীকে দুই-চারিটি সহানুভূতির কথা বলিয়া শেষে বলিল,—'আমরা আপনাকে বেশী কষ্ট দেব না, শুধু দু'চারটে প্রশ্ন করব যার আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তর দিতে পারবে না—আপনাদের বিয়ে হয়েছিল কতদিন আগে?'

দময়ন্তী দেবীর নত চক্ষু ব্যোমকেশের মুখ পর্যন্ত উঠিয়া আবার নামিয়া পড়িল। করুণ মিনতিভরা দৃষ্টি, তবু যেন তাহার মধ্যে একটা সংকল্প রহিয়াছে। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন,—'দশ বছর আগে।'

অতঃপর নিম্নরূপ সওয়াল জবাব হইল। দময়ন্তী দেবী আর দ্বিতীয়বার চক্ষু তুলিলেন না, নিম্নস্বরে সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

ব্যোমকেশ: আপনাদের যখন বিয়ে হয় নিশানাথবাবু তখন চাকরিতে ছিলেন?

দময়ন্তী: না, তার পরে।

ব্যোমকেশ: কিন্তু কলোনী তৈরী হবার আগে?

দময়ন্তী: হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ: তাহলে বিয়ের সময় নিশানাথবাবুর বয়স ছিল সাতচল্লিশ বছর?

দময়ন্তী: হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ: মাফ করবেন, আপনার এখন বয়স কত?

দময়ন্তী: উনত্রিশ।

ব্যোমকেশ: বিজয়বাবু কবে থেকে আপনাদের কাছে আছেন?

বিজয় এই প্রশ্নের জবাব দিল, বলিল,—'আমার দশ বছর বয়সে মা-বাবা মারা যান, সেই থেকে আমি কাকার কাছে আছি।'

ব্যোমকেশ: আপনার এখন বয়স কত?

বিজয়: পঁচিশ।

লক্ষ্য করিলাম বিজয়ের চোয়ালের হাড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত দুটাও দময়ন্তী দেবীর কাঁধের উপর আড়ষ্টভাবে শক্ত হইয়া আছে। সে যেন ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রাণপণে চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। ব্যোমকেশ নিশ্চয় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কিন্তু সে নির্লিপ্তভাবে আবার প্রশ্ন করিল।

ব্যোমকেশ: বছর দুই আগে আপনি কলকাতার একটি মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কি নাম স্কুলটির?

দময়ন্তী: সেণ্ট মার্থা গার্লস্ স্কুল।

ব্যোমকেশ: হঠাৎ স্কুলে ভর্তি হবার কি কারণ?

দময়ন্তী: ইংরেজি শেখবার ইচ্ছে হয়েছিল।

ব্যোমকেশ: মাস আষ্টেক পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন?

দময়ন্তী: হ্যাঁ, আর ভালো লাগল না।

বরাট এতক্ষণ খাতা পেন্সিল লইয়া মাঝে মাঝে নোট করিতেছিল। ব্যোমকেশ আবার আরম্ভ করিল—

ব্যোমকেশ: পরশু রাত্রে আপনি খাওয়া সেরে রান্নাঘর থেকে কখন ফিরে এসেছিলেন?

দময়ন্তী: প্রায় দশটা।

ব্যোমকেশ: নিশানাথবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

দময়ন্তী: (একটু নীরব থাকিয়া) শুয়ে পড়েছিলেন।

ব্যোমকেশ: ঘর অন্ধকার ছিল?

দময়ন্তী: হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ: জানালা খোলা ছিল?

দময়ন্তী: বোধহয় ছিল। লক্ষ্য করিনি।

ব্যোমকেশ: সদর দরজা তখন নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

দময়ন্তী: (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ: আপনি বাড়িতে এলেন কি করে?

দময়ন্তী: পিছনের দরজা দিয়ে।

ব্যোমকেশ: সে-রাত্রে—তারপর আপনি কি করলেন?

দময়ন্তী: শুয়ে পড়লাম।

ব্যোমকেশ: নিশানাথবাবু তখন ঘুমোচ্ছিলেন? অর্থাৎ বেঁচে ছিলেন?

দময়ন্তী: (বিলম্বে) হ্যাঁ।

ব্যোমকেশ: আপনি তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখেননি? কি করে বুঝলেন?

দময়ন্তী: নিশ্বাস পড়ছিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিল,—'সুনয়না নামের কোনও মেয়েকে আপনি চেনেন?'

দময়ন্তী: না।

ব্যোমকেশ: কিছুদিন থেকে আপনার বাড়িতে কেউ মোটরের টুকরো ফেলে দিয়ে যায়—এ বিষয়ে কিছু জানেন?

দময়ন্তী: যা সকলে জানে তাই জানি।

ব্যোমকেশ: আপনার জীবনে কোনও গুপ্তকথা আছে?

দময়ন্তী: না।

ব্যোমকেশ: নিশানাথবাবুর জীবনে কোনও গুপ্তকথা ছিল?

দময়ন্তী: জানি না।

ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল,—'উপস্থিত আর কোনও প্রশ্ন নেই। বিজয়বাবু, এবার ওঁকে নিয়ে যান।'

বিজয় সশব্দে একটি নিশ্বাস ফেলিল, তারপর দময়ন্তী দেবীর হাত ধরিয়া তুলিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল। দেখিলাম তাঁহার পা কাঁপিতেছে। তাঁহার বর্তমান মানসিক অবস্থায় তীক্ষ্ণ প্রশ্নের আঘাত না করিলেই বোধহয় ভাল হইত।

ইতিমধ্যে বসিবার ঘরে জনসমাগম হইতেছিল, আমি দ্বারের কাছে বসিয়া দেখিতেছিলাম। প্রথমে আসিল পানুগোপাল, ঘরের কোণে গিয়া যথাসম্ভব অদৃশ্য হইয়া বসিল। তারপর আসিলেন সকন্যা নেপালবাবু; তাঁহারা সামনের চেয়ারে বসিলেন; নেপালবাবুর পোড়া মুখের দিকটা আমার দিকে রহিয়াছে তাই তাঁহার মুখভাব দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু মুকুলের মুখে শঙ্কিত উদ্বেগ। সে একবার এদিক ওদিক চাহিল, তারপর নিম্নকণ্ঠে পিতাকে কিছু বলিল।

সর্বশেষে আসিল বনলক্ষ্মী। তাহার মুখ শুষ্ক, যেন চুপসিয়া গিয়াছে; রান্নার কাজ সম্ভবত তাহাকেই চালাইতে হইতেছে। তাহাকে দেখিয়া মুকুল গভীর বিতৃষ্ণাভরে ভ্রূকুটি

করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। বনলক্ষ্মী একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর ধীরপদে খোলা জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, গরাদের উপর হাত রাখিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

এদিকে বিজয় ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেবীর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়াছিল, চাদরে কপালের ঘাম মুছিয়া বলিল,—'এবার আমার এজেহারও না হয় সেরে নিন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ তো। আপনাকে সামান্যই জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

লক্ষ্য করিলাম, দময়ন্তী দেবীকে জেরা করার সময় বিজয় যতটা তটস্থ হইয়াছিল, তাহার তুলনায় এখন অনেকটা সুস্থ। কিন্তু ব্যোমকেশের প্রথম প্রশ্নেই সে থতমত খাইয়া গেল।

ব্যোমকেশ: কিছুদিন আগে নেপালবাবুর মেয়ে মুকুলের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। আপনি প্রথমে রাজী ছিলেন। তারপর হঠাৎ মত বদলালেন কেন?

বিজয়: আমি—আমার—ওটা আমার ব্যক্তিগত কথা। ওর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্পর্ক নেই।

ব্যোমকেশ তাহাকে একটি নাতিদীর্ঘ নেত্রপাতে অভিষিক্ত করিয়া অন্য প্রশ্ন করিল। বলিল,—'পরশু বিকেলবেলা আপনি কলকাতা থেকে ফিরে এসে রাত্রে আবার কলকাতা গিয়েছিলেন কেন?

বিজয়: আমার দরকার ছিল।

ব্যোমকেশ: কী দরকার বলতে চান না?

বিজয়: এটাও আমার ব্যক্তিগত কথা।

ব্যোমকেশ: বিজয়বাবু, আপনার ব্যক্তিগত কথা জানবার কৌতূহল আমার নেই। আপনার কাকার মৃত্যু সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে আপনি আমাদের ডেকেছেন। এখন আপনিই যদি আমাদের কাছে কথা গোপন করেন তাহলে আমাদের অনুসন্ধান করে লাভ কি?

বিজয়: আমি বলছি এর সঙ্গে কাকার মৃত্যুর কোনও সম্বন্ধ নেই।

ব্যোমকেশ: সে বিচার আমাদের হাতে ছেড়ে দিলে ভাল হয় না?

দেখিলাম বিজয়ের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। তারপর সে পরাভব স্বীকার করিল। অপ্রসন্ন স্বরে বলিল,—'বেশ শুনুন। পরশু বিকেলে কলকাতা থেকে ফিরে এসে একটা চিঠি পেলাম। বেনামী চিঠি। তাতে লেখা ছিল—আপনি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন। যদি বিপদে পড়তে না চান আজ রাত্রি দশটার সময় হগ্ সাহেবের বাজারে চায়ের দোকানে থাকবেন, একজনের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন।—এই চিঠি পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু যে চিঠি লিখেছিল সে এল না। এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে এলাম।'

ব্যোমকেশ: চিঠি আপনার কাছে আছে?

বিজয়: না, ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ব্যোমকেশ: আপনি যে পরশু রাত্রে কলকাতায় গিয়েছিলেন তার কোনও সাক্ষী আছে?

বিজয়: না, সাক্ষী রেখে যাইনি, চুপি চুপি গিয়েছিলাম।

ব্যোমকেশ: স্টেশনে গেলেন কিসে—পায়ে হেঁটে?

বিজয়: না, কলোনীর একটা সাইকেল আছে, তাইতে।

ব্যোমকেশ: যাক।—আপনি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছেন, তার মানে কি?

বিজয়: জানি না।

ব্যোমকেশ: বেনামী চিঠিতে ছিল, একজনের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারবেন। এই একজনটি কে? কারুর নাম ছিল না?

বিজয়: (ঢোক গিলিয়া) নাম ছিল না। একজনটি কে তা জানি না।

ব্যোমকেশ: তবে গেলেন কেন?

বিজয়: কে বেনামী চিঠি লিখেছে দেখবার জন্যে।

ব্যোমকেশ: ও।—কিছু মনে করবেন না, আপনি যে-দোকান দেখাশুনো করেন তার টাকার হিসেব কি গরমিল হয়েছে?

বিজয়: (একটু উদ্ধতভাবে) হ্যাঁ হয়েছে। আমার কাকার টাকা আমার টাকা। আমি নিয়েছি।

ব্যোমকেশ: কত টাকা?

বিজয়: হিসেব করে নিইনি। দু'তিন হাজার হবে।

ব্যোমকেশ: টাকা নিয়ে কি করলেন?

বিজয়: টাকা নিয়ে মানুষ কী করে? মনে করুন রেস্ খেলে উড়িয়েছি।

ব্যোমকেশ তির্যক হাসিল, বলিল,—'রেস্ খেলে ওড়াননি। যা হোক, আর কিছু জানবার নেই—অজিত, বনলক্ষ্মীকে আসতে বল। আর যদি ভুজঙ্গধরবাবু এসে থাকেন তাঁকেও।'

ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়াছেন কিনা দেখি নাই। আমি উঠিয়া বাহিরের ঘরে গেলাম। সকলে উচ্চকিত হইয়া চাহিল। দেখিলাম, ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়াছেন, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার মুখের ভাব স্বপ্নালু, আমাকে দেখিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—'দন্তরুচি কৌমুদী!'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'সে আবার কি?'

ভুজঙ্গধরবাবুর স্বপ্নালুতা কাটিয়া গেল, তিনি বলিলেন,—'ওটা মোহমুদ্গরের অ্যান্টিডোট।—আমার ডাক পড়েছে? চলুন।'

'আসুন' বলিয়া আমি বনলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়াছি এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিল। বনলক্ষ্মী জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ চীৎকার করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমি ছুটিয়া গেলাম, পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ, বরাট ও বিজয় বাহির হইয়া আসিল।

বনলক্ষ্মীর কপালের ডানদিকে কাটিয়া গিয়া রক্ত পড়িতেছে। ব্যোমকেশ তাহাকে তুলিতে গিয়া ঘাড় তুলিয়া চাহিল।

'ডাক্তার, আপনি আসুন। মূর্ছা গিয়েছে।'

ভুজঙ্গধরবাবু আসিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন,—'সামান্য জখম, মূর্ছা যাবার মত নয়।'

'কিন্তু জখম হল কি করে?'

'তা কি করে জানব? বোধহয় জানালার বাইরে থেকে কেউ ইট পাটকেল ছুঁড়েছিল, তাই লেগেছে।'

বরাট পকেট হইতে টর্চ লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। ব্যোমকেশ ভুজঙ্গধরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—'এখন একে নিয়ে কি করা যায়?'

ভুজঙ্গধরবাবু একটা মুখভঙ্গী করিলেন, তারপর বনলক্ষ্মীকে দুই বাহুর দ্বারা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—'আমি ওকে ওর কুঠিতে নিয়ে যাচ্ছি, বিছানায় শুইয়ে মুখে জলের ঝাপ্টা দিলেই জ্ঞান হবে। যেখানটা কেটে গেছে সেখানে টিঞ্চার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দিলেই চলবে। আপনারা কাজ চালান, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আসছি।'

বিজয় এতক্ষণ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া ছিল, বলিল,—'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

'আসুন' বলিয়া ভুজঙ্গধরবাবু বনলক্ষ্মীকে লইয়া অগ্রসর হইলেন। দ্বার দিয়া বাহিরে হইতে হইতে তিনি বিজয়কে বলিতেছেন শুনিতে পাইলাম—'আপনি বরং এক কাজ করুন, আমার কুঠি থেকে টিঞ্চার আয়োডিনের শিশি আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসুন—'

ব্যোমকেশ আর পাশের ঘরে ফিরিয়া না গিয়া এই ঘরেই বসিল, বলিল,—'কি বিপত্তি! অজিত, তুমি তো উপস্থিত ছিলে, কি হয়েছিল বল দেখি?'

যাহা যাহা ঘটিয়াছিল বলিলাম, দন্তরুচি কৌমুদীও বাদ দিলাম না। শুনিয়া ব্যোমকেশ

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

বরাট ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—'কাউকে দেখতে পেলাম না। জানালার বাইরে মানুষের পায়ের দাগ রয়েছে কিন্তু কাঁচা দাগ বলে মনে হল না। ইট পাটকেল অবশ্য অনেক পড়ে রয়েছে।'

যেখানে বনলক্ষ্মী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল সেখানে একটা বাঁকা কালো জিনিস আলোয় চিকমিক করিতেছিল। ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া সেটা তুলিয়া লইল, আলোয় ধরিয়া বলিল,—'ভাঙা কাঁচের চুড়ি। বোধহয় বনলক্ষ্মী পড়ে যাবার সময় চুড়ি ভেঙেছে।'

চুড়ির টুকরা বরাটকে দিয়া ব্যোমকেশ আবার আসিয়া বসিল, নেপালবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—'আপনারা বোধহয় জানেন, পুলিসের সন্দেহ নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাই একটু খোঁজ খবর নিতে হচ্ছে।—নেপালবাবু, যে-রাত্রে নিশানাথবাবু মারা যান সে-রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

সোজাসুজি প্রশ্ন, প্রশ্নের অন্তর্নিহিত সন্দেহটিও খুব অস্পষ্ট নয়। নেপালবাবুর গলার শির উঁচু হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বরাটের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কণ্ঠ-সংযত কণ্ঠে বলিলেন,—'দাবা খেলছিলাম।'

এই সময় ঘরের কোণে পানুগোপালের উপর চোখ পড়িল। সে কানের তুলা খুলিয়া ফেলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া একাগ্রভাবে শুনিবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যোমকেশ: দাবা খেলছিলেন? কার সঙ্গে?

নেপাল: মুকুলের সঙ্গে।

ব্যোমকেশ: উনি দাবা খেলতে জানেন?

নেপাল: জানে কিনা একবার খেলে দেখুন না!

ব্যোমকেশ: না না, তার দরকার নেই। তা আপনারা যখন খেলছিলেন, সেখানে কেউ উপস্থিত ছিল?

নেপাল: কেউ না। নিশানাথ যে সেই সময় মারা যাবে তা জানতাম না, জানলে সাক্ষী যোগাড় করে রাখতাম।

ব্যোমকেশ: সে-রাত্রে আপনারা এদিকে আসেননি?

নেপাল: এদিকে আসব কি জন্যে? গরমে রাত্রে ঘুম আসে না তাই দাবা খেলছিলাম।

ব্যোমকেশ: তাহলে—সে-রাত্রে এ বাড়িতে কেউ এসেছিল কিনা তা আপনারা বলতে পারেন না?

নেপাল: না।

এই সময় ঘরের কোণে পানুগোপাল হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটা জ্বলজ্বল করিতেছে। সে প্রাণপণে একটা কিছু বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ বাহির হইল না। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কি কিছু বলবেন?' পানু সবেগে ঘাড় নাড়িয়া আবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এবারও কৃতকার্য হইল না।

নেপালবাবু মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন,—'যত সব হাবা কালার কাণ্ড।'

দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম ভুজঙ্গধরবাবু ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং তীক্ষ্ণচক্ষে পানুগোপালকে দেখিতেছেন। তিনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন,—'পানু বোধহয় কিছু বলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ও এখন উত্তেজিত হয়েছে, কিছু বলতে পারবে না। পরে ঠাণ্ডা হলে হয়তো—'

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'ওদিকের খবর কি?'

'বনলক্ষ্মীর জ্ঞান হয়েছে। কপাল ড্রেস করে দিয়েছি।'

'বিজয়বাবু কোথায়?'

'তিনি বনলক্ষ্মীর কাছে আছেন।' ভুজঙ্গধরবাবুর অধরপ্রান্ত একটু প্রসারিত হইল।

নেপালবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কর্কশস্বরে বলিলেন,—'আপনাদের জেরা আশা করি

শেষ হয়েছে। আমরা এবার যেতে পারি?'

ব্যোমকেশ: একটু দাঁড়ান। (মুকুলকে) আপনি কখনও সিনেমায় অভিনয় করেছেন?

মুকুলের মুখ শুকাইয়া গেল, সে ত্রস্ত-চোখে চারিদিকে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, —'আমি—না, আমি কখনও সিনেমায় অভিনয় করিনি।'

নেপালবাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন,—'মিথ্যে কথা! কে বলে আমার মেয়ে সিনেমা করে! যত সব মিথ্যুক ছোটলোকের দল।'

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে বলিল,—'আপনার মেয়েকে সিনেমা স্টুডিওতে যাতায়াত করতে দেখেছে এমন সাক্ষীর অভাব নেই।'

নেপাল আবার গর্জন ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মুকুল পিতাকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—'সিনেমা স্টুডিওতে আমি কয়েকবার গিয়েছি সত্যি, কিন্তু অভিনয় করিনি। চল বাবা।' বলিয়া মুকুল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। নেপালবাবু বাঘের মত এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'রমেনবাবু ঠিকই ধরেছিলেন। যাক, ভুজঙ্গধরবাবু, আপনাকেও একটি মাত্র প্রশ্ন করব। সে-রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

ভুজঙ্গধরবাবু একপেশে হাসি হাসিয়া বলিলেন,—'সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে বসে অনেকক্ষণ সেতার বাজিয়েছিলাম। সাক্ষী সাবুদ আছে কিনা জানি না।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল, তারপর উঠিয়া বরাটকে বলিল,—'চলুন, বনলক্ষ্মীকে দেখে আসি।'

## সতের

বরাট, ব্যোমকেশ ও আমি বনলক্ষ্মীর কুঠিতে উপস্থিত হইলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় পাশের খোলা জানালা দিয়া একটি নিভৃত দৃশ্য চোখে পড়িল। ঘরটি বোধয় বনলক্ষ্মীর শয়নঘর; আলো জ্বলিতেছিল, বনলক্ষ্মী শয্যায় শুইয়া আছে, আর বিজয় শয্যার পাশে বসিয়া মৃদুস্বরে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে।

আমাদের পদশব্দে বিজয় বাহির হইয়া আসিল। বলিল,—'বনলক্ষ্মী এখনও বড় দুর্বল। মাথার চোট গুরুতর নয়, কিন্তু স্নায়ুতে শক্ লেগেছে। তাকে এখন জেরা করা ঠিক হবে কি?'

ব্যোমকেশ স্নিগ্ধস্বরে বলিল,—'জেরা করব না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা শুধু তাকে দেখতে এসেছি, দেখেই চলে যাব।'

'তা—আসুন।'

ব্যোমকেশ ঘনিষ্ঠভাবে বিজয়ের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—'আপনাকে কিন্তু আর একটি কাজ করতে হবে বিজয়বাবু। একাজ আপনি ছাড়া আর কারুর দ্বারা হবে না।'

'কি করতে হবে বলুন।'

'পানুগোপাল কিছু জানে, আপনার কাকার মৃত্যুর রাত্রে বোধহয় কিছু দেখেছিল! কিন্তু সে উত্তেজিত হয়েছে, কিছু বলতে পারছে না। আপনি তাকে ঠাণ্ডা করে কথাটা বার করে নিতে পারেন? আমরা পারব না, আমাদের দেখলেই সে আবার উত্তেজিত হয়ে উঠবে।'

বিজয় উৎসুক হইয়া বলিল,—'আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে।' বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমরা বনলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিলাম।

লোহার সরু খাটের উপর বিছানা। বনলক্ষ্মী খাটের ধারে উঠিয়া বসিয়াছে, তাহার কপালে পটি বাঁধা। আমাদের দেখিয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'উঠবেন না, উঠবেন না, আপনি শুয়ে থাকুন।'

বনলক্ষ্মী লজ্জিতমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—'কোথায় যে বসতে দেব আপনাদের!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সে ভাবনা ভাবতে হবে না আপনাকে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো আগে।'

বনলক্ষ্মী গুটিসুটি হইয়া শুইল। ব্যোমকেশ তখন খাটের পাশে বসিল, আমরা দু'জনে খাটের পায়ের কাছে দাঁড়াইলাম। ক্ষুদ্র নিরাভরণ ঘর; লোহার খাটটি ছাড়া বলিতে গেলে আর কিছুই নাই।

ব্যোমকেশ হাল্কা গল্প করার ভঙ্গীতে বলিল—'কী হয়েছিল বলুন দেখি? বাইরে থেকে কেউ ঢিল ছুঁড়েছিল?'

বনলক্ষ্মী দুর্বল কণ্ঠে বলিল,—'কিছু জানি না। জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে ছিলুম, তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হল ডাক্তারবাবুর টিঞ্চার আয়োডিনের জ্বলুনিতে।'

'কপালে ছাড়া আর কোথাও লেগেছে নাকি?'

বনলক্ষ্মী ডান হাত তুলিয়া দেখাইল,—'হাতে কাঁচের চুড়ি ছিল, ভেঙে গেছে। হাতে একটু আঁচড় লেগেছে। বোধহয় হাতটা মাথার কাছে ছিল, একসঙ্গে লেগেছে—'

'তা হতে পারে।' ব্যোমকেশ হাত পরীক্ষা করিয়া বলিল,—'প্রথমে বোধহয় ইট আপনার হাতে লেগেছিল, তাই মাথায় বেশী চোট লাগেনি। আচ্ছা, কে ইট ছুঁড়তে পারে? কলোনীতে এমন কেউ আছে কি, যে আপনার প্রতি প্রসন্ন নয়?'

বনলক্ষ্মী ব্যথিত স্বরে বলিল,—'মুকুল আর নেপালবাবু আমাকে—পছন্দ করেন না। তা ছাড়া—তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া ভুজঙ্গধরবাবুও আপনার ওপর সন্তুষ্ট নন।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ভুজঙ্গধরবাবু হয়তো আপনাকে দেখতে পারেন না, কিন্তু সেজন্য ওঁর কর্তব্যে ত্রুটি হয় না।'

বনলক্ষ্মীর অধরে একটু তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—'না, তা হয় না। আমার কপালে খুব টিঞ্চার আয়োডিন ঢেলেছেন।'

ব্যোমকেশ হাসিল,—'যাক।—ব্রজদাস বাবাজী আর রসিকবাবুর সঙ্গে আপনার কোনও রকম অসদ্ভাব— ?'

বনলক্ষ্মী বলিল,—'ব্রজদাস ঠাকুর খুব ভাল লোক ছিলেন, আমাকে স্নেহ করতেন। কেন যে কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন—'

'আর রসিকবাবু?'

'রসিকবাবুকে আমি দেখেছি, এই পর্যন্ত। কখনও কথা হয়নি।—তিনি মিশুকে লোক ছিলেন না, নিজের কাজ নিয়ে থাকতেন।'

'ওকথা যাক। আপনি এখন বেশ সুস্থ বোধ করছেন তো?'

বনলক্ষ্মী একটু হাসিল,—'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে বাঁধা বুলিটা আউড়ে নিই। সে-রাত্রে দশটা এগারোটার মধ্যে আপনি কোথায় ছিলেন?'

বনলক্ষ্মীর চোখে অন্ধকার জমিয়া উঠিল। অতি অস্ফুট স্বরে সে বলিল,—'কাকাবাবুর মৃত্যু তাহলে— ?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাই মনে হচ্ছে।' বনলক্ষ্মী ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'সে-রাত্রে রান্নাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে আসার পর আমি অনেকক্ষণ কলে সেলাই করেছিলুম।'

বাহিরের ঘরে একটি পায়ে-চালানো সেলাইয়ের মেশিন দেখিয়াছি; পূর্বে নিশানাথবাবু বনলক্ষ্মীকে দর্জিখানার পরিচারিকা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন মনে পড়িল।

ব্যোমকেশ নরম সুরে বলিল,—'আপনি তো কলোনীর সকলের জামা-কাপড় সেলাই

করেন। অনেক কাজ জমা হয়ে গিয়েছিল বুঝি?'

'না, কাজ বেশী জমা হয়নি। কাকাবাবুর জন্যে সিল্কের একটা ড্রেসিং গাউন তৈরি করছিলুম।' বনলক্ষ্মীর চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি সে-রাত্রে যখন সেলাইয়ের কল চালাচ্ছিলেন, তখন ভুজঙ্গধরবাবুকে সেতার বাজাতে শুনেছিলেন? ওঁর কুঠি তো আপনার পাশেই?'

বনলক্ষ্মী চোখ মুছিয়া মাথা নাড়িল,—'না, আমি কিছু শুনিনি। কানের কাছে কল চলছিল, শুনব কি করে!' তাহার যেন একটু রাগ-রাগ ভাব।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিল,—'শুধু যে ভুজঙ্গধরবাবু আপনাকে দেখতে পারেন না তা নয়, আপনিও তাঁকে দেখতে পারেন না। ভুজঙ্গধরবাবু সে-রাত্রে নিজের ঘরে বসে সেতার বাজাচ্ছিলেন, অন্তত তাই বললেন। আপনি যদি না শুনে থাকেন, তাহলে বলতে হবে উনি মিথ্যে কথা বলেছেন।'

এবার বনলক্ষ্মীর মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল। লজ্জা ও অনুতাপভরা মুখে সে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া আবেগভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—'না! উনি সেতার বাজাচ্ছিলেন। আমি কল চালাবার ফাঁকে ফাঁকে শুনেছিলাম!'

ব্যোমকেশ তাহার হাতটি দুই হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—'তবে যে আগে বললেন শোনেননি!'

বনলক্ষ্মীর অধর স্ফুরিত হইল, অনুতাপের সহিত অভিমান মিশ্রিত হইল। সে বলিল,—'উনি আমার সঙ্গে যেরকম ব্যাভার করেন—'

'কিন্তু কেন ও রকম ব্যবহার করেন? কোনও কারণ আছে কি?'

বনলক্ষ্মী হাত ছাড়াইয়া লইয়া একবার কপালের উপর আঙুল বুলাইয়া অর্ধস্ফুট স্বরে বলিল,—'সে আপনার শুনে কাজ নেই।'

'কিন্তু আমার যে জানা দরকার।'

বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া রহিল। ব্যোমকেশ আবার অনুরোধ করিল। তখন বনলক্ষ্মী লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার কথা বোধহয় শুনেছেন, নিজের দোষে ইহকাল পরকাল নষ্ট করেছি। কাকাবাবু আশ্রয় দিয়েছিলেন তাই—নইলে—

'আমি এখানে আশ্রয় পাবার পর ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে খুব সদয় ব্যাভার করেছিলেন। উনি খুব মিশুকে, ওঁকে আমার খুব ভাল লাগত। উনি চমৎকার সেতার বাজাতে পারেন। আমার ছেলেবেলা থেকে গান-বাজনার দিকে ঝোঁক, কিন্তু কিছু শিখতে পারিনি। একদিন ওঁর কাছে গিয়ে বললুম, আমি সেতার শিখব, আমাকে শেখাবেন?—'

'তারপর?'

বনলক্ষ্মীর চোখ ঝাপ্সা হইয়া গেল,—'উনি যে প্রস্তাব করলেন তাতে ছুটে পালিয়ে এলুম...আমি জীবনে একবার ভুল করেছি তাই উনি মনে করেন আমি—' তাহার স্বর বুজিয়া গেল।

ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'ভুজঙ্গবাবু তো খাসা মানুষ। একথা কেউ জানে?'

বনলক্ষ্মী জিভ কাটিল,—'আমি কাউকে বলিনি। একথা কি বলবার? বললে কেউ বিশ্বাস করত না...যে-মেয়ের একবার বদনাম হয়েছে—'

বাহিরে পায়ের শব্দ হইল। বনলক্ষ্মী চমকিয়া ত্রস্তস্বরে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'উনি—বিজয়বাবু আসছেন! ওঁকে যেন কিছু বলবেন না। উনি রাগী মানুষ—'

'ভয় নেই' বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বারের কাছে বিজয়ের সঙ্গে দেখা হইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'কি হল? পানুগোপালের কাছ থেকে কিছু বার করতে পারলেন?'

বিজয় বিষন্ন বিরক্তির সহিত বলিল,—'কিছু না। পানুটা ইডিয়ট; হয়তো ওর কিছুই বলবার নেই, যখন বলতে পারবে তখন দেখা যাবে অতি তুচ্ছ কথা। আপনাদের কোনই কাজে লাগবে না।'

'তা হতে পারে। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। কাজের কথাও বেরিয়ে পড়তে পারে।'

'কাল সকালে আর একবার চেষ্টা করে দেখব।'

'আচ্ছা। আজ চলি তাহলে।'

'আসুন। দরকার হলে কাল টেলিফোন করব।'

বিজয় রহিয়া গেল, আমরা বাহিরে আসিলাম। কুঠি হইতে নামিবার স্থানটি অন্ধকার। বরাট টর্চ জ্বালিল।

পাশের যে জানালা দিয়া বনলক্ষ্মীর শয়নঘর দেখা যায়, তাহার নীচে একটা কালো কাপড়-ঢাকা মূর্তি লুকাইয়া ছিল. টর্চের প্রভা সেদিকে পড়িতেই প্রেত-মূর্তির মত একটা ছায়া সট্ করিয়া সরিয়া গেল, তারপর গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হইল। ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে বরাটের হাত হইতে টর্চ কাড়িয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আমরা বোকার মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম, তারপর অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে তাহার অনুসরণ করিলাম।

কিছুদূর যাইবার পর দেখা গেল ব্যোমকেশ ফিরিয়া আসিতেছে। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—'ধরতে পারলাম না। নেপালবাবুর কুঠির পিছন পর্যন্ত গিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে গেল।'

বরাট বলিল,—'লোকটা কে আন্দাজ করতে পারলেন?'

'উহুঁ। তবে মেয়েমানুষ। দৌড়ুবার সময় মনে হল বাতাসে গোলাপী আতরের গন্ধ পেলাম। একবার চুড়ি কিম্বা চাবির আওয়াজও যেন কানে এল।'

'মেয়েমানুষ—কে হতে পারে?'

'মুকুল হতে পারে, মুস্কিলের বিবি হতে পারে. আবার দময়ন্তী দেবীও হতে পারেন। —চলুন, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।'

বরাট স্টেশন পর্যন্ত আমাদের পোঁছাইয়া দিতে আসিল—ট্রেন তখনও আসে নাই। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে। ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি মনে করবেন না আমি আপনার ওপর সর্দারি করছি। এ কাজে আমরা সহযোগী। আপনার পেছনে পুলিসের অফুরন্ত এক্তিয়ার রয়েছে, আপনি যে-কাজটা পাঁচ মিনিটে পারবেন আমি করতে গেলে সেটা পাঁচ দিন লাগবে। তাই আপনাকে অনুরোধ

বরাট হাসিয়া বলিল,—'কি কাজ করতে হবে বলুন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'গুপ্তচর লাগাতে হবে। কলোনী থেকে কে কখন কলকাতায় যাচ্ছে তার খবর আমার দরকার। যেই খবর পাবেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেলিফোন করবেন।'

'তাই হবে। কলোনীতে আর স্টেশনে লোক রাখব।—বনলক্ষ্মীর ভাঙা চুড়িটা আমায় দিয়েছিলেন. সেটা নিয়ে কী করা যাবে?'

'ওটা ফেলে দিতে পারেন। ভেবেছিলাম পরীক্ষা করাতে হবে. কিন্তু তার দরকার নেই।'

'আর কিছু?'

'আপাতত আর কিছু নয়।—আজ যা দেখলেন শুনলেন তা থেকে কি মনে হল? কাউকে সন্দেহ হচ্ছে?'

'দময়ন্তীকে সবচেয়ে বেশী সন্দেহ হচ্ছে।'

'কিন্তু এ স্ত্রীলোকের কাজ নয়।'

'স্ত্রীলোকের সহকারী থাকতে পারে তো।'

ব্যোমকেশ চকিতে বরাটের পানে চোখ তুলিল।

'সহকারী কে হতে পারে?'

'সেটা বলা শক্ত। যে-কেউ হতে পারে। বিজয় হতে বাধা কি? ও যেভাবে কাকীমাকে আগলে বেড়াচ্ছে দেখলাম—'

'হ্যাঁ—ভাববার কথা বটে। ওদিকে নেপালবাবুর সঙ্গেও দময়ন্তী দেবীর একটা প্রচ্ছন্ন সংযোগ রয়েছে।'

'আচ্ছা, দময়ন্তীর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু জানা গেছে?'

'দুর্নাম কিছু শুনিনি, বরং ভালই শুনেছি।'

'আপনার গাড়ী এসে পড়েছে। হ্যাঁ, রসিক দে'র সবজি-দোকানের হিসেব-পত্র দেখবার ব্যবস্থা করেছি। যদি সত্যিই চুরি করে থাকে, ওর নামে ওয়ারেণ্ট বার করব।'

ট্রেনের শূন্য কামরায় ব্যোমকেশ একটা বেঞ্চিতে চিৎ হইয়া আলোর দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। তারপর হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—'চিড়িয়াখানাই বটে।'

উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'হঠাৎ একথা কেন?'

ব্যোমকেশ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল,—'চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কি? নাম-কাটা ডাক্তার সংস্কৃত শ্লোক আওড়ায়, মুখপোড়া প্রফেসার রাত দুপুরে মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলে, কর্তাকে দোর-বন্ধ বাড়িতে ঢুকে কেউ খুন করে যায় কিন্তু পাশের ঘরে গৃহিণী কিছু জানতে পারেন না, কর্তার ভাইপো খুড়োর তহবিল ভেঙ্গে সগর্বে সেকথা প্রচার করে, বোষ্টম ফেরারী হয়, গাড়োয়ানের বৌ আড়ি পাতে—। চিড়িয়াখানা আর কাকে বলে?'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজকের অনুসন্ধানে কিছু পেলে?'

'এইটুকু পেলাম যে সবাই মিথ্যে কথা বলছে। নির্জলা মিথ্যে বলছে না। সত্যি-মিথ্যে মিশিয়ে এমনভাবে বলছে যে কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যে ধরা যায় না।'

'বনলক্ষ্মীও মিথ্যে বলছে?'

'অন্তত বলবার তালে ছিল। নেহাৎ বিবেকের দংশনে সত্যি কথা বলে ফেলল।'

'আচ্ছা, অ্যালিবাই সম্বন্ধে কি মনে হল?'

'কারুর অ্যালিবাই পাকা নয়। বিজয় বলছে, ঠিক যে-সময় খুন হয় সে-সময় সে কলকাতায় ছিল, অথচ তার কোনোও সাক্ষী-প্রমাণ নেই, বেনামী চিঠিখানা পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নেপালবাবু মেয়ের সঙ্গে দাবা খেলছিলেন, কেউ তাঁদের খেলতে দেখেনি। ডাক্তার অন্ধকারে সেতার বাজাচ্ছিলেন, একজন কানে শুনেছে কিন্তু চোখে দেখেনি। বনলক্ষ্মী কলে সেলাই করছিল, সাক্ষী নেই। দময়ন্তীর কথা ছেড়েই দাও। এর নাম কি অ্যালিবাই?'

ব্যোমকেশ খানিকক্ষণ বাহিরের অপসৃয়মান আলো-আঁধারের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার ললাটে চিন্তার ভ্রুকুটি। সে বলিল,—'বনলক্ষ্মী একবার আমার হাত ধরেছিল, লক্ষ্য করেছিলে?'

বলিলাম,—'লক্ষ্য আবার করিনি! তুমিও দু'হাতে তার হাত ধরে কত আদর করলে দেখলাম।'

ব্যোমকেশ ফিকা হাসিল,—'আদর করিনি, সহানুভূতি দেখাচ্ছিলাম।—কিন্তু আশ্চর্য বনলক্ষ্মীর বাঁ হাতের তর্জনীর ডগায় কড়া পড়েছে।'

বলিলাম,—'এ আর আশ্চর্য কি? যারা সেলাই করে তাদের আঙুলে কড়া পড়েই থাকে।'

ব্যোমকেশ চিন্তাক্রান্ত মুখে সিগারেটে একটা সুখ-টান দিয়া সেটা বাহিরে ফেলিয়া দিল। তারপর আবার লম্বা হইয়া শুইল।

সে-রাত্রে বাসায় ফিরিতে সাড়ে এগারোটা বাজিল। আর কোনও কথা হইল না তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম।

## আঠারো

ঘুম ভাঙিল মাথার মধ্যে ঝন্ ঝন্ শব্দে। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই, মনে হইল কানের কাছে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। কয়েকদিন আগে ঘুমের মধ্যে এমনি আর্ত আহ্বান আসিয়াছিল।

আজ আর বিছানায় থাকিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ ইতিমধ্যে আসিয়া টেলিফোন ধরিয়াছে। আমি তক্তপোষের পাশে বসিয়া একতরফা সংলাপ শুনিলাম—'হ্যালো...বিজয়বাবু...কী? মারা গেছে! কখন?...কি হয়েছিল...আমি যেতে পারি, কিন্তু এখন গিয়ে লাভ কি?...আপনি বরং ইন্সপেক্টর বরাটকে ফোন করুন, তিনি ব্যবস্থা করবেন...হ্যাঁ, পোস্ট-মর্টেম হওয়া চাই, আর ওষুধের শিশিটা পরীক্ষা হওয়া চাই...আচ্ছা—'

টেলিফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ একটা আরাম চেয়ারে বসিল। আমার ঠোঁটের কাছে যে প্রশ্নটা ধড়ফড় করিতেছিল তাহা বাহির হইয়া আসিল,—'কে? কে গেল?'

ব্যোমকেশের চোখে-মুখে যেন দুঃস্বপ্নের জড়তা লাগিয়া ছিল, সে মুখের উপর হাত চালাইয়া তাহা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল,—'পানুগোপাল। কিছুক্ষণ আগে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। বোধহয় কানে ওষুধ দিয়েছিল; ওষুধের শিশিটা ছিপিখোলা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ওষুধে বিষ মেশানো ছিল, বিষের জ্বালায় সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে, বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যায়। সেইখানেই মৃত্যু হয়েছে।—আমার দোষ। আমার ভাবা উচিত ছিল, পানু যদি সত্যিই কোনও গুরুতর কথা জানতে পেরে থাকে, তাহলে তার প্রাণের আশঙ্কা আছে। কেন সাবধান হইনি! কেন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসিনি! কিন্তু কাল বিজয় বললে, ওটা একটা ইডিয়ট, হয়তো কিছুই বলবার নেই। আমার মনও সেই কথায় ভিজে গেল—'

ব্যোমকেশ হঠাৎ চুপ করিল। তাহার তীব্র আত্মগ্লানির মধ্যে আবার কোন নূতন সংশয় মাথা তুলিয়াছে, সে মুখের উপর একটা হাত ঢাকা দিয়া নীরব হইয়া রহিল।

তারপর সকাল হইল; পুঁটিরাম চা দিয়া গেল। ব্যোমকেশ কিন্তু চা স্পর্শ করিল না, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাইল না, মোহগ্রস্তের মত মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আরাম চেয়ারে পড়িয়া রহিল।

আমার মনটা বিকল হইয়া গিয়াছিল। পানুগোপাল ছেলেটা প্রকৃতির কৃপণতায় অসুস্থ দেহ লইয়া জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে নির্বোধ ছিল না। তাহার হৃদয় ছিল, হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ছিল। নিশানাথবাবু তাহাকে ভালবাসিতেন, আমারও তাহাকে ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। তাহার এই যন্ত্রণাময় মৃত্যুর সংবাদ কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধিয়া রহিল।

বেলা বারোটার সময় ব্যোমকেশ নিঃশব্দে উঠিয়া স্নানাহার করিল, তারপর পাখা চালাইয়া শয্যায় শয়ন করিল। সে যে দিবানিদ্রা দিবার জন্য শয়ন করিল না তাহা বুঝিলাম। পানুগোপালের মৃত্যুর জন্য সে নিজেকে দোষী মনে করিতেছে, একান্ত নিভৃতে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চায়। এবং যে অদৃশ্য নরঘাতক পর-পর দুইটি মানুষকে নিঃশব্দে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিল তাহার ছদ্মবেশ অপসারিত করিয়া তাহাকে ফাঁসিকাঠে লটকাইবার পন্থা আবিষ্কার করিতে চায়।

অপরাহ্নে দুইজনে নীরবে বসিয়া চা-পান করিলাম। ব্যোমকেশের মুখখানা শাণ দেওয়া ক্ষুরের মত হিংস্র এবং কঠিন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট লইয়া প্রমোদ বরাট আসিল। ব্যোমকেশের হাতে রিপোর্ট দিয়া বলিল,—'নিকোটিন বিষে মৃত্যু হয়েছে। ওষুধের শিশিতেও নিকোটিন পাওয়া গেছে।'

ব্যোমকেশ বরাটের সম্মুখে সিগারেটের টিন রাখিয়া পুঁটিরামকে আর এক দফা চায়ের হুকুম দিল; রিপোর্ট পড়িয়া কোনও মন্তব্য না করিয়া আমার হাতে দিল।

রাত্রি দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। পানুর কানের মধ্যে ক্ষত ছিল, রাত্রে শয়নের পূর্বে শিশির ঔষধে তুলা ভিজাইয়া কানে দিয়াছিল। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কর্ম। কিন্তু কাল কেহ অলক্ষিতে তাহার ঔষধে বিষ মিশাইয়া দিয়া গিয়াছিল। বিষ রক্তের সহিত মিশিবার অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।—পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট ও বরাটের মুখের কথা হইতে এই তথ্যগুলি প্রকাশ পাইল।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'মৃতদেহ কে প্রথম আবিষ্কার করে?'

বরাট বলিল,—'নেপালবাবুর মেয়ে মুকুল।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বরাটের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'এবারেও মুকুল! আশ্চর্য।'

বরাট বলিল,—'যা শুনলাম, ভোর রাত্রে উঠে বাগানে ঘুরে বেড়ানো মেয়েটার অভ্যেস।'

'হুঁ।—আপনি খোঁজ-খবর নিয়েছিলেন?'

'সকলকেই সওয়াল করেছিলাম কিন্তু কাজের কথা কিছু পেলাম না।'

'পানু যে-ওষুধ কানে দিত সেটা কি ভুজঙ্গধরবাবুর দেওয়া ওষুধ?'

'হ্যাঁ। ওষুধে ছিল স্রেফ গ্লিসারিন আর বোরিক পাউডার। ভুজঙ্গধরবাবু বললেন, তিনি মাসে এক শিশি পানুকে তৈরি করে দিতেন. পানু তাই কানে দিত। কাল রাত্রি দশটার আগে কোনও সময় হত্যাকারী এসে তার শিশিতে নিকোটিন মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত পানু তখন খেতে গিয়েছিল।'

'কে কখন খেতে গিয়েছিল খবর নিয়েছেন?'

'সকলে একসঙ্গে খেতে যায়নি, কেউ আগে কেউ পরে। পানু খেতে গিয়েছিল আন্দাজ পৌনে দশটার সময়, অর্থাৎ আমরা চলে আসবার পরই।'

'কাল রান্না করেছিল কে?'

'দময়ন্তী আর মুকুল। দু'জনেই সারাক্ষণ রান্নাঘরে ছিল।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পুঁটিরাম চা ও জলখাবার দিয়া গেল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিকোটিন। অজিত, লক্ষ্য করেছ, দ্বিতীয়বার নিকোটিনের আবির্ভাব হল।'

বলিলাম,—'হ্যাঁ। তার মানে—সুনয়না।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু সুনয়না বা অন্য কোনও স্ত্রীলোক নিশানাথবাবুকে কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারে এ প্রস্তাব আমরা আগেই খারিজ করেছি। ধরে নিতে হবে সুনয়নার একজন সহকর্মী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সহকর্মী কিম্বা সহকর্মিণী। একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে যে কাজ অসম্ভব, দু'জন স্ত্রীলোক মিলে সে কাজ সহজেই করতে পারে। কিন্তু আসল কথা নিকোটিন। এ বিষ এল কোত্থেকে? ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি নিকোটিন সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

বরাট বলিল,—'ওটা ভয়ঙ্কর বিষ এই জানি। আপনার মুখে সুনয়নার কথা শোনবার পর খোঁজখবর নিয়েছিলাম, দেখলাম ওষুধের দোকানে ও-মাল পাওয়া যায় না; কোথাও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এক যদি কোনও বড় ফ্যাক্টরীতে তৈরি হয় তো বলতে পারি না।'

'এক হতে পারে যে-ব্যক্তি বিষ ব্যবহার করেছে সে নিজে একজন কেমিস্ট কিংবা কোনও কেমিস্টকে দিয়ে বিষ তৈরি করিয়েছে।'

'তা হতে পারে। কেমিস্ট তো একজন হাতের কাছেই রয়েছে—নেপাল গুপ্ত।'

'যদি নেপাল গুপ্ত হয়, সুনয়নার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?'

'বাপ-বেটি হতে বাধা কি?'

আমি বলিলাম,—'নেপালবাবুর সঙ্গে দময়ন্তী দেবীরও যোগাযোগ আছে—তাঁরা দু'জনে হতে পারেন।'

ব্যোমকেশ ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—'দময়ন্তী দেবী আর বিজয় হতে পারে, বিজয় আর বনলক্ষ্মী হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর দময়ন্তী হতে পারে, দময়ন্তী আর ভুজঙ্গধর হতে পারে, বনলক্ষ্মী আর ব্রজদাস হতে পারে, এমন কি মুস্কিল মিঞা আর নজর বিবি হতে পারে। সম্ভাবনা অনেকগুলো রয়েছে, কিন্তু কেবল সম্ভাবনার কথা গবেষণা করে কোনও লাভ হবে না। পাকাপাকি জানতে হবে।'

বরাট জলযোগ শেষ করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল,—'বেশ তো, পাকাপাকি জানার একটা উপায় বলুন না। পুলিসের দিক থেকে আর কোনও বাধা নেই, পানুকে যে খুন করা হয়েছে—আমার কর্তারা তা স্বীকার করবেন; সুতরাং পুলিসের যা-কিছু কর্তব্য সবই আমি করতে পারি। এখন কি করতে হবে বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল.—'এক, কলোনীর সকলের কুঠি খানাতল্লাস করে দেখতে পারেন, কিন্তু নিকোটিন পাবেন না। আমার মনে হয়, রুটিন-মাফিক কাজে কোনও ফল হবে না। বরং আপাতত কিছুদিন বসে থাকা ভাল।'

'চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে থাকব?'

'একেবারে হাত গুটোবার দরকার নেই। ব্রজদাস আর রসিকের তল্লাস যেমন চলছে চলুক। রসিকের দোকানের খাতাপত্র পরীক্ষা করুন। আর কলোনীতে গুপ্তচর বসান। কে কখন বাইরে যাচ্ছে সেটা জানা বিশেষ দরকার।'

বরাট গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—'আজ থেকেই লোক লাগাবো ঠিক করেছিলাম কিন্তু পানুর ব্যাপারে সব গোলমাল হয়ে গেছে। কাল থেকে হবে।—কলোনীতে আর কারুর হঠাৎ মৃত্যুর যোগ নেই তো?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'বোধহয় না। থাকলেও আমরা ঠেকাতে পারব না।'

## উনিশ

দুইদিন গোলাপ কলোনীর দিক হইতে কোনও সাড়াশব্দ আসিল না; প্রমোদ বরাটও খবর দিল না। মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন কলোনীর কথা যেন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ টেলিফোনের দিকে চোখ রাখিয়া অতৃপ্ত প্রেতাত্মার মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দু'একবার আমরা দাবার ছক সাজাইয়া বসিলাম। কিন্তু ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক হইয়া রহিল. খেলা জমিল না।

তৃতীয় দিন বিকালবেলা চা-পানের পর ব্যোমকেশ বলিল.—'আমি একটু বেরুব।'

আমারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিল. বলিলাম.—'কোথায় যাবে?'

'সেন্ট মার্থার স্কুলে খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। তুমি কিন্তু বাড়িতেই থাকবে। যদি টেলিফোন আসে।'

ব্যোমকেশ চলিয়া গেল। তারপর দু'ঘণ্টা কড়িকাঠ গুনিয়া কাটাইয়া দিলাম।

ছ'টা বাজিতে পাঁচ মিনিটে টেলিফোন বাজিল। বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

বরাট টেলিফোন করিতেছে। বলিল.—'বেরিয়েছেন?—তাঁকে বলে দেবেন ভুজঙ্গধর-বাবু কোট-প্যাণ্ট পরে পৌনে ছ'টার ট্রেনে কলকাতা গেছেন।—আর একটা খবর আছে. রসিক দে'র খাতাপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে তিন হাজার টাকার গরমিল। রসিকের নামে ওয়ারেণ্ট বার করেছি।'

'কলোনীর খবর কী?'

'নতুন খবর কিছু নেই।'

বরাট টেলিফোন ছাড়িয়া দিবার পর মনটা আরও অস্থির হইয়া উঠিল। ভুজঙ্গধর-বাবু কলিকাতায় আসিতেছেন এ সংবাদের গুরুত্ব কতখানি কিছুই জানি না। ব্যোমকেশ

কখন ফিরিবে?

ব্যোমকেশ ফিরিল সওয়া ছ'টার সময়। ভুজঙ্গধরবাবুর সংবাদ দিতেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে হাতের ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—'ট্রেন এসে পৌঁছতে এখনও আধ ঘণ্টা। অনেক সময় আছে।' বলিয়া নিজের শয়নকক্ষে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

আমি দ্বারের নিকট হইতে বলিলাম,—'রসিক দে দোকানের তিন হাজার টাকা মেরেছে।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল,—'বেশ বেশ।'

পাঁচ মিনিট পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি আধবয়সী ফিরিঙ্গী। পরিধানে ময়লা জিনের প্যাণ্টুলুন ও রঙচটা আলপাকার কোট, মাথায় তেল-চিটে নাইট ক্যাপ, ছাঁটা গোঁফের ভিতর হইতে আধ-পোড়া একটা চুরুট বাহির হইয়া আছে।

বলিলাম,—'এ কি গোয়াণ্ডি পিদ্রু সেজে কোথায় চললে?'

সাহেব কড়া সুরে বলিল,—'None of your business, young man.'

বলিয়া পা ঘষিয়া বাহির হইয়া গেল।

তারপর সাড়ে দশটার আগে আর তাহার দেখা পাইলাম না। একেবারে স্নান সারিয়া গরম চায়ের পেয়ালা হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল।

আমি বলিলাম,—'কোট-প্যাণ্টুলুনের একটা মহৎ গুণ, পরলেই মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। আশা করি মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোট-প্যাণ্টুলুনের আর একটা মহৎ গুণ, বেশী ছদ্মবেশ দরকার হয় না।—তুমি বোধহয় খুবই উৎসুক হয়ে উঠেছ?'

'তা উঠেছি। এবার তোমার হৃদয়ভার লাঘব কর।'

'কোনটা আগে বলব? ভুজঙ্গধরবাবুর বৃত্তান্ত?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশ চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিল,—'বুঝতেই পেরেছ ফিরিঙ্গী সেজে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল ভুজঙ্গধরবাবু কোথায় যান দেখা। স্টেশনে তাঁকে আবিষ্কার করে তাঁর পিছু নিলাম। তখন সন্ধ্যে ঘনিয়ে এসেছে। তাঁকে অনুসরণ করা শক্ত হল না। তিনি ট্রামে চড়লেন, আমিও ট্রামে চড়লাম। মৌলালির মোড়ে এসে তিনি নামলেন, আমিও নামলাম। তারপর ধর্মতলা দিয়ে কিছুদূর গিয়ে তিনি একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। গলির পর গলি, তস্য গলি। দেখলাম ফিরিঙ্গী পাড়ায় এসে পৌঁছেছি। ভালই হল। পাড়ার সঙ্গে আমার ছদ্মবেশ খাপ খেয়ে গেল। কোট-প্যাণ্টুলুনের ওই মাহাত্ম্য, যে পাড়াতেই যাও বেমানান হয় না।'

'তারপর?'

'একটা এঁদোপড়া বাড়ির দরজার পাশে দুটো স্ত্রীলোক দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভুজঙ্গধরবাবু গিয়ে তাদের সঙ্গে খাটো গলায় কথা বললেন, তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। স্ত্রীলোক দুটো দাঁড়িয়ে রইল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'তাদের কি রকম মনে হল?'

ব্যোমকেশের মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়া উঠিল, সে বলিল,—

'দেবতা ঘুমালে তাহাদের দিন
দেবতা জাগিলে তাদের রাতি
ধরার নরক সিংহদুয়ারে
জ্বালায় তাহারা সন্ধ্যাবাতি!'

'তারপর বল।'

'আমি বড় মুস্কিলে পড়ে গেলাম। ভুজঙ্গধরবাবুর চরিত্র আমরা যতটা জানতে পেরেছি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। কিন্তু এই এঁদোপড়া বাড়িটাই তাঁর একমাত্র গন্তব্যস্থল কিনা তা না জেনে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমি বাড়ির সামনে দিয়ে একবার হেঁটে গেলাম, দেখে নিলাম বাড়ির নম্বর উনিশ। তারপর একটা অন্ধকার কোণে লুকিয়ে অপেক্ষা

করতে লাগলাম। মেয়ে দুটো দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল।

'প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে ভুজঙ্গধরবাবু বেরুলেন। আশেপাশে দৃক্‌পাত না করে যে-পথে এসেছিলেন সেই পথে ফিরে চললেন। আমিও চললাম। তারপর সটান শেয়ালদা স্টেশনে তাঁকে ন'টা পঞ্চান্নর গাড়িতে তুলে দিয়ে আসছি।'

চায়ের পেয়ালা এক চুমুকে শেষ করিয়া ব্যোমকেশ সিগারেট ধরাইল। আমি বলিলাম, 'তাহলে ভুজঙ্গধরবাবুর কার্যকলাপ থেকে কিছু ধরা গেল না?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তারপর বলিল,—'কেমন যেন ধোঁকা লাগল। ভুজঙ্গধরবাবু যখন দরজা থেকে বেরুলেন তখন তাঁর পকেট থেকে কি একটা জিনিস মাটিতে পড়ল। ঝিনিৎ করে শব্দ হল। তিনি দেশলাই জেবলে সেটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন। দেখলাম একটা চাবির রিঙ, তাতে গোটা তিনেক বড়-বড় চাবি রয়েছে।'

'এতো ধোঁকা লাগবার কি আছে?'

'হয়তো কিছু নেই, তবু ধোঁকা লাগছে।'

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিবার পর বলিলাম,—'ওদিকে কী হল? সেন্ট মার্থা স্কুল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবী মাস আষ্টেক স্কুলে যাতায়াত করেছিলেন। রোজ যেতেন না, ইংরেজী শেখার দিকেও খুব বেশি চাড় ছিল না। স্কুলে দু' তিনটি পাঞ্জাবী মেয়ে পড়ত, তাদের সঙ্গে গল্প করতেন—'

'পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। দময়ন্তী দেবী পাঞ্জাবী ভাষা জানেন।'

এই সময়ে টেলিফোন বাজিল। ব্যোমকেশ টপ্‌ করিয়া ফোন তুলিয়া লইল,—'হ্যালো ...ইন্সপেক্টর বরাট! এত রাত্রে কী খবর?...রসিক দে ধরা পড়েছে! কোথায় ছিল...অ্যাঁ। শিয়ালদার কাছে 'বঙ্গ বিলাস' হোটেলে! সঙ্গে টাকাকড়ি কিছু ছিল?...মাত্র ত্রিশ টাকা! ...আজ তাকে আপনাদের লক্‌-আপে রাখুন, কাল সকালেই আমি গিয়ে হাজির হব।... আর কি! হ্যাঁ দেখুন, একটা ঠিকানা দিচ্ছি, আপনার একজন লোক পাঠিয়ে সেখানকার হালচাল সব সংগ্রহ করতে হবে...১৯ নম্বর মির্জা লেন...হ্যাঁ, স্থানটা খুব পবিত্র নয়... কিন্তু সেখানে গিয়ে আলাপ জমাবার মতন লোক আপনাদের বিভাগে নিশ্চয় আছে... হাঃ হাঃ হাঃ...আচ্ছা, কাল সকালেই যাচ্ছি...নমস্কার।'

ফোন রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, আজ খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া যাক, কাল ভোরে উঠতে হবে।'

## কুড়ি

গোলাপ কলোনীর ঘটনাবলী ধাবমান মোটরের মত হঠাৎ বানচাল হইয়া রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, তিন দিন পরে মেরামত হইয়া আবার প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

পরদিন সকালে আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মোহনপুরের স্টেশনে অবতীর্ণ হইলাম। আকাশে শেষরাত্রি হইতে মেঘ জমিতেছিল, সূর্য ছাই-ঢাকা আগুনের মত কেবল অন্তর্দাহ বিকীর্ণ করিতেছিলেন। আমরা পদব্রজে থানার দিকে চলিলাম।

থানার কাছাকাছি পৌঁছিয়াছি এমন সময় নেপালবাবু বন্য বরাহের ন্যায় থানার ফটক দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। আমাদের দিকে মোড় ঘুরিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ আমাদের দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তারপর আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া ছুটিয়া চলিলেন।

ব্যোমকেশ ডাকিল,—'নেপালবাবু, শুনুন—শুনুন।'

নেপালবাবু যুযুৎসু ভঙ্গীতে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ তাঁহার কাছে গিয়া বলিল,—'এ কি, আপনি থানায় গিয়েছিলেন! কী হয়েছে?'

নেপালবাবু ফাটিয়া পড়িলেন,—'ঝকমারি হয়েছে! পুলিসকে সাহায্য করতে গিয়েছিলাম, আমার ঘাট হয়েছে। পুলিসের খুরে দণ্ডবৎ।' বলিয়া আবার উল্টামুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ব্যোমকেশ আবার গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল,—'কিন্তু ব্যাপারটা কি? পুলিসকে কোন্ বিষয়ে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন?'

ঊর্ধ্বে হাত তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে নেপালবাবু বলিলেন,—'না না, আর না, যথেষ্ট হয়েছে। কোন্ শালা আর পুলিসের কাজে মাথা গলায়। আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল, তাই—!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু আমাকে বলতে দোষ কি? আমি তো আর পুলিস নই।'

নেপালবাবু কিন্তু বাগ মানিতে চান না। অনেক কষ্টে পিঠে অনেক হাত বুলাইয়া ব্যোমকেশ তাঁহাকে কতকটা ঠাণ্ডা করিল। একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া কথা হইল। নেপালবাবু বলিলেন,—'কলোনীতে দুটো খুন হয়ে গেল, পুলিস চুপ করে বসে থাকতে পারে কিন্তু আমি চুপ করে থাকি কি করে? আমার তো একটা দায়িত্ব আছে! আমি জানি কে খুন করেছে, তাই পুলিসকে বলতে গিয়েছিলাম। তা পুলিস উল্টে আমার ওপরই চাপ দিতে লাগল। ভাল রে ভাল—যেন আমিই খুন করেছি!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি জানেন কে খুন করেছে?'

'এর আর জানাজানি কি? কলোনীর সবাই জানে, কিন্তু মুখ ফুটে বলবার সাহস কারুর নেই।'

'কে খুন করেছে।'

'বিজয়! বিজয়! আর কে খুন করবে? খুড়ীর সঙ্গে ষড় করে আগে খুড়োকে সরিয়েছে, তারপর পানুকে সরিয়েছে। পানুটাও দলে ছিল কি না।'

'কিন্তু—পানু কিসে মারা গেছে আপনি জানেন?'

'নিকোটিন। আমি সব খবর রাখি।'

'কিন্তু বিজয় নিকোটিন পাবে কোথায়? নিকোটিন কি বাজারে পাওয়া যায়?'

'বাজারে সিগারেট তো পাওয়া যায়। যার ঘটে এতটুকু বুদ্ধি আছে সে এক প্যাকেট সিগারেট থেকে এত নিকোটিন বার করতে পারে যে কলোনী সুদ্ধ লোককে তা দিয়ে সাবাড় করা যায়।'

'তাই নাকি? নিকোটিন তৈরি করা এত সহজ?'

'সহজ নয় তো কী! একটা বকযন্ত্র যোগাড় করতে পারলেই হল।' এই পর্যন্ত বলিয়া নেপালবাবু হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলেন, তারপর আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্টেশনের দিকে পা চালাইলেন।

আমরাও সঙ্গে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি বৈজ্ঞানিক, আপনার কথাই ঠিক। আমি জানতাম না নিকোটিন তৈরি করা এত সোজা।—তা আপনি এদিকে কোথায় চলেছেন? কলোনীতে ফিরবেন না?'

'কলকাতা যাচ্ছি একটা বাসা ঠিক করতে—কলোনীতে ভদ্দরলোক থাকে না—' বলিয়া তিনি হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

আমরা থানার দিকে ফিরিলাম। ব্যোমকেশের ঠোঁটের কোণে একটা বিচিত্র হাসি খেলা করিতে লাগিল।

থানায় প্রমোদ বরাটের ঘরে আসন গ্রহণ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—'রাস্তায় নেপাল গুপ্তর সঙ্গে দেখা হল।'

বরাট বলিল,—'আর বলবেন না, লোকটা বদ্ধ পাগল। সকাল থেকে আমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বিশ্বাস বিজয় খুন করেছে, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ কিছু নেই, শুধু আক্রোশ। আমি বললাম, আপনি যদি বিজয়ের নামে পুলিসে ডায়েরী করতে চান আমার আপত্তি নেই, কিন্তু পরে যদি বিজয় মানহানির মামলা করে তখন আপনি কি করবেন? এই শুনে

নেপাল গুপ্ত উঠে পালাল। আসল কথা বিজয় ওকে নোটিস দিয়েছে; বলেছে চুপটি করে কলোনীতে থাকতে পারেন তো থাকুন, নৈলে রাস্তা দেখুন, সর্দারি করা এখানে চলবে না। তাই এত রাগ।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমারও তাই আন্দাজ হয়েছিল।—যাক, এবার আপনার রসিককে বার করুন।'

রসিক আনীত হইল। হাজতে রাত্রিবাসের ফলে তাহার চেহারার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই। খুঁতখুঁতে মুখে নিপীড়িত একগুঁয়েমির ভাব। আমাদের দেখিয়া একবার ঢোক গিলিল, কণ্ঠার হাড় সবেগে নড়িয়া উঠিল।

কিন্তু তাহাকে জেরা করিয়া ব্যোমকেশ কোনও কথাই বাহির করিতে পারিল না। বস্তুত রসিক প্রায় সারাক্ষণই নির্বাক হইয়া রহিল। সে চুরি করিয়াছে কি না এ প্রশ্নের জবাব নাই, টাকা লইয়া কী করিল এ বিষয়েও নিরুত্তর। কেবল একবার সে কথা কহিল, তাহাও প্রায় অজ্ঞাতসারে।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'যে-রাত্রে নিশানাথবাবু মারা যান সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাঁর সঙ্গে আপনার ঝগড়া হয়েছিল?'

রসিক চোখ মেলিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, বলিল,—'নিশানাথবাবু মারা গেছেন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। পানুগোপালও মারা গেছে। আপনি জানেন না?'

রসিক কেবল মাথা নাড়িল।

তারপর ব্যোমকেশ আরও প্রশ্ন করিল কিন্তু উত্তর পাইল না। শেষে বলিল,—'দেখুন, আপনি চুরির টাকা নষ্ট করেননি, কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। আপনি যদি আমাদের জানিয়ে দেন কোথায় টাকা রেখেছেন তাহলে আমি বিজয়বাবুকে বলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা তুলিয়ে নেব, আপনাকে জেলে যেতে হবে না।—কোথায় কার কাছে টাকা রেখেছেন বলবেন কি?'

রসিক পূর্ববৎ নির্বাক হইয়া রহিল।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পর ব্যোমকেশ হাল ছাড়িয়া দিল। বলিল,—'আপনি ভাল করলেন না। আপনি যে-কথা লুকোবার চেষ্টা করছেন তা আমরা শেষ পর্যন্ত জানতে পারবই। মাঝ থেকে আপনি পাঁচ বছর জেল খাটবেন।'

রসিকের কণ্ঠার হাড় আর একবার নড়িয়া উঠিল, সে যেন কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল। তারপর আবার দৃঢ়ভাবে ওষ্ঠাধর সম্বদ্ধ করিল।

রসিককে স্থানান্তরিত করিবার পর ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল,—'এদিকে তো কিছু হল না—কিন্তু আর দেরি নয়, সব যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে—'

বরাট বলিল,—'কী প্ল্যান?'

প্ল্যান কিন্তু শোনা হইল না। এই সময় একটি বকাটে ছোকরা গোছের চেহারা দরজা দিয়া মুণ্ড বাড়াইয়া বলিল,—'ব্রজদাস বোষ্টমকে পাক্‌ড়েছি স্যার।'

বরাট বলিল,—'বিকাশ! এস। কোথায় পাক্‌ড়ালে বোষ্টমকে?'

বিকাশ ঘরে প্রবেশ করিয়া দন্তবিকাশ করিল,—'নবদ্বীপের এক আখড়ায় বসে খঞ্জনী বাজাচ্ছিল। কোনও গোলমাল করেনি। যেই বললাম, আমার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে, অমনি সুস্‌সুড় করে চলে এল।'

'বাঃ বেশ। এই ঘরেই পাঠিয়ে দাও তাকে।'

ব্রজদাস বৈষ্ণব ঘরে প্রবেশ করিলেন। গায়ে নামাবলী, মুখে কয়েক দিনের অক্ষৌরিত দাড়ি-গোঁফ মুখখানিকে ধুতরা-ফলের মত কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, চোখে লজ্জিত অপ্রস্তুত ভাব। তিনি বিনয়াবনত হইয়া জোড়হস্তে আমাদের নমস্কার করিলেন।

বরাট ব্যোমকেশকে চোখের ইশারা করিল, ব্যোমকেশ ব্রজদাসের দিকে মুচকি হাসিয়া বলিল,—'বসুন।'

ব্রজদাস যেন আরও লজ্জিত হইয়া একটি টুলের উপর বসিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি হঠাৎ ডুব মেরেছিলেন কেন বলুন তো? যতদূর জানি কলোনীর টাকাকড়ি কিছু আপনার কাছে ছিল না।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আজ্ঞে না।'

'তবে পালালেন কেন?'

ব্রজদাস কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, নিশানাথ বলিয়াছিলেন ব্রজদাস মিথ্যা কথা বলে না। ইহাও কি সম্ভব? পাছে সত্য কথা বলিতে হয় এই ভয়ে তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন! কিন্তু কী এমন মারাত্মক সত্য কথা?

ব্যোমকেশ বলিল,—'আচ্ছা, ও কথা পরে হবে। এখন বলুন দেখি, নিশানাথবাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানেন?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'না, কিছু জানি না।'

'কাউকে সন্দেহ করেন?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে—' ব্যোমকেশ থামিয়া গিয়া বলিল,—'নিশানাথবাবুর মৃত্যুর রাত্রে আপনি কলোনীতেই ছিলেন তো?'

'আজ্ঞে কলোনীতেই ছিলাম।'

লক্ষ্য করিলাম ব্রজদাস এতক্ষণে যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়াছেন, কাঁচুমাচু ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কোথায় ছিলেন, কি করছিলেন?'

ব্রজদাস বলিলেন,—'আমি আর ডাক্তারবাবু একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফিরে এলাম, উনি নিজের কুঠিতে গিয়ে সেতার বাজাতে লাগলেন, আমি নিজের দাওয়ায় শুয়ে তাঁর বাজনা শুনলাম!'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'ও!—ভুজঙ্গধরবাবু সেতার বাজাচ্ছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মালকোষের আলাপ করছিলেন।'

'কতক্ষণ আলাপ করেছিলেন?'

'তা প্রায় সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। চমৎকার হাত ওঁর।'

'হুঁ। একটানা আলাপ করেছিলেন? একবারও থামেননি?'

'আজ্ঞে না, একবারও থামেননি।'

'পাঁচ মিনিটের জন্যেও নয়?'

'আজ্ঞে না।' সেতারের কান মোচ্ড়াবার জন্য দু'একবার থেমেছিলেন, তা সে পাঁচ-দশ সেকেন্ডের জন্য, তার বেশি নয়।'

'কিন্তু আপনি তাঁকে বাজাতে দেখেননি?'

'দেখব কি করে? উনি অন্ধকারে বসে বাজাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি ওঁর আলাপ চিনি, উনি ছাড়া আর কেউ নয়।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া রহিল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিল।—

'আপনি কলোনীতে আসবার আগে থেকেই নিশানাথবাবুকে চিনতেন?'

আবার ব্রজদাসের মুখ শুকাইল। তিনি উস্খুস করিয়া বলিলেন,—'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ওঁর সেরেস্তায় কাজ করতেন, উনি সাক্ষী দিয়ে আপনাকে জেলে পাঠিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি চুরি করেছিলাম।'

'বিজয় তখন নিশানাথবাবুর কাছে থাকত?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'দময়ন্তী দেবীর তখন বিয়ে হয়েছিল?'

ব্রজদাসের মুখ কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল, তিনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন। ব্যোমকেশ

বলিল,—'উত্তর দিচ্ছেন না যে? দময়ন্তী দেবীকে তখন থেকেই চেনেন তো?'

ব্রজদাস অস্পষ্টভাবে হ্যাঁ বলিলেন। ব্যোমকেশ বলিল,—'তার মানে নিশানাথ আর দময়ন্তীর বিয়ে তার আগেই হয়েছিল—কেমন?'

ব্রজদাস এবার ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—'এই জন্যেই আমি পালিয়েছিলাম। আমি জানতাম আপনারা এই কথা তুলবেন। দোহাই ব্যোমকেশবাবু, আমাকে ও প্রশ্ন করবেন না। আমি সাত বছর ওঁদের অন্ন খেয়েছি। আমাকে নিমকহারামি করতে বলবেন না।' বলিয়া তিনি কাতরভাবে হাত জোড় করিলেন।

ব্যোমকেশ সোজা হইয়া বসিল, তাহার চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'এ সব কী ব্যাপার?'

ব্রজদাস ভগ্নস্বরে বলিলেন,—'আমি জীবনে অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, আর মিথ্যে কথা বলব না। জেল থেকে বেরিয়ে আমি বৈষ্ণব হয়েছি, কণ্ঠী নিয়েছি; কিন্তু শুধু কণ্ঠী নিলেই তো হয় না, প্রাণে ভক্তি কোথায়, প্রেম কোথায়? তাই প্রতিজ্ঞা করেছি জীবনে আর মিথ্যে কথা বলব না, তাতে যদি ঠাকুরের কৃপা হয়।—আপনারা আমায় দয়া করুন, ওঁদের কথা জিগ্যেস করবেন না। ওঁরা আমার মা বাপ।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল,—'আপনার কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম যে আপনি মিথ্যে কথা বলেন না, কিন্তু নিশানাথ সম্বন্ধে সত্যি কথা বলতেও আপনার সঙ্কোচ হচ্ছে। মিথ্যে কথা না বলা খুবই প্রশংসার কথা, কিন্তু সত্যি কথা গোপন করায় কোনও পুণ্য নেই। ভেবে দেখুন, সত্যি কথা না জানলে আমরা নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা করব কি করে? আপনি কি চান না যে নিশানাথবাবুর খুনের কিনারা হয়?'

ব্রজদাস নতমুখে রহিলেন। তারপর আমরা সকলে মিলিয়া নির্বন্ধ করিলে তিনি অসহায়ভাবে বলিলেন,—'কি জানতে চান বলুন।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'নিশানাথ ও দময়ন্তীর বিয়ের ব্যাপারে কিছু গোলমাল আছে। কী গোলমাল?'

'ওঁদের বিয়ে হয়নি।'

বোকার মত সকলে চাহিয়া রহিলাম।

ব্যোমকেশ প্রথমে সামলাইয়া লইল। তারপর ধীরে ধীরে একটি একটি প্রশ্ন করিয়া ব্রজদাস বাবাজীর নিকট হইতে যে কাহিনী উদ্ধার করিল তাহা এই—

নিশানাথবাবু পুণায় জজ ছিলেন, ব্রজদাস ছিলেন তাঁর সেরেস্তার কেরানি। লাল সিং নামে একজন পাঞ্জাবী খুনের অপরাধে দায়রা-সোপর্দ হইয়া নিশানাথবাবুর আদালতে বিচারার্থ আসে। দময়ন্তী এই লাল সিং-এর স্ত্রী।

নিশানাথের কোর্টে যখন দায়রা মোকদ্দমা চলিতেছে তখন দময়ন্তী নিশানাথের বাংলোতে আসিয়া সকাল-সন্ধ্যা বসিয়া থাকিত, কান্নাকাটি করিত। নিশানাথ তাহাকে তাড়াইয়া দিতেন, সে আবার আসিত। বলিত, আমি অনাথা, আমার স্বামীর সাজা হইলে আমি কোথায় যাইব?

দময়ন্তীর বয়স তখন উনিশ-কুড়ি; অপরূপ সুন্দরী। বিজয়ের বয়স তখন তেরো-চৌদ্দ, সে দময়ন্তীর অতিশয় অনুগত হইয়া পড়িল। কাকার কাছে দময়ন্তীর জন্য দরবার করিত। নিশানাথ কিন্তু প্রশ্রয় দিতেন না। বিজয় যে দময়ন্তীকে চুপি চুপি খাইতে দিতেছে এবং রাত্রে বাংলোতে লুকাইয়া রাখিতেছে তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না।

লাল সিং-এর ফাঁসির হুকুম হইয়া যাইবার পর নিশানাথ জানিতে পারিলেন। খুব খানিকটা বকাবকি করিলেন এবং দময়ন্তীকে অনাথ আশ্রমে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। দময়ন্তী কিন্তু তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, বালক বিজয়ও চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিরুপায় হইয়া নিশানাথ দময়ন্তীকে বাংলোয় থাকিতে দিলেন। বাড়ির চাকর-বাকরের কাছে ব্রজদাস এই সকল সংবাদ পাইয়াছিলেন।

হাইকোর্টের আপীলে লাল সিং-এর ফাঁসির হুকুম রদ হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাস হইল।

দময়ন্তী নিশানাথের আশ্রয়ে রহিয়া গেল। হাকিম-হুকুম মহলে এই লইয়া একটু কানাঘুষা হইল। কিন্তু নিশানাথের চরিত্র-খ্যাতি এতই মজবুত ছিল যে, প্রকাশ্যে কেহ তাঁহাকে অপবাদ দিতে সাহস করিল না।

ইহার দু'এক মাস পরে ব্রজদাসের চুরি ধরা পড়িল; নিশানাথ সাক্ষী দিয়া তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন। তারপর কয়েক বৎসর কী হইল ব্রজদাস তাহা জানেন না।

ব্রজদাস জেল হইতে বাহির হইয়া শুনিলেন নিশানাথ কর্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, তিনি নিশানাথের সন্ধান লইতে লাগিলেন। জেলে থাকাকালে ব্রজদাসের মতিগতি পরিবর্তিত হইয়াছিল, তিনি বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। সন্ধান করিতে করিতে তিনি গোলাপ কলোনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এখানে আসিয়া ব্রজদাস দেখিলেন নিশানাথ ও দময়ন্তী স্বামী-স্ত্রীরূপে বাস করিতেছেন। নিশানাথ তাঁহাকে কলোনীতে থাকিতে দিলেন, কিন্তু সাবধান করিয়া দিলেন, দময়ন্তীঘটিত কোনও কথা যেন প্রকাশ না পায়। দময়ন্তী ও বিজয় পূর্বে ব্রজদাসকে এক-আধবার দেখিয়াছিল, এতদিন পরে তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তদবধি ব্রজদাস কলোনীতে আছেন। নিশানাথ ও দময়ন্তীর মত মানুষ সংসারে দেখা যায় না। তাঁহারা যদি কোনও পাপ করিয়া থাকেন ভগবান তাহার বিচার করিবেন।

ব্যোমকেশ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'ইন্সপেক্টর বরাট, চলুন একবার কলোনীতে যাওয়া যাক। অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে।'

ব্রজদাস করুণ স্বরে বলিলেন,—'আমার এখন কী হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনিও কলোনীতে চলুন। যেমন ছিলেন তেমনি থাকবেন।'

## একুশ

প্রমোদ বরাটের ঘর হইতে যখন বাহিরে আসিলাম বেলা তখন প্রায় বারোটা। পাশের ঘরে থানার কয়েকজন কর্মচারী খাতা-পত্র লইয়া কাজ করিতেছিল, বরাট বাহিরে আসিলে হেড-ক্লার্ক উঠিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বরাটকে কিছু বলিল।

বরাট ব্যোমকেশকে বলিল,—'একটু অসুবিধা হয়েছে। আমাকে এখনি আর একটা কাজে বেরুতে হবে। তা আপনারা না হয় এগোন, আমি বিকেলের দিকে কলোনীতে হাজির হব।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'তার চেয়ে এক কাজ করা যাক, সন্ধ্যের সময় সকলে একসঙ্গে গেলেই চলবে। আপনি কাজে যান, সন্ধ্যে ছ'টার সময় স্টেশনে ওয়েটিং রুমে আমাদের খোঁজ করবেন।'

বরাট বলিল,—'বেশ, সেই ভাল।'

ব্রজদাস বলিলেন,—'কিন্তু আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি এখন কলোনীতে ফিরে যেতে পারেন, কিন্তু যে-সব কথা হল তা কাউকে বলবার দরকার নেই।'

'যে আজ্ঞে।'

ব্রজদাস কলোনীর রাস্তা ধরিলেন, আমরা স্টেশনে ফিরিয়া চলিলাম। চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের চোখে ঠুলি আঁটা ছিল। দময়ন্তী নামটা প্রচলিত বাংলা নাম নয় এটাও চোখে পড়েনি। অমন রঙ এবং রূপ যে বাঙালীর ঘরে চোখে পড়ে না এ কথাও একবার ভেবে দেখিনি। দময়ন্তী এবং নিশানাথের বয়সের পার্থক্য থেকে কেবল দ্বিতীয় পক্ষই আন্দাজ করলাম, অন্য সম্ভাবনা যে থাকতে পারে তা ভাবলাম না। দময়ন্তী স্কুলে গিয়ে পাঞ্জাবী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করেন এ থেকেও কিছু সন্দেহ হল না। অথচ সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। নিশানাথবাবু বোম্বাই প্রদেশে সাতচল্লিশ বছর বয়সে একটি উনিশ-কুড়ি

বছরের বাঙালী তরুণীকে বিয়ে করলেন এটা এক কথায় মেনে নেবার মত নয়।—অজিত, মাথার মধ্যে ধূসর পদার্থ ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে আসছে, এবার অবসর নেওয়া উচিত। সত্যান্বেষণ ছেড়ে ছাগল চরানো কিম্বা অনুরূপ কোনও কাজ করার সময় উপস্থিত হয়েছে।'

তাহার ক্ষোভ দেখিয়া হাসি আসিল। বলিলাম,—'ছাগল না হয় পরে চরিও, আপাতত এ ব্যাপারের তো একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দময়ন্তী নিশানাথবাবুর স্ত্রী নয় এ থেকে কী বুঝলে?'

ক্ষুব্ধ ব্যোমকেশ কিন্তু উত্তর দিল না।

স্টেশনে ওয়েটিং রুমে তালা লাগানো ছিল, তালা খোলাইয়া ভিতরে গিয়া বসিলাম। একটা কুলিকে দিয়া বাজার হইতে কিছু হিঙের কচুরি ও মিষ্টান্ন আনাইয়া পিত্ত রক্ষা করা গেল।

আকাশে মেঘ আরও ঘন হইয়াছে, মাঝে মাঝে চড়বড় করিয়া দু'চার ফোঁটা ছাগল-তাড়ানো বৃষ্টি ঝরিয়া পড়িতেছে। সন্ধ্যা নাগাদ বেশ চাপিয়া বৃষ্টি নামিবে মনে হইল।

দুইটি দীর্ঘবাহু আরাম-কেদারায় আমরা লম্বা হইলাম। বাহিরে থাকিয়া থাকিয়া ট্রেন আসিতেছে যাইতেছে। আমি মাঝে মাঝে ঝিমাইয়া পড়িতেছি, মনের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তার ধারা বহিতেছে—দময়ন্তী দেবী নিশানাথের স্ত্রী নয়, লাল সিং-এর স্ত্রী...মানসিক অবস্থার কিরূপ বিবর্তনের ফলে একজন সচ্চরিত্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এরূপ কর্ম করিতে পারেন?...দময়ন্তী প্রকৃতপক্ষে কিরূপ স্ত্রীলোক? স্বৈরিণী? কুহকিনী? কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া তাহা মনে হয় না......

সাড়ে পাঁচটার সময় পুলিস ভ্যান লইয়া বরাট আসিল। আকাশের তখন এমন অবস্থা হইয়াছে যে, মনে হয় রাত্রি হইতে আর দেরী নাই। মেঘগুলো ভিজা ভোট-কম্বলের মত আকাশ আবৃত করিয়া দিনের আলো মুছিয়া দিয়াছে।

বরাট বলিল,—'বিকাশকে আপনার উনিশ নম্বর মির্জা লেনে পাঠিয়ে দিলাম। কাল খবর পাওয়া যাবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—বিকাশ! ও—বেশ বেশ। ছোকরা কি আপনাদের দলের লোক, অর্থাৎ পুলিসে কাজ করে?'

বরাট বলিল,—কাজ করে বটে কিন্তু ইউনিফর্ম পরতে হয় না। ভারী খলিফা ছেলে। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

স্টেশনের স্টলে এক পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিয়া আমরা বাহির হইতেছি, একটা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিল। দেখিলাম নেপালবাবু গাড়ি হইতে নামিলেন, হন্‌হন্‌ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমাদের দেখিতে পাইলেন না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'উনি এগিয়ে যান। আমরা আধ ঘণ্টা পরে বেরুব।'

আমরা আবার ওয়েটিং রুমে গিয়া বসিলাম। একথা-সেকথায় আধ ঘণ্টা কাটাইয়া মোটর ভ্যানে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কলোনীর ফটক পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—'এখানেই গাড়ি থামাতে বলুন, গাড়ি ভেতরে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। অনর্থক সকলকে সচকিত করে তোলা হবে।'

গাড়ি থামিল, আমরা নামিয়া পড়িলাম। অন্ধকার আরও গাঢ় হইয়াছে। আমরা কলোনীর ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম নিশানাথবাবুর ঘরের পাশের জানালা দিয়া আলো আসিতেছে।

ব্যোমকেশ সদর দরজার কড়া নাড়িল। বিজয় দরজা খুলিয়া দিল এবং আমাদের দেখিয়া চমকিয়া বলিয়া উঠিল,—'আপনারা!'

ভিতরে দময়ন্তী চেয়ারে বসিয়া আছেন দেখা গেল। ব্যোমকেশ গম্ভীর মুখে বলিল, —'দময়ন্তী দেবীকে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে।'

আমাদের ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দময়ন্তী ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার

মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ব্যোমকেশ বলিল,—'উঠবেন না। বিজয়বাবু, আপনিও বসুন।
দময়ন্তী ধীরে ধীরে আবার বসিয়া পড়িলেন। বিজয় চোখে শঙ্কিত সন্দেহ ভরিয়া তাঁহার চেয়ারের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।
আমরা উপবিষ্ট হইলাম। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'বাড়িতে আর কেউ নেই?'
বিজয় নীরবে মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ যেন তাহা লক্ষ্য না করিয়াই নিজের ডান হাতের নখগুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—'দময়ন্তী দেবী, সেদিন আপনাকে যখন প্রশ্ন করেছিলাম তখন সব কথা আপনি বলেননি। এখন বলবেন কি?'
দময়ন্তী ভয়ার্ত চোখ তুলিলেন,—'কি কথা?'
ব্যোমকেশ নির্লিপ্তভাবে বলিল,—'সেদিন আপনি বলেছিলেন দশ বছর আগে আপনাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি বিয়ে হওয়া সম্ভব ছিল না। নিশানাথবাবু আপনার স্বামী নন—'
মৃত্যুশরাহতের মত দময়ন্তী কাঁদিয়া উঠিলেন,—'না না, উনিই আমার স্বামী—উনিই আমার স্বামী—' বলিয়া নিজের কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া মুখ ঢাকিলেন।
বিজয় গর্জিয়া উঠিল,—'ব্যোমকেশবাবু!'
বিজয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া ব্যোমকেশ বলিয়া চলিল,—'আপনার ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয় কথায় আমাদের দরকার ছিল না। অন্য সময় হয়তো চুপ করে থাকতাম, কিন্তু এখন তো চুপ করে থাকবার উপায় নেই। সব কথাই জানতে হবে—'
বিজয় বিকৃত স্বরে বলিল,—'আর কী কথা জানতে চান আপনি?'
ব্যোমকেশ চকিতে বিজয়ের পানে চোখ তুলিয়া করাতের মত অমসৃণ কণ্ঠে বলিল,—'আপনাকেও অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে, বিজয়বাবু; অনেক মিছে কথা বলেছেন আপনি। কিন্তু সে পরের কথা। এখন দময়ন্তী দেবীর কাছ থেকে জানতে চাই, যে-রাত্রে নিশানাথ-বাবুর মৃত্যু হয় সে-রাত্রে কী ঘটেছিল?'
দময়ন্তী গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিজয় তাঁহার পাশে নতজানু হইয়া বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ডাকিতে লাগিল,—'কাকিমা—কাকিমা—!'
প্রায় দশ মিনিট পরে দময়ন্তী অনেকটা শান্ত হইলেন, অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিলেন। ব্যোমকেশ শুষ্ক স্বরে বলিল,—'সত্য কথা গোপন করার অনেক বিপদ। হয়তো এই সত্য গোপনের ফলেই পানুগোপাল বেচারা মারা গেছে। এর পর আর মিথ্যে কথা বলে ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুলবেন না।'
দময়ন্তী ভগ্ন স্বরে বলিলেন,—'আমি মিথ্যে কথা বলিনি, সে-রাত্রির কথা যা জানি সব বলেছি।'
ব্যোমকেশ বলিল,—'দেখুন, কী ভয়ঙ্করভাবে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছিল তা বিজয়বাবু জানেন। আপনি পাশের ঘরে থেকেও কিছু জানতে পারেননি, এ অসম্ভব। হয় আপনি দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে বাড়িতে ছিলেন না, কিংবা আপনার চোখের সামনে নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়েছে।'
পূর্ণ এক মিনিট ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর বিজয় ব্যগ্র স্বরে বলিল—'কাকিমা, আর লুকিয়ে রেখে লাভ কি। আমাকে যা বলেছ এঁদেরও তা বল। হয় তো—'
আরও খানিকক্ষণ মূক থাকিয়া দময়ন্তী অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—'আমি বাড়িতে ছিলাম না।'
'কোথায় গিয়েছিলেন? কি জন্যে গিয়েছিলেন?'
অতঃপর দময়ন্তী স্খলিত স্বরে এলোমেলোভাবে তাঁহার বাহিরে যাওয়ার ইতিহাস বলিলেন। দীর্ঘ আট মাসের ইতিহাস; তাঁহার ভাষায় বলিলে অনাবশ্যক জটিল ও জবড়জং হইয়া পড়িবে। সংক্ষেপে তাহা এইরূপ—
আট নয় মাস পূর্বে দময়ন্তী ডাকে একটি চিঠি পাইলেন। লাল সিং-এর চিঠি। লাল সিং লিখিয়াছে—জেল হইতে বাহির হইয়া আমি তোমাদের সন্ধান পাইয়াছি। ছদ্মবেশে

গোলাপ কলোনী দেখিয়া আসিয়াছি, তোমাদের সব কীর্তি জানিতে পারিয়াছি। আমি ভীষণ প্রতিহিংসা লইতে পারিতাম কিন্তু তাহা লইব না। আমার টাকা চাই। কাল রাত্রি দশটা হইতে এগারোটার মধ্যে কলোনীর ফটকের পাশে যে কাচের ঘর আছে সেই ঘরে বেঞ্চির উপর ৫০০৲ টাকা রাখিয়া আসিবে। কাহাকেও কিছু বলিবে না, বলিলে তোমাদের দু'জনকেই খুন করিব। এর পর আর আমি তোমাকে চিঠি লিখিব না (জেলে বাংলা শিখিয়াছি কিন্তু লিখিতে চাই না), টাকার দরকার হইলে মোটরের একটি ভাঙা অংশ বাড়ির কাছে ফেলিয়া দিয়া যাইব। তুমি সেই রাত্রে নির্দিষ্ট সময়ে ৫০০৲ টাকা কাচের ঘরে রাখিয়া আসিবে।—

চিঠি পাইয়া দময়ন্তী ভয়ে দিশাহারা হইয়া গেলেন। কিন্তু নিশানাথকে কিছু বলিলেন না। রাত্রে ৫০০৲ টাকার নোট কাচের ঘরে রাখিয়া আসিলেন। কলোনীর টাকাকড়ি দময়ন্তীর হাতেই থাকিত। কেহ জানিতে পারিল না।

তারপর মাসের পর মাস শোষণ চলিতে লাগিল। মাসে দুই তিন বার মোটরের ভগ্নাংশ আসে, দময়ন্তী কাচের ঘরে টাকা রাখিয়া আসেন। কলোনীর আয় ছিল মাসে প্রায় আড়াই হাজার তিন হাজার, কিন্তু এই সময় হইতে আয় কমিতে লাগিল। তাহার উপর এইভাবে দেড় হাজার টাকা বাহির হইয়া যায়। আগে অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত, এখন টায়ে টায়ে খরচ চলিতে লাগিল।

নিশানাথ টাকার হিসাব রাখিতেন না, কিন্তু তিনিও লক্ষ্য করিলেন। তিনি দময়ন্তীকে প্রশ্ন করিলেন, দময়ন্তী মিথ্যা বলিয়া তাঁহাকে স্তোক দিলেন; আয় কমিয়া যাওয়ার কথা বলিলেন, খরচ বাড়ার কথা বলিলেন না।

এইভাবে আট মাস কাটিয়াছে। নিশানাথের মৃত্যুর দিন সকালে দময়ন্তী আবার একখানি চিঠি পাইলেন। লাল সিং লিখিয়াছে—আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, যাইবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে চাই। তুমি রাত্রি দশটার সময় কাচের ঘরে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। যদি এগারটার মধ্যে না যাইতে পারি তখন ফিরিয়া যাইও। আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়াছি কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলে কিম্বা আমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে খুন করিব।

সে-রাত্রে আহারের পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তী দেখিলেন, নিশানাথ আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। দময়ন্তী নিঃশব্দে পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু লাল সিং আসিল না। দময়ন্তী এগারোটা পর্যন্ত কাচের ঘরে অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলেন নিশানাথ পূর্ববৎ ঘুমাইতেছেন। তখন তিনিও নিজের ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া নিশানাথের গায়ে হাত দিয়া দময়ন্তী দেখিলেন। নিশানাথ বাঁচিয়া নাই। তিনি চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ নত মুখে সমস্ত শুনিল, তারপর বিজয়ের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,—'বিজয়বাবু, আপনি এ কাহিনী কবে জানতে পারলেন?'

বিজয় বলিল,—'তিন চার দিন আগে। আমি আগে জানতে পারলে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল,—'অন্য কথাটা অর্থাৎ আপনার কাকার সঙ্গে দময়ন্তী দেবীর প্রকৃত সম্পর্কের কথা আপনি গোড়া থেকেই জানেন। কোনও সময় কাউকে একথা বলেছেন?'

বিজয় চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সে বলিল,—'না, কাউকে না।'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বরাটকে বলিল,—'চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

দ্বার পর্যন্ত গিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—'একটা খবর দিয়ে যাই। লাল সিং দু'বছর আগে জেলে মারা গেছে।'

## বাইশ

পুলিস ভ্যানে ফিরিয়া যাইতে যাইতে ব্যোমকেশ বলিল,—'দময়ন্তী দেবীর কথা সত্যি বলেই মনে হয়। নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছিল কেউ দময়ন্তীকে blackmail করছে; তাই যেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে যান সেদিন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক-ভাবে কথাটা উচ্চারণ করেছিলেন। কথাটা তাঁর মনের মধ্যে ছিল তাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল,—'এখন কথা হচ্ছে, কে blackmail করছে? নিশ্চয় এমন লোক যে দময়ন্তীর গুপ্ত কথা জানে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আমাদের জানত তিনজন এই গুপ্ত কথা জানে—বিজয়, ব্রজদাস বাবাজী আর নেপালবাবু। নেপালবাবু জানলে মুকুল জানবে। সব মিলিয়ে চারজন; আরও কেউ কেউ থাকতে পারে, যাদের আমরা নাম জানি না। আর কিছু না হোক হত্যার একটা স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভ পাওয়া গেল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'স্পষ্ট পরিষ্কার মোটিভটা কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ধরা যাক নেপালবাবু blackmail করছিলেন। আট মাস ধরে তিনি বেশ কিছু দোহন করেছেন, আরও অনেক দিন পেন্সন ভোগ করবার ইচ্ছে আছে, এমন সময় দেখলেন নিশানাথবাবুর সন্দেহ হয়েছে, তিনি আমাকে ডেকে এনেছেন। নেপাল-বাবুর ভয় হল এমন লাভের ব্যবসাটা বুঝি ফেঁসে যায়। শুধু তাই নয়, তিনি যদি ধরা পড়েন তাহলে ইতিপূর্বে তাঁর কন্যার সাহায্যে যে হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়েছেন তাও প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাঁর কন্যাটিও যে চিত্রাভিনেত্রী সুনয়না ওরফে নৃত্যকালী তাও আর গোপন থাকবে না। রমেন মল্লিককে আমাদের সঙ্গে দেখে তাঁর এ রকম সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি তখন কী করবেন? নিশানাথকে মারতে পারলে সব সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, নির্ভয়ে blackmail চালানো যায়। কিন্তু নিশানাথের মৃত্যুটা স্বাভাবিক হওয়া চাই। সুতরাং নিশানাথ যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবে মারা গেলেন। কিন্তু তবু খুঁত রয়ে গেল। পুলিসের যাতায়াত শুরু হল। তার ওপর পানুগোপালটা কিছু দেখে ফেলেছিল। অতএব তাকেও সরানো দরকার হল। মোটামুটি এই মোটিভ।'

বরাট বলিল,—'তাহলে কর্তব্য কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটা প্ল্যান আমার মাথায় ঘুরছে, কিন্তু সে বিষয়ে পরে ব্যবস্থা হবে। আজ রাত্রেই একটা কাজ করা দরকার, আবার আমাদের কলোনীতে ফিরে যেতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে কলোনীর লোকগুলির ওপর নজর রাখতে হবে।'

'কী উদ্দেশ্যে?'

'আজ মেঘৈর্মেদুরমম্বরং—অভিসারের উপযুক্ত রাত্রি। দেখতে হবে কেউ কারুর ঘরে যায় কিনা। আপনি রাজী?'

'নিশ্চয় রাজী। কিন্তু আগে চলুন আমার বাসায় খাওয়া-দাওয়া করবেন।'

বরাটের বাসায় আহার শেষ করিয়া আমরা যখন বাহির হইলাম রাত্রি তখন সওয়া ন'টা। একটু আগে যাওয়া ভাল, পালা শেষ হইবার পর প্রেক্ষাগৃহে রাত জাগিয়া বসিয়া থাকার মানে হয় না। বরাট আমাদের জন্য দুইটা বর্ষাতি যোগাড় করিয়া লইল।

কলোনী হইতে আধ মাইল দূরে গাড়ি থামানো হইল, ড্রাইভারকে এইখানে গাড়ি রাখিতে বলিয়া আমরা পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। আকাশ তেমনি থমথমে হইয়া আছে, প্রত্যাশিত বৃষ্টি নামে নাই। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা অবগুণ্ঠিতা বধূর মুচকি হাসির মত লজ্জিত; তাহার পিছনে গুরু গুরু ডাকও নাই।

কলোনীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম একটিও কুঠিতে আলো জ্বলিতেছে না, কেবল ভোজন গৃহে আলো। সকলেই আহার করিতে গিয়াছে। ব্যোমকেশ চুপি চুপি আমাদের নির্দেশ দিল,—'অজিত, তুমি বিজয়ের কুঠির আনাচে কানাচে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বোসো,

বিজয় ছাড়া আর কেউ আসে কিনা লক্ষ্য করবে।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি দময়ন্তীর খিড়কি দরজার ওপর নজর রাখবেন।'

'আর আপনি?'

'আমি নেপালবাবুর সদর আর অন্দর দু'দিকেই চোখ রাখব। একটা করবীর ঝাড় দেখে রেখেছি, সেখান থেকে দু'দিকেই দৃষ্টি রাখা চলবে।'

বরাট ও ব্যোমকেশের বর্ষাতি-পরা মূর্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। আমি বিজয়ের কুঠির এক কোণে একটা ঝোপের মধ্যে আড্ডা গাড়িলাম।

পনরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ভোজনকারীরা একে একে ফিরিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। তারপর বিজয়ের পায়ের শব্দ শুনিলাম; সে নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিল। বনলক্ষ্মীর ঘর অন্ধকার, সে বোধহয় এখনও রান্নাঘরে আছে।

বসিয়া বসিয়া দময়ন্তী ও নিশানাথের চিন্তাই মনে আসিল; যে-কঙ্কালটুকু পাইয়াছিলাম তাহাতে কল্পনার রক্ত-মাংস সংযোগ করিয়া মানুষের মত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলাম।—দময়ন্তী বোধহয় লাল সিংএর মত দুর্দান্ত নিষ্ঠুর স্বামীকে ভালবাসিত না, কিন্তু স্বামী খুনের অপরাধে অভিযুক্ত হইলে অশিক্ষিত রমণীর স্বাভাবিক কর্তব্যবোধে বিচারকের করুণা-ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল; তারপর বিজয় ও নিশানাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, দাম্পত্য জীবনে যে-কোমলতা পায় নাই তাহার আশায় লুব্ধ হইয়াছিল। নিশানাথও ক্রমশ নিজের বিবেকবুদ্ধির বিরুদ্ধে এই সুন্দরী অনাথার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে ঘাত-প্রতিঘাত আরম্ভ হইয়াছিল, বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি নীতি লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। চাকরি ছাড়িয়া দিয়া এই একান্ত অপরিচিত স্থানে আসিয়া দময়ন্তীর সহিত বাস করিতেছিলেন।......দোষ কাহার, কে কাহাকে অধিক প্রলুব্ধ করিয়াছিল, এ প্রশ্নের অবতারণা এখন নিরর্থক; কিন্তু এ জগতে কর্মফলের হাত এড়ানো যায় না, বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। নিশানাথ কঠিন মূল্য দিয়াছেন, দময়ন্তীও লজ্জা ভয় ও শোকের মাশুল দিয়া জীবনের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। যে ছিদ্রান্বেষী শত্রু তাহাদের দুর্বলতার ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া কৃমিকীটের ন্যায় আত্মপুষ্টি করিতে চায় সে নিমিত্ত মাত্র। আবার তাহাকেও একদিন মাশুল দিতে হইবে—

বিজয়ের ঘরে আলো নিভিয়া গেল; পাশের কুঠিতে বনলক্ষ্মীর আলো জ্বলিল। কিছুক্ষণ পরে বনলক্ষ্মীর ওপাশের কুঠিতে ভুজঙ্গধরবাবুর সেতার বাজিয়া উঠিল! কী সুর ঠিক জানি না, কিন্তু দ্রুত তাহার ছন্দ তাল, অসন্দিগ্ধ তাহার ভঙ্গী; যেন বহিঃপ্রকৃতির রসালতায় নূতন উদ্দীপনা প্রয়োগ করিবার প্রয়াস পাইতেছে, বিরহী প্রিয়তমাকে আহ্বান করিতেছে—

কাজর রুচিহর রয়নী বিশালা,<br>তছুপর অভিসার করু নববালা—

দশ মিনিট পরে সেতার থামিল, ভুজঙ্গধরবাবু আলো নিভাইলেন। কয়েক মিনিট পরে বনলক্ষ্মীর আলোও নিভিয়া গেল। সব কুঠিগুলি অন্ধকার।

আপন আপন নিভৃত কক্ষে ইহারা কি করিতেছে—কী ভাবিতেছে? এই কলোনীর তিমিরাবৃত বুকে কোন্ মানুষটির মনের মধ্যে কোন্ চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে? বনলক্ষ্মী এখন তাহার সঙ্কীর্ণ বিছানায় শুইয়া কি ভাবিতেছে? কাহার কথা ভাবিতেছে?—যদি অন্তর্যামী হইতাম......

অলস ও অসংলগ্ন চিন্তায় বোধ করি ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিলাম। পায়ের শব্দ। দ্রুত অথচ সতর্ক। আমি যে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম তাহার পাশ দিয়া বিজয়ের কুঠির দিকে যাইতেছে। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

যেখানে লুকাইয়া আছি সেখান হইতে বিজয়ের সদর দরজা দশ-বারো হাত দূরে। শুনিতে পাইলাম খুট্‌খুট্‌ শব্দে দরজায় টোকা পড়িল; তারপর দ্বার খোলার শব্দ পাইলাম।

তারপর নিস্তব্ধ।

এই সময় আকাশের অবগুণ্ঠিতা বধূ একবার মুচকি হাসিল। আর আধ মিনিট আগে হাসিলে বিজয়ের নৈশ অতিথিকে দেখিতে পাইতাম।

পাঁচ মিনিট—দশ মিনিট। কুঠির আরও কাছে গেলে হয়তো কিছু শুনিতে পাইতাম, কিন্তু সাহস হইল না। অন্ধকারে হোঁচট কিম্বা আছাড় খাইলে নিজেই ধরা পড়িয়া যাইব।

দ্বার খোলার মৃদু শব্দ! আবার আমার পাশ দিয়া অদৃশ্যচারী চলিয়া যাইতেছে। আকাশ-বধূ হাসিল না। কাহাকেও দেখা গেল না, কেবল একটা চাপা কান্নার নিগৃহীত আওয়াজ কানে আসিল। কে?—কান্নার শব্দ হইতে চিনিতে পারিলাম না, কিন্তু যেই হোক সে স্ত্রীলোক!

তারপর আরও এক ঘণ্টা হাত পা শক্ত করিয়া বসিয়া রহিলাম কিন্তু আর কাহারও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইবে ভাবিতেছি, কানের কাছে ব্যোমকেশের ফিস্‌ফিস্‌ গলা শুনিলাম—'চলে এস। যা দেখবার দেখা হয়েছে।'

ফটকের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম ছায়ামূর্তির মত বরাট দাঁড়াইয়া আছে। তিনজনে ফিরিয়া চলিলাম।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কে কি দেখলে বল।—অজিত, তুমি?'

আমি যাহা শুনিয়াছিলাম বলিলাম।

ব্যোমকেশ নিজের রিপোর্ট দিল,—'আমি একজনকে নেপালবাবুর খিড়কি দিয়ে বেরুতে শুনেছি। নেপালবাবু নয়, কারণ পায়ের শব্দ হাল্কা। পনরো-কুড়ি মিনিট পরে তাকে আবার ফিরে আসতে শুনেছি।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনি?'

বরাট বলিল,—'আমি দময়ন্তীর বাড়ি থেকে কাউকে বেরুতে শুনিনি। কিন্তু অন্য কিছু দেখেছি!'

'কী?'

'বনলক্ষ্মীকে তার ঘর থেকে বেরুতে দেখেছি। আমি ছিলাম দময়ন্তীর বাড়ির পিছনের কোণে; বনলক্ষ্মীর ঘরের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর আলো নিভে গেল, আমি সেই দিকেই তাকিয়ে রইলাম। একবার একটু বিদ্যুৎ চমকালো। দেখলাম বনলক্ষ্মী নিজের কুঠি থেকে বেরুচ্ছে।'

'কোন্ দিকে গেল?'

'তা জানি না। আর বিদ্যুৎ চমকায়নি।'

কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর ব্যোমকেশ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'মুস্কিল মিঞার বৌ মিথ্যা বলেনি। এখন কথা হচ্ছে, বিজয়ের ঘরে যে গিয়েছিল সে কে? মুকুল, না বনলক্ষ্মী? যদি বনলক্ষ্মী বিজয়ের ঘরে গিয়ে থাকে তবে মুকুল কোথায় গিয়েছিল?'

## তেইশ

শেষ রাত্রির দিকে কলকাতায় ফিরিয়া পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরি হইল। শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিলাম আকাশ জলভারাক্রান্ত হইয়া আছে, আজও মেঘ কাটে নাই। বসিবার ঘরে গিয়া দেখি তক্তপোষের উপর ব্যোমকেশ ও আর একজন চায়ের পেয়ালা লইয়া বসিয়াছে। আমার আগমনে লোকটি ঘাড় ফিরাইয়া দন্ত বাহির করিল। দেখিলাম—বিকাশ।

আমিও তক্তপোষে গিয়া বসিলাম। বিকাশের মুখখানা বকাটে ধরনের কিন্তু তাহার দাঁত-খিঁচানো হাসিতে একটা আপন-করা ভাব আছে। তাহার বাচনভঙ্গীও অত্যন্ত সিধা ও বস্তুনিষ্ঠ। সে বলিল,—'উনিশ নম্বরে গিয়ে জান্ কয়লা হয়ে গিয়েছে স্যার।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কী দেখলেন শুনলেন বলুন।'

বিকাশ সঙ্কোচে বলিল,—'কি আর দেখব শুনব স্যার, একেবারে লঝ্‌ঝড় মাল, নাইন্‌টীন্‌-ফিফটীন্‌ মডেল—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিল,—'হ্যাঁ হ্যাঁ। বুঝেছি। ওখানে কি কি খবর পেলেন তাই বলুন।'

বিকাশ বলিল,—'খবর কিস্‌সু নেই। ও বাড়িতে দুটো বস্তাপচা ইস্ত্রীলোক থাকে—'

'দুটো!' ব্যোমকেশের স্বর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

'আজ্ঞে। বাড়িতে তিনটে ঘর আছে, কিন্তু ইস্ত্রীলোক থাকে দুটোই।'

'ঠিক দেখেছেন, দুটোর বেশী নেই?'

বিকাশের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল,—'দুটোর জায়গায় যদি আড়াইটে বেরোয় স্যার, আমার কান কেটে নেবেন। অমন ভুল বিকাশ দত্ত করবে না।'

'না না, আপনি ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু তৃতীয় ঘরে কি কেউ থাকে না, ঘরটা খোলা পড়ে থাকে?'

'খোলা পড়ে থাকবে কেন স্যার, বাড়িওয়ালা ও-ঘরটা নিজের দখলে রেখেছে। মাঝে মাঝে আসে, তখন থাকে।'

'ও—' ব্যোমকেশ আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল।

তারপর বিকাশ আরও কয়েকটা খুচরা খবর দিল, কিন্তু তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং ছাপার অযোগ্য বলিয়া উহ্য রাখিলাম।

বিকাশ চলিয়া যাইবার পর প্রায় পনরো মিনিট ব্যোমকেশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'ব্যস্‌, প্ল্যাম ঠিক করে ফেলেছি। অজিত, তুমি নীচের ডাক্তারখানা থেকে কিছু ব্যাণ্ডেজ, কিছু তুলো আর একশিশি টিংচার আয়োডিন কিনে আনো দেখি।'

অবাক হইয়া বলিলাম,—'কি হবে ওসব?'

'দরকার আছে। যাও, আমি ইতিমধ্যে কলোনীতে টেলিফোন করি।—হ্যাঁ, গোটা দুই বেশ পুরু খাম মনিহারী দোকান থেকে কিনে এনো।' বলিয়া সে টেলিফোন তুলিয়া লইল।

আমি জামা পরিতে পরিতে শুনিলাম সে বলিতেছে,—'হ্যালো,......কে, বিজয়বাবু? একবার নেপালবাবুকে ফোনে ডেকে দেবেন? বিশেষ দরকার।...'

সওদা করিয়া ফিরিয়া দেখিলাম ব্যোমকেশ টেলিফোনে বাক্যালাপ শেষ করিয়াছে, টেবিলে ঝুঁকিয়া বসিয়া দুইটি ফটোগ্রাফ দেখিতেছে।

ফটোগ্রাফ দুইটি সুনয়নার, রমেনবাবু যাহা দিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, —'এবার মন দিয়ে শোনো।'—

দুটি খামে ফটো দুইটি পুরিয়া সযত্নে আঠা জুড়িতে জুড়িতে ব্যোমকেশ বলিল,— 'আমি কিছুদিন থেকে একটা দুর্দান্ত গুণ্ডাকে ধরবার চেষ্টা করছি। গুণ্ডা কাল রাত্রে বাদুরবাগানের মোড়ে আমাকে ছুরি মেরে পালিয়েছে। আঘাত গুরুতর নয়, কিন্তু গুণ্ডা আমাকে ছাড়বে না, আবার চেষ্টা করবে। আমি তাকে আগে ধরব, কিম্বা সে আমাকে আগে মারবে, তা বলা যায় না। যদি সে আমাকে মারে তাহলে গোলাপ কলোনীর রহস্যটা রহস্যই থেকে যাবে। তাই আমি এক উপায় বার করেছি। এই দুটি খামে দুটি ফটো রেখে যাচ্ছি। একটি খাম নেপালবাবুকে দেব, অন্যটি ভুজঙ্গধরবাবুকে। আমি যদি দু'চার দিনের মধ্যে গুণ্ডার ছুরিতে মারা যাই তাহলে তাঁরা খাম খুলে দেখবেন আমি কাকে কলোনীর হত্যা সম্পর্কে সন্দেহ করি। আর যদি গুণ্ডাকে ধরতে পারি তখন আমার অপঘাত-মৃত্যুর সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে; তখন আমি খাম দুটি ওঁদের কাছ থেকে ফেরত নেব এবং গোলাপ কলোনীর অনুসন্ধান যেমন চালাচ্ছি তেমনি চালাতে থাকব। বুঝতে পারলে?'

বলিলাম,—'কিছু কিছু বুঝেছি। কিন্তু এই অভিনয়ের ফল কি হবে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ফল কিছুই হবে কি না এখনও জানি না। মা ফলেষু। নেপালবাবু বারোটার আগেই আসছেন। তুমি এই বেলা আমার হাতে ব্যাণ্ডেজটা বেঁধে দাও। আর,

তোমাকে কি করতে হবে শোনো।'—

আমি তাহার বাঁ হাতের প্রগণ্ডে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে আরম্ভ করিলাম; টিংচার আয়োডিনে তুলা ভিজাইয়া বেশ মোটা করিয়া তাগার মত পটি বাঁধিলাম; কামিজের আস্তিনে ব্যাণ্ডেজ ঢাকা দিয়া একফালি ন্যাকড়া দিয়া হাতটা গলা হইতে ঝুলাইয়া দিলাম। এই সঙ্গে ব্যোমকেশ আমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিল—

বেলা এগারটার সময় দ্বারের কড়া নড়িল। আমি দ্বারের কাছে গিয়া সশঙ্ককণ্ঠে বলিলাম,—'কে? আগে নাম বল তবে দোর খুলব।'

ওপার হইতে আওয়াজ আসিল,—'আমি নেপাল গুপ্ত।' সন্তর্পণে দ্বার একটু খুলিলাম; নেপালবাবু প্রবেশ করিলে আবার হুড়কা লাগাইয়া দিলাম।

নেপালবাবুর মুখ ভয় ও সংশয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'এ কি! মতলব কি আপনাদের?'

ব্যোমকেশ তক্তপোষের উপর বালিসে পিঠ দিয়া অর্ধশয়ান ছিল। ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—'ভয় নেই, নেপালবাবু। এদিকে আসুন, সব বলছি।'

নেপালবাবু দ্বিধাজড়িত পদে ব্যোমকেশের পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যোমকেশ ফ্যাকাসে হাসি হাসিয়া বলিল,—'বসুন। টেলিফোনে সব কথা বলিনি, পাছে জানাজানি হয়। আমাকে গুণ্ডা ছুরি মেরেছে—' কাল্পনিক গুণ্ডার নামে অজস্র মিথ্যা কথা বলিয়া শেষে কহিল,—'আপনিই কলোনীর মধ্যে একমাত্র লোক, যার বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যদি আমার ভালমন্দ কিছু হয়, তাই এই খামখানা আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। আমার মৃত্যু-সংবাদ যদি পান, তখন খামখানা খুলে দেখবেন, কার ওপর আমার সন্দেহ বুঝতে পারবেন। তারপর যদি অনুসন্ধান চালান, অপরাধীকে ধরা শক্ত হবে না। আমি পুলিসকে আমার সন্দেহ জানিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পুলিসের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা সব ভণ্ডুল করে ফেলবে।'

শুনিতে শুনিতে নেপালবাবুর সংশয় শঙ্কা কাটিয়া গিয়াছিল, মুখে সদম্ভ প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি খামখানা সযত্নে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'ভাববেন না, যদি আপনি মারা যান, আমি আছি। পুলিসকে দেখিয়ে দেব বৈজ্ঞানিক প্রথায় অনুসন্ধান কাকে বলে।'

দেখা গেল ইতিপূর্বে তিনি যে বিজয়কে আসামী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন, তাহা আর তাঁহার মনে নাই। বোধহয় বিজয়ের সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—'কিন্তু একটা কথা, আমার মৃত্যু-সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত খাম খুলবেন না। গুণ্ডাটাকে যদি জেলে পুরতে পারি, তাহলে আর আমার প্রাণহানির ভয় থাকবে না; তখন কিন্তু খামখানি যেমন আছে তেমনি অবস্থায় আমাকে ফেরত দিতে হবে।'

নেপালবাবু একটু দুঃখিতভাবে শর্ত স্বীকার করিয়া লইলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিল, বলিল,—'অজিত, পুঁটিরামকে বলে দাও এ বেলা কিছু খাব না।'

'খাবে না কেন?'

'ক্ষিদে নেই।' বলিয়া সে একটু হাসিল।

আমি বেলা একটা নাগাদ আহারাদি শেষ করিয়া আসিলে ব্যোমকেশ বলিল,—'এবার তুমি টেলিফোন কর।'

আমি কলোনীতে টেলিফোন করিলাম। বিজয় ফোন ধরিল। বলিলাম,—'ভুজঙ্গধরবাবুকে একবারটি ডেকে দেবেন?' ভুজঙ্গধরবাবু আসিলে বলিলাম,—'ব্যোমকেশ অসুস্থ, আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়। আপনি আসতে পারবেন?'

মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন,—'নিশ্চয়। কখন আসব বলুন।'

'চারটের সময় এলেই চলবে। কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবেন না। গোপনীয় ব্যাপার।'

'আচ্ছা।'

চারটের কিছু আগেই ভুজঙ্গধরবাবু আসিলেন। দ্বারের সম্মুখে আগের মতই অভিনয় হইল। ভুজঙ্গধরবাবু চমকিত হইলেন, তারপর ব্যোমকেশের আহ্বানে তাহার পাশে গিয়া বসিলেন।

সমস্ত দিনের অনাহারে ব্যোমকেশের মুখ শুষ্ক। সে ভুজঙ্গধরবাবুকে গুণ্ডা কাহিনী শুনাইল। ভুজঙ্গধরবাবু তাহার নাড়ী দেখিলেন, বলিলেন,—'একটু দুর্বল হয়েছেন। ও কিছু নয়।'

ব্যোমকেশ কেন সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে বুঝিলাম। ডাক্তারের চোখে ধরা পড়িতে চায় না।

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'যাক, আসল কথাটা কি বলুন।' আজ তাঁহার আচার আচরণে চপলতা নাই; একটু গম্ভীর।

ব্যোমকেশ আসল কথা বলিল। ভুজঙ্গধর সমস্ত শুনিয়া এবং খামখানি একটু সন্দিগ্ধ-ভাবে পকেটে রাখিয়া বলিলেন,—'এ সব দিকে আমার মাথা খ্যালে না। যা হোক, যদিই আপনার ভালমন্দ কিছু ঘটে—আশা করি সে রকম কিছু ঘটবে না—তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনি বোধহয় এখনও নিঃসন্দেহ হতে পারেননি, তাই ঝেড়ে কাশছেন না। কেমন?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। নিঃসন্দেহ হতে পারলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না, সটান পুলিসকে বলতাম—ঐ তোমার আসামী।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর চা ও সিগারেট সেবন করিয়া ভুজঙ্গধরবাবু বিদায় লইলেন।

আমি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, তিনি ট্রাম ধরিয়া শিয়ালদার দিকে চলিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ এবার গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল,—'ম্যয় ভুখা হুঁ।—পুঁটিরাম!

## চব্বিশ

ভুজঙ্গধরবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে রিম্‌ঝিম্‌ তারপর ঝম্‌ঝম্‌। দীর্ঘ আয়োজনের পর বেশ জুত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, শীঘ্র থামিবে বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যোমকেশের ভাবভঙ্গী হইতে অনুমান হইল, তাহার উদ্যোগ আয়োজনও চরম পরিণতির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে, ক্রমাগত সিগারেট টানিতেছে। এ সব লক্ষণ আমি চিনি। জাল গুটাইয়া আসিতেছে।

মেঘের অন্তরপথে দিন শেষ হইয়া রাত্রি আসিল। আটটার সময় ব্যোমকেশ প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল; অনেকক্ষণ ধরিয়া ফোনের মধ্যে গুজগুজ করিল। তাহার সংলাপের ছিন্নাংশ হইতে এইটুকু শুধু বুঝিলাম যে, গোলাপ কলোনীর উপর কড়া পাহারা রাখা দরকার, কেহ না পালায়।

রাত্রে ঘুমের মধ্যেও অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ জাগিয়া আছে এবং বাড়িময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি হইল। সকালে দেখিলাম, মেঘগুলো ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে; বৃষ্টির তেজ কমিয়াছে, কিন্তু থামে নাই। এগারোটার সময় বৃষ্টি বন্ধ হইয়া পাণ্ডাস সূর্যালোক দেখা দিল।

ব্যোমকেশ ছাতা লইয়া গুটি গুটি বাহির হইতেছে দেখিয়া বলিলাম,—'এ কি! চললে কোথায়?'

উত্তর না দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ফিরিল বিকাল সাড়ে তিনটার সময়। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'আজও কি একাদশী?'

সে বলিল,—'উহু, কাফে সাজাহানে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের ডিম দিয়ে দিব্যি চব্য-চোষ্য হয়েছে।'

'যদি নেপাল গুপ্ত কিম্বা ভুজঙ্গ ডাক্তার দেখে ফেলত!'

'সে সম্ভাবনা কম। তাঁরা কেউ কলোনী থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে গ্রেপ্তার হতেন।'

'যাক, ওদিকে তাহলে পাকা বন্দোবস্ত করেছ। এদিকের খবর কি, গিছলে কোথায়?'

'প্রথমত কর্পোরেশন অফিস। ১৯নং মির্জা লেনের বাড়িটার মালিক কে জানবার কৌতূহল হয়েছিল।'

'মালিক কে—ভুজঙ্গধরবাবু?'

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল,—'না, একজন স্ত্রীলোক।'

'আর কোথায় গিছলে?'

'রমেনবাবুর কাছে। সুনয়নার আরও দুটো ফটো যোগাড় করেছি।'

'আর কি করলে?'

'আর, একবার চীনেপাটিতে গিয়েছিলাম দাঁতের সন্ধানে।'

'দাঁতের সন্ধানে?'

'হ্যাঁ। চীনেরা খুব ভাল দাঁতের ডাক্তার হয় জানো?' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্নান-ঘরের দিকে চলিয়া গেল। আমি বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—নাটকের পঞ্চম অঙ্কে যবনিকা পড়িতে আর দেরি নাই, অথচ নাটকের নায়ক-নায়িকাকে চিনিতে পারিতেছি না কেন?

পরদিন সকালে আকাশ একেবারে পরিষ্কার হইয়া ঝল্‌মলে রোদ উঠিয়াছে, ব্যোমকেশ খবরের কাগজ রাখিয়া বলিল,—'আটটা বাজল। এস, এবার আমাকে কাটা সৈনিক সাজিয়ে দাও। কলোনীতে যেতে হবে।'

'একলা যাবে?'

'না, তুমিও যাবে। গুণ্ডা ধরা পড়েছে। কিন্তু তবু সাবধানের মার নেই। একজন সঙ্গী থাকা দরকার।'

'গুণ্ডা কবে ধরা পড়ল?'

'কাল রাত্তিরে।'

'আজ কলোনীতে যাওয়ার উদ্দেশ্য কি?'

'ছবির খাম ফেরত নিতে হবে। আজ এস্পার কি ওস্পার।'

তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। বাহির হইবার পূর্বে সে একবার প্রমোদ বরাটকে ফোন করিল। আমি একটা মোটা লাঠি হাতে লইলাম।

মোহনপুরের স্টেশনে বরাট উপস্থিত ছিল। ব্যোমকেশের রূপসজ্জা দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হাসছেন কি, ভেক না হলে ভিক পাওয়া যায় না। আমার গুণ্ডার নাম জানেন তো? সজ্জনদাস মিরজাপুরী। যদি দরকার হয়, মনে রাখবেন। আজ কাগজে ঐ নামটা পেয়েছি, কাল রাত্রে বেলগাছিয়া পুলিস তাকে ধরেছে।'

'বাঃ! জুতসই একটা গুণ্ডাও পেয়ে গেছেন।'

'অমন একটা-আধটা গুণ্ডার খবর প্রায় রোজই কাগজে থাকে!'

কলোনীতে উপস্থিত হইলাম। ফটকের কাছে পুলিসের থানা বসিয়াছে, তাছাড়া তারের বেড়া ঘিরিয়া কয়েকজন পাহারাওয়ালা রোঁদ দিতেছে। বেশ একটা থমথমে ভাব।

ফটকের বাহিরে গাড়ি রাখিয়া আমরা প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই চোখে পড়িল, নিশানাথ-বাবুর বারান্দায় বিজয় ও ভুজঙ্গধরবাবু বসিয়া আছেন। ভুজঙ্গধরবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া কাগজ মুড়িয়া রাখিলেন। বিজয় ভ্রূকুটি করিয়া চাহিল। আমরা নিকটস্থ হইলে সে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল,—'এর মানে কি, ব্যোমকেশবাবু? অপরাধীকে ধরবার ক্ষমতা নেই, মাঝ থেকে কলোনীর ওপর চৌকি বসিয়ে দিয়েছেন। পরশু

থেকে আমরা কলোনীর সীমানার মধ্যে বন্দী হয়ে আছি।'

ব্যোমকেশ তাহার রূক্ষতা গায়ে মাখিল না, হাসিমুখে বলিল,—'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যেখানে খুন হয়েছে সেখানে একটু-আধটু অসুবিধে হবে বৈকি। দেখুন না আমার অবস্থা।'

ভুজঙ্গধরবাবু বলিলেন,—'আজ তো আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। গুণ্ডা কি ধরা পড়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, সজ্জনদাস ধরা পড়েছে।'

'সজ্জনদাস! নামটা যেন কোথায় দেখেছি!—ও—আজকের কাগজে আছে। তা—এই সজ্জনদাসই আপনার দুর্জনদাস?'

'হ্যাঁ, পুলিস কাল রাত্রে তাকে ধরেছে! তাই অনেকটা নির্ভয়ে বেরুতে পেরেছি।'

'তাহলে—?' ভুজঙ্গধরবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। আসুন, আপনার সঙ্গে কাজ আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুকে লইয়া আমরা তাঁহার কুঠির দিকে চলিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'খামখানা ফেরত নিতে এসেছি।'

ভুজঙ্গধর বলিলেন,—'বাঁচালেন মশাই, ঘাড় থেকে বোঝা নামল। ভয় হয়েছিল শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাকেই গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।—একটু দাঁড়ান।'

নিজের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া তিনি মিনিটখানেক পরে খাম হাতে বাহির হইয়া আসিলেন। ব্যোমকেশ খাম লইয়া বলিল,—'খোলেননি তো?'

'না, খুলিনি। লোভ যে একেবারে হয়নি তা বলতে পারি না কিন্তু সামলে নিলাম। হাজার হোক, কথা দিয়েছি।—আচ্ছা ব্যোমকেশবাবু, সত্যি কি কিছু জানতে পেরেছেন?'

'এইটুকু জানতে পেরেছি যে স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার।'

'তাই নাকি!' কৌতূহলী চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি মস্তকের পশ্চাৎভাগ চুলকাইতে লাগিলেন।

'ধন্যবাদ।—আবার বোধহয় ওবেলা আসব।' বলিয়া ব্যোমকেশ নেপালবাবুর কুঠির দিকে পা বাড়াইল।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?' ভুজঙ্গধরবাবু প্রশ্ন করিলেন।

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—'নেপালবাবুর সঙ্গে কিছু গোপনীয় কথা আছে।'

ভুজঙ্গধরবাবুর চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, মুখে অর্ধ-হাস্য লইয়া মস্তকের পশ্চাৎভাগে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

নেপালবাবু নিজের ঘরে বসিয়া দাবার ধাঁধা ভাঙিতেছিলেন, ব্যোমকেশকে দেখিয়া এমন কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন যে মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশকে চোখের সামনে দেখিয়া তিনি মোটেই প্রসন্ন হন নাই। তারপর যখন সে খামটি ফেরত চাহিল তখন তিনি নিঃশব্দে খাম আনিয়া ব্যোমকেশের সামনে ফেলিয়া দিয়া আবার দাবার ধাঁধায় মন দিলেন।

আমরা সুড়সুড় করিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। নেপালবাবু আগে হইতেই পুলিসের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, তাহার উপর ব্যোমকেশের ব্যবহারে যে মর্মান্তিক চটিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

## পঁচিশ

কলোনী হইতে আমরা সিধা থানায় ফিরিলাম। বরাটের ঘরে বসিয়া ব্যোমকেশ খাম দুটি সযত্নে পকেট হইতে বাহির করিল। বলিল,—'এইবার প্রমাণ।'

খাম দুটির উপরে কিছু লেখা ছিল না, দেখিতেও সম্পূর্ণ একপ্রকার। তবু কোনও

দুর্লক্ষ্য চিহ্ন দেখিয়া সে একটি খাম বাছিয়া লইল; খামের আঠা লাগানো স্থানটা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল,—'খোলা হয়নি বলেই মনে হচ্ছে।'

অতঃপর খাম কাটিয়া সে ভিতর হইতে অতি সাবধানে ফটো বাহির করিল; ঝক্‌ঝকে পালিশ করা কাগজের উপর শ্যামা-ঝি'র ভূমিকায় সুনয়নার ছবি। বরাট এবং আমি ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছবিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলাম, তারপর বরাট নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—'কৈ, কিছু তো দেখছি না।'

ছবিটা খামে পুরিয়া ব্যোমকেশ সরাইয়া রাখিল। দ্বিতীয় খামটি লইয়া আগের মতই সমীক্ষার পর খাম খুলিতে খুলিতে বলিল,—'এটিও মনে হচ্ছে গোয়ালিনী মার্কা দুধের মত হস্তস্পর্শ অস্পৃষ্ট।'

খামের ভিতর হইতে ছবি বাহির করিয়া সে আলগোছে ছবির দুই পাশ ধরিয়া তুলিয়া ধরিল। তারপর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—'আছে—আছে? বাঘ ফাঁদে পা দিয়েছে!'

বরাট ছবিখানা ব্যোমকেশের হাত হইতে প্রায় কাড়িয়া লইয়া একাগ্রচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, তারপর দ্বিধাভরে বলিল,—'আছে। কিন্তু—'

ব্যোমকেশের মুখে চোখে উত্তেজনা ফাটিয়া পড়িতেছিল, সে একটু শান্ত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'আপনার 'কিন্তু'র জবাব আমি দিতে পারব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস বাঘ এবং বাঘিনীকে এক জায়গাতেই পাওয়া যাবে।—চলুন আর দেরি নয়, খাতাপত্র নিয়ে নিন। আপনাদের বিশেষজ্ঞদের অফিস বোধহয় কলকাতায়?'

'হ্যাঁ। চলুন।'

বিশেষজ্ঞ মহাশয়ের মন্তব্য লইয়া আমরা যখন বাহির হইলাম তখন বেলা দুটা বাজিয়া গিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা কাহারও মনে ছিল না; ব্যোমকেশ বরাটের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—'আসুন, আমাদের বাসাতেই শাক-ভাত খাবেন।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু—ও কাজটা যে এখনও বাকী—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কাজটা পরে হবে। আগে খাওয়া, তারপর খানাতল্লাস—তারপর আবার গোলাপ কলোনী। গোলাপ কলোনীর বিয়োগাদ্য নাটকে আজই যবনিকা পতন হবে।'

গোলাপ কলোনীতে নিশানাথবাবুর বহিঃকক্ষে সভা বসিয়াছিল। ঘরের মধ্যে ছিলাম আমরা তিনজন এবং দময়ন্তী দেবী ছাড়া কলোনীর সকলে। রসিক দে'কেও হাজত হইতে আনা হইয়াছিল। দময়ন্তী দেবীর প্রবল মাথা ধরিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে সভার অধিবেশন হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হইয়াছিল। দুইজন সশস্ত্র পুলিস কর্মচারী দ্বারের কাছে পাহারা দিতেছিল।

রাত্রি প্রায় আটটা। মাথার উপর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল। সামনের দেয়ালে নিশানাথবাবুর একটি বিশদীকৃত ফটোগ্রাফ টাঙানো হইয়াছিল। নিশানাথের ঠোঁটের কোণে একটু নৈর্ব্যক্তিক হাসি, তিনি যেন হাকিমের উচ্চ আসনে বসিয়া নিরাসক্তভাবে বিচার-সভার কার্যবিধি পরিচালনা করিতেছেন।

ব্যোমকেশের মুখে আতপ্ত চাপা উত্তেজনা। সে একে একে সকলের মুখের উপর চোখ বুলাইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল,—'আপনারা শুনে সুখী হবেন নিশানাথবাবু এবং পানুগোপালকে কারা হত্যা করেছিল তা আমরা জানতে পেরেছি।'

কেহ কথা কহিল না। নেপালবাবু ফস্‌ করিয়া দেশলাই জ্বালাইয়া নির্বাপিত চুরুট ধরাইলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'শুধু যে জানতে পেরেছি তা নয়, অকাট্য প্রমাণও পেয়েছি। অপরাধীরা এই ঘরেই আছে। অন্নদাতা নিশানাথবাবুকে যারা বীভৎসভাবে হত্যা করেছে, অসহায় নিরীহ পানুগোপালকে যারা বিষ দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে, আইন তাদের ক্ষমা করবে না। তাদের প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। তাই আমি আহ্বান করছি, মনুষ্যত্বের কণামাত্র যদি অপরাধীদের প্রাণে থাকে তারা অপরাধ স্বীকার করুক।'

এবারও সকলে নীরব। ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের মধ্যে যেন সুপারি-লবঙ্গের মত একটা কিছু ছিল, তিনি সেটা এ গাল হইতে ও গালে লইলেন। বিজয় একদৃষ্টে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিল। মুকুলকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন পাথরের মূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। আজ তাহার মুখে রুজ পাউডার নাই; রক্তহীন সুন্দর মুখে অজ্ঞানিতের বিভীষিকা।

ঘরের অন্য কোণে বনলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখে প্রবল উদ্বেগের ব্যঞ্জনা নাই। সে কোলের উপর হাত রাখিয়া আঙুলগুলা লইয়া খেলা করিতেছে, যেন অদৃশ্য কাঁটা দিয়া অদৃশ্য পশমের জামা বুনিতেছে।

আধ মিনিট পরে ব্যোমকেশ বলিল,—'বেশ, তাহলে আমিই বলছি।—নেপালবাবু, আপনি নিশানাথবাবুর সম্বন্ধে একটা গুপ্তকথা জানেন। আমি যখন জানতে চেয়েছিলাম তখন অস্বীকার করেছিলেন কেন?'

নেপালবাবুর চোখের মধ্যে চকিত আশঙ্কার ছায়া পড়িল, তিনি স্খলিতস্বরে বলিলেন, —'আমি—আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক, কেন অস্বীকার করেছিলেন তার কৈফিয়ৎ দরকার নেই। কিন্তু কার কাছে এই গুপ্তকথা শুনেছিলেন? কে আপনাকে বলেছিল?—আপনার মেয়ে মুকুল?' ব্যোমকেশের তর্জনী মুকুলের দিকে নির্দিষ্ট হইল।

নেপালবাবু ঘোর শব্দ করিয়া গলা পরিষ্কার করিলেন। বলিলেন,—'হ্যাঁ—মানে—মুকুল জানতে পেরেছিল—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কার কাছে জানতে পেরেছিল?—আপনার কাছে?' ব্যোমকেশের তর্জনী দিগ্দর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত বিজয়ের দিকে ফিরিল।

বিজয়ের মুখ সাদা হইয়া গেল, সে মুখ তুলিতে পারিল না। অধোমুখে বলিল,—'হ্যাঁ —আমি বলেছিলাম। কিন্তু—'

ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করিল,—'আর কাউকে বলেছিলেন?'

বিজয়ের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যাকুল চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তারপর আবার অধোবদন হইল। উত্তর দিল না।

ব্যোমকেশ বলিল,—'যাক, আর একটা কথা বলুন। আপনি দোকান থেকে যে টাকা সরিয়েছিলেন সে টাকা কার কাছে রেখেছেন?'

বিজয় হেঁটমুখে নিরুত্তর রহিল।

'বলবেন না?' ব্যোমকেশ ঘরের অন্যদিকে যেখানে রসিক দে বৃষকাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়াছিল সেইদিকে ফিরিল,—'রসিকবাবু, আপনিও দোকানের টাকা চুরি করে একজনের কাছে রেখেছিলেন, তার নাম বলবেন না?'

রসিকের কণ্ঠের হাড় একবার লাফাইয়া উঠিল, কিন্তু সে নীরব রহিল; আঙুলকাটা হাতটা একবার চোখের উপর বুলাইল।

ব্যোমকেশের অধরে শুষ্ক ব্যঙ্গ ফুটিয়া উঠিল। সে বলিল,—'ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের একনিষ্ঠা! কিন্তু একটা কথা বোধহয় আপনারা জানেন না। বিজয়বাবু, আপনি যার কাছে টাকা জমা রাখছেন, রসিকবাবুও ঠিক তার কাছেই টাকা গচ্ছিত রাখছিলেন। এবং দু'জনেই আশা করেছিলেন যে, একদিন শুভ মুহূর্তে বামাল সমেত গোলাপ কলোনী থেকে অদৃশ্য হয়ে কোথাও এক নিভৃত স্থানে রোমান্সের নন্দন-কানন রচনা করবেন! বলিহারি!'

রসিক এবং বিজয় দু'জনেই একদৃষ্টে একজনের দিকে তাকাইয়া একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল,—'বসুন, বসুন, আমি যা জানতে চাই তা জানতে পেরেছি, আর আপনাদের কিছু বলবার দরকার নেই।—ইন্সপেক্টর বরাট, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। আপনি বনলক্ষ্মী দেবীর বাঁ হাতের আঙুলগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখুন।'

বরাট উঠিয়া গিয়া বনলক্ষ্মীর সম্মুখে দাঁড়াইল। বনলক্ষ্মী ক্ষণেক ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বাঁ হাতখানা সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

ভুজঙ্গধরবাবু এইবার কথা কহিলেন। একটু জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন,—'কী ধরনের অভিনয় হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না—নাটক, না প্রহসন, না কমিক অপেরা!'

ব্যোমকেশ উত্তর দিবার পূর্বেই বরাট বলিল,—'এ'র তর্জনীর আগায় কড়া পড়েছে, মনে হয় ইনি তারের যন্ত্র বাজাতে জানেন।'

বরাট স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। ভুজঙ্গধরবাবু অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—'তাহলে কমিক অপেরা।'

ব্যোমকেশ ভুজঙ্গধরবাবুকে হিম-কঠিন দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া বলিল,—'এটা কমিক অপেরা নয় তা আপনি ভাল করেই জানেন; আপনি নিপুণ যন্ত্রী, সুদক্ষ অভিনেতা। —কিন্তু আপাতত আর্ট ছেড়ে বৈষয়িক প্রসঙ্গে আসা যাক। ভুজঙ্গধরবাবু, ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়িটা বোধহয় আপনার, কারণ আপনি ভাড়া আদায় করেন। কেমন?'

ভুজঙ্গধর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার গলার একটা শির দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ পুনশ্চ বলিল,—'কিন্তু কর্পোরেশনের খাতায় দেখলাম বাড়িটা শ্রীমতী নৃত্যকালী দাসের নামে রয়েছে। নৃত্যকালী দাস কি আপনার স্ত্রীর নাম?'

ভুজঙ্গধরবাবুর মুখের উপর দিয়া যেন একটা রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয় হইয়া গেল; মানুষের অন্তরে যতপ্রকার আবেগ উৎপন্ন হইতে পারে, সবগুলি দ্রুত পরম্পরায় তাঁহার মুখে প্রতিফলিত হইল। তারপর তিনি আত্মস্থ হইলেন। সহজ স্বরে বলিলেন,— 'হ্যাঁ, নৃত্যকালী আমার স্ত্রীর নাম, ১৯ নম্বর বাড়িটা আমার স্ত্রীর নামে।'

'কিন্তু—কয়েকদিন আগে আপনি বলেছিলেন, বিলেতে থাকা কালে আপনি এক ইংরেজ মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন!'

'হ্যাঁ। তাঁরই স্বদেশী নাম নৃত্যকালী—বিলিতী নাম ছিল নিটা।'

'ও।—নিটা-নৃত্যকালী-সুনয়না, আপনার স্ত্রীর দেখছি অনেক নাম। তা—তিনি এখন বিলেতে আছেন?'

'হ্যাঁ।—যদি না জার্মান বোমায় মারা গিয়ে থাকেন।'

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—'তিনি মারা যাননি। তিনি বিলিতী মেয়ে নন, খাঁটি দেশী মেয়ে; যদিও আপনাদের বিয়ে বিলেতেই হয়েছিল। আপনার স্ত্রী এই দেশেই আছেন, এমনকি এই ঘরেই আছেন।'

'ভারি আশ্চর্য কথা।'

'ভুজঙ্গধরবাবু, আর অভিনয় করে লাভ কি? আপনারা দু'জনেই উ'চু দরের আর্টিস্ট. আপনাদের অভিনয়ে এতটুকু খুঁত নেই। কিন্তু অভিনয় যতই উচ্চাঙ্গের হোক, শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। অসতর্ক মুহূর্তে আপনি ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন।'

'ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছি। বুঝলাম না।'

'আপনি বুদ্ধিমান, কিন্তু ভয় পেয়ে একটু নির্বুদ্ধিতা করে ফেলেছেন। খামটা আপনার খোলা উচিত হয়নি। খামের মধ্যে যে ছবিটা ছিল, সেটা আপনি নিজে দেখেছেন, স্ত্রীকেও দেখিয়েছেন. ছবির ওপর আপনাদের আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। নৃত্যকালী ওরফে সুনয়না ওরফে বনলক্ষ্মী যে আপনার সহধর্মিণী এবং সহকর্মিণী তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।'

ভুজঙ্গধর চকিত বিস্ফারিত চক্ষে বনলক্ষ্মীর পানে চাহিলেন, বনলক্ষ্মীও বিস্ময়ে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া দিল। ভুজঙ্গধর মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনার হাসির অর্থ সুনয়নার সঙ্গে বনলক্ষ্মীর চেহারার একটুও মিল নেই. এই তো? কিন্তু যে-কথাটা সকলে ভুলে গেছে আমি তা ভুলিনি, ডাক্তার দাস। আপনি বিলেতে গিয়ে প্ল্যাস্টিক সার্জারি শিখেছিলেন। এবং বনলক্ষ্মীর মুখের ওপর শিল্পীর হাতের যে অস্ত্রোপচার হয়েছে একটু ভাল করে পরীক্ষা করলেই তা ধরা পড়বে।

এবং তাঁর সব দাঁতগুলিও যে নিজস্ব নয়, তাও বেশী পরীক্ষার অপেক্ষা রাখে না।'

বনলক্ষ্মীর মুখ-ভাবের কোনও পরিবর্তন হইল না, বিস্ময়বিমূঢ় ফ্যাল্‌ফেলে মুখ লইয়া সে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। ভুজঙ্গধর কয়েক মুহূর্ত নতনেত্রে চাহিয়া যখন চোখ তুলিলেন, তখন মনে হইল অপরিসীম ক্লান্তিতে তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছে। তবু তিনি শান্ত স্বরেই বলিলেন,—'যদি ধরে নেওয়া যায় যে বনলক্ষ্মী আমার স্ত্রী, তাতে কী প্রমাণ হয়? আমি নিশানাথবাবুকে খুন করেছি প্রমাণ হয় কি? যে-সময় নিশানাথবাবুর মৃত্যু হয়, সে-সময় আমি নিজের বারান্দায় বসে সেতার বাজাচ্ছিলাম। তার সাক্ষী আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি যে অ্যালিবাই তৈরি করেছিলেন, তা সত্যিই অদ্ভুত, কিন্তু ধোপে টিকলো না। সে-রাত্রে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে আপনি মিনিট পাঁচেক সেতার বাজিয়েছিলেন বটে, কিন্তু বাকী সময়টা বাজিয়েছিলেন আপনার স্ত্রী। বনলক্ষ্মী দেবী অস্বীকার করলেও তিনি সেতার বাজাতে জানেন, তাঁর আঙুলে কড়া আছে।'

'এটা কি প্রমাণ? না জোড়াতাড়া দেওয়া একটা থিওরী!'

'বেশ, এটা থিওরি। আপনি নিশানাথবাবুকে খুন করেছেন এটা যদি আদালতে প্রমাণ নাও হয়, তবু আপনাদের নিষ্কৃতি নেই ডাক্তার। আপনার ১৯ নম্বর মির্জা লেনের বাড়ি আজ বিকেলে পুলিস খানাতল্লাস করেছে; আপনার বন্ধ ঘরটিতে কি কি আছে আমরা জানতে পেরেছি। আছে একটি অপারেটিং টেবিল এবং একটি স্টিলের আলমারি। আলমারিও আমরা খুলে দেখেছি। তার মধ্যে পাওয়া গেছে—অপারেশনের অস্ত্রশস্ত্র, আপনাদের বিয়ের সার্টিফিকেট, আন্দাজ বিশ হাজার টাকার নোট, তামাক থেকে নিকোটিন চোলাই করবার যন্ত্রপাতি, আর—'

'আর—?'

'মনে করতে পারছেন না? আলমারির চোরা-কুঠুরির মধ্যে যে হীরের নেকলেসটি রেখেছিলেন তার কথা ভুলে গেছেন? মুরারি দত্তর মৃত্যুর সময় ওই নেকলেসটা দোকান থেকে লোপাট হয়ে যায়।—নিশানাথ এবং পানুকে খুন করার অপরাধে যদি বা নিষ্কৃতি পান, মুরারি দত্তকে বিষ খাওয়াবার দায় থেকে উদ্ধার পাবেন কি করে?'

ভুজঙ্গধরবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বরাট রিভলবার বাহির করিল। কিন্তু রিভলবার দরকার হইল না। ভুজঙ্গধর বনলক্ষ্মীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর যে অভিনয় হইল তাহা বাংলা দেশের মঞ্চাভিনয় নয়, হলিউডের সিনেমা। বনলক্ষ্মী উঠিয়া ভুজঙ্গধরের কণ্ঠলগ্না হইল। ভুজঙ্গধর তাহাকে বিপুল আবেগে জড়াইয়া লইয়া তাহার উন্মুক্ত অধরে দীর্ঘ চুম্বন করিলেন। তারপর তাহার মুখখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া স্নেহক্ষরিত স্বরে বলিলেন,—'চল, এবার যাওয়া যাক।'

মৃত্যু আসিল অকস্মাৎ, বজ্রপাতের মত। দু'জনের মুখের মধ্যে কাচ চিবানোর মত একটা শব্দ হইল; দু'জনে একসঙ্গে পড়িয়া গেল। যেখানে দেয়ালের গায়ে নিশানাথের ছবি ঝুলিতেছিল, তাহারই পদমূলে ভূ-লুণ্ঠিত হইল।

আমরা ছুটিয়া গিয়া যখন তাহাদের পাশে উপস্থিত হইলাম, তখন তাহাদের দেহে প্রাণ নাই, কেবল মুখের কাছে একটু মৃদু বাদাম-তেলের গন্ধ লাগিয়া আছে।

বিজয় দাঁড়াইয়া দুঃস্বপ্নভরা চোখে চাহিয়া ছিল। তাহার চোয়ালের হাড় রোমন্থনের ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে নড়িতেছিল। মুকুল তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, চাপা গলায় বলিল,—'এস—চলে এস এখান থেকে—'

বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল, বোধহয় শুনিতে পাইল না। মুকুল তখন তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

## ছাব্বিশ

পরদিন সকালবেলা হ্যারিসন রোডের বাসায় বসিয়া ব্যোমকেশ গভীর মনঃসংযোগে হিসাব কষিতেছিল। হিসাব শেষ হইলে সে একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—'জমা ষাট টাকা, খরচ ঊনষাট টাকা সাড়ে ছয় আনা। নিশানাথবাবু খরচ বাবদ যে ষাট টাকা দিয়েছিলেন, তা থেকে সাড়ে নয় আনা বেঁচেছে।—যথেষ্ট, কি বল?'

আমি নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যান্বেষণের ব্যবসা যে রকম লাভের ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে শেষ পর্যন্ত আমাকেও গোলাপ কলোনীতে ঢুকে পড়তে হবে দেখছি।'

বলিলাম,—'ছাগল চরানোর প্রস্তাবটা ভুলো না।'

সে বলিল,—'খুব মনে করিয়ে দিয়েছ। ছাগলের ব্যবসায় পয়সা আছে। একটা ছাগলের ফার্ম খোলা যাক্, নাম দেওয়া যাবে—ছাগল কলোনী। কেমন হবে?'

'চমৎকার। কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই।'

'নেই কেন? বিদ্যেসাগর মশাই থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে-কাজ করতে পারেন, সে-কাজ তুমি পারবে না! তোমার এত গুমর কিসের?'

বিপজ্জনক প্রসঙ্গ এড়াইয়া গিয়া বলিলাম,—'ব্যোমকেশ, কাল সমস্ত রাত কেবল স্বপ্ন দেখেছি।'

সে চকিত হইয়া বলিল,—'কি স্বপ্ন দেখলে?'

'দেখলাম বনলক্ষ্মী দাঁত বার করে হাসছে। যতবার দেখলাম, ঐ এক স্বপ্ন।'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—'অজিত, মনে আছে আর একবার বনলক্ষ্মীকে স্বপ্ন দেখেছিলে। আমি সত্যবতীকে স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু আসলে একই কথা। মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় কথা। বনলক্ষ্মীর দাঁত যে বাঁধানো তা আমাদের চর্মচক্ষে ধরা পড়েনি বটে, কিন্তু আমাদের অবচেতন মন জানতে পেরেছিল—তাই বারবার স্বপ্ন দেখিয়ে আমাদের জানাবার চেষ্টা করেছিল। এখন আমরা জানি বনলক্ষ্মীর ওপর পাটির দু'পাশের দুটি দাঁত বাঁধানো, তাতে তার মুখের গড়ন হাসি সব বদলে গেছে। সেদিন ভুজঙ্গধর 'দন্তরুচি কৌমুদী' বলেছিলেন তার ইঙ্গিত তখন হৃদয়ঙ্গম হয়নি।'

'দন্তরুচির মধ্যে ইঙ্গিত ছিল নাকি?'

'তা এখনও বোঝোনি? সেদিন সকলের সাক্ষী নেওয়া হচ্ছিল। বাইরের ঘরে বনলক্ষ্মী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। যেই তার সাক্ষী দেবার ডাক পড়ল ঠিক সেই সময় ভুজঙ্গধরবাবু ঘরে ঢুকলেন। বনলক্ষ্মীকে এক নজর দেখেই বুঝলেন সে তাড়াতাড়িতে দাঁত পরে আসতে ভুলে গেছে। যারা বাঁধানো দাঁত পরে, তাদের এরকম ভুল মাঝে মাঝে হয়। ভুজঙ্গধর দেখলেন,—সর্বনাশ। বনলক্ষ্মী যদি বিরল-দন্ত অবস্থায় আমার সামনে আসে, তখনি আমার সন্দেহ হবে! তিনি ইশারা দিলেন—দন্তরুচি কৌমুদী। বনলক্ষ্মী সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুল বুঝতে পারল এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কপালে চুড়ি-সুদ্ধ হাত ঠুকে দিলে। কাচের চুড়ি ভেঙে কপাল কেটে গেল, বনলক্ষ্মী অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বনলক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে ভুজঙ্গধর তার কুঠিতে চললেন। বিজয় যখন তার সঙ্গ নিলে, তখন তিনি তাকে বললেন—ডাক্তারখানা থেকে টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি নিয়ে আসতে। যতক্ষণে বিজয় টিঞ্চার আয়োডিন নিয়ে বনলক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে পৌঁছল, ততক্ষণ বনলক্ষ্মী দাঁত পরে নিয়েছে।'—

দ্বারে টোকা পড়িল।

ইন্সপেক্টর বরাট এবং বিজয়। বিজয়ের ভাবভঙ্গী ভিজা বিড়ালের মত। বরাট চেয়ারে বসিয়া দুই পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, চা খাওয়ান। কাল সমস্ত রাত ঘুমুতে পারিনি। তার ওপর সকাল হতে না হতে বিজয়বাবু এসে উপস্থিত, উনিও ঘুমোননি।'

পাঁটিরামকে চায়ের হুকুম দেওয়া হইল। বরাট বলিল,—'ব্যাপারটা সবই জানি, তবু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে ফাঁক রয়েছে। আপনি বলুন—আমরা শুনব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বিজয়বাবু, আপনিও শুনবেন? গল্পটা আপনার পক্ষে খুব গৌরবজনক নয়।'

বিজয় ম্রিয়মান স্বরে বলিল,—'শুনব।'

'বেশ, তাহলে বলছি।' অতিথিদের সিগারেটের টিন বাড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ আরম্ভ করিল,—'যা বলব তাকে আপনারা গল্প বলেই মনে করবেন, কারণ তার মধ্যে খানিকটা অনুমান, খানিকটা কল্পনা আছে। গল্পের নায়ক নায়িকা অবশ্য ভুজঙ্গধর ডাক্তার আর নৃত্যকালী।

'ভুজঙ্গধর আর নৃত্যকালী স্বামী-স্ত্রী। বাঘ আর বাঘিনী যেমন পরস্পরকে ভালবাসে, কিন্তু বনের অন্য জন্তুদের ভালবাসে না, ওরাও ছিল তেমনি সমাজবিরোধী, জন্মদুষ্ট অপরাধী। পরস্পরের মধ্যে ওরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ আদর্শের সন্ধান পেয়েছিল। ওদের ভালবাসা ছিল যেমন গাঢ় তেমনি তীব্র। বাঘ আর বাঘিনীর ভালবাসা।

'লন্ডনের একটি রেজিস্ট্রি অফিসে ওদের বিয়ে হয়। ডাক্তার তখন প্ল্যাস্টিক সার্জারি শিখতে বিলেত গিয়েছিল, নৃত্যকালী বোধহয় গিয়েছিল কোনও নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে। দু'জনের দেখা হল, রতনে রতন চিনে নিলে। ওদের প্রেমের মূল ভিত্তি বোধহয় ওদের অভিনয় এবং সঙ্গীতের প্রতিভা। দু'জনেই অসামান্য আর্টিস্ট; সেতারে এমন হাত পাকিয়েছিল যে বাজনা শুনে ধরা যেত না কে বাজাচ্ছে, বড় বড় সমজদারেরা ধরতে পারত না।

'দু'জনে মিলে ওরা কত নীতিগর্হিত কাজ করেছিল তার হিসেব আমার জানা নেই —স্টিলের আলমারিতে যে ডায়েরিগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো ভাল করে পড়লে হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে—কিন্তু ডাক্তারের বৈধ এবং অবৈধ ডাক্তারি থেকে বেশ আয় হচ্ছিল; অন্তত উনিশ নম্বর বাড়িটা কেনবার মত টাকা তারা সংগ্রহ করেছিল।

'কিন্তু ও-ধাতুর লোক অল্পে সন্তুষ্ট থাকে না, অপরাধ করার দিকে ওদের একটা অহেতুক প্রবণতা আছে। বছর চারেক আগে ডাক্তার ধরা পড়ল, তার নাম কাটা গেল। ডাক্তার কলকাতার পরিচিত পরিবেশ থেকে ডুব মেরে গোলাপ কলোনীতে গিয়ে বাসা বাঁধল। নিজের সত্যিকার পরিচয় গোপন করল না। কলোনীতে একজন ডাক্তার থাকলে ভাল হয়, তা হোক নাম-কাটা। নিশানাথবাবু তাকে রেখে দিলেন।

'নৃত্যকালী কলকাতায় রয়ে গেল। কোথায় থাকত জানি না, সম্ভবত ১৯ নম্বরে। বাড়ির ভাড়া আদায় করত, তাতেই চালাত। ডাক্তার মাসে একবার দু'বার যেত; হয়তো অবৈধ অপারেশন করত।

'নৃত্যকালী সতীসাধ্বী একনিষ্ঠ স্ত্রীলোক ছিল। কিন্তু নিজের রূপ-যৌবন ছলা-কলার ফাঁদ পেতে শিকার ধরা সম্বন্ধে তার মনে কোনও সংকোচ ছিল না। ডাক্তারেরও অগাধ বিশ্বাস ছিল স্ত্রীর ওপর, সে জানত নৃত্যকালী চিরদিনের জন্য তারই. কখনও আর কারুর হতে পারে না।

'বছর আড়াই আগে ওরা মতলব করল নৃত্যকালী সিনেমায় যোগ দেবে। সিনেমায় টাকা আছে. টাকাওয়ালা লোকও আছে। নৃত্যকালী সিনেমায় ঢুকল। তার অভিনয় দেখে সকলে মুগ্ধ। নৃত্যকালী যদি সিধে পথে চলত, তাহলে সিনেমা থেকে অনেক পয়সা রোজগার করতে পারত। কিন্তু অবৈধ উপায়ে টাকা মারবার একটা সুযোগ যখন হাতের কাছে এসে গেল তখন নৃত্যকালী লোভ সামলাতে পারল না।

'মুরারি দত্ত অতি সাধারণ লম্পট, কিন্তু সে জহরতের দোকানের মালিক। ডাক্তার আর নৃত্যকালী মতলব ঠিক করল। ডাক্তার নিকোটিন তৈরি করল। তারপর নির্দিষ্ট রাত্রে মুরারি দত্তর মৃত্যু হল; তার দোকান থেকে হীরের নেকলেস অদৃশ্য হয়ে গেল।

'প্রথমটা পুলিস জানতে পারেনি সে-রাত্রে মুরারির ঘরে কে এসেছিল। তারপর রমেনবাবু ফাঁস করে দিলেন। নৃত্যকালীর নামে ওয়ারেন্ট বেরুল।

'নৃত্যকালীর আসল চেহারার ফটোগ্রাফ ছিল না বটে, কিন্তু সিনেমা স্টুডিওর সকলেই তাকে দেখেছিল। কোথায় কার চোখে পড়ে যাবে ঠিক নেই, নৃত্যকালীর বাইরে বেরুনো বন্ধ হল। কিন্তু এভাবে তো সারা জীবন চলে না। ডাক্তার নৃত্যকালীর মুখের ওপর প্ল্যাস্টিক অপারেশন করল। কিন্তু শুধু সার্জারি যথেষ্ট নয়, দাঁত দেখে অনেক সময় মানুষ চেনা যায়। নৃত্যকালীর দুটো দাঁত তুলিয়ে ফেলে নকল দাঁত পরিয়ে দেওয়া হল। তার মুখের চেহারা একেবারে বদলে গেল। তখন কার সাধ্য তাকে চেনে।

'তারপর ওরা ঠিক করল নৃত্যকালীরও কলোনীতে থাকা দরকার। স্বামী-স্ত্রীর এক জায়গায় থাকা হবে, তাছাড়া টোপ গেলবার মত মাছও এখানে আছে।

'চায়ের দোকানে বিজয়বাবুর সঙ্গে নৃত্যকালীর দেখা হল; তার করুণ কাহিনী শুনে বিজয়বাবু গলে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে নৃত্যকালী কলোনীতে গিয়ে বসল। ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর পরিচয় আছে কেউ জানল না, পরে যখন পরিচয় হল তখন পরিচয় ঝগড়ায় দাঁড়াল। সকলে জানল ডাক্তারের সঙ্গে নৃত্যকালীর আদায়-কাঁচকলায়।

'নিশানাথ এবং দময়ন্তীর জীবনে গুপ্ত কথা ছিল। প্রথমে সে কথা জানতেন বিজয়বাবু আর ব্রজদাস বাবাজী। কিন্তু নেপালবাবু তাঁর মেয়ে মুকুলকে নিয়ে কলোনীতে আসবার পর বিজয়বাবু মুকুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আবেগের মুখে তিনি একদিন পারিবারিক রহস্য মুকুলের কাছে প্রকাশ করে ফেললেন।—বিজয়বাবু, যদি ভুল করে থাকি, আমাকে সংশোধন করে দেবেন।'

বিজয় নতমুখে নির্বাক রহিল।

ব্যোমকেশ আবার বলিতে লাগিল—

'মুকুল ভাল মেয়ে। বাপ যতদিন চাকরি করতেন ততদিন সে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়েছে, তারপর হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয় হল; কাঁচ বয়সে তাকে অন্ন-চিন্তা করতে হল। সে সিনেমায় কাজ যোগাড় করবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু হল না। তার গলার আওয়াজ বোধহয় 'মাইকে' ভাল আসে না। তিক্ত মন নিয়ে শেষ পর্যন্ত সে কলোনীতে এল এবং বারোয়ারী রাঁধুনীর কাজ করতে লাগল।

'তারপর তার জীবনে এল ক্ষণ-বসন্ত, বিজয়বাবুর ভালবাসা পেয়ে তার জীবনের রঙ বদলে গেল। বিয়ের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে, হঠাৎ আবার ভাগ্য-বিপর্যয় হল। বনলক্ষ্মীকে দেখে বিজয়বাবু মুকুলের ভালবাসা ভুলে গেলেন। বনলক্ষ্মী মুকুলের মত রূপসী নয়, কিন্তু তার একটা দুর্নিবার চৌম্বক শক্তি ছিল। বিজয়বাবু সেই চুম্বকের আকর্ষণে পড়ে গেলেন। মুকুলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিলেন।

'প্রাণের জ্বালায় মুকুল নিশানাথবাবুর গুপ্ত কথা বাপকে বলল। নেপালবাবুর উচ্চাশা ছিল তিনি কলোনীর কর্ণধার হবেন, তিনি তড়্‌পাতে লাগলেন। কিন্তু হাজার হলেও অন্তরে তিনি ভদ্রলোক, blackmail -এর চিন্তা তাঁর মনেও এল না।

'এদিকে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তার অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী জেনেও তাকে বিয়ে করবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। নিশানাথ কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালেন, কুলত্যাগিনীর সঙ্গে তিনি ভাইপোর বিয়ে দেবেন না। বংশে একটা কেলেঙ্কারিই যথেষ্ট।

'কাকার হুকুম ডিঙিয়ে বিয়ে করবার সাহস বিজয়বাবুর ছিল না, কাকা যদি তাড়িয়ে দেন তাহলে না খেয়ে মরতে হবে। দুই প্রেমিক প্রেমিকা মিলে পরামর্শ হল; দোকান থেকে কিছু কিছু টাকা সরিয়ে বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছে জমা করবেন, তারপর যথেষ্ট টাকা জমলে দু'জনে কলোনী ছেড়ে চলে যাবেন। ওদিকে রসিক দে'র সঙ্গে বনলক্ষ্মী ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা করেছিল। রসিক কপর্দকহীন যুবক, সেও বনলক্ষ্মীকে দেখে মজেছিল; বনলক্ষ্মীর কলঙ্ক ছিল বলেই বোধহয় তার দিকে হাত বাড়াতে সাহস করেছিল। বনলক্ষ্মীও তাকে নিরাশ করেনি, ভরসা দিয়েছিল কিছু টাকা জমাতে পারলেই দু'জনে পালিয়ে গিয়ে কোথাও বাসা বাঁধবে। এইভাবে রসিক এবং বিজয়বাবুর টাকা ১৯ নম্বর

মির্জা লেনের লোহার আলমারিতে জমা হচ্ছিল।

'তারপর একদিন বিজয়বাবু বনলক্ষ্মীর কাছেও পারিবারিক গুপ্ত কথাটি বলে ফেললেন। ভাবপ্রবণ প্রকৃতির ঐ এক বিপদ, যখন আবেগ উপস্থিত হয় তখন অতিবড় গুপ্ত কথাও চেপে রাখতে পারেন না।

'গুপ্ত কথা জানতে পেরে বনলক্ষ্মী সেই রাত্রেই ডাক্তারকে গিয়ে বলল; আনন্দে ডাক্তারের বুক নেচে উঠল। অতি যত্নে দু'জনে ফাঁদ পাতল। নিশানাথকে হুমকি দিতে গেলে বিপরীত ফল ফলতে পারে, কিন্তু দময়ন্তী দেবী স্ত্রীলোক, কলঙ্কের ভয় তাঁরই বেশী। সুতরাং তিনি blackmail-এর উপযুক্ত পাত্রী।

'দময়ন্তী দেবীর শোষণ শুরু হল; আট মাস ধরে চলতে লাগল। কিন্তু শেষের দিকে নিশানাথবাবুর সন্দেহ হল, তিনি আমার কাছে এলেন।

'সুনয়না কলোনীতে আছে এ সন্দেহ নিশানাথের কেমন করে হয়েছিল তা আমি জানি না, অনুমান করাও কঠিন। মানুষের জীবনে অতর্কিতে অভাবিত ঘটনা ঘটে, তেমনি কোনও ঘটনার ফলে হয়তো নিশানাথের সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে গবেষণা নিষ্ফল।

'নিশানাথের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমরা রমেন মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে কলোনীতে গেলাম। রমেনবাবুকে ডাক্তার চিনত না কিন্তু সুনয়না চিনত; স্টুডিওতে অনেকবার দেখেছে, মুরারি দত্তর বন্ধু। তাই রমেনবাবুকে দেখে সুনয়না ভয় পেয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না, সুনয়নার খোঁজেই আমরা কলোনীতে এসেছি।

'দাস-দম্পতি বড় দ্বিধায় পড়ল। এ অবস্থায় কী করা যেতে পারে? বনলক্ষ্মী যদি কলোনী ছেড়ে পালায় তাহলে খুঁচিয়ে সন্দেহ জাগানো হবে, পুলিস বনলক্ষ্মীকে খুঁজতে আরম্ভ করবে। বনলক্ষ্মী যদি ধরা পড়ে, তার মুখে অপারেশনের সূক্ষ্ম চিহ্ন বিশেষজ্ঞের চোখে ধরা পড়ে যাবে, বনলক্ষ্মীই যে সুনয়না তা আর গোপন থাকবে না। তবে উপায়?

'নিশানাথবাবু যত নষ্টের গোড়া, তিনিই ব্যোমকেশ বক্সীকে ডেকে এনেছেন। তাঁর যদি হঠাৎ মৃত্যু হয় তাহলে সুনয়নার তল্লাস বন্ধ হয়ে যাবে, নিষ্কণ্টকে দময়ন্তী দেবীর রুধির শোষণ করা চলবে।

'কিন্তু নিশানাথবাবুর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু বলে প্রতিপন্ন হওয়া চাই। তাঁর ব্লাড-প্রেসার আছে, ব্লাড-প্রেসারের রুগী বেশির ভাগই হঠাৎ মরে—হার্টফেল হয় কিম্বা মাথার শিরা ছিঁড়ে যায়। সুতরাং কাজটা সাবধানে করতে পারলে কারুর সন্দেহ হবার কথা নয়।

'ভুজঙ্গধর ডাক্তার খুব সহজেই নিশানাথকে মারতে পারত। সে প্রায়ই নিশানাথের রক্ত-মোক্ষণ করে দিত। এখন রক্ত-মোক্ষণ ছুতোয় যদি একটু হাওয়া তাঁর ধমনীতে ঢুকিয়ে দিতে পারত, তাহলে তিন মিনিটের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হত। অ্যাড্রেনালিন ইন্‌জেকশন দিলেও একই ফল হত; তাঁর পায়ে দড়ি বেঁধে কড়িকাঠে ঝোলাবার দরকার হত না। কিন্তু তাতে একটা বিপদ ছিল। ইন্‌জেকশন দিলে চামড়ার ওপর দাগ না থাক, শিরার ওপর দাগ থেকে যায়, পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষায় ধরা পড়ে। নিশানাথের গায়ে ইন্‌জেকশনের চিহ্ন পাওয়া গেলে প্রথমেই সন্দেহ হত ডাক্তার ভুজঙ্গধরের ওপর। সুতরাং ভুজঙ্গধর সে রাস্তা দিয়ে গেল না; অত্যন্ত স্থূল প্রথায় নিশানাথবাবুকে মারলে।

'ব্যবস্থা খুব ভাল করেছিল। বেনামী চিঠি পেয়ে বিজয়বাবু কলকাতায় এলেন। ওদিকে লাল সিং-এর চিঠি পেয়ে রাত্রি দশটার সময় দময়ন্তী পিছনের দরজা দিয়ে কাচ-ঘরে চলে গেলেন। রাস্তা সাফ, ডাক্তার সেতার বাজাচ্ছিল, বনলক্ষ্মীর হাতে সেতার দিয়ে নিশানাথের ঘরে ঢুকল। সম্ভবত নিশানাথ তখন জেগে ছিলেন। ডাক্তার আলো জ্বেলেই জানালা বন্ধ করে দিলে। তারপর—

'দুটো ভুল ডাক্তার করেছিল। কাজ শেষ করে জানালাটা খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, আর তাড়াতাড়িতে মোজা জোড়া খুলে নিয়ে যায়নি। এ দুটো ভুল যদি সে না করত তাহলে নিশানাথবাবুর মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে কারুর সন্দেহ হত না।

'পানুগোপাল কিছু দেখেছিল। কী দেখেছিল তা চিরদিনের জন্যে অজ্ঞাত থেকে যাবে।

আমার বিশ্বাস সে বাইরে থেকে ডাক্তারকে জানালা বন্ধ করতে দেখেছিল। নিশানাথের মৃত্যুটা যতক্ষণ স্বাভাবিক মৃত্যু মনে হয়েছিল ততক্ষণ সে কিছু বলেনি, কিন্তু যখন বুঝতে পারল মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তখন সে উত্তেজিত হয়ে যা দেখেছিল তা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু তার কপাল খারাপ, সে কিছু বলতে পারল না।

'ডাক্তার বুঝলে পানু কিছু দেখেছে। সে আর দেরি করল না, পানুর অবর্তমানে তার কানের ওষুধে নিকোটিন মিশিয়ে রেখে এল।

'তারপর যা যা ঘটেছে সবই আপনাদের জানা, নতুন করে বলবার কিছু নেই।—কাল ডাক্তার আর বনলক্ষ্মীর আত্মহত্যা আপনাদের হয়তো আকস্মিক মনে হয়েছিল। আসলে ওরা তৈরী হয়ে এসেছিল।'

বরাট বলিল,—'কিন্তু সায়েনাইডের অ্যাম্পুল কখন মুখে দিলে জানতে পারিনি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দুটো সায়েনাইডের অ্যাম্পুল ডাক্তারের মুখে ছিল, মুখে করেই এসেছিল। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তখন প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিনি। তারপর ডাক্তার যখন দেখল আর নিস্তার নেই, তখন সে উঠে বনলক্ষ্মীকে চুমো খেল। এ শুধু প্রণয়ীদের বিদায় চুম্বন নয়, মৃত্যু চুম্বন। চুমু খাবার সময় ডাক্তার একটা অ্যাম্পুল স্ত্রীর মুখে দিয়েছিল।'—

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ব্যোমকেশই আবার কথা কহিল—'যাক, এবার আপনারা দু'একটা খবর দিন। রসিকের কি ব্যবস্থা হল?'

বরাট বলিল,—'রসিকের ওপর থেকে বিজয়বাবু অভিযোগ তুলে নিয়েছেন। তাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

'ভাল। বিজয়বাবু, পরশু রাত্রে আন্দাজ এগারোটার সময় যে-মেয়েটি আপনার ঘরে গিয়েছিল সে কে? মুকুল?'

বিজয় চমকিয়া মুখ তুলিল, লজ্জালাঞ্ছিত মুখে বলিল,—'হ্যাঁ।'

'তাহলে বনলক্ষ্মী গিয়েছিল স্বামীর কাছে। ডাক্তার সেতার বাজিয়ে তাকে ডেকেছিল। মুকুল আপনার কাছে গিয়েছিল কেন? আপনি ওদের কলোনী থেকে চলে যাবার হুকুম দিয়েছিলেন, তাই সে আপনার কৃপা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল?'

বিজয় অধোবদনে রহিল।

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল,—'বিজয়বাবু, আশা করি আপনি মুকুলকে বিয়ে করবেন। সে আপনাকে ভালবাসে। এত ভালবাসা উপেক্ষার বস্তু নয়।'

বিজয় মৌন রহিল, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, মৌনং সম্মতি-লক্ষণম্। মুকুলের সঙ্গে হয়তো ইতিমধ্যেই পুনর্মিলন হইয়া গিয়াছে।

বিদায়কালে বিজয় আমতা-আমতা করিয়া বলিল,—'ব্যোমকেশবাবু, আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন তা শোধ দেবার নয়। কিন্তু কাকিমা বলেছেন আপনাকে আমাদের কাছ থেকে একটা উপহার নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ ভ্রূ তুলিয়া বলিল,—'কি উপহার?'

বিজয় বলিল, 'কাকার পাঁচ হাজার টাকার জীবনবীমা ছিল, দু'চার দিনের মধ্যেই কাকিমা সে টাকা পাবেন। ওটা আপনাকে নিতে হবে।'

ব্যোমকেশ আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া হাসিল। বলিল,—'বেশ, নেব। আপনার কাকিমাকে আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ জানাবেন।'

প্রশ্ন করিলাম,—'ছাগল কলোনীর প্রস্তাব কি তাহলে মুলতুবি রইল?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা বলা যায় না। এই মূলধন দিয়েই ছাগল কলোনীর পত্তন হতে পারে। বিজয়বাবু প্রস্তুত থাকবেন, গোলাপ কলোনীর পাশে হয়তো শীগ্‌গির ছাগল কলোনীর আবির্ভাব হবে।'